চারিত্রপূজা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়
২১০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়
২১০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
প্রকাশক—রায়সাহেব শ্রীজগদানন্দ রায়।

চারিত্রপূজা

পুনর্মুদ্রণ ... (১১০০) ভাদ্র, ১৩৩৭ সাল।

মূল্য—আট আনা।

শান্তিনিকেতন প্রেস। শান্তিনিকেতন, (বীরভূম)।
রায়সাহেব শ্রীজগদানন্দ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সূচী

চারিত্রপূজা

চারিত্রপূজা

স্বীকার করিতেই হইবে, মৃত মান্যব্যক্তির জন্য পাথরের মূর্ত্তি গড়া আমাদের দেশে চলিত ছিল না ; এই প্রকার মার্ব্বলপাথরের পিণ্ডদান-প্রথা আমাদের কাছে অভ্যস্ত নহে। আমরা হাহাকার করিয়াছি, অশ্রুপাত করিয়াছি, বলিয়াছি, 'আহা, দেশের এতো-বড় লোকটাও গেল'—কিন্তু কমিটির উপর স্মৃতিরক্ষার ভার দিই নাই।

এখন আমরা শিখিয়াছি এইরূপই কর্ত্তব্য, অথচ তাহা আমাদের সংস্কারগত হয় নাই, এইজন্য কর্ত্তব্য পালিত না হইলে মুখে লজ্জা দিই, কিন্তু হৃদয়ে আঘাত পাই না।

ভিন্ন মানুষের হৃদয়ের বৃত্তি একরকম হইলেও বাহিরে তাহার প্রকাশ নানাকারণে নানারকম হইয়া থাকে। ইংরাজ প্রিয়ব্যক্তির মৃতদেহ মাটির মধ্যে ঢাকিয়া পাথরে চাপা দিয়া রাখে, তাহাতে নামধাম-তারিখ খুদিয়া রাখে এবং তাহার চারিদিকে ফুলের গাছ করে। আমরা পরমাত্মীয়ের মৃতদেহ শ্মশানে ভস্ম করিয়া চলিয়া আসি। কিন্তু প্রিয়-জনের প্রিয়ত্ব কি আমাদের কাছে কিছুমাত্র অল্প ? ভালবাসিতে এবং শোক করিতে আমরা জানি না, ইংরাজ জানে, এ-কথা কবর এবং শ্মশানের সাক্ষ্য লইয়া ঘোষণা করিলেও, হৃদয় তাহাতে সায় দিতে পারে না।

ইহার অনুরূপ তর্ক এই যে, "থ্যাঙ্ক্ য়ু"র প্রতিবাক্য আমরা বাংলায় ব্যবহার করি না, অতএব আমরা অকৃতজ্ঞ।

"থ্যাঙ্ক্ য়ু" শব্দের দ্বারা হাতে-হাতে কৃতজ্ঞতা ঝাড়িয়া ফেলিবার একটা চেষ্টা আছে, সেটা আমরা জবাবস্বরূপ বলিতে পারি। য়ুরোপ কাহারো কাছে বাধ্য থাকিতে চাহে না—সে স্বতন্ত্র। কাহারো কাছে তাহার কোনো দাবী নাই, সুতরাং যাহা পায়, তাহা সে গায়ে রাখে না। শুধিয়া তখনি নিষ্কৃতি পাইতে চায়।

পরস্পরের প্রতি আমাদের দাবী আছে, আমাদের সমাজের গঠনই সেইরূপ। আমাদের সমাজে যে ধনী, সে দান করিবে; যে গৃহী, সে আতিথ্য করিবে; যে জ্ঞানী, সে অধ্যাপন করিবে; যে জ্যেষ্ঠ, সে পালন করিবে; যে কনিষ্ঠ, সে সেবা করিবে;—ইহাই বিধান। পরস্পরের দাবীতে আমরা পরস্পর বাধ্য। ইহাই আমরা মঙ্গল বলিয়া জানি। প্রার্থী যদি ফিরিয়া যায়, তবে ধনীর পক্ষেই তাহা অশুভ; অতিথি যদি ফিরিয়া যায়, তবে গৃহীর পক্ষেই তাহা অকল্যাণ। শুভকর্ম্ম কর্ম্মকর্ত্তার পক্ষেই শুভ। এইজন্য নিমন্ত্রণকারীই নিমন্ত্রিতের নিকট কৃতজ্ঞতা-স্বীকার করেন। আহূতবর্গের সন্তোষে যে একটি মঙ্গলজ্যোতি গৃহ পরিব্যাপ্ত করিয়া উদ্ভাসিত হয়, তাহা নিমন্ত্রণকারীর পক্ষেই পুরস্কার। আমাদের দেশে নিমন্ত্রণের প্রধানতম ফল নিমন্ত্রিত পায় না, নিমন্ত্রণ-কারীই পায়—তাহা, মঙ্গলকর্ম্ম সুসম্পন্ন করিবার আনন্দ, তাহা রসনা-তৃপ্তির অপেক্ষা অধিক।

এই মঙ্গল যদি আমাদের সমাজের মুখ্য অবলম্বন না হইত, তবে সমাজের প্রকৃতি এবং কর্ম্ম অন্যরকমের হইত। স্বার্থ এবং স্বাতন্ত্র্যকে যে বড়ো করিয়া দেখে, পরের জন্য কাজ করিতে তাহার সর্ব্বদা উত্তেজনা আবশ্যক করে। সে যাহা দেয়, অন্তত তাহার একটা রসিদ লিখিয়া রাখিতে চায়। তাহার যে ক্ষমতা আছে, সেই ক্ষমতার দ্বারা অন্যের

উপরে সে যদি প্রভাববিস্তার করিতে না পারে, তবে ক্ষমতাপ্রয়োগ করিবার যথেষ্ট উৎসাহ তাহার না থাকিবার কথা। এইজন্য স্বাতন্ত্র্য-প্রধান সমাজকে ক্ষমতাশালী লোকের কাছ হইতে কাজ আদায় করিবার জন্য সর্ব্বদা বাহবা দিতে হয়; যে দান করে, তাহার যেমন সমারোহ, যে গ্রহণ করে, তাহারও তেম্‌নি অনেক আয়োজনের দরকার হয়। প্রত্যেক সমাজ নিজের বিশেষ প্রকৃতি এবং বিশেষ আবশ্যক অনুসারে নিজের নিয়মে নিজের কাজ-উদ্ধারে প্রবৃত্ত হয়। দাতা দান করিয়াই কৃতার্থ, এই ভাবটার উপরেই আমরা অত্যন্ত ঝোঁক দিয়া থাকি; আর গ্রহীতা গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ, এই ভাবটার উপরেই য়ুরোপ অধিক ঝোঁক দিয়া থাকে। স্বার্থের দিক্ দিয়া দেখিলে যে গ্রহণ করে, তাহারই গরজ বেশি, মঙ্গলের দিক্ দিয়া দেখিলে যে দান করে, তাহারই গরজ বেশি। অতএব আদর্শভেদে ভিন্ন সমাজ ভিন্ন পথ দিয়া নিজের কাজে যাত্রা করে।

কিন্তু স্বার্থের উত্তেজনা মানবপ্রকৃতিতে মঙ্গলের উত্তেজনা অপেক্ষা সহজ এবং প্রবল, তাহাতে সন্দেহ নাই। অর্থনীতিশাস্ত্রে বলে, ডিমাণ্ড্ অনুসারে সাপ্লাই অর্থাৎ চাহিদা অনুসারে জোগান্ হইয়া থাকে। খরিদদারের তরফে যেখানে অধিক মূল্য হাঁকে, ব্যবসাদারের তরফ হইতে সেইখানেই অধিক মাল আসিয়া পড়ে। যে সমাজে ক্ষমতার মূল্য বেশি, সেই সমাজেই ক্ষমতাশালীর চেষ্টা বেশি হইয়া থাকে, ইহাই সহজ স্বভাবের নিয়ম।

কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষ বরাবর সহজ স্বভাবের নিয়মের উপর জয়ী হইবার চেষ্টা করিয়াছে। অর্থনীতিশাস্ত্র অধিকাংশ জায়গাতেই খাটে, অথচ ভারতবর্ষে তাহা উলট্‌পালট্ হইয়া যায়। ছোটো-বড়ো সকল বিষয়েই ভারতবর্ষ মানবস্বভাবকে সহজ স্বভাবের ঊর্দ্ধে রাখিতে চেষ্টা করিয়াছে। ক্ষুধাতৃষ্ণা হইতে আরম্ভ করিয়া ধনমান-সম্ভোগ পর্য্যন্ত কোনো বিষয়েই তাহার চালচলন সহজরকম নহে। আর

কিছু না পায় তো অন্তত তিথিনক্ষত্রের দোহাই দিয়া সে আমাদের অত্যন্ত স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলাকে পদে-পদে প্রতিহত করিয়া রাখে। এই দুঃসাধ্য কার্য্যে সে অনেকসময় মূঢ়তাকে সহায় করিয়া অবশেষে সেই মূঢ়তার দ্বারা নিজের সর্ব্বনাশসাধন করিয়াছে। ইহা হইতে, তাহার চেষ্টার একান্ত লক্ষ্য কোন্ দিকে, অন্তত তাহা বুঝা যায়।

দুর্ভাগ্যক্রমে মানুষের দৃষ্টি সঙ্কীর্ণ। এইজন্য তাহার প্রবল চেষ্টা এমন-সকল উপায় অবলম্বন করে, যাহাতে শেষকালে সেই উপায়ের দ্বারাতেই সে মারা পড়ে। সমস্ত সমাজকে নিষ্কাম মঙ্গলকর্ম্মে দীক্ষিত করিবার প্রবল আবেগে ভারতবর্ষ অন্ধতাকেও শ্রেয়োজ্ঞান করিয়াছে। এ-কথা ভুলিয়া গেছে যে, বরঞ্চ স্বার্থের কাজ অন্ধভাবে চলিতে পারে, কিন্তু মঙ্গলের কাজ তাহা পারে না। সজ্ঞান ইচ্ছার উপরেই মঙ্গলের মঙ্গলত্ব প্রতিষ্ঠিত। কলেই হউক, আর বলেই হউক, উপযুক্ত কাজটি করাইয়া লইতে পারিলেই স্বার্থসাধন হয়, কিন্তু সম্পূর্ণ বিবেকের সঙ্গে কাজ না করিলে কেবল কাজের দ্বারা মঙ্গলসাধন হইতে পারে না। তিথিনক্ষত্রের বিভীষিকা এবং জন্মজন্মান্তরের সদ্গতির লোভদ্বারা মঙ্গলকাজ করাইবার চেষ্টা করিলে, কেবল কাজই করান হয়, মঙ্গল করান হয় না। কারণ, মঙ্গল স্বার্থের ন্যায় অন্য লক্ষ্যের অপেক্ষা করে না, মঙ্গলেই মঙ্গলের পূর্ণতা।

কিন্তু বৃহৎ জনসমাজকে এক আদর্শে বাঁধিবার সময় মানুষের ধৈর্য্য থাকে না। তখন ফললাভের প্রতি তাহার আগ্রহ ক্রমে যতোই বাড়িতে থাকে, ততোই উপায়সম্বন্ধে তাহার আর বিচার থাকে না। রাষ্ট্রহিতৈষা যে-সকল দেশের উচ্চতম আদর্শ, সেখানেও এই অন্ধতা দেখিতে পাওয়া যায়। রাষ্ট্রহিতৈষার চেষ্টাবেগ যতোই বাড়িতে থাকে, ততোই সত্যমিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়ের বুদ্ধি তিরোহিত হইতে থাকে। ইতিহাসকে অলীক করিয়া, প্রতিজ্ঞাকে লঙ্ঘন করিয়া, ভদ্রনীতিকে উপেক্ষা করিয়া, রাষ্ট্র-

মহিমাকে বড়ো করিবার চেষ্টা হয়,—অন্ধ অহঙ্কারকে প্রতিদিন অভ্রভেদী করিয়া তোলাকেও শ্রেয় বলিয়া বোধ হইতে থাকে—অবশেষে, ধর্ম্ম, যিনি সকলকে ধারণ করিয়া রক্ষা করেন, তাঁহাকে সবলে আঘাত করিয়া নিজের আশ্রয়শাখাটিকেই ছেদন করা হয়। ধর্ম্ম কলের মধ্যেও বিনষ্ট হন, বলের দ্বারাও বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকেন। আমরা আমাদের মঙ্গলকে কলের মধ্যে ধরিয়া রাখিতে গিয়া মারিয়া ফেলিয়াছি, য়ুরোপ স্বার্থোন্নতিকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিতে গিয়া প্রত্যহই বিনাশ করিতেছে।

অতএব, আমাদের প্রাচীনসমাজ আজ নিজের মঙ্গল হারাইয়াছে, দুর্গতির বিস্তীর্ণ জালের মধ্যে অঙ্গে-প্রত্যঙ্গে জড়ীভূত হইয়া আছে, ইহা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি বটে; তবু বলিতে হইবে, মঙ্গলকেই লাভ করিবার জন্য ভারতবর্ষের সর্ব্বাঙ্গীণ চেষ্টা ছিল। স্বার্থসাধনের প্রয়াসই যদি স্বভাবের সহজ নিয়ম হয়, তবে সে নিয়মকে ভারতবর্ষ উপেক্ষা করিয়াছিল। সেই নিয়মকে উপেক্ষা করিয়াই যে তাহার দুর্গতি ঘটিয়াছে, তাহা নহে; কারণ, সে নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়াও গুরুতর দুর্গতি ঘটে—কিন্তু সমাজকে সকল দিক্ হইতে মঙ্গলজালে জড়িত করিবার প্রবল চেষ্টায় অন্ধ হইয়া, সে নিজের চেষ্টাকে নিজে ব্যর্থ করিয়াছে। ধৈর্য্যের সহিত যদি জ্ঞানের উপর এই মঙ্গলকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করি, তবে আমাদের সামাজিক আদর্শ সভ্যজগতের আদর্শের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান পাইবে। অর্থাৎ আমাদের পিতামহদের শুভ ইচ্ছাকে যদি কলের দ্বারা সফল করিবার চেষ্টা না করিয়া জ্ঞানের দ্বারা সফল করিবার চেষ্টা করি, তবে ধর্ম্ম আমাদের সহায় হইবেন।

কিন্তু কল-জিনিষটাকে একেবারে বরখাস্ত করা যায় না। এক এক দেবতার এক এক বাহন আছে—সম্প্রদায়দেবতার বাহন কল। বহুতর লোককে এক আদর্শে গঠিত করিতে গেলে বোধ করি বারো-আনা লোককে অন্ধ অভ্যাসের বশবর্ত্তী করিতে হয়। জগতে যতো ধর্ম্মসম্প্রদায়

আছে, তাহাদের মধ্যে সজ্ঞান নিষ্ঠাসম্পন্ন লোক বেশি পাওয়া যায় না। খ্রীষ্টানজাতির মধ্যে আন্তরিক খ্রীষ্টান কতো অল্প, তাহা দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা জানিতে পাইয়াছি, এবং হিন্দুদের মধ্যে অন্ধসংস্কারবিমুক্ত যথার্থ জ্ঞানী হিন্দু যে কতো বিরল, তাহা আমরা চিরাভ্যাসের জড়তা-বশত ভালো করিয়া জানিতেও পাই না। সকল লোকের প্রকৃতি যখন এক হয় না, তখন এক আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করিতে গেলে অনেক বাজে মাল্‌মস্‌লা আসিয়া পড়ে। যে সকল বাছা-বাছা লোক এই আদর্শের অনুসারী, তাঁহারা সাম্প্রদায়িক কলের ভাবটাকে প্রাণের দ্বারা ঢাকিয়া লন। কিন্তু কলটাই যদি বিপুল হইয়া উঠিয়া প্রাণকে পিষিয়া ফেলে, প্রাণকে খেলিবার সুবিধা না দেয়, তবেই বিপদ্। সকল দেশেই মাঝে মাঝে মহাপুরুষরা উঠিয়া সামাজিক কলের বিরুদ্ধে সকলকে সচেতন করিতে চেষ্টা করেন—সকলকে সতর্ক করিয়া বলেন, কলের অন্ধ গতিকেই সকলে প্রাণের গতি বলিয়া যেন ভ্রম না করে। অতএব বাহনটিই যখন সমাজদেবতার কাঁধের উপর চড়িয়া বসিবার চেষ্টা করে, যন্ত্র যখন যন্ত্রীকেই নিজের যন্ত্রস্বরূপ করিবার উপক্রম করে, তখন সমাজে ও সমাজের কলে মাঝে মাঝে ঝুটাপুটি বাধিয়া যায়। মানুষ যদি সেই যুদ্ধে কলের উপর জয়ী হয় তো ভালো, আর কল যদি মানুষকে পরাভূত করিয়া চাকার নীচে চাপিয়া রাখে, তবেই সর্ব্বনাশ।

আমাদের সমাজের প্রাচীন কলটা নিজের সচেতন আদর্শকে অন্তরাল করিয়া ফেলিয়াছে বলিয়া, জড় অনুষ্ঠানে জ্ঞানকে সে আধমরা করিয়া পিঁজরার মধ্যে আবদ্ধ করিয়াছে বলিয়া, আমরা য়ুরোপীয় আদর্শের সহিত নিজেদের আদর্শের তুলনা করিয়া গৌরব অনুভব করিবার অবকাশ পাই না। আমরা কথায়-কথায় লজ্জা পাই। আমাদের সমাজের দুর্ভেদ্য জড়স্তূপ হিন্দুসভ্যতার কীর্ত্তিস্তম্ভ নহে—ইহার অনেকটাই

সুদীর্ঘকালের অযত্নসঞ্চিত ধূলামাত্র। অনেকসময় য়ুরোপীয় সভ্যতার কাছে ধিক্কার পাইয়া আমরা এই ধূলিস্তূপকে লইয়াই গায়ের জোরে গর্ব্ব করি—কালের এই সমস্ত অনাহূত আবর্জ্জনারাশিকেই আমরা আপনার বলিয়া অভিমান করি—ইহার অভ্যন্তরে যেখানে আমাদের যথার্থ গর্ব্বের ধন হিন্দুসভ্যতার প্রাচীন আদর্শ আলোক ও বায়ুর অভাবে মূর্চ্ছান্বিত হইয়া পড়িয়া আছে, সেখানে দৃষ্টিপাত করিবার পথ পাই না।

প্রাচীন ভারতবর্ষ সুখ, স্বার্থ, এমন কি ঐশ্বর্য্যকে পর্য্যন্ত খর্ব্ব করিয়া মঙ্গলকেই যেভাবে সমাজের প্রতিষ্ঠাস্থল করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, এমন আর কোথায় হইয়াছিল জানি না। অন্যদেশে ধনমানের জন্য, প্রভুত্ব-অর্জ্জনের জন্য, হানাহানি-কাড়াকাড়ি করিতে সমাজ প্রত্যেককেই উৎসাহ দিয়া থাকে। ভারতবর্ষ সেই উৎসাহকে সর্ব্বপ্রকারে নিরস্ত করিয়াছে ; কারণ স্বার্থোন্নতি তাহার লক্ষ্য ছিল না, মঙ্গলই তাহার লক্ষ্য ছিল। আমরা—ইংরাজের ছাত্র আজ বলিতেছি, এই প্রতি-যোগিতা—এই হানাহানির অভাবে আমাদের আজ দুর্গতি হইয়াছে। প্রতিযোগিতার উত্তরোত্তর প্রশ্রয়ে ইংলণ্ড-ফ্রান্স-জর্ম্মণি-রাশিয়া-আমেরিকাকে ক্রমশ কিরূপ উগ্র হিংস্রতার দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে, কিরূপ প্রচণ্ড সংঘাতের মুখের কাছে দাঁড় করাইয়াছে, সভ্যনীতিকে প্রতিদিন কিরূপ বিপর্য্যস্ত করিয়া দিতেছে, তাহা দেখিলে প্রতিযোগিতাপ্রধান সভ্যতাকেই চরম সভ্যতা বলিতে কোনোমতেই প্রবৃত্তি হয় না। বলবুদ্ধি ও ঐশ্বর্য্য মনুষ্যত্বের একটা অঙ্গ হইতে পারে, কিন্তু শান্তি, সামঞ্জস্য এবং মঙ্গলও কি তদপেক্ষা উচ্চতর অঙ্গ নহে ? তাহার আদর্শ এখন কোথায় ? এখনকার কোন্ বণিকের আপিসে, কোন্ রণক্ষেত্রে ? কোন্ কালো কোর্ত্তায়, লাল কোর্ত্তায় বা খাথি কোর্ত্তায় সে সজ্জিত হইয়াছে ? সে ছিল প্রাচীন ভারতবর্ষের

কুটীরপ্রাঙ্গণে শুভ্র উত্তরীয় পরিয়া। সে ছিল ব্রহ্মপরায়ণ তপস্বীর স্তিমিত ধ্যানাসনে, সে ছিল ধর্ম্মপরায়ণ আর্য্যগৃহস্থের কর্ম্মমুখরিত যজ্ঞশালায়।

দল বাঁধিয়া পূজা, কমিটি করিয়া শোক বা চাঁদা করিয়া কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ, এ আমাদের জাতির প্রকৃতিগত নহে, এ কথা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে। এ গৌরবের অধিকার আমাদের নাই—কিন্তু তাই বলিয়া আমরা লজ্জা পাইতে প্রস্তুত নহি। সংসারের সর্ব্বত্রই হরণ-পূরণের নিয়ম আছে। আমাদের বাঁ-দিকে কম্‌তি থাকিলেও ডান-দিকে বাড়্‌তি থাকিতে পারে। যে ওড়ে, তাহার ডানা বড়ো, কিন্তু পা ছোটো ; যে দৌড়ায়, তাহার পা বড়ো, কিন্তু ডানা নাই।

আমাদের দেশে আমরা বলিয়া থাকি, মহাত্মাদের নাম প্রাতঃ-স্মরণীয়। তাহা কৃতজ্ঞতার ঋণ শুধিবার জন্য নহে—ভক্তিভাজনকে দিবসারম্ভে যে ব্যক্তি ভক্তিভাবে স্মরণ করে, তাহার মঙ্গল হয়—মহা-পুরুষদের তাহাতে উৎসাহবৃদ্ধি হয় না, যে ভক্তি করে, সে ভালো হয়। ভক্তি-করা প্রত্যেকের প্রাত্যহিক কর্ত্তব্য।

কিন্তু তবে তো একটা লম্বা নামের মালা গাঁথিয়া প্রত্যহ আওড়াইতে হয় এবং সে মালা ক্রমশই বাড়িয়া চলে। তাহা হয় না। যথার্থ ভক্তিই যেখানে উদ্দেশ্য, সেখানে মালা বেশি বাড়িতে পারে না। ভক্তি যদি নির্জ্জীব না হয়, তবে সে জীবনের ধর্ম্ম অনুসারে গ্রহণ-বর্জ্জন করিতে থাকে, কেবলি সঞ্চয় করিতে থাকে না।

আমার প্রকৃতি যে মহাত্মাদিগকে প্রত্যহস্মরণযোগ্য বলিয়া ভক্তি করে, তাঁহাদের নাম যদি উচ্চারণ করি, তবে কতোটুকু সময় লয়! প্রত্যেক পাঠক যদি নিজের মনে চিন্তা করিয়া দেখেন, তবে কয়টি নাম তাঁহাদের মুখে আসে? ভক্তি যাঁহাদিগকে হৃদয়ে সজীব করিয়া না

রাখে, বাহিরে তাঁহাদের পাথরের মূর্ত্তি গড়িয়া রাখিলে আমার তাহাতে কী লাভ?

তাঁহাদের তাহাতে লাভ আছে, এমন কথা উঠিতেও পারে। লোকে দল বাঁধিয়া প্রতিমা স্থাপন করিবে, অথবা মৃতদেহ বিশেষ স্থানে সমাহিত হইয়া গৌরব প্রাপ্ত হইবে, এই আশা স্পষ্টত বা অলক্ষ্যে মনকে উৎসাহ দিতেও পারে। কবরের দ্বারা খ্যাতিলাভ করিবার একটা মোহ আছে, তাহা তাজমহল প্রভৃতির ইতিহাস হইতে জানা যায়।

কিন্তু আমাদের সমাজ মহাত্মাদিগকে সেই বেতন দিয়া বিদায় করিতে চাহে নাই। আমাদের সমাজে মাহাত্ম্য সম্পূর্ণ বিনা-বেতনের। ভারতবর্ষে অধ্যাপক, সমাজের নিকট হইতে ব্রাহ্মণের প্রাপ্য দান-দক্ষিণা গ্রহণ করিয়া থাকেন, কিন্তু অধ্যাপনার বেতন শোধ করিয়া দিয়া আমাদের সমাজ তাঁহাদিগকে অপমানিত করে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মঙ্গলকর্ম্ম যিনি করিবেন, তিনি নিজের মঙ্গলের জন্যই করিবেন, ইহাই ভারতবর্ষের আদর্শ। কোনো বাহ্যমূল্য লইতে গেলেই মঙ্গলের মূল্য কমিয়া যায়।

দলের একটা উৎসাহ আছে, তাহা সংক্রামক—তাহা মূঢ়ভাবে পরস্পরের মধ্যে সঞ্চারিত হয়—তাহার অনেকটা অলীক। "গোলে হরিবোল" ব্যাপারে হরিবোল যতোটা থাকে, গোলের মাত্রা তাহা অপেক্ষা অনেক বেশি হইয়া পড়ে। দলের আন্দোলনে অনেক সময় তুচ্ছ উপলক্ষ্যে ভক্তির ঝড় উঠিতে পারে—তাহার সাময়িক প্রবলতা যতোই হোক্ না কেন, ঝড়-জিনিষটা কখনই স্থায়ী নহে। সংসারে এমন কতোবার কতোশত দলের দেবতার অকস্মাৎ সৃষ্টি হইয়াছে এবং জয়ঢাক বাজিতে বাজিতে অতলস্পর্শ বিস্মৃতির মধ্যে তাহাদের বিসর্জ্জন হইয়াছে। পাথরের মূর্ত্তি গড়িয়া জবরদস্তি করিয়া কি কাহাকেও

মনে রাখা যায়? ওয়েষ্ট্‌মিন্‌ষ্টার অ্যাবিতে কি এমন অনেকের নাম পাথরে খোদা হয় নাই, ইতিহাসে যাহাদের নামের অক্ষর প্রত্যহ ক্ষুদ্র ও ম্লান হইয়া আসিতেছে? এই সকল ক্ষণকালের দেবতাগণকে দলীয় উৎসাহে চিরকালের আসনে বসাইবার চেষ্টা করা, না দেবতার পক্ষে ভাল, না দলের পক্ষে শুভকর। দলগত প্রবল উত্তেজনা যুদ্ধে-বিগ্রহে এবং প্রমোদ-উৎসবে উপযোগী হইতে পারে, কারণ ক্ষণিকতাই তাহার প্রকৃতি—কিন্তু ভক্তির পক্ষে সংযত-সমাহিত শান্তিই শোভন এবং অনুকূল, কারণ তাহা অকৃত্রিমতা, এবং ধ্রুবতা চাহে, উন্মত্ততায় তাহা আপনাকে নিঃশেষিত করিতে চাহে না।

য়ুরোপেও আমরা কি দেখিতে পাই? সেখানে দল বাঁধিয়া যে ভক্তি উচ্ছ্বসিত হয়, তাহা কি যথার্থ ভক্তিভাজনের বিচার করে? তাহা কি সাময়িক উপকারকে চিরন্তন উপকারের অপেক্ষা বড়ো করে না, তাহা কি গ্রাম্যদেবতাকে বিশ্বদেবতার চেয়ে উচ্চে বসায় না? তাহা মুখর দলপতিগণকে যতো সম্মান দেয়, নিভৃতবাসী মহাতপস্বীদিগকে কি তেমন সম্মান দিতে পারে? শুনিয়াছি লর্ড্‌ পামার্‌ষ্টনের সমাধিকালে যেরূপ বিরাট্‌ সম্মানের সমারোহ হইয়াছিল, এমন ক্বচিৎ হইয়া থাকে। দূরে হইতে আমাদের মনে এ কথা উদয় হয় যে, এই ভক্তিই কি শ্রেয়? পামার্‌ষ্টনের নামই কি ইংলণ্ডের প্রাতঃস্মরণীয়ের মধ্যে—সর্ব্বাগ্রগণনীয়ের মধ্যে স্থান পাইল? দলের চেষ্টায় যদি কৃত্রিম উপায়ে সেই উদ্দেশ্য কিয়ৎপরিমাণে সাধিত হইয়া থাকে, তবে দলের চেষ্টাকে প্রশংসা করিতে পারি না—যদি না হইয়া থাকে, তবে সেই বৃহৎ আড়ম্বরে বিশেষ গৌরব করিবার এমনি কি কারণ আছে?

যাঁহাদের নামস্মরণ আমাদের সমস্ত দিনের বিচিত্র মঙ্গলচেষ্টার উপযুক্ত উপক্রমণিকা বলিয়া গণ্য হইতে পারে, তাঁহারাই আমাদের প্রাতঃস্মরণীয়। তাহার অধিক আর বোঝাই করিবার কোনো দরকার

নাই। ব্যয়কাতর কৃপণের ধনের মতো, ছোটো বড়ো-মাঝারি, ক্ষণিক এবং চিরন্তন, সকলপ্রকার মাহাত্ম্যকেই শাদা-পাথর দিয়া চাপা রাখিবার প্রবৃত্তি যদি আমাদের না হয় তবে তাহা লইয়া লজ্জা না করিলেও চলে। ভক্তিকে যদি প্রতিদিনের ব্যবহারযোগ্য করিতে হয়, তবে তাহা হইতে প্রতিদিনের অভ্যাগত অনাবশ্যক ভারগুলি বিদায় করিবার উপায় রাখিতে হয়, তাহার বিপরীত প্রণালীতে সমস্তই স্তূপাকার করিবার চেষ্টা না করাই ভাল।

যাহা বিনষ্ট হইবার, তাহাকে বিনষ্ট হইতে দিতে হইবে, যাহা অগ্নিতে দগ্ধ হইবার, তাহা ভস্ম হইয়া যাক্! মৃতদেহ যদি লুপ্ত হইয়া না যাইত, তবে পৃথিবীতে জীবিতের অবকাশ থাকিত না, ধরাতল একটি প্রকাণ্ড কবরস্থান হইয়া থাকিত। আমাদের হৃদয়ের ভক্তিকে পৃথিবীর ছোটো এবং বড়ো, খাঁটি এবং ঝুঁটা, সমস্ত বড়োত্বের গোরস্থান করিয়া বাখিতে পারি না। যাহা চিরজীবী, তাহাই থাক্; যাহা মৃত-দেহ, আজবাদে-কাল কীটের খাদ্য হইবে, তাহাকে মুগ্ধস্নেহে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা না করিয়া শোকের সহিত অথচ বৈরাগ্যের সহিত শ্মশানে ভস্ম করিয়া আসাই বিহিত। পাছে ভুলি, এই আশঙ্কায় নিজেকে উত্তেজিত রাখিবার জন্য কল বানাইবার চেয়ে ভোলাই ভাল। ঈশ্বর আমাদিগকে দয়া করিয়াই বিস্মরণশক্তি দিয়াছেন।

সঞ্চয় নিতান্ত অধিক হইয়া উঠিতে থাকিলে, বাছাই-করা দুঃসাধ্য হয়। তাহা ছাড়া সঞ্চয়ের নেশা বড় দুর্জ্জয় নেশা—একবার যদি হাতে কিছু জমিয়া যায়, তবে জমাইবার ঝোঁক আর সাম্‌লানো যায় না। আমাদের দেশে ইহাকেই বলে—নিরেনব্বইয়ের ধাক্কা। য়ুরোপ একবার বড়লোক জমাইতে আরম্ভ করিয়া এই নিরেনব্বইয়ের আবর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া গেছে। য়ুরোপে দেখিতে পাই, কেহ বা ডাকের টিকিট জমায়, কেহ বা দেশালাইয়ের বাক্সের কাগজের আচ্ছাদন জমায়, কেহ বা

পুরাতন জুতা, কেহ বা বিজ্ঞাপনের ছবি জমাইতে থাকে—সেই নেশার রোখ যতোই চড়িতে থাকে, ততোই এইসকল জিনিষের একটা কৃত্রিম মূল্য অসম্ভবরূপে বাড়িয়া উঠে। তেম্‌নি য়ুরোপে মৃত বড়লোক জমাইবার যে একটা প্রচণ্ড নেশা আছে, তাহাতে মূল্যের বিচার আর থাকে না। কাহাকেও আর বাদ দিতে ইচ্ছা করে না। যেখানে একটুমাত্র উচ্চতা বা বিশেষত্ব আছে, সেইখানেই য়ুরোপ তাড়াতাড়ি সিঁদূর মাখাইয়া দিয়া ঘণ্টা নাড়িতে থাকে। দেখিতে দেখিতে দল জুটিয়া যায়।

বস্তুত মাহাত্ম্যের সঙ্গে ক্ষমতা বা প্রতিভার প্রভেদ আছে। মহাত্মারা আমাদের কাছে এমন একটি আদর্শ রাখিয়া যান, যাহাতে তাঁহাদিগকে ভক্তিভরে স্মরণ করিলে জীবন মহত্ত্বের পথে আকৃষ্ট হয়, কিন্তু ক্ষমতাশালীকে স্মরণ করিয়া আমরা যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইতে পারি, তাহা নহে। ভক্তিভাবে শেক্‌স্‌পিয়রের স্মরণমাত্র আমাদিগকে শেক্‌স্‌পিয়রের গুণের অধিকারী করে না, কিন্তু যথার্থভাবে কোন সাধুকে অথবা বীরকে স্মরণ করিলে আমাদের পক্ষে সাধুত্ব বা বীরত্ব কিয়ৎপরিমাণেও সরল হইয়া আসে।

তবে গুণিসম্বন্ধে আমাদের কি কর্ত্তব্য? গুণীকে তাঁহার গুণের দ্বারা স্মরণ করাই আমাদের স্বাভাবিক কর্ত্তব্য। শ্রদ্ধার সহিত তানসেনের গানের চর্চ্চা করিয়াই গুণমুগ্ধ গায়কগণ তানসেনকে যথার্থভাবে স্মরণ করে। ধ্রুপদ শুনিলে যাহার গায়ে জ্বর আসে, সে-ও তানসেনের প্রতিমা গড়িবার জন্য চাঁদা দিয়া ঐহিক-পারত্রিক কোন ফললাভ করে, এ কথা মনে করিতে পারি না। সকলকেই যে গানে ওস্তাদ হইতে হইবে, এমন কোন অবশ্যবাধ্যতা নাই। কিন্তু সাধুতা বা বীরত্ব সকলেরই পক্ষে আদর্শ। সাধুদিগের এবং মহৎকর্ম্মে প্রাণবিসর্জ্জনপর বীরদিগের স্মৃতি সকলেরই পক্ষে মঙ্গলকর। কিন্তু দল বাঁধিয়া ঋণশোধ করাকে

সেই স্মৃতিপালন করে না; স্মরণব্যাপার প্রত্যেকের পক্ষে প্রত্যহের কর্ত্তব্য।

য়ুরোপে এই ক্ষমতা এবং মাহাত্ম্যের প্রভেদ লুপ্তপ্রায়। উভয়েরই জয়ধ্বজা একই-রকম—এমন কি, মাহাত্ম্যের পতাকাই যেন কিছু খাটো। পাঠকগণ অনুধাবন করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন, বিলাতে অভিনেতা আর্ভিঙের সম্মান পরমসাধুর প্রাপ্য সম্মান অপেক্ষা অল্প নহে। রামমোহন রায় আজ যদি ইংলণ্ডে যাইতেন, তবে তাঁহার গৌরব ক্রিকেট্-খেলোয়াড় রঞ্জিতসিংহের গৌরবের কাছে খর্ব্ব হইয়া থাকিত।

আমরা কবিচরিতনামক প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছি, য়ুরোপে ক্ষমতাশালী লোকের জীবনচরিত লেখার একটা নিরতিশয় উদ্যম আছে। য়ুরোপকে চরিতবায়ুগ্রস্ত বলা যাইতে পারে। কোনোমতে একটা যে-কোনো-প্রকারের বড়লোকত্বের সুদূর গন্ধটুকু পাইলেই তাহার সমস্ত চিঠিপত্র, গল্পগুজব, প্রাত্যহিক ঘটনার সমস্ত আবর্জ্জনা সংগ্রহ করিয়া মোটা দুই ভল্যুমে লিখিত জীবনচরিতের জন্য লোকে হাঁ করিয়া বসিয়া থাকে। যে নাচে, তাহার জীবনচরিত, যে গান করে, তাহার জীবনচরিত, যে হাসাইতে পারে, তাহার জীবনচরিত—জীবন যাহার যেমনই হোক্, যে-লোক কিছু-একটা পারে, তাঁহারই জীবনচরিত! কিন্তু যে মহাত্মা জীবনযাত্রার আদর্শ দেখাইয়াছেন, তাঁহারই জীবনচরিত সার্থক—যাঁহারা সমস্ত জীবনের দ্বারা কোনো কাজ করিয়াছেন, তাঁহাদেরই জীবন আলোচ্য—যিনি কবিতা লিখিয়াছেন, গান তৈরি করিয়াছেন, তিনি কবিতা এবং গানই দান করিয়া গেছেন, তিনি জীবন দান করিয়া যান নাই, তাঁহার জীবনচরিতে কাহার কি প্রয়োজন? টেনিসনের কবিতা পড়িয়া আমরা টেনিসন্‌কে যতো বড়ো করিয়া জানিয়াছি, তাঁহার জীবনচরিত পড়িয়া তাঁহাকে তাহা অপেক্ষা অনেক ছোটো করিয়া জানিয়াছি মাত্র।

কৃত্রিম আদর্শে মানুষকে এইরূপ নির্ব্বিবেক করিয়া তোলে। মেকী এবং খাঁটির এক দর হইয়া আসে। আমাদের দেশে আধুনিককালে পাঁপপুণ্যের আদর্শ কৃত্রিম হওয়াতে তাহার ফল কি হইয়াছে? ব্রাহ্মণের পায়ের ধূলা লওয়া এবং গঙ্গায় স্নান করাও পুণ্য, আবার অচৌর্য্য ও সত্যপরায়ণতাও পুণ্য, কিন্তু কৃত্রিমের সহিত খাঁটি পুণ্যের কোনো জাতিবিচার না থাকাতে, যে ব্যক্তি নিত্য গঙ্গাস্নান ও আচারপালন করে, সমাজে অলুব্ধ ও সত্যপরায়ণের অপেক্ষা তাহার পুণ্যের সম্মান কম নহে, বরঞ্চ বেশি। যে ব্যক্তি যবনের অন্ন খাইয়াছে, আর যে ব্যক্তি জাল মকদ্দমায় যবনের অন্নের উপায় অপহরণ করিয়াছে, উভয়েই পাপীর কোঠায় পড়ায় প্রথমোক্ত পাপীর প্রতি ঘৃণা ও দণ্ড যেন মাত্রায় বাড়িয়া উঠে।

য়ুরোপে তেম্নি মাহাত্ম্যের মধ্যে জাতিবিচার উঠিয়া গেছে। যে ব্যক্তি ক্রিকেট্‌খেলায় শ্রেষ্ঠ, যে অভিনয়ে শ্রেষ্ঠ, যে দানে শ্রেষ্ঠ, যে সাধুতায় শ্রেষ্ঠ, সকলেই গ্রেট্‌ম্যান্। একই-জাতীয় সম্মানস্বর্গে সকলেরই সদ্গতি। ইহাতে ক্রমেই যেন ক্ষমতার অর্ঘ্য মাহাত্ম্যের অপেক্ষা বেশি দাঁড়াইয়াছে। দলের হাতে বিচারের ভার থাকিলে, এইরূপ ঘটাই অনিবার্য্য। যে আচারপরায়ণ, সে ধর্ম্মপরায়ণের সমান হইয়া দাঁড়ায়, এমন কি, বেশি হইয়া ওঠে; যে ক্ষমতাশালী, সে মহাত্মাদের সমান, এমন কি, তাহাদের চেয়ে বড় হইয়া দেখা দেয়।

যথার্থ ভক্তির উপর পূজার ভার না দিয়া লোকারণ্যের উপর পূজার ভার দিলে দেবপূজার ব্যাঘাত ঘটে। বারোয়ারির দেবতার যতো ধুম, গৃহদেবতা—ইষ্টদেবতার ততো ধুম নহে। কিন্তু বারোয়ারির দেবতা কি মুখ্যত একটা অবান্তর উত্তেজনার উপলক্ষ্যমাত্র নহে? ইহাতে ভক্তির চর্চ্চা না হইয়া ভক্তির অবমাননা হয় না কি?

আমাদের দেশে আধুনিককালের বারোয়ারির শোকের মধ্যে—

বারোয়ারির স্মৃতিপালনচেষ্টার মধ্যে, গভীর শূন্যতা দেখিয়া আমরা পদে-পদে ক্ষুব্ধ হই। নিজের দেবতাকে কোন্ প্রাণে এমন কৃত্রিম সভায় উপস্থিত করিয়া পূজার অভিনয় করা হয়, বুঝিতে পারি না। সেই অভিনয়ের আয়োজনে যদি মালমস্‌লা কিছু কম হয়, তবে আমরা পরস্পরকে লজ্জা দিই—কিন্তু লজ্জার বিষয় গোড়াতেই। যিনি ভক্ত, তিনি মহতের মাহাত্ম্যকীর্ত্তন করিবেন, ইহা স্বাভাবিক এবং সকলের পক্ষেই শুভফলপ্রদ; কিন্তু মহাত্মাকে লইয়া সকলে মিলিয়া একদিন বারোয়ারির কোলাহল তুলিয়া কর্ত্তব্যসমাধার চেষ্টা লজ্জাকর এবং নিষ্ফল।

বিদ্যাসাগর আমাদের সমাজে ভক্তিলাভ করেন নাই, এ কথা কোনোমতেই বলা যায় না। তাঁহার প্রতি বাঙালিমাত্রেরই ভক্তি অকৃত্রিম। কিন্তু যাঁহারা বর্ষে বর্ষে বিদ্যাসাগরের স্মরণসভা আহ্বান করেন, তাঁহারা বিদ্যাসাগরের স্মৃতিরক্ষার জন্য সমুচিত চেষ্টা হইতেছে না বলিয়া আক্ষেপ করিতে থাকেন। ইহাতে কি এই প্রমাণ হয় যে, বিদ্যাসাগরের জীবন আমাদের দেশে নিষ্ফল হইয়াছে? তাহা নহে। তিনি আপন মহত্ত্বদ্বারা দেশের হৃদয়ে অমরস্থান অধিকার করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। নিষ্ফল হইয়াছে তাঁহার স্মরণসভা। বিদ্যাসাগরের জীবনের যে উদ্দেশ্য, তাহা তিনি নিজের ক্ষমতাবলেই সাধন করিয়াছেন—স্মরণসভার যে উদ্দেশ্য, তাহা সাধন করিবার ক্ষমতা স্মরণসভার নাই, উপায় সে জানে না।

মঙ্গলভাব স্বভাবতই আমাদের কাছে কতো পূজ্য, বিদ্যাসাগর তাহার দৃষ্টান্ত। তাঁহার অসামান্য ক্ষমতা অনেক ছিল, কিন্তু সেই সকল ক্ষমতায় তিনি আমাদিগকে আকর্ষণ করেন নাই। তাঁহার দয়া, তাঁহার অকৃত্রিম অশ্রান্ত লোকহিতৈষাই তাঁহাকে বাংলাদেশের আবালবৃদ্ধবনিতার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। নূতন ফ্যাশনের টানে পড়িয়া আমরা যতোই আড়ম্বর করিয়া যতো চেষ্টাই করি না কেন, আমাদের অন্তঃকরণ

স্বভাবতই শক্তি-উপাসনায় মাতে না। ক্ষমতা আমাদের আরাধ্য নহে, মঙ্গলই আমাদের আরাধ্য। আমাদের ভক্তি শক্তির অভ্রভেদী সিংহদ্বারে নহে, পুণ্যের স্নিগ্ধ-নিভৃত দেবমন্দিরেই মস্তক নত করে।

আমরা বলি—কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি। যিনি ক্ষমতাপন্ন লোক, তিনি নিজের কীর্ত্তির মধ্যেই নিজে বাঁচিয়া থাকেন। তিনি যদি নিজেকে বাঁচাইতে না পারেন, তবে তাঁহাকে বাঁচাইবার চেষ্টা আমরা করিলে তাহা হাস্যকর হয়। বঙ্কিমকে কি আমরা স্বহস্তরচিত পাথরের মূর্ত্তিদ্বারা অমরত্বলাভে সহায়তা করিব? আমাদের চেয়ে তাঁহার ক্ষমতা কি অধিক ছিল না? তিনি কি নিজের কীর্ত্তিকে স্থায়ী করিয়া যান নাই? হিমালয়কে স্মরণ রাখিবার জন্য কি চাঁদা করিয়া তাহার একটা কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করার প্রয়োজন আছে? হিমালয়কে দর্শন করিতে গেলেই তাহার দেখা পাইব—অন্যত্র তাহাকে স্মরণ করিবার উপায় করিতে যাওয়া মূঢ়তা। কৃত্তিবাসের জন্মস্থানে বাঙালি একটা কোনোপ্রকারের ধুমধাম করে নাই বলিয়া বাঙালি কৃত্তিবাসকে অবজ্ঞা করিয়াছে, এ কথা কেমন করিয়া বলিব? যেমন "গঙ্গা পূজি গঙ্গাজলে," তেমনি বাংলাদেশে মুদির দোকান হইতে রাজার প্রাসাদ পর্য্যন্ত কীর্ত্তিবাসের কীর্ত্তিদ্বারাই কৃত্তিবাস কতো শতাব্দী ধরিয়া প্রত্যহ পূজিত হইয়া আসিতেছেন। এমন প্রত্যক্ষপূজা আর কিসে হইতে পারে?

য়ুরোপে যে দল বাঁধিবার ভাব আছে, তাহার উপযোগিতা নাই, এ কথা বলা মূঢ়তা। যে সকল কাজ বলসাধ্য,—বহুলোকের আলোচনার দ্বারা সাধ্য, সে সকল কাজে দল না বাঁধিলে চলে না। দল বাঁধিয়া য়ুরোপ যুদ্ধে, বিগ্রহে, বাণিজ্যে রাষ্ট্রব্যাপারে বড় হইয়া উঠিয়াছে, সন্দেহ নাই। মৌমাছির পক্ষে যেমন চাক-বাঁধা, য়ুরোপের পক্ষে তেমনি দল-বাঁধা প্রকৃতিসিদ্ধ। সেইজন্য য়ুরোপ দল বাঁধিয়া দয়া করে,—ব্যক্তিগত দয়াকে প্রশ্রয় দেয় না; দল বাঁধিয়া পূজা করিতে যায়,—ব্যক্তিগত পূজাহ্নিকে

মন দেয় না ; দল বাঁধিয়া ত্যাগস্বীকার করে,—ব্যক্তিগত ত্যাগে তাহাদের আস্থা নাই। এই উপায়ে য়ুরোপ একপ্রকার মহত্ত্ব লাভ করিয়াছে, অন্যপ্রকার মহত্ত্ব খোয়াইয়াছে। একাকী কর্ত্তব্যকর্ম্ম নিষ্পন্ন করিবার উৎসাহ তাহার নাই। আমাদের সমাজে প্রত্যেককে প্রত্যহই প্রত্যেক প্রহরেই ধর্ম্মপালন করিতে বাধ্য বলিয়া জানে। য়ুরোপে ধর্ম্মপালন করিতে হইলে কমিটিতে বা ধর্ম্মসভায় যাইতে হয়। সেখানে সম্প্রদায়-গণই সদনুষ্ঠানে রত—সাধারণ লোকেরা স্বার্থসাধনে তৎপর। কৃত্রিম উত্তেজনার দোষ এই যে, তাহার অভাবে মানুষ অসহায় হইয়া পড়ে। দল বাঁধিলে পরস্পর পরস্পরকে ঠেলিয়া খাড়া করিয়া রাখে, কিন্তু দলের বাহিরে নামিয়া পড়িতে হয়। আমাদের দেশে প্রত্যেকের প্রত্যহের কর্ত্তব্য ধর্ম্মকর্ম্মরূপে নির্দ্দিষ্ট হওয়াতে আবালবৃদ্ধবনিতাকে যথাসম্ভব নিজের স্বার্থ-প্রবৃত্তি ও পশুপ্রকৃতিকে সংযত করিয়া পরের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করিতে হয়, ইহাই আমাদের আদর্শ। ইহার জন্য সভা করিতে বা খবরের কাগজে রিপোর্ট পাঠাইতে হয় না। এইজন্য সাধারণত সমস্ত হিন্দুসমাজে একটি সাত্ত্বিকভাব বিরাজমান—এখানে ছোট-বড় সকলেই মঙ্গলচর্চ্চায় রত, কারণ গৃহই তাহাদের মঙ্গলচর্চ্চার স্থান। এই যে আমাদের ব্যক্তিগত মঙ্গলভাব, ইহাকে আমরা শিক্ষার দ্বারা উন্নত, অভিজ্ঞতার দ্বারা বিস্তৃত এবং জ্ঞানের দ্বারা উজ্জ্বলতর করিতে পারি ; কিন্তু ইহাকে নষ্ট হইতে দিতে পারি না, ইহাকে অবজ্ঞা করিতে পারি না,—য়ুরোপে ইহার প্রাদুর্ভাব নাই বলিয়া ইহাকে লজ্জা দিতে এবং ইহাকে লইয়া লজ্জা করিতে পারি না—দলকেই একমাত্র দেবতা জ্ঞান করিয়া তাহার নিকট ইহাকে ধূলিলুণ্ঠিত করিতে পারি না। যেখানে দল-বাঁধা অত্যাবশ্যক, সেখানে যদি দল বাঁধিতে পারি তো ভাল, যেখানে অনাবশ্যক, এমন কি, অসঙ্গত, সেখানেও দল বাঁধিবার চেষ্টায় শেষকালে দলের উগ্র নেশা যেন অভ্যাস না করিয়া বসি। সর্ব্বাগ্রে সর্ব্বোচ্চে নিজের ব্যক্তিগতকৃত্য, তাহা

প্রাত্যহিক, তাহা চিরন্তন; তাহার পরে দলীয় কর্ত্তব্য, তাহা বিশেষ আবশ্যকসাধনের জন্য ক্ষণকালীন—তাহা অনেকটা পরিমাণে যন্ত্রমাত্র, তাহাতে নিজের ধর্ম্মপ্রবৃত্তির সর্ব্বতোভাবে সম্পূর্ণ চর্চ্চা হয় না। তাহা ধর্ম্মসাধন অপেক্ষা প্রয়োজনসাধনের পক্ষে অধিক উপযোগী।

কিন্তু কালের এবং ভাবের পরিবর্ত্তন হইতেছে। চারিদিকেই দল বাঁধিয়া উঠিতেছে—কিছুই নিভৃত এবং কেহই গোপন থাকিতেছে না। নিজের কীর্ত্তির মধ্যেই নিজেকে কৃতার্থ করা, নিজের মঙ্গলচেষ্টার মধ্যেই নিজেকে পুরস্কৃত করা, এখন আর টেঁকে না। শুভকর্ম্ম এখন আর সহজ এবং আত্মবিস্মৃত নহে, এখন তাহা সর্ব্বদাই উত্তেজনার অপেক্ষা রাখে। যে সকল ভাল কাজ ধ্বনিত হইয়া উঠে না, আমাদের কাছে তাহার মূল্য প্রতিদিন কমিয়া আসিতেছে, এইজন্য ক্রমশ আমাদের গৃহ পরিত্যক্ত, আমাদের জনপদ নিঃসহায়, আমাদের জন্মগ্রাম রোগজীর্ণ, আমাদের পল্লীর সরোবরসকল পঙ্কদূষিত, আমাদের সমস্ত চেষ্টাই কেবল সভাসমিতি এবং সংবাদপত্রহাটের মধ্যে। ভ্রাতৃভাব এখন ভ্রাতাকে ছাড়িয়া বাহিরে ফিরিতেছে, দয়া এখন দীনকে ছাড়িয়া সংবাদদাতার স্তম্ভের উপর চড়িয়া দাঁড়াইতেছে এবং লোকহিতৈষিতা এখন লোককে ছাড়িয়া রাজদ্বারে খেতাব খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। ম্যাজিষ্ট্রেটের তাড়া না খাইলে এখন আমাদের গ্রামে স্কুল হয় না, রোগী ঔষধ পায় না, দেশের জলকষ্ট দূর হয় না। এখন ধ্বনি, ধন্যবাদ এবং করতালির নেশা যখন ক্রমে চড়িয়া উঠিয়াছে, তখন সেই প্রলোভনের ব্যবস্থা রাখিতে হয়। ঠিক যেন বাছুরটাকে কশাইখানায় বিক্রয় করিয়া ফুঁকাদেওয়া দুধের ব্যবসায় চালাইতে হইতেছে।

অতএব আমরা যে দল বাঁধিয়া শোক, দল বাঁধিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য পরস্পরকে প্রাণপণে উৎসাহিত করিতেছি, এখন তাহার সময় আসিয়াছে। কিন্তু পরিবর্ত্তনের সন্ধিকালে ঠিক নিয়মমত কিছুই হয় না।

সকালে হয় তো শীতের আভাস, বিকালে হয় তো বসন্তের বাতাস দিতে থাকে। দিশী-হাল্কা কাপড় গায়ে দিলে হঠাৎ সর্দ্দি লাগে, বিলাতি মোটা-কাপড় গায়ে দিলে ঘর্ম্মাক্তকলেবর হইতে হয়। সেইজন্য আজকাল দিশী ও বিলাতি কোন নিয়মই পূরাপূরি খাটে না। যখন বিলাতি-প্রথায় কাজ করিতে যাই, দেশী-সংস্কার অলক্ষ্যে হৃদয়ের অন্তঃপুরে থাকিয়া বাধা দিতে থাকে, আমরা লজ্জায়-ধিক্কারে অস্থির হইয়া উঠি—দেশীভাবে যখন কাজ ফাঁদিয়া বসি, তখন বিলাতের রাজ-অতিথি আসিয়া নিজের বসিবার উপযুক্ত আসন না পাইয়া নাসা কুঞ্চিত করিয়া সমস্ত মাটি করিয়া দেয়। সভাসমিতি নিয়মমত ডাকি, অথচ তাহা সফল হয় না,—চাঁদার খাতা খুলি, অথচ তাহাতে যেটুকু অঙ্কপাত হয়, তাহাতে কেবল আমাদের কলঙ্ক ফুটিয়া উঠে।

আমাদের সমাজে যেরূপ বিধান ছিল, তাহাতে আমাদের প্রত্যেক গৃহস্থকে প্রতিদিন চাঁদা দিতে হইত। তাহার তহবিল আত্মীয়স্বজন, অতিথি-অভ্যাগত, দীনদুঃখী, সকলের জন্যই ছিল। এখনো আমাদের দেশে যে দরিদ্র, সে নিজের ছোটভাইকে স্কুলে পড়াইতেছে, ভগিনীর বিবাহ দিতেছে, পৈতৃক নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়া সাধন করিতেছে, বিধবা পিসীমাসীকে সসন্তান পালন করিতেছে। ইহাই দিশীমতে চাঁদা, ইহার উপরে আবার বিলাতিমতে চাঁদা লোকের সহ্য হয় কি করিয়া? ইংরাজ নিজের বয়স্ক ছেলেকে পর্য্যন্ত স্বতন্ত্র করিয়া দেয়, তাহার কাছে চাঁদার দাবী করা অসঙ্গত নহে। নিজের ভোগেরই জন্য যাহার তহবিল, তাহাকে বাহ্য উপায়ে স্বার্থত্যাগ করাইলে ভালই হয়। আমাদের কয়জন লোকের নিজের ভোগের জন্য কতটুকু উদ্বৃত্ত থাকে? ইহার উপরে বারোমাসে তেরোশত নূতন-নূতন অনুষ্ঠানের জন্য চাঁদা চাহিতে আসিলে বিলাতি সভ্যতার উত্তেজনাসত্ত্বেও গৃহীর পক্ষে বিনয়রক্ষা করা কঠিন হয়। আমরা ক্রমাগতই লজ্জিত হইয়া বলিতেছি, এতো-বড়ো অনুষ্ঠানপত্র বাহির

করিলাম, টাকা আসিতেছে না কেন, এতো-বড়ো ঢাক পিটাইতেছি, টাকা আসিয়া পড়িতেছে না কেন, এতো-বড়ো কাজ আরম্ভ করিলাম, অর্থাভাবে বন্ধ হইয়া যাইতেছে কেন? বিলাত হইলে এমন হইত, তেমন হইত, হুহু করিয়া মুষলধারে টাকা বর্ষিত হইয়া যাইত,—কবে আমরা বিলাতের মত হইব?

বিলাতের আদর্শ আসিয়া পৌঁছিয়াছে, বিলাতের অবস্থা এখনো বহুদূরে। বিলাতি মতের লজ্জা পাইয়াছি, কিন্তু সে লজ্জা নিবারণের বহুমূল্য বিলাতি বস্ত্র এখনো পাই নাই। সকলদিকেই টানাটানি করিয়া মরিতেছি। এখন সর্ব্বসাধারণে চাঁদা দিয়া যে সকল কাজের চেষ্টা করে, পূর্ব্বে আমাদের দেশে ধনীরা তাহা একাকী করিতেন—তাহাতেই তাঁহাদের ধনের সার্থকতা ছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদের দেশে সাধারণ গৃহস্থ সমাজকৃত্য শেষ করিয়া নিজের স্বাধীন ভোগের জন্য উদ্বৃত্ত কিছুই পাইত না, সুতরাং অতিরিক্ত কোন কাজ না করিতে পারা তাহার পক্ষে লজ্জার বিষয় ছিল না। যে সকল ধনীর ভাণ্ডারে উদ্বৃত্ত অর্থ থাকিত, ইষ্টাপূর্ত্তকাজের জন্য তাহাদেরই উপর সমাজের সম্পূর্ণ দাবী থাকিত। তাহারা সাধারণের অভাবপূরণ করিবার জন্য ব্যয়সাধ্য মঙ্গলকর্ম্মে প্রবৃত্ত না হইলে সকলের কাছে লাঞ্ছিত হইত—তাহাদের নামোচ্চারণও অশুভকর বলিয়া গণ্য হইত। ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বরই বিলাতি ধনীর প্রধান শোভা, মঙ্গলের আয়োজন ভারতের ধনীর প্রধান শোভা। সমাজস্থ বন্ধুদিগকে বহুমূল্য পাত্রে বহুমূল্য ভোজ দিয়া বিলাতের ধনী তৃপ্ত, আহূত-রবাহূত-অনাহূতদিগকে কলার পাতায় অন্নদান করিয়া আমাদের ধনীরা তৃপ্ত। ঐশ্বর্য্যকে মঙ্গলদানের মধ্যে প্রকাশ করাই ভারতবর্ষের ঐশ্বর্য্য—ইহা নীতিশাস্ত্রের নীতিকথা নহে—আমাদের সমাজে ইহা এতোকাল পর্য্যন্ত প্রত্যহই ব্যক্ত হইয়াছে—সেইজন্যই সাধারণ গৃহস্থের কাছে আমাদিগকে চাঁদা চাহিতে হয় নাই। ধনীরাই আমাদের দেশে দুর্ভিক্ষকালে

অন্ন, জলাভাবকালে জল দান করিয়াছে,—তাহারাই দেশের শিক্ষাবিধান, শিল্পের উন্নতি, আনন্দকর উৎসবরক্ষা ও গুণীর উৎসাহসাধন করিয়াছে, হিতানুষ্ঠানে আজ যদি আমরা পূর্ব্বাভ্যাসক্রমে তাহাদের দ্বারস্থ হই, তবে সামান্য ফল পাইয়া অথবা নিষ্ফল হইয়া কেন ফিরিয়া আসি? বরঞ্চ আমাদের মধ্যবিত্তগণ সাধারণ কাজে যেরূপ ব্যয় করিয়া থাকেন, সম্পদের তুলনা করিয়া দেখিলে ধনীরা তাহা করেন না। তাঁহাদের দ্বারবান্‌গণ স্বদেশের অভাবকে দেউড়ি পার হইয়া প্রাসাদে ঢুকিতে দেয় না—ভ্রমক্রমে ঢুকিতে দিলেও ফিরিবার সময় তাহার মুখে অধিক উল্লাসের লক্ষণ দেখা যায় না। ইহার কারণ, আমাদের ধনীদের ঘরে বিলাতের বিলাসিতা প্রবেশ করিয়াছে, অথচ বিলাতের ঐশ্বর্য্য নাই। নিজেদের ভোগের জন্য তাহাদের অর্থ উদ্বৃত্ত থাকে বটে, কিন্তু সেই ভোগের আদর্শ বিলাতের। বিলাতের ভোগীরা ভারবিহীন স্বাধীন ঐশ্বর্য্যশালী, নিজের ভাণ্ডারের সম্পূর্ণ কর্ত্তা। সমাজবিধানে আমরা তাহা নহি। অথচ ভোগের আদর্শ সেই বিলাতি ভোগীর অনুরূপ হওয়াতে খাটে-পালঙ্কে, বসনে-ভূষণে, গৃহসজ্জায়, গাড়িতে-জুড়িতে আমাদের ধনীদিগকে আর বদান্যতার অবসর দেয় না—তাহাদের বদান্যতা বিলাতি জুতাওয়ালা, টুপিওয়ালা, ঝাড়লণ্ঠনওয়ালা, চৌকিটেবিলওয়ালার সুবৃহৎ পকেটের মধ্যে নিজেকে উজাড় করিয়া দেয়, শীর্ণ কঙ্কালসার দেশ রিক্তহস্তে ম্লানমুখে দাঁড়াইয়া থাকে! দেশী গৃহস্থের বিপুল কর্ত্তব্য এবং বিলাতি ভোগীর বিপুল ভোগ, এই দুই ভার একলা কয়জনে বহন করিতে পারে?

বিদ্যাসাগরচরিত *

১

বিদ্যাসাগরের চরিত্রে যাহা সর্ব্বপ্রধান গুণ—যে-গুণে তিনি আচারের ক্ষুদ্রতা, বাঙালীজীবনের জড়ত্ব সবলে ভেদ করিয়া একমাত্র নিজের গতিবেগপ্রাবল্যে কঠিন প্রতিকূলতার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া—হিন্দুত্বের দিকে নহে, সাম্প্রদায়িকতার দিকে নহে—করুণার অশ্রুজলপূর্ণ উন্মুক্ত অপার মনুষ্যত্বের অভিমুখে আপনার দৃঢ়নিষ্ঠ একাগ্র একক জীবনকে প্রবাহিত করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, আমি যদি অদ্য তাঁহার সেই গুণকীর্ত্তন করিতে বিরত হই, তবে আমার কর্ত্তব্য একেবারেই অসম্পন্ন থাকিয়া যায়। কারণ, বিদ্যাসাগরের জীবনবৃত্তান্ত আলোচনা করিয়া দেখিলে এই কথাটি বারংবার মনে উদয় হয় যে, তিনি যে বাঙালী বড়লোক ছিলেন, তাহা নহে, তিনি যে রীতিমত হিন্দু ছিলেন, তাহাও নহে—তিনি তাহা অপেক্ষাও অনেক বেশি বড় ছিলেন, তিনি যথার্থ মানুষ ছিলেন। বিদ্যাসাগরের জীবনীতে এই অনন্যসুলভ মনুষ্যত্বের প্রাচুর্য্যই সর্ব্বোচ্চ গৌরবের বিষয়। তাঁহার সেই পর্ব্বতপ্রমাণ চরিত্রমাহাত্ম্যে তাঁহারই কৃতকীর্ত্তিকেও খর্ব্ব করিয়া রাখিয়াছে।

তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি বঙ্গভাষা। যদি এই ভাষা কখন সাহিত্য-সম্পদে ঐশ্বর্য্যশালিনী হইয়া উঠে, যদি এই ভাষা অক্ষয় ভাবজননীরূপে মানবসভ্যতার ধাত্রীগণের ও মাতৃগণের মধ্যে গণ্য হয়, যদি এই ভাষা পৃথিবীর শোকদুঃখের মধ্যে এক নূতন সান্ত্বনাস্থল—সংসারের তুচ্ছতা

* ১৩০২ সালের ১৩ই শ্রাবণ অপরাহ্নে বিদ্যাসাগরের স্মরণার্থসভার সাংবৎসরিক অধিবেশনে এমারল্ড থিয়েটার রঙ্গমঞ্চে পঠিত।

ও ক্ষুদ্র স্বার্থের মধ্যে এক মহত্ত্বের আদর্শলোক, দৈনন্দিন মানবজীবনের অবসাদ ও অস্বাস্থ্যের মধ্যে সৌন্দর্য্যের এক নিভৃত নিকুঞ্জবন রচনা করিতে পারে, তবেই তাঁহার এই কীর্ত্তি তাঁহার উপযুক্ত গৌরব লাভ করিতে পারিবে।

বাংলাভাষার বিকাশে বিদ্যাসাগরের প্রভাব কিরূপ কার্য্য করিয়াছে, এখানে তাহা স্পষ্ট করিয়া নির্দ্দেশ করা আবশ্যক।

বিদ্যাসাগর বাংলাভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন। তৎপূর্ব্বে বাংলায় গদ্যসাহিত্যের সূচনা হইয়াছিল, কিন্তু তিনিই সর্ব্বপ্রথমে বাংলা-গদ্যে কলানৈপুণ্যের অবতারণা করেন। ভাষা-যে কেবল ভাবের একটা আধারমাত্র নহে, তাহার মধ্যে যেন-তেন-প্রকারেণ কতকগুলা বক্তব্য-বিষয় পূরিয়া দিলেই যে কর্ত্তব্যসমাপন হয় না, বিদ্যাসাগর দৃষ্টান্তদ্বারা তাহাই প্রমাণ করিয়াছিলেন। তিনি দেখাইয়াছিলেন যে,যতোটুকু বক্তব্য, তাহা সরল করিয়া, সুন্দর করিয়া এবং সুশৃঙ্খল করিয়া ব্যক্ত করিতে হইবে। আজিকার দিনে এ কাজটিকে তেমন বৃহৎ বলিয়া মনে হইবে না, কিন্তু সমাজবন্ধন যেমন মনুষ্যত্ববিকাশের পক্ষে অত্যাবশ্যক, তেম্‌নি ভাষাকে কলাবন্ধনের দ্বারা সুন্দররূপে সংযমিত না করিলে, সে ভাষা হইতে কদাচ প্রকৃত সাহিত্যের উদ্ভব হইতে পারে না। সৈন্যদলের দ্বারা যুদ্ধ সম্ভব, কেবলমাত্র জনতার দ্বারা নহে;—জনতা নিজেকেই নিজে খণ্ডিত-প্রতিহত করিতে থাকে, তাহাকে চালনা করাই কঠিন। বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যভাষার উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত, সুপরিচ্ছন্ন এবং সুসংযত করিয়া তাহাকে সহজ গতি এবং কার্য্যকুশলতা দান করিয়াছেন—এখন তাহার দ্বারা অনেক সেনাপতি ভাবপ্রকাশের কঠিন বাধাসকল পরাহত করিয়া সাহিত্যের নব নব ক্ষেত্র আবিষ্কার ও অধিকার করিয়া লইতে পারেন—কিন্তু যিনি এই সেনানীর রচনাকর্ত্তা, যুদ্ধজয়ের যশোভাগ সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাকেই দিতে হয়।

বাংলাভাষাকে পূর্ব্বপ্রচলিত অনাবশ্যক সমাসাড়ম্বরভার হইতে মুক্ত করিয়া, তাহার পদগুলির মধ্যে অংশযোজনার সুনিয়ম স্থাপন করিয়া বিদ্যাসাগর যে বাংলাগদ্যকে কেবলমাত্র সর্ব্বপ্রকারব্যবহারযোগ্য করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন, তাহা নহে, তিনি তাহাকে শোভন করিবার জন্যও সর্ব্বদা সচেষ্ট ছিলেন। গদ্যের পদগুলির মধ্যে একটা ধ্বনিসামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া, তাহার গতির মধ্যে একটি অনতিলক্ষ্য ছন্দঃস্রোত রক্ষা করিয়া, সৌম্য এবং সরল শব্দগুলি নির্ব্বাচন করিয়া বিদ্যাসাগর বাংলা-গদ্যকে সৌন্দর্য্য ও পরিপূর্ণতা দান করিয়াছেন। গ্রাম্যপাণ্ডিত্য এবং গ্রাম্যবর্ব্বরতা, উভয়ের হস্ত হইতেই উদ্ধার করিয়া তিনি ইহাকে পৃথিবীর ভদ্রসভার উপযোগী আর্য্যভাষারূপে গঠিত করিয়া গিয়াছেন। তৎপূর্ব্বে বাংলাগদ্যের যে অবস্থা ছিল, তাহা আলোচনা করিয়া দেখিলে এই ভাষাগঠনে বিদ্যাসাগরের শিল্পপ্রতিভা ও সৃষ্টিক্ষমতার প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়।

কিন্তু প্রতিভাসম্পন্ন বলিয়া বিদ্যাসাগরের সম্মান নহে। বিশেষত বিদ্যাসাগর যাহার উপর আপন প্রতিভা প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহা প্রবহমান,—পরিবর্ত্তনশীল। ভাষা নদীস্রোতের মতো—তাহার উপরে কাহারো নাম খুদিয়া রাখা যায় না। মনে হয়, যেন সে চিরকাল এবং সর্ব্বত্র স্বভাবতই এইভাবে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। বাস্তবিক সে যে কোন্ কোন্ নির্ঝরধারায় গঠিত ও পরিপুষ্ট, তাহা নির্ণয় করিতে হইলে উজানমুখে গিয়া পুরাবৃত্তের দুর্গম গিরিশিখরে আরোহণ করিতে হয়। বিশেষ গ্রন্থ অথবা চিত্র অথবা মূর্ত্তি চিরকাল আপনার স্বাতন্ত্র্য-রক্ষা করিয়া আপন রচনাকর্ত্তাকে স্মরণ করাইয়া দেয়, কিন্তু ভাষা ছোটো-বড়ো অসংখ্য লোকের নিকট হইতে জীবনলাভ করিতে করিতে ব্যাপ্ত হইয়া পূর্ব্ব ইতিহাস বিস্মৃত হইয়া চলিয়া যায়, বিশেষরূপে কাহারো নাম ঘোষণা করে না।

কিন্তু সেজন্য আক্ষেপ করিবার প্রয়োজন নাই ; কারণ, বিদ্যাসাগরের গৌরব কেবলমাত্র তাঁহার প্রতিভার উপর নির্ভর করিতেছে না।

প্রতিভা মানুষের সমস্তটা নহে, তাহা মানুষের একাংশমাত্র। প্রতিভা মেঘের মধ্যে বিদ্যুতের মতো, আর মনুষ্যত্ব চরিত্রের দিবালোক, তাহা সর্ব্বত্রব্যাপী ও স্থির। প্রতিভা মানুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অংশ—আর, মনুষ্যত্ব জীবনের সকল মুহূর্ত্তেই সকল কার্য্যেই আপনাকে ব্যক্ত করিতে থাকে। প্রতিভা অনেক সময়ে বিদ্যুতের ন্যায় আপনার আংশিকতা-বশতই লোকচক্ষে তীব্রতররূপে আঘাত করে এবং চরিত্রমহত্ত্ব আপনার ব্যাপকতাগুণেই প্রতিভা অপেক্ষা ম্লানতর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কিন্তু চরিত্রের শ্রেষ্ঠতাই যে যথার্থ শ্রেষ্ঠতা, ভাবিয়া দেখিলে সে বিষয়ে কাহারো সংশয় থাকিতে পারে না।

ভাষা, প্রস্তর অথবা চিত্রপটের দ্বারা সত্য এবং সৌন্দর্য্য প্রকাশ করা ক্ষমতার কার্য্য, সন্দেহ নাই, তাহাতে বিচিত্র বাধা অতিক্রম এবং অসামান্য নৈপুণ্য প্রয়োগ করিতে হয়। কিন্তু নিজের সমগ্র জীবনের দ্বারা সেই সত্য ও সৌন্দর্য্য প্রকাশ করা তদপেক্ষা আরো বেশি দুরূহ, তাহাতে পদে পদে কঠিনতর বাধা অতিক্রম করিতে হয় এবং তাহাতে স্বাভাবিক সূক্ষ্ম বোধশক্তি ও নৈপুণ্য, সংযম ও বল অধিকতর আবশ্যক হয়।

এই চরিত্ররচনার প্রতিভা কোনো সাম্প্রদায়িক শাস্ত্র মানিয়া চলে না। প্রকৃত কবির কবিত্ব যেমন অলঙ্কারশাস্ত্রের অতীত, অথচ বিশ্বহৃদয়ের মধ্যে বিধিরচিত নিগূঢ়নিহিত এক অলিখিত অলঙ্কারশাস্ত্রের কোনো নিয়মের সহিত তাহার স্বভাবত কোনো বিরোধ হয় না, তেম্‌নি যাঁহারা যথার্থ মনুষ্য তাঁহাদের শাস্ত্র তাঁহাদের অন্তরের মধ্যে, অথচ বিশ্বব্যাপী মনুষ্যত্বের সমস্ত নিত্যবিধানগুলির সঙ্গে সে শাস্ত্র আপনি মিলিয়া যায়। অতএব, অন্যান্য প্রতিভায় যেমন "ওরিজিন্যালিটি" অর্থাৎ অনন্যতন্ত্রতা প্রকাশ পায়, মহৎচরিত্রবিকাশেও সেইরূপ অনন্যতন্ত্রতার প্রয়োজন হয়।—অনেকে বিদ্যা-

সাগরের অনন্যতন্ত্র প্রতিভা ছিল না বলিয়া আভাস দিয়া থাকেন ; তাঁহারা জানেন, অনন্যতন্ত্রত্ব কেবল সাহিত্যে এবং শিল্পে, বিজ্ঞানে এবং দর্শনেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। বিদ্যাসাগর এই অকৃতকীর্ত্তি অকিঞ্চিৎকর বঙ্গসমাজের মধ্যে নিজের চরিত্রকে মনুষ্যত্বের আদর্শরূপে প্রস্ফুট করিয়া যে এক অসামান্য অনন্যতন্ত্রত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বাংলার ইতিহাসে অতিশয় বিরল। এতো বিরল যে, এক শতাব্দীর মধ্যে কেবল আর দুইএক-জনের নাম মনে পড়ে এবং তাঁহাদের মধ্যে রামমোহন রায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

অনন্যতন্ত্রতা শব্দটা শুনিবামাত্র তাহাকে সঙ্কীর্ণতা বলিয়া ভ্রম হইতে পারে ; মনে হইতে পারে, তাহা ব্যক্তিগত বিশেষত্ব, সাধারণের সহিত তাহার যোগ নাই। কিন্তু সে কথা যথার্থ নহে। বস্তুত আমরা নিয়মের শৃঙ্খলে, জটিল কৃত্রিমতার বন্ধনে এতোই জড়িত ও আচ্ছন্ন হইয়া থাকি যে, আমরা সমাজের কল-চালিত পুত্তলের মতো হইয়া যাই ; অধি-কাংশ কাজই সংস্কারাধীনে অন্ধভাবে সম্পন্ন করি ; নিজত্ব কাহাকে বলে, জানি না, জানিবার আবশ্যকতা রাখি না। আমাদের ভিতরকার আসল মানুষটি জন্মাবধি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত প্রায় সুপ্তভাবেই কাটাইয়া দেয়, তাহার স্থানে কাজ করে একটা নিয়ম-বাঁধা যন্ত্র। যাঁহাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের পরিমাণ অধিক, চিরাগত প্রথা ও অভ্যাসের জড় আচ্ছাদনে তাঁহাদের সেই প্রবল শক্তিকে চাপা দিয়া রাখিতে পারে না। ইহারাই নিজের চরিত্রপুরীর মধ্যে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার প্রাপ্ত হন। অন্তরস্থ মনুষ্যত্বের এই স্বাধীনতার নামই নিজত্ব। এই নিজত্ব ব্যক্তভাবে ব্যক্তিবিশেষের, কিন্তু নিগূঢ়ভাবে সমস্ত মানবের। মহৎব্যক্তিরা এই নিজত্বপ্রভাবে একদিকে স্বতন্ত্র,—একক, অন্যদিকে সমস্ত মানবজাতির সবর্ণ,—সহোদর। আমাদের দেশে রামমোহন রায় এবং বিদ্যাসাগর উভয়ের জীবনেই ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। একদিকে যেমন তাঁহারা ভারতবর্ষীয়, তেম্নি অপরদিকে য়ুরোপীয়-প্রকৃতির সহিত তাঁহাদের

চরিত্রের বিস্তর নিকটসাদৃশ্য দেখিতে পাই। অথচ তাহা অনুকরণগত সাদৃশ্য নহে। বেশভূষায়, আচারে-ব্যবহারে তাঁহারা সম্পূর্ণ বাঙালী ছিলেন ; স্বজাতীয় শাস্ত্রজ্ঞানে তাঁহাদের সমতুল্য কেহ ছিল না ; স্বজাতিকে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের মূলপত্তন তাঁহারাই করিয়া গিয়াছেন—অথচ নির্ভীক বলিষ্ঠতা, সত্যচারিতা, লোকহিতৈষা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা এবং আত্মনির্ভরতায় তাঁহারা বিশেষরূপে য়ুরোপীয় মহাজনদের সহিত তুলনীয় ছিলেন। য়ুরোপীয়দের তুচ্ছ বাহ্য অনুকরণের প্রতি তাঁহারা যে অবজ্ঞা-প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতেও তাঁহাদের য়ুরোপীয়সুলভ গভীর আত্ম-সম্মানবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। য়ুরোপীয় কেন, সরল সত্যপ্রিয় সাঁওতালেরাও যে অংশে মনুষ্যত্বে ভূষিত, সেই অংশে বিদ্যাসাগর তাঁহার স্বজাতীয় বাঙালীর অপেক্ষা সাঁওতালের সহিত আপনার অন্তরের যথার্থ ঐক্য অনুভব করিতেন।

মাঝে মাঝে বিধাতার নিয়মের এরূপ আশ্চর্য্য ব্যতিক্রম হয় কেন, বিশ্বকর্ম্মা যেখানে চারকোটি বাঙালী নির্ম্মাণ করিতেছিলেন, সেখানে হঠাৎ দুইএকজন মানুষ গড়িয়া বসেন কেন, তাহা বলা কঠিন। কি নিয়মে বড়োলোকের অভ্যুত্থান হয়, তাহা সকল দেশেই রহস্যময়—আমাদের এই ক্ষুদ্রকর্ম্মা ভীরুহৃদয়ের দেশে সে রহস্য দ্বিগুণতর দুর্ভেদ্য। বিদ্যাসাগরের চরিত্রসৃষ্টিও রহস্যাবৃত—কিন্তু ইহা দেখা যায়, সে চরিত্রের ছাঁচ ছিল ভালো। ঈশ্বরচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষের মধ্যে মহত্ত্বের উপকরণ প্রচুরপরিমাণে সঞ্চিত ছিল।

বিদ্যাসাগরের জীবনবৃত্তান্ত আলোচনা করিলে প্রথমেই তাঁহার পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। লোকটি অনন্যসাধারণ ছিলেন, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই।

মেদিনীপুরজেলায় বনমালীপুরে তাঁহার পৈতৃক বাসস্থান ছিল। তাঁহার পিতার মৃত্যুর পরে বিষয়বিভাগ লইয়া সহোদরদের সহিত মনান্তর-

হওয়ায় তিনি সংসারত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। বহুকাল পরে তর্কভূষণ দেশে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার স্ত্রী দুর্গাদেবী ভাশুর ও দেবরগণের অনাদরে প্রথমে শ্বশুরালয় হইতে বীরসিংহগ্রামে পিত্রালয়ে, পরে সেখানেও ভ্রাতা ও ভ্রাতৃজায়ার লাঞ্ছনায় বৃদ্ধপিতার সাহায্যে পিতৃভবনের অনতিদূরে এক কুটীরে বাস করিয়া চরকা কাটিয়া দুই পুত্র ও চারি কন্যা সহ বহুকষ্টে দিনপাত করিতেছেন। তর্কভূষণ ভ্রাতাদের আচরণ শুনিয়া নিজের স্বত্ব ও তাঁহাদের সংস্রব ত্যাগ করিয়া ভিন্নগ্রামে দারিদ্র্য অবলম্বন করিয়া রহিলেন। কিন্তু যাঁহার স্বভাবের মধ্যে মহত্ত্ব আছে, দারিদ্র্যে তাঁহাকে দরিদ্র করিতে পারে না। বিদ্যাসাগর স্বয়ং তাঁহার পিতামহের যে চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন, স্থানে স্থানে তাহা উদ্ধৃত করিতে ইচ্ছা করি।

"তিনি নিরতিশয় তেজস্বী ছিলেন; কোন অংশে কাহারও নিকট অবনত হইয়া চলিতে, অথবা কোনোপ্রকারে অনাদর বা অবমাননা সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি সকল স্থলে, সকল বিষয়ে, স্বীয় অভিপ্রায়ের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতেন, অন্যদীয় অভিপ্রায়ের অনুবর্ত্তন, তদীয় স্বভাব ও অভ্যাসের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। উপকারপ্রত্যাশায়, অথবা অন্য কোনও কারণে, তিনি কখনও পরের উপাসনা বা আনুগত্য করিতে পারেন নাই।"*

ইহা হইতেই শ্রোতৃগণ, বুঝিতে পারিবেন, একান্নবর্ত্তী পরিবারে কেন এই অগ্নিখণ্ডটিকে ধরিয়া রাখিতে পারে নাই। তাঁহারা পাঁচ সহোদর ছিলেন, কিন্তু তিনি একাই নীহারিকাচক্র হইতে বিচ্ছিন্ন জ্যোতিষ্কের মতো আপন বেগে বাহিরে বিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন। একান্নবর্ত্তী পরিবারে বহুভারাক্রান্ত যন্ত্রেও তাঁহার কঠিন চরিত্রস্বাতন্ত্র্য পেষণ করিয়া দিতে পারে নাই।

* স্বরচিত বিদ্যাসাগরচরিত, ৩১ পৃষ্ঠা।।

"তাঁহার শ্যালক রামসুন্দর বিদ্যাভূষণ গ্রামের প্রধান বলিয়া পরিগণিত এবং সাতিশয় গর্ব্বিত ও উদ্ধতস্বভাব ছিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, ভগিনীপতি রামজয় তাঁহার অনুগত হইয়া থাকিবেন। কিন্তু, তাঁহার ভগিনীপতি কিরূপ প্রকৃতির লোক, তাহা বুঝিতে পারিলে, তিনি সেরূপ মনে করিতে পারিতেন না। রামজয় রামসুন্দরের অনুগত হইয়া না চলিলে, রামসুন্দর নানাপ্রকারে তাঁহাকে জব্দ করিবেন, অনেকে তাঁহাকে এই ভয় দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু রামজয়, কোনও কারণে, ভয় পাইবার লোক ছিলেন না; তিনি স্পষ্টবাক্যে বলিতেন, বরং বাসত্যাগ করিব, তথাপি শালার অনুগত হইয়া চলিতে পারিব না। শ্যালকের আক্রোশে, তাঁহাকে সময়ে সময়ে প্রকৃতপ্রস্তাবে, একঘরিয়া হইয়া থাকিতে ও নানাপ্রকার অত্যাচার-উপদ্রব সহ্য করিতে হইত, তিনি তাহাতে ক্ষুব্ধ বা চলচিত্ত হইতেন না।" *

তাঁহার তেজস্বিতার উদাহরণস্বরূপে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, জমিদার যখন তাঁহাদের বীরসিংহগ্রামের নূতন বাস্তবাটী নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর করিয়া দিবেন মানস করিয়াছিলেন, তখন রামজয় দানগ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই। গ্রামের অনেকেই বসতবাটী নাখেরাজ করিবার জন্য তাঁহাকে অনেক উপদেশ দিয়াছিল, কিন্তু তিনি কাহারও অনুরোধ রক্ষা করেন নাই। এমন লোকের পক্ষে দারিদ্র্যও মহৈশ্বর্য্য, ইহাতে তাঁহার স্বাভাবিক সম্পদ্ জাজ্জ্বল্যমান করিয়া তোলে। †

কিন্তু তর্কভূষণ যে আপন স্বাতন্ত্র্যগর্ব্বে সর্ব্বসাধারণকে অবজ্ঞা করিয়া দূরে থাকিতেন, তাহা নহে। বিদ্যাসাগর বলেন, "তর্কভূষণমহাশয় নিরতিশয় অমায়িক ও নিরহঙ্কার ছিলেন; কি ছোটো, কি বড়ো,

---

* স্বরচিত বিদ্যাসাগরচরিত, ৩০ পৃষ্ঠা।

† সহোদর শ্রীশম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত বিদ্যাসাগরজীবনচরিত, ৫ পৃষ্ঠা।

সর্ব্ববিধ লোকের সহিত, সমভাবে সদয় ও সাদর ব্যবহার করিতেন। তিনি যাঁহাদিগকে কপটাচারী মনে করিতেন, তাঁহাদের সহিত সাধ্যপক্ষে আলাপ করিতেন না। তিনি স্পষ্টবাদী ছিলেন, কেহ রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইবেন, ইহা ভাবিয়া, স্পষ্টকথা বলিতে ভীত বা সঙ্কুচিত হইতেন না। তিনি যেমন স্পষ্টবাদী, তেমনই যথার্থবাদী ছিলেন। কাহারও ভয়ে বা অনুরোধে, অথবা অন্য কোনও কারণে তিনি, কখনও কোনও বিষয়ে অযথা নির্দ্দেশ করেন নাই। তিনি যাঁহাদিগকে আচরণে ভদ্র দেখিতেন, তাঁহাদিগকেই ভদ্র বলিয়া গণ্য করিতেন; আর যাঁহাদিগকে আচরণে অভদ্র দেখিতেন, বিদ্বান্, ধনবান্ ও ক্ষমতাপন্ন হইলেও, তাঁহাদিগকে ভদ্রলোক বলিয়া জ্ঞান করিতেন না।" *

এদিকে তর্কভূষণমহাশয়ের বল এবং সাহসও আশ্চর্য্য ছিল। সর্ব্বদাই তাহার হস্তে একখানি লৌহদণ্ড থাকিত। তখন দস্যুভয়ে অনেকে একত্র না হইয়া স্থানান্তরে যাইতে পারিত না, কিন্তু তিনি একা এই লৌহদণ্ডহস্তে অকুতোভয়ে সর্ব্বত্র যাতায়াত করিতেন; এমন কি, দুইচারিবার আক্রান্ত হইয়া দস্যুদিগকে উপযুক্তরূপ শিক্ষা দিয়াছিলেন। একুশবৎসর বয়সে একবার তিনি এক ভালুকের সম্মুখে পড়িয়াছিলেন। "ভালুক নখরপ্রহারে তাঁহার সর্ব্বশরীর ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিল, তিনিও অবিশ্রান্ত লৌহযষ্টি প্রহার করিতে লাগিলেন। ভালুক ক্রমে নিস্তেজ হইয়া পড়িলে, তিনি, তদীয় উদরে উপর্য্যুপরি পদাঘাত করিয়া, তাহার প্রাণসংহার করিলেন।" † অবশেষে শোণিত-স্রুত বিক্ষতদেহে চারিক্রোশ পথ হাঁটিয়া মেদিনীপুরে এক আত্মীয়ের গৃহে শয্যা আশ্রয় করেন;—দুইমাস পরে সুস্থ হইয়া বাড়ি ফিরিতে পারেন।

---

* স্বরচিত বিদ্যাসাগরচরিত, ৩৪ পৃষ্ঠা।

† স্বরচিত বিদ্যাসাগরচরিত।

আর একটিমাত্র ঘটনা উল্লেখ করিলে তর্কভূষণের চরিত্রচিত্র সম্পূর্ণ হইবে।

১৭৪২ শকের ১২ই আশ্বিন মঙ্গলবারে বিদ্যাসাগরের পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অদূরে কোমরগঞ্জে মধ্যাহ্নে হাট করিতে গিয়াছিলেন। রামজয় তর্কভূষণ তাঁহাকে ঘরের একটি শুভসংবাদ দিতে বাহির হইয়াছিলেন। পথের মধ্যে পুত্রের সহিত দেখা হইলে বলিলেন, "একটি এঁড়েবাছুর হ'য়েছে।" শুনিয়া ঠাকুরদাস ঘরে আসিয়া গোয়ালের অভিমুখে গমন করিতেছিলেন; তর্কভূষণ হাসিয়া কহিলেন, "ওদিকে নয়, এদিকে এস"—বলিয়া সূতিকাগৃহে লইয়া নবপ্রসূত শিশু ঈশ্বরচন্দ্রকে নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইলেন।

এই কৌতুকহাস্যরশ্মিপাতে রামজয়ের বলিষ্ঠ উন্নতচরিত্র আমাদের নিকট প্রভাতের গিরিশিখরের ন্যায় রমণীয় বোধ হইতেছে। এই হাস্যময় তেজোময় নির্ভীক ঋজুস্বভাব পুরুষের মতো আদর্শ বাংলাদেশে অত্যন্ত বিরল না হইলে বাঙালির মধ্যে পৌরুষের অভাব হইত না। আমরা তাঁহার চরিত্রবর্ণনা বিস্তারিতরূপে উদ্ধৃত করিলাম, তাহার কারণ, এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাঁহার পৌত্রকে আর কোন সম্পত্তি দান করিতে পারেন নাই, কেবল যে অক্ষয়সম্পদের উত্তরাধিকারবণ্টন একমাত্র ভগবানের হস্তে, সেই চরিত্রমাহাত্ম্য অখণ্ডভাবে তাঁহার জ্যেষ্ঠপৌত্রের অংশে রাখিয়া গিয়াছিলেন।

পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ও সাধারণ লোক ছিলেন না। যখন তাঁহার বয়স ১৪।১৫ বৎসর, এবং যখন তাঁহার মাতা দুর্গাদেবী চরকায় সূতা কাটিয়া একাকিনী তাঁহার দুই পুত্র এবং চারি কন্যার ভরণপোষণে প্রবৃত্ত ছিলেন, তখন ঠাকুরদাস উপার্জ্জনের চেষ্টায় কলিকাতায় প্রস্থান করিলেন।

কলিকাতায় আসিয়া প্রথমে তিনি তাঁহার আত্মীয় জগন্মোহন তর্কা-

লঙ্কারের বাড়ীতে উঠিলেন। ইংরাজি শিখিলে সওদাগর সাহেবদের হৌসে কাজ জুটিতে পারিবে জানিয়া প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলায় এক শিপ্‌সরকারের বাড়ী ইংরাজি শিখিতে যাইতেন। যখন বাড়ী ফিরিতেন, তখন তর্কলঙ্কারের বাড়ীতে উপ্‌রিলোকের আহারের কাণ্ড শেষ হইয়া যাইত, সুতরাং তাঁহাকে রাত্রে অনাহারে থাকিতে হইত। অবশেষে তিনি তাঁহার শিক্ষকের এক আত্মীয়ের বাড়ী আশ্রয় লইলেন। আশ্রয়দাতার দারিদ্র্যনিবন্ধন একএকদিন তাঁহাকে সমস্তদিন উপবাসী থাকিতে হইত। একদিন ক্ষুধার জ্বালায় তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব একখানি পিতলের থালা ও একটি ছোটো ঘটি কাঁসারির দোকানে বেচিতে গিয়াছিলেন। কাঁসারিরা তাহার পাঁচসিকা দর স্থির করিয়াছিল, কিন্তু কিনিতে সম্মত হইল না; বলিল, অজানিত লোকের নিকট হইতে পুরাণ বাসন কিনিয়া মাঝে মাঝে বড়ো ফেসাদে পড়িতে হয়। *

আর একদিন ক্ষুধার যন্ত্রণা ভুলিবার অভিপ্রায়ে মধ্যাহ্নে ঠাকুরদাস বাসা হইতে বাহির হইয়া পথে পথে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। "বড়বাজার হইতে ঠন্‌ঠনিয়া পর্য্যন্ত গিয়া এতো অভিভূত হইলেন যে, আর তাঁহার চলিবার ক্ষমতা রহিল না। কিঞ্চিৎ পরেই তিনি এক দোকানের সম্মুখে উপস্থিত ও দণ্ডায়মান হইলেন; দেখিলেন, এক মধ্যবয়স্কা বিধবা নারী ঐ দোকানে বসিয়া মুড়িমুড়কি বেচিতেছেন। তাঁহাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া, ঐ স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, বাপাঠাকুর দাঁড়াইয়া আছ কেন? ঠাকুরদাস তৃষ্ণার উল্লেখ করিয়া, পানার্থে জল প্রার্থনা করিলেন। তিনি, সাদর ও সস্নেহবাক্যে, ঠাকুরদাসকে বসিতে বলিলেন, এবং ব্রাহ্মণের ছেলেকে শুধু জল দেওয়া অবিধেয়, এই বিবেচনা করিয়া, কিছু মুড়কি ও জল দিলেন। ঠাকুরদাস, যেরূপ ব্যগ্র হইয়া, মুড়কিগুলি

* সহোদর শ্রীশম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত বিদ্যাসাগরজীবনচরিত।

খাইলেন, তাহা একদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া, ঐ স্ত্রীলোক জিজ্ঞাসা করিলেন, বাপাঠাকুর, আজ বুঝি তোমার খাওয়া হয় নাই? তিনি বলিলেন, না মা, আজ আমি এখন পর্য্যন্ত কিছু খাই নাই। তখন সেই স্ত্রীলোক ঠাকুরদাসকে বলিলেন, বাপাঠাকুর, জল খাইয়ো না, একটু অপেক্ষা কর। এই বলিয়া নিকটবর্ত্তী গোয়ালার দোকান হইতে, সত্বর, দই কিনিয়া আনিলেন, এবং আরও মুড়কি দিয়া, ঠাকুরদাসকে পেট ভরিয়া ফলার করাইলেন; পরে তাঁহার মুখে সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া, জিদ্ করিয়া বলিয়া দিলেন, যেদিন তোমার এরূপ ঘটিবেক, এখানে আসিয়া ফলার করিয়া যাইবে।"*

এইরূপ কষ্টে কিছু ইংরাজি শিখিয়া ঠাকুরদাস প্রথমে মাসিক দুই-টাকা ও তাহার দুইতিনবৎসর পরে মাসিক পাঁচটাকা বেতন উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। অবশেষে জননী দুর্গাদেবী যখন শুনিলেন, তাঁহার ঠাকুরদাসের মাসিক আটটাকা মাহিয়ানা হইয়াছে, তখন তাঁহার আহ্লাদের সীমা রহিল না এবং ঠাকুরদাসের সেই তেইশচব্বিশবৎসর বয়সে গোঘাটনিবাসী রামকান্ত তর্কবাগীশের দ্বিতীয়া কন্যা ভগবতী দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন।

বঙ্গদেশের সৌভাগ্যক্রমে এই ভগবতী দেবী এক অসামান্যা রমণী ছিলেন। শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের রচিত বিদ্যাসাগরগ্রন্থে লিথোগ্রাফপটে এই দেবীমূর্ত্তি প্রকাশিত হইয়াছে। অধিকাংশ প্রতি-মূর্ত্তিই অধিকক্ষণ দেখিবার দরকার হয় না, তাহা যেন মুহূর্ত্তকালের মধ্যেই নিঃশেষিত হইয়া যায়। তাহা নিপুণ হইতে পারে, সুন্দর হইতে পারে, তথাপি তাহার মধ্যে চিত্তনিবেশের যথোচিত স্থান পাওয়া যায় না, চিত্রপটের উপরিতলেই দৃষ্টির প্রসর পর্য্যবসিত হইয়া যায়। কিন্তু ভগবতী দেবীর এই পবিত্র মুখশ্রীর গভীরতা এবং উদারতা বহুক্ষণ

* স্বরচিত বিদ্যাসাগরচরিত, ১৪ পৃষ্ঠা।

নিরীক্ষণ করিয়াও শেষ করিতে পারা যায় না। উন্নত ললাটে তাঁহার বুদ্ধির প্রসার, সুদূরদর্শী স্নেহবর্ষী আয়ত নেত্র, সরল সুগঠিত নাসিকা, দয়াপূর্ণ ওষ্ঠাধর, দৃঢ়তাপূর্ণ চিবুক, এবং সমস্ত মুখের একটি মহিমময় সুসংযত সৌন্দর্য্য দর্শকের হৃদয়কে বহু দূরে এবং বহু উর্দ্ধে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়—এবং ইহাও বুঝিতে পারি, ভক্তিবৃত্তির চরিতার্থতা-সাধনের জন্য কেন বিদ্যাসাগরকে এই মাতৃদেবী ব্যতীত কোনো পৌরাণিক দেবী-প্রতিমার মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয় নাই।

ভগবতী দেবীর অকুণ্ঠিত দয়া তাঁহার গ্রাম, পল্লী, প্রতিবেশীকে নিয়ত অভিষিক্ত করিয়া রাখিত। রোগার্ত্তের সেবা, ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান এবং শোকাতুরের দুঃখে শোকপ্রকাশ করা তাঁহার নিত্যনিয়মিত কার্য্য ছিল। অগ্নিদাহে বীরসিংহগ্রামের বাসস্থান ভস্মীভূত হইয়া গেলে বিদ্যাসাগর যখন তাঁহার জননীদেবীকে কলিকাতায় লইয়া যাইবার চেষ্টা করেন, তিনি বলিলেন, "যে সকল দরিদ্রলোকের সন্তানগণ এখানে ভোজন করিয়া বীরসিংহবিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে, আমি এস্থান পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিলে তাহারা কি খাইয়া স্কুলে অধ্যয়ন করিবে ?"*

দয়াবৃত্তি আরো অনেক রমণীর মধ্যে দেখা যায়, কিন্তু ভগবতী দেবীর দয়ার মধ্যে একটি অসাধারণত্ব ছিল, তাহা কোনোপ্রকার সঙ্কীর্ণ সংস্কারের দ্বারা বদ্ধ ছিল না। সাধারণলোকের দয়া দিয়াশেলাই-শলাকার মত কেবল বিশেষরূপ সংঘর্ষেই জ্বলিয়া উঠে এবং তাহা অভ্যাস ও লোকাচারের ক্ষুদ্র বাক্সের মধ্যেই বদ্ধ। কিন্তু ভগবতী দেবীর হৃদয়, সূর্য্যের ন্যায় আপনার বুদ্ধি-উজ্জ্বল দয়ারশ্মি স্বভাবতই চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ করিয়া দিত, শাস্ত্র বা প্রথাসংঘর্ষের অপেক্ষা করিত না। বিদ্যাসাগরের তৃতীয়সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় তাঁহার ভ্রাতার জীবনচরিতে লিখিয়াছেন যে,

* সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত বিদ্যাসাগরজীবনচরিত, ২০০ পৃষ্ঠা।

একবার বিদ্যাসাগর তাঁহার জননীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "বৎসরের মধ্যে একদিন পূজা করিয়া ৬।৭ শত টাকা বৃথা ব্যয় করা ভাল, কি গ্রামের নিরুপায় অনাথ লোকদিগকে ঐ টাকা অবস্থানুসারে মাসে মাসে কিছু কিছু সাহায্য করা ভাল?" ইহা শুনিয়া জননীদেবী উত্তর করেন, "গ্রামের দরিদ্র নিরুপায় লোক প্রত্যহ খাইতে পাইলে পূজা করিবার আবশ্যক নাই।" এ কথাটি সহজ কথা নহে,—তাঁহার নির্ম্মলবুদ্ধি এবং উজ্জ্বল দয়া, প্রাচীন সংস্কারের মোহাবরণ যে এমন অনায়াসে বর্জ্জন করিতে পারে, ইহা আমার নিকট বড় বিস্ময়কর বোধ হয়। লৌকিক-প্রথার বন্ধন রমণীর কাছে যেমন দৃঢ়, এমন আর কার কাছে? অথচ, কি আশ্চর্য্যস্বাভাবিক চিত্তশক্তির দ্বারা তিনি জড়তাময় প্রথাভিত্তি ভেদ করিয়া নিত্যজ্যোতির্ম্ময় অনন্ত বিশ্বধর্ম্মাকাশের মধ্যে উত্তীর্ণ হইলেন। এ কথা তাঁহার কাছে এত সহজ বোধ হইল কি করিয়া যে, মনুষ্যের সেবাই যথার্থ দেবতার পূজা? তাহার কারণ, সকল সংহিতা অপেক্ষা প্রাচীন-তম সংহিতা তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত ছিল।

সিবিলিয়ান্ হ্যারিসন্‌সাহেব যখন কার্য্যোপলক্ষ্যে মেদিনীপুরজেলায় গমন করেন, তখন ভগবতী দেবী তাঁহাকে স্বনামে পত্র পাঠাইয়া বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিলেন; তৎসম্বন্ধে তাঁহার তৃতীয়পুত্র শম্ভুচন্দ্র নিম্নলিখিত বর্ণনা প্রকাশ করিয়াছেন;—"জননীদেবী সাহেবের ভোজন-সময়ে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাকে ভোজন করাইয়াছিলেন। তাহাতে সাহেব আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন যে, অতি বৃদ্ধা হিন্দুস্ত্রীলোক সাহেবের ভোজনসময়ে চিয়ারে উপবিষ্টা হইয়া কথাবার্ত্তা কহিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ········ সাহেব হিন্দুর মত জননীকে ভূমিষ্ঠ হইয়া মাতৃভাবে অভিবাদন করেন। তদনন্তর নানা বিষয়ের কথাবার্ত্তা হইল। জননীদেবী প্রবীণ হিন্দুস্ত্রীলোক, তথাপি তাঁহার স্বভাব অতি উদার, মন অতিশয় উন্নত, এবং মনে কিছুমাত্র কুসংস্কার নাই। কি ধনশালী কি দরিদ্র, কি বিদ্বান্

কি মূর্খ, কি উচ্চজাতীয় কি নীচজাতীয়, কি পুরুষ কি স্ত্রী, কি হিন্দু-ধর্ম্মাবলম্বী কি অন্যধর্ম্মাবলম্বী, সকলেরই প্রতি সমদৃষ্টি।"*

শম্ভুচন্দ্র অন্যত্র লিখিতেছেন, "১২৬৬ শাল হইতে ৭২ শাল পর্য্যন্ত ক্রমিক বিস্তর বিধবা কামিনীর বিবাহকার্য্য সমাধা হয়। ঐ সকল বিবাহিত লোককে বিপদ্ হইতে রক্ষার জন্য অগ্রজমহাশয় বিশেষরূপ যত্নবান্ ছিলেন। উহাদিগকে মধ্যে মধ্যে আপন দেশস্থ ভবনে আনাইতেন। বিবাহিতা ঐ সকল স্ত্রীলোককে যদি কেহ ঘৃণা করে, এ কারণ জননীদেবী ঐ সকল বিবাহিতা ব্রাহ্মণজাতীয়া স্ত্রীলোকের সহিত একত্র একপাত্রে ভোজন করিতেন।"†

অথচ তখন বিধবাবিবাহের আন্দোলনে দেশের পুরুষেরা বিদ্যাসাগরের প্রাণসংহারের জন্য গোপনে আয়োজন করিতেছিল, এবং দেশের পণ্ডিতবর্গ শাস্ত্র মন্থন করিয়া কুযুক্তি এবং ভাষা মন্থন করিয়া কটূক্তি বিদ্যাসাগরের মস্তকের উপর বর্ষণ করিতেছিলেন ; আর এই রমণীকে কোনো শাস্ত্রের কোনো শ্লোক খুঁজিতে হয় নাই ; বিধাতার স্বহস্তলিখিত শাস্ত্র তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে রাত্রিদিন উদ্ঘাটিত ছিল। অভিমন্যু জননী-জঠরে থাকিতে যুদ্ধবিদ্যা শিখিয়াছিলেন, বিদ্যাসাগরও বিধিলিখিত সেই মহাশাস্ত্র মাতৃগর্ভবাসকালেই অধ্যয়ন করিয়া আসিয়াছিলেন।

আশঙ্কা করিতেছি, সমালোচকমহাশয়েরা মনে করিতে পারেন যে, বিদ্যাসাগরসম্বন্ধীয় ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাঁহার জননীসম্বন্ধে এতখানি আলোচনা কিছু পরিমাণবহির্ভূত হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু এ কথা তাঁহারা স্থির জানিবেন, এখানে জননীর চরিতে এবং পুত্রের চরিতে প্রভেদ নাই, তাঁহারা যেন পরস্পরের পুনরাবৃত্তি। তাহা ছাড়া, মহা-

* সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত বিদ্যাসাগরজীবনচরিত, ১৯৯ পৃষ্ঠা।

† সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত বিদ্যাসাগরজীবনচরিত, ১৬৪ পৃষ্ঠা।

পুরুষের ইতিহাস বাহিরের নানা কার্য্যে এবং জীবনবৃত্তান্তে স্থায়ী হয়, আর, মহৎ-নারীর ইতিহাস তাঁহার পুত্রের চরিত্রে তাঁহার স্বামীর কার্য্যে রচিত্ত হইতে থাকে, এবং সে লেখায় তাঁহার নামোল্লেখ থাকে না। অতএব, বিদ্যাসাগরের জীবনে তাঁহার মাতার জীবনচরিত কেমন করিয়া লিখিত হইয়াছে, তাহা ভালোরূপ আলোচনা না করিলে উভয়েরই জীবনী অসম্পূর্ণ থাকে। আর, আমরা যে মহাত্মার স্মৃতিপ্রতিমাপূজার জন্য এখানে সমবেত হইয়াছি, যদি তিনি কোনোরূপ সূক্ষ্ম চিন্ময় দেহে অদ্য এই সভায় আসনগ্রহণ করিয়া থাকেন, এবং যদি এই অযোগ্য ভক্ত-কর্ত্তৃক তাঁহার চরিতকীর্ত্তন তাঁহার শ্রুতিগোচর হয়, তবে এই রচনায় যে অংশে তাঁহার জীবনী অবলম্বন করিয়া তাঁহার মাতৃদেবীর মাহাত্ম্য মহীয়ান্ হইয়াছে, সেইখানেই তাঁহার দিব্যনেত্র হইতে প্রভূততম পুণ্যাশ্রুবর্ষণ হইতে থাকিবে, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই।

বিদ্যাসাগর তাঁহার বর্ণপরিচয় প্রথমভাগে গোপালনামক একটি সুবোধ ছেলের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহাকে বাপমায়ে যাহা বলে, সে তাহাই করে। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র নিজে যখন সেই গোপালের বয়সী ছিলেন, তখন গোপালের অপেক্ষা কোনো কোনো অংশে রাখালের সঙ্গেই তাঁহার অধিকতর সাদৃশ্য দেখা যাইত। পিতার কথা পালন করা দূরে থাক্, পিতা যাহা বলিতেন, তিনি ঠিক তাহার উল্টা করিয়া বসিতেন। শম্ভুচন্দ্র লিখিয়াছেন—"পিতা তাঁহার স্বভাব বুঝিয়া চলিতেন। যেদিন শাদাবস্ত্র না থাকিত, সেদিন বলিতেন, আজ ভাল কাপড় পরিয়া কালেজে যাইতে হইবে, তিনি হঠাৎ বলিতেন, না, আজ ময়লা কাপড় পরিয়া যাইব। যেদিন বলিতেন, আজ স্নান করিতে হইবে, শ্রবণমাত্র দাদা বলিতেন যে, আজ স্নান করিব না; পিতা প্রহার করিয়াও স্নান করাইতে পারিতেন না। সঙ্গে করিয়া ট্যাকশালের ঘাটে নামাইয়া

দিলেও দাঁড়াইয়া থাকিতেন। পিতা চড়চাপড় মারিয়া জোর করিয়া স্নান করাইতেন।"*

পাঁচছয়বৎসর বয়সের সময় যখন গ্রামের পাঠশালায় পড়িতে যাইতেন, তখন প্রতিবেশী মথুরমণ্ডলের স্ত্রীকে রাগাইয়া দিবার জন্য যে প্রকার সভ্যবিগর্হিত উপদ্রব তিনি করিতেন, বর্ণপরিচয়ের সর্ব্বজননিন্দিত রাখালবেচারাও বোধ করি এমন কাজ কখনও করে নাই।

নিরীহ বাংলাদেশে গোপালের মত সুবোধছেলের অভাব নাই। এই ক্ষীণতেজ দেশে রাখাল এবং তাহার জীবনীলেখক ঈশ্বরচন্দ্রের মত দুর্দ্দান্ত ছেলের প্রাদুর্ভাব হইলে বাঙালীজাতির শীর্ণচরিত্রের অপবাদ ঘুচিয়া যাইতে পারে। সুবোধ ছেলেগুলি পাস্ করিয়া ভালো চাকৃরি-বাকৃরি ও বিবাহকালে প্রচুর পণ লাভ করে, সন্দেহ নাই, কিন্তু দুষ্ট অবাধ্য-অশান্ত ছেলেগুলির কাছে স্বদেশের জন্য অনেক আশা করা যায়। বহুকাল পূর্ব্বে একদা নবদ্বীপের শচীমাতার এক প্রবল দুরন্ত-ছেলে এই আশা পূর্ণ করিয়াছিলেন।

কিন্তু একটা বিষয়ে রাখালের সহিত তাহার জীবনচরিতলেখকের সাদৃশ্য ছিল না। "রাখাল পড়িতে যাইবার সময় পথে খেলা করে, মিছামিছি দেরি করিয়া, সকলের শেষে পাঠশালায় যায়।" কিন্তু পড়াশুনায় বালক ঈশ্বরচন্দ্রের কিছুমাত্র শৈথিল্য ছিল না। যে প্রবল জিদের সহিত তিনি পিতার আদেশ ও নিষেধের বিপরীত কাজ করিতে প্রবৃত্ত হইতেন, সেই দুর্দ্দম জিদের সহিত তিনি পড়িতে যাইতেন। সেও তাঁহার প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে নিজের জিদ্‌রক্ষা। ক্ষুদ্র একগুঁয়ে ছেলেটি মাথায় এক মস্ত ছাতা তুলিয়া তাঁহাদের বড়বাজারের বাসা হইতে পটলডাঙায় সংস্কৃতকালেজে যাত্রা করিতেন, লোকে মনে করিত, একটা ছাতা চলিয়া যাইতেছে। এই দুর্জ্জয় বালকের শরীরটি খর্ব্ব, শীর্ণ,

* সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত বিদ্যাসাগরজীবনচরিত, ২৫ পৃষ্ঠা।

মাথাটা প্রকাণ্ড,—স্কুলের ছেলেরা সেইজন্য তাঁহাকে যশুরে কৈ ও তাহার অপভ্রংশ কস্‌রে জৈ বলিয়া ক্ষ্যাপাইত, তিনি তখন তোৎলা ছিলেন, রাগিয়া কথা কহিতে পারিতেন না।*

এই বালক রাত্রি দশটার সময় শুইতে যাইতেন। পিতাকে বলিয়া যাইতেন, রাত্রি দুইপ্রহরের সময় তাঁহাকে জাগাইয়া দিতে। পিতা আর্ম্মাণিগির্জ্জার ঘড়িতে বারোটা বাজিলেই ঈশ্বরচন্দ্রকে জাগাইতেন, বালক অবশিষ্ট রাত্রি জাগিয়া পড়া করিতেন। ইহাও একগুঁয়ে ছেলের নিজের শরীরের প্রতি জিদ্‌। শরীরও তাহার প্রতিশোধ তুলিতে ছাড়িত না। মাঝে মাঝে কঠিন সাংঘাতিক পীড়া হইয়াছিল, কিন্তু পীড়ার শাসনে তাঁহাকে পরাভূত করিতে পারে নাই।

ইহার উপরে গৃহকর্ম্মও অনেক ছিল। বাসায় তাঁহার পিতা ও মধ্যমভ্রাতা ছিলেন। দাসদাসী ছিল না। ঈশ্বরচন্দ্র দুইবেলা সকলের রন্ধনাদি কার্য্য করিতেন। সহোদর শম্ভুচন্দ্র তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গ হইলে ঈশ্বরচন্দ্র কিয়ৎক্ষণ পুস্তক আবৃত্তি করিয়া গঙ্গার ঘাটে স্নান করিয়া কাশীনাথবাবুর বাজারে বাটামাছ ও আলুপটল-তরকারী ক্রয় করিয়া আনিতেন। বাট্‌না বাটিয়া উনান্‌ ধরাইয়া রন্ধন করিতেন। বাসায় তাঁহারা চারিজন খাইতেন। আহারের পর উচ্ছিষ্ট মুক্ত ও বাসন ধৌত করিয়া তবে পড়িতে যাইবার অবসর পাইতেন। পাক করিতে করিতে ও স্কুলে যাইবার সময় পথে চলিতে চলিতে পাঠানু-শীলন করিতেন।

এই তো অবস্থা। এদিকে ছুটির সময় যখন জল খাইতে যাইতেন, তখন স্কুলের ছাত্র যাহারা উপস্থিত থাকিত, তাহাদিগকে মিষ্টান্ন খাওয়া-ইতেন। স্কুল হইতে মাসিক যে বৃত্তি পাইতেন, ইহাতেই তাহা ব্যয় হইত। আবার, দরোয়ানের নিকট ধার করিয়া দরিদ্র ছাত্রদিগকে

* সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত বিদ্যাসাগরজীবনচরিত।

নূতন বস্ত্র কিনিয়া দিতেন। পূজার ছুটির পর দেশে গিয়া "দেশস্থ যে সকল লোকের দিনপাত হওয়া দুষ্কর দেখিতেন, তাহাদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে ক্ষান্ত থাকিতেন না। অন্যান্য লোকের পরিধেয় বস্ত্র না থাকিলে, গামছা পরিধান করিয়া নিজের বস্ত্রগুলি তাহাদিগকে বিতরণ করিতেন।"*

যে অবস্থায় মানুষ নিজের নিকট নিজে প্রধান দয়ার পাত্র, সে অবস্থায় ঈশ্বরচন্দ্র অন্যকে দয়া করিয়াছেন। তাঁহার জীবনে প্রথম হইতে ইহাই দেখা যায় যে, তাঁহার চরিত্র সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে ক্রমাগতই যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিয়াছে। তাঁহার মতো অবস্থাপন্ন ছাত্রের পক্ষে বিদ্যালাভ করা পরম দুঃসাধ্য, কিন্তু এই গ্রাম্যবালক শীর্ণ খর্ব্বদেহ এবং প্রকাণ্ড মাথা লইয়া আশ্চর্য্য অল্পকালের মধ্যেই বিদ্যাসাগর-উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার মতো দরিদ্রাবস্থার লোকের পক্ষে দান করা, দয়া করা বড়ো কঠিন, কিন্তু তিনি যখন যে অবস্থাতেই পড়িয়াছেন, নিজের কোনোপ্রকার অসচ্ছলতায় তাঁহাকে পরের উপকার হইতে বিরত করিতে পারে নাই, এবং অনেক মহৈশ্বর্য্যশালী রাজা-রায়বাহাদুর প্রচুর ক্ষমতা লইয়া যে উপাধি লাভ করিতে পারে নাই, এই দরিদ্র পিতার দরিদ্র সন্তান সেই 'দয়ার সাগর' নামে বঙ্গদেশে চিরদিনের জন্য বিখ্যাত হইয়া রহিলেন।

কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যাসাগর প্রথমে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান পণ্ডিত ও পরে সংস্কৃতকলেজের অ্যাসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারির পদে নিযুক্ত হন। এই কার্য্যোপলক্ষ্যে তিনি যে সকল ইংরাজ প্রধান-কর্ম্মচারীর সংস্রবে আসিয়াছিলেন, সকলেরই পরম শ্রদ্ধা ও প্রীতি-ভাজন হইয়াছিলেন। আমাদের দেশে প্রায় অনেকেই নিজের এবং স্বদেশের মর্য্যাদা নষ্ট করিয়া ইংরাজের অনুগ্রহ লাভ করেন। কিন্তু

* সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত বিদ্যাসাগরজীবনচরিত, ৩৭ পৃষ্ঠা।

বিদ্যাসাগর, সাহেবের হস্ত হইতে শিরোপা লইবার জন্য কখনো মাথা নত করেন নাই ; তিনি আমাদের দেশের ইংরাজপ্রসাদগর্ব্বিত সাহেবানুজীবীদের মতো আত্মাবমাননার মূল্যে বিক্রীত সম্মান ক্রয় করিতে চেষ্টা করেন নাই। একটা উদাহরণে তাহার প্রমাণ হইবে,—একবার তিনি কার্য্যোপলক্ষ্যে হিন্দুকলেজের প্রিন্সিপল্ কার্-সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন। সভ্যতাভিমানী সাহেব তাঁহার বুট্-বেষ্টিত দুই পা টেবিলের উপরে উর্দ্ধগামী করিয়া দিয়া বাঙালী ভদ্রলোকের সহিত ভদ্রতারক্ষা করা বাহুল্য বোধ করিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে ঐ কার্‌সাহেব কার্য্যবশত সংস্কৃতকলেজে বিদ্যাসাগরের সহিত দেখা করিতে আসিলে বিদ্যাসাগর চটিজুতাসমেত তাঁহার সর্ব্বজনবন্দনীয় চরণযুগল টেবিলের উপর প্রসারিত করিয়া এই অহঙ্কৃত ইংরাজ অভ্যাগতের সহিত আলাপ করিলেন। বোধ করি শুনিয়া কেহ বিস্মিত হইবেন না, সাহেব নিজের এই অবিকল অনুকরণ দেখিয়া সন্তোষলাভ করেন নাই।

ইতিমধ্যে কলেজের কার্য্যপ্রণালীসম্বন্ধে তাঁহার সহিত কর্ত্তৃপক্ষের মতান্তর হওয়ায় ঈশ্বরচন্দ্র কর্ম্মত্যাগ করিলেন। সম্পাদক রসময় দত্ত এবং শিক্ষাসমাজের অধ্যক্ষ ময়েট্‌সাহেব অনেক উপরোধ-অনুরোধ করিয়াও কিছুতেই তাঁহার পণ ভঙ্গ করিতে পারিলেন না। আত্মীয়-বান্ধবেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার চলিবে কি করিয়া ? তিনি বলিলেন, আলুপটল বেচিয়া, মুদির দোকান করিয়া দিন চালাইব। তখন বাসায় প্রায় কুড়িটি বালককে তিনি অন্নবস্ত্র দিয়া অধ্যয়ন করাইতেছিলেন—তাহাদের কাহাকেও বিদায় করিলেন না। তাঁহার পিতা পূর্ব্বে চাকরি করিতেন—বিদ্যাসাগরের সবিশেষ অনুরোধে কার্য্যত্যাগ করিয়া বাড়ী বসিয়া সংসারখরচের টাকা পাইতেছিলেন। বিদ্যাসাগর কাজ ছাড়িয়া দিয়া প্রতিমাসে ধার করিয়া পঞ্চাশটাকা বাড়ী পাঠাইতে লাগিলেন।

এইসময় ময়েট্সাহেবের অনুরোধে বিদ্যাসাগর ক্যাপ্তেন্-ব্যাঙ্ক-নামক একজন ইংরাজকে কয়েকমাস বাংলা ও হিন্দী শিখাইতেন। সাহেব যখন মাসিক পঞ্চাশটাকা হিসাবে বেতন দিতে গেলেন, তিনি বলিলেন, আপনি ময়েট্সাহেবের বন্ধু এবং ময়েট্সাহেব আমার বন্ধু—আপনার কাছে আমি বেতন লইতে পারি না।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর সংস্কৃতকলেজের সাহিত্য-অধ্যাপক ও ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে উক্ত কলেজের প্রিন্সিপল্ পদে নিযুক্ত হন। আটবৎসর দক্ষতার সহিত কাজ করিয়া শিক্ষাবিভাগের নবীন কর্ত্তা এক তরুণ সিবিলিয়ানের সহিত মনান্তর হইতে থাকায় ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে তিনি কর্ম্ম-ত্যাগ করেন। বিদ্যাসাগর স্বভাবতই সম্পূর্ণ স্বাধীনতন্ত্রের লোক ছিলেন; অব্যাহতভাবে আপন ইচ্ছা চালনা করিতে পাইলে তবে তিনি কাজ করিতে পারিতেন; উপরিতন কর্ত্তৃপক্ষের মতের দ্বারা কোনোরূপ প্রতিঘাত প্রাপ্ত হইলে তদনুসারে আপন সঙ্কল্পের প্রবাহ তিলমাত্র পরিবর্ত্তন করিতে পারিতেন না। কর্ম্মনীতির নিয়মে ইহা তাঁহার পক্ষে প্রশংসনীয় ছিল না, কিন্তু বিধাতা তাঁহাকে একাধিপত্য করিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন; অধীনে কাজ চালাইবার গুণগুলি তাঁহাকে দেন নাই। উপযুক্ত অধীনস্থ কর্ম্মচারী বাংলাদেশে যথেষ্ট আছে,—বিদ্যাসাগরকে দিয়া তাহাদের সংখ্যাবৃদ্ধি করা বিধাতা অনাবশ্যক ও অসঙ্গত বোধ করিয়াছিলেন।

বিদ্যাসাগর যখন সংস্কৃতকলেজে নিযুক্ত, তখন কলেজের কাজকর্ম্মের মধ্যে থাকিয়াও এক প্রচণ্ড সমাজসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। একদিন বীরসিংহবাটীর চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহার পিতার সহিত বীরসিংহস্কুলসম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার মাতা রোদন করিতে করিতে চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া একটি বালিকার বৈধব্য-সংঘটনের উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, তুই এতদিন এত শাস্ত্র

পড়িলি, তাহাতে বিধবার কি কোনো উপায় নাই? * মাতার পুত্র উপায়-অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন।

স্ত্রীজাতির প্রতি বিদ্যাসাগরের বিশেষ স্নেহ অথচ ভক্তি ছিল। ইহাও তাঁহার সুমহৎ-পৌরুষের একটি প্রধান লক্ষণ। সাধারণত আমরা স্ত্রীজাতির প্রতি ঈর্ষাবিশিষ্ট; অবলা স্ত্রীলোকের সুখ-স্বাস্থ্য-স্বচ্ছন্দতা আমাদের নিকট পরম পরিহাসের বিষয়, প্রহসনের উপকরণ। আমাদের ক্ষুদ্রতা ও কাপুরুষতার অন্যান্য লক্ষণের মধ্যে ইহাও একটি।

বিদ্যাসাগর শৈশবে জগদ্দুর্লভবাবুর বাসায় আশ্রয় পাইয়াছিলেন। জগদ্দুর্লভের কনিষ্ঠা ভগিনী রাইমণির সম্বন্ধে তিনি স্বরচিত জীবনবৃত্তান্তে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। "রাইমণির অদ্ভুত স্নেহ ও যত্ন আমি কস্মিন্‌কালেও বিস্মৃত হইতে পারিব না। তাঁহার একমাত্র পুত্র গোপালচন্দ্র ঘোষ আমার প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন। পুত্রের উপর জননীর যেরূপ স্নেহ ও যত্ন থাকা উচিত ও আবশ্যক, গোপালচন্দ্রের উপর রাইমণির স্নেহ ও যত্ন তদপেক্ষা অধিকতর ছিল, তাহার সংশয় নাই। কিন্তু আমার আন্তরিক দৃঢ়বিশ্বাস এই যে, স্নেহ ও যত্নবিষয়ে আমায় ও গোপালে রাইমণির অণুমাত্র বিভিন্নভাব ছিল না। ফল কথা এই, স্নেহ, দয়া, সৌজন্য, অমায়িকতা, সদ্বিবেচনা প্রভৃতি সদ্‌গুণবিষয়ে, রাইমণির সমকক্ষ স্ত্রীলোক এ পর্য্যন্ত আমার নয়নগোচর হয় নাই। এই দয়াময়ীর সৌম্যমূর্ত্তি আমার হৃদয়মন্দিরে দেবীমূর্ত্তির ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিরাজমান রহিয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে তাঁহার কথা উত্থাপিত হইলে তদীয় অপ্রতিমগুণের কীর্ত্তন করিতে করিতে অশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারি না। আমি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী বলিয়া অনেকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। আমার বোধ হয়, সে নির্দ্দেশ অসঙ্গত নহে। যে ব্যক্তি রাইমণির স্নেহ, দয়া, সৌজন্য প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিয়াছে এবং ঐ সমস্ত

* সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত বিদ্যাসাগরজীবনচরিত, ১১০ পৃষ্ঠা।

সদ্‌গুণের ফলভোগী হইয়াছে, সে যদি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী না হয়, তাহা হইলে, তাহার তুল্য কৃতঘ্ন পামর ভূমণ্ডলে নাই।”

স্ত্রীজাতির স্নেহ-দয়া-সৌজন্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, আমাদের মধ্যে এমন হতভাগ্য কয়জন আছে? কিন্তু ক্ষুদ্র হৃদয়ের স্বভাব এই যে, সে যে পরিমাণে অযাচিত উপকার প্রাপ্ত হয়, সেই পরিমাণে অকৃতজ্ঞ হইয়া উঠে। যাহা-কিছু সহজেই পায়, তাহাই আপনার প্রাপ্য বলিয়া জানে; নিজের দিক্‌ হইতে যে কিছুমাত্র দেয় আছে, তাহা সহজেই ভুলিয়া যায়। আমরাও সংসারে মাঝে মাঝে রাইমণিকে দেখিতে পাই;—এবং যখন সেবা করিতে আসেন, তখন তাঁহার সমস্ত যত্ন এবং প্রীতি অবহেলাভরে গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে পরম অনুগ্রহ করিয়া থাকি;—তিনি যখন চরণপূজা করিতে আসেন, তখন আপন পঙ্ক-কলঙ্কিত পদযুগল অসঙ্কোচে প্রসারিত করিয়া দিয়া অত্যন্ত নির্লজ্জ স্পর্দ্ধা-ভরে সত্যসত্যই আপনাদিগকে নরদেবতারূপে নারীসম্প্রদায়ের পূজা-গ্রহণের অধিকারী বলিয়া জ্ঞান করি। কিন্তু এই সকল সেবক-পূজক অবলাগণের দুঃখমোচন এবং সুখস্বাস্থ্যবিধানে আমাদের মতো মর্ত্ত্য-দেবগণের সুমহৎ ঔদাসীন্য কিছুতেই দূর হয় না; তাহার কারণ, নারীদের কৃত সেবা কেবল আমরা আমাদের সাংসারিক স্বার্থসুখের সহিত জড়িত করিয়া দেখি, তাহা আমাদের হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কৃতজ্ঞতা উদ্রেক করিবার অবকাশ পায় না।

বিদ্যাসাগর প্রথমত বেথুন্‌সাহেবের সহায়তা করিয়া বঙ্গদেশে স্ত্রী-শিক্ষার সূচনা ও বিস্তার করিয়া দেন। অবশেষে যখন তিনি বালবিধবা-দের দুঃখে ব্যথিত হইয়া বিধবাবিবাহপ্রচলনের চেষ্টা করেন, তখন দেশের মধ্যে সংস্কৃতশ্লোক ও বাংলা গালি মিশ্রিত এক তুমুল কল-কোলাহল উত্থিত হইল। সেই মুষলধারে শাস্ত্র ও গালিবর্ষণের মধ্যে এই

ব্রাহ্মণবীর বিজয়ী হইয়া বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত প্রমাণ করিলেন এবং তাহা রাজবিধিসম্মত করিয়া লইলেন।

বিদ্যাসাগর এই সময়ে আরো এক ক্ষুদ্র সামাজিক যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন, এস্থলে তাহারও সংক্ষেপে উল্লেখ আবশ্যক। তখন সংস্কৃত-কলেজে কেবল ব্রাহ্মণেরই প্রবেশ ছিল, সেখানে শূদ্রেরা সংস্কৃত পড়িতে পাইত না। বিদ্যাসাগর সকল বাধা অতিক্রম করিয়া শূদ্রদিগকে সংস্কৃত-কলেজে বিদ্যাশিক্ষার অধিকার দান করেন।

সংস্কৃতকলেজের কর্ম্ম ছাড়িয়া দিবার পর বিদ্যাসাগরের প্রধান-কীর্ত্তি মেট্রোপলিটান্ ইনষ্টিট্যুশন্। বাঙালীর নিজের চেষ্টায় এবং নিজের অধীনে উচ্চতর শিক্ষার কলেজস্থাপন এই প্রথম। আমাদের দেশে ইংরাজিশিক্ষাকে স্বাধীনভাবে স্থায়ী করিবার এই প্রথম ভিত্তি বিদ্যাসাগরকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইল। যিনি দরিদ্র ছিলেন, তিনি দেশের প্রধান দাতা হইলেন; যিনি লোকাচাররক্ষক ব্রাহ্মণপণ্ডিতের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি লোকাচারের একটি সুদৃঢ় বন্ধন হইতে সমাজকে মুক্ত করিবার জন্য সুকঠোর সংগ্রাম করিলেন, এবং সংস্কৃত-বিদ্যায় যাঁহার অধিকারের ইয়ত্তা ছিল না, তিনিই ইংরাজিবিদ্যাকে প্রকৃতপ্রস্তাবে স্বদেশের ক্ষেত্রে বদ্ধমূল করিয়া রোপণ করিয়া গেলেন।

বিদ্যাসাগর তাঁহার জীবনের অবশিষ্টকাল এই স্কুল ও কলেজটিকে একাগ্রচিত্তে প্রাণাধিক যত্নে পালন করিয়া, দীনদরিদ্র রোগীর সেবা করিয়া, অকৃতজ্ঞদিগকে মার্জ্জনা করিয়া, বন্ধুবান্ধবদিগকে অপরিমেয় স্নেহে অভিষিক্ত করিয়া, আপন পুষ্পকোমল এবং বজ্রকঠিন বক্ষে দুঃসহ বেদনাশল্য বহন করিয়া, আপন আত্মনির্ভরপর উন্নত-বলিষ্ঠ চরিত্রের মহান্ আদর্শ বাঙালীজাতির মনে চিরাঙ্কিত করিয়া দিয়া ১২৯৮ সালের ১৩ই শ্রাবণ রাত্রে ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়া গেলেন।

বিদ্যাসাগর বঙ্গদেশে তাঁহার অক্ষয় দয়ার জন্য বিখ্যাত। কারণ,

দয়াবৃত্তি আমাদের অশ্রুপাতপ্রবণ বাঙালীহৃদয়কে যত শীঘ্র প্রশংসায় বিচলিত করিতে পারে, এমন আর কিছুই নহে। কিন্তু বিদ্যাসাগরের দয়ায় কেবল যে বাঙালীজনসুলভ হৃদয়ের কোমলতা প্রকাশ পায়, তাহা নহে, তাহাতে বাঙালীদুর্লভ চরিত্রের বলশালিতারও পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার দয়া কেবল একটা প্রবৃত্তির ক্ষণিক উত্তেজনামাত্র নহে, তাহার মধ্যে একটা সচেষ্ট আত্মশক্তির অচলকর্তৃত্ব সর্ব্বদা বিরাজ করিত বলিয়াই তাহা এমন মহিমশালিনী। এ দয়া অন্যের কষ্টলাঘবের চেষ্টায় আপনাকে কঠিন কষ্টে ফেলিতে মুহূর্ত্তকালের জন্য কুণ্ঠিত হইত না। সংস্কৃতকলেজে কাজ করিবার সময় ব্যাকরণ-অধ্যাপকের পদ শূন্য হইলে বিদ্যাসাগর তারানাথ তর্কবাচস্পতির জন্য মার্শালসাহেবকে অনুরোধ করেন। সাহেব বলিলেন, তাঁহার চাকুরি লইবার ইচ্ছা আছে কি না, অগ্রে জানা আবশ্যক। শুনিয়া বিদ্যাসাগর সেইদিনে ত্রিশক্রোশ পথ দূরে কালনায় তর্কবাচস্পতির চতুষ্পাঠী-অভিমুখে পদব্রজে যাত্রা করিলেন। পরদিনে তর্কবাচস্পতির সম্মতি ও তাঁহার প্রশংসাপত্রগুলি লইয়া পুনরায় পদব্রজে যথাসময়ে সাহেবের নিকট উপস্থিত হইলেন।* পরের উপকারকার্য্যে তিনি আপনার সমস্ত বল ও উৎসাহ প্রয়োগ করিতেন। ইহার মধ্যেও তাঁহার আজন্মকালের একটা জিদ্ প্রকাশ পাইত। সাধারণত আমাদের দয়ার মধ্যে এই জিদ্ না থাকাতে তাহা সঙ্কীর্ণ ও স্বল্পফলপ্রসূ হইয়া বিশীর্ণ হইয়া যায়, তাহা পৌরুষমহত্ত্ব লাভ করে না।

কারণ, দয়া বিশেষরূপে স্ত্রীলোকের নহে; প্রকৃত দয়া যথার্থ পুরুষেরই ধর্ম্ম। দয়ার বিধান পূর্ণরূপে পালন করিতে হইলে দৃঢ় বীর্য্য এবং কঠিন অধ্যবসায় আবশ্যক, তাহাতে অনেক সময় সুদূরব্যাপী সুদীর্ঘ কর্ম্মপ্রণালী অনুসরণ করিয়া চলিতে হয়; তাহা কেবল ক্ষণকালের

* সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত বিদ্যাসাগরজীবনচরিত।

আত্মত্যাগের দ্বারা প্রবৃত্তির উচ্ছ্বাসনিবৃত্তি এবং হৃদয়ের ভারলাঘব করা নহে ; তাহা দীর্ঘকাল ধরিয়া নানা উপায়ে নানা বাধা অতিক্রম করিয়া দুরূহ উদ্দেশ্য সিদ্ধির অপেক্ষা রাখে।

একবার গবর্মেণ্টের কোনো অত্যুৎসাহী ভৃত্য জাহানাবাদ-মহকুমার ইন্‌কম্‌ট্যাক্স ধার্য্যের জন্য উপস্থিত হন। আয়ের স্বল্পতাপ্রযুক্ত যে সকল ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ইন্‌কম্‌ট্যাক্সের অধীনে না আসিতে পারে, গবর্মেণ্টের এই সুচতুর শিকারী তাহাদের দুইতিনজনের নাম একত্র করিয়া ট্যাক্সের জালে বদ্ধ করিতেছিলেন। বিদ্যাসাগর ইহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ খড়ার গ্রামে অ্যাসেসর্‌বাবুর নিকটে আসিয়া আপত্তি প্রকাশ করেন। বাবুটি তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া অভিযোগকারীদিগকে ধমক দিয়া বাধ্য করিলেন। বিদ্যাসাগর তৎক্ষণাৎ কলিকাতায় আসিয়া লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণরের নিকট বাদী হইলেন। লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর বর্দ্ধমানের কালেক্টর হ্যারিসন্‌সাহেবকে তদন্ত জন্য প্রেরণ করেন। বিদ্যাসাগর হ্যারিসনের সঙ্গে গ্রামে গ্রামে ব্যবসায়ীদের খাতাপত্র পরীক্ষা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন— এইরূপে দুইমাসকাল অনন্যমনা ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া তিনি এই অন্যায়-নিবারণে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।*

বিদ্যাসাগরের জীবনে এরূপ দৃষ্টান্ত আরো অনেক দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু এরূপ দৃষ্টান্ত বাংলায় অন্যত্র হইতে সংগ্রহ করা দুষ্কর। আমাদের হৃদয় অত্যন্ত কোমল বলিয়া আমরা প্রচার করিয়া থাকি, কিন্তু আমরা কোনো ঝঞ্চটে যাইতে চাহি না। এই অলস শান্তিপ্রিয়তা আমাদিগকে অনেক সময়েই স্বার্থপর নিষ্ঠুরতায় অবতীর্ণ করে। একজন জাহাজী-গোরা কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া মজ্জমান ব্যক্তির পশ্চাতে জলে ঝাঁপ দিয়া পড়ে ; কিন্তু একখানা নৌকা যেখানে বিপন্ন, অন্য নৌকাগুলি তাহার কিছুমাত্র সাহায্য চেষ্টা না করিয়া চলিয়া যায়, এরূপ ঘটনা

* সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত বিদ্যাসাগরজীবনচরিত।

আমাদের দেশে সর্ব্বদাই শুনিতে পাই। দয়ার সহিত বীর্য্যের সম্মিলন না হইলে সে দয়া অনেকস্থলেই অকিঞ্চিৎকর হইয়া থাকে।

কেবল যে সঙ্কট এবং অধ্যবসায়ের ক্ষেত্রে আমাদের অন্তঃপুরচারিণী দয়া প্রবেশ করিতে চাহে না, তাহা নহে। সামাজিক কৃত্রিম শুচিতারক্ষার নিয়মলঙ্ঘনও তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য। আমি জানি, কোনো এক গ্রাম্য মেলায় এক বিদেশী ব্রাহ্মণের মৃত্যু হইলে ঘৃণা করিয়া কেহই তাহার অন্ত্যেষ্টিসংকারের ব্যবস্থা করে নাই, অবশেষে তাহার অনুপস্থিত আত্মীয়-পরিজনের অন্তরে চিরশোকশল্য নিহিত করিয়া ডোমের দ্বারা মৃতদেহ শ্মশানে শৃগালকুক্কুরের মুখে ফেলিয়া আসা হয়। আমরা অতি সহজেই 'আহা উহু' এবং অশ্রুপাত করিতে পারি, কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে পরোপকারের পথে আমরা সহস্র স্বাভাবিক এবং কৃত্রিম বাধার দ্বারা পদে পদে প্রতিহত। বিদ্যাসাগরের কারুণ্য বলিষ্ঠ,—পুরুষোচিত; এইজন্য তাহা সরল এবং নির্ব্বিকার; তাহা কোথাও সূক্ষ্মতর্ক তুলিত না, নাসিকা-কুঞ্চন করিত না, বসন তুলিয়া ধরিত না; একেবারে দ্রুতপদে, ঋজু-রেখায়, নিঃশঙ্কে, নিঃসঙ্কোচে আপন কার্য্যে গিয়া প্রবৃত্ত হইত। রোগের বীভৎস মলিনতা তাঁহাকে কখন রোগীর নিকট হইতে দূরে রাখে নাই। এমন কি, (চণ্ডীচরণবাবুর গ্রন্থে লিখিত আছে) কার্ম্মাটাড়ে এক মেথর-জাতীয়া স্ত্রীলোক ওলাউঠায় আক্রান্ত হইলে বিদ্যাসাগর স্বয়ং তাহার কুটীরে উপস্থিত থাকিয়া স্বহস্তে তাহার সেবা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। বর্দ্ধমানবাসকালে তিনি তাঁহার প্রতিবেশী দরিদ্র মুসলমানগণকে আত্মীয়-নির্ব্বিশেষে যত্ন করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় তাঁহার সহোদরের জীবনচরিতে লিখিতেছেন—"অন্নচ্ছত্রে ভোজনকারিণী স্ত্রীলোকদের মস্তকের কেশগুলি তৈলাভাবে বিরূপ দেখাইত। অগ্রজ-মহাশয় তাহা অবলোকন করিয়া দুঃখিত হইয়া তৈলের ব্যবস্থা করিয়া-ছিলেন। প্রত্যেককে দুইপলা করিয়া তৈল দেওয়া হইত। যাহারা

তৈল বিতরণ করিত, তাহারা, পাছে মুচি, হাড়ি, ডোম প্রভৃতি অপকৃষ্ট-জাতীয় স্ত্রীলোক স্পর্শ করে, এই আশঙ্কায় তফাৎ হইতে তৈল দিত, ইহা দেখিয়া অগ্রজমহাশয় স্বয়ং উক্ত অপকৃষ্ট ও অস্পৃশ্য জাতীয় স্ত্রীলোকদের মাথায় তৈল মাথাইয়া দিতেন।”

এই ঘটনাশ্রবণে আমাদের হৃদয় যে ভক্তিতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, তাহা বিদ্যাসাগরের দয়া অনুভব করিয়া নহে—কিন্তু তাঁহার দয়ার মধ্য হইতে যে একটি নিঃসঙ্কোচ বলিষ্ঠ মনুষ্যত্ব পরিস্ফুট হইয়া উঠে, তাহা দেখিয়া আমাদের এই নীচজাতির প্রতি চিরাভ্যস্ত ঘৃণাপ্রবণ মনও আপন নিগূঢ় মানবধর্ম্মবশত ভক্তিতে আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে না।

তাঁহার কারুণ্যের মধ্যে যে পৌরুষের লক্ষণ ছিল, তাহার অনেক উদাহরণ দেখা যায়। আমাদের দেশে আমরা যাঁহাদিগকে ভালোমানুষ অমায়িকপ্রকৃতি বলিয়া প্রশংসা করি, সাধারণত তাঁহাদের চক্ষুলজ্জা বেশি। অর্থাৎ কর্ত্তব্যস্থলে তাঁহারা কাহাকেও বেদনা দিতে পারেন না। বিদ্যাসাগরের দয়ায় সেই কাপুরুষতা ছিল না। ঈশ্বরচন্দ্র যখন কলেজের ছাত্র ছিলেন, তখন তাঁহাদের বেদান্ত-অধ্যাপক শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতির সহিত তাঁহার বিশেষ প্রীতিবন্ধন ছিল। বাচস্পতিমহাশয় বৃদ্ধবয়সে পুনরায় দারপরিগ্রহ করিবার ইচ্ছা করিয়া তাঁহার প্রিয়তম ছাত্রের মত জিজ্ঞাসা করিলে ঈশ্বরচন্দ্র প্রবল আপত্তিপ্রকাশ করিলেন। গুরু বারংবার কাকুতিমিনতি করা সত্ত্বেও তিনি মত পরিবর্ত্তন করিলেন না। তখন বাচস্পতিমহাশয় ঈশ্বরচন্দ্রের নিষেধে কর্ণপাত না করিয়া এক সুন্দরী বালিকাকে বিবাহপূর্ব্বক তাহাকে আশু বৈধব্যের তটদেশে আনয়ন করিলেন। শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার বিদ্যাসাগর গ্রন্থে এই ব্যাপারের যে পরিণাম বর্ণন করিয়াছেন, তাহা এইস্থলে উদ্ধৃত করি।

"বাচস্পতিমহাশয় ঈশ্বরচন্দ্রের হাত ধরিয়া বলিলেন, 'তোমার মাকে দেখিয়া যাও'। এই বলিয়া দাসীকে নববধূর অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিতে বলিলেন। তখন বাচস্পতিমহাশয়ের নববিবাহিতা পত্নীকে দেখিয়া ঈশ্বরচন্দ্র অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলেন না। সেই জননীস্থানীয়া বালিকাকে দর্শন করিয়া ও এই বালিকার পরিণাম চিন্তা করিয়া বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। তখন বাচস্পতিমহাশয় 'অকল্যাণ করিস্ না রে' বলিয়া তাঁহাকে লইয়া বাহিরবাটীতে আসিলেন এবং নানাপ্রকার শাস্ত্রীয় উপদেশের দ্বারা ঈশ্বরচন্দ্রের মনের উত্তেজনা ও হৃদয়ের আবেগ রোধ করিতে ও তাঁহাকে শান্ত করিতে প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। এইরূপ বহুবিধ প্রবোধবাক্যে শান্ত করিতে প্রয়াস পাইয়া শেষে ঈশ্বরচন্দ্রকে কিঞ্চিৎ জল খাইতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু পাষাণ-তুল্য-কঠিন প্রতিজ্ঞা-পরায়ণ ঈশ্বরচন্দ্র জলযোগ করিতে সম্পূর্ণরূপে অসম্মত হইয়া বলিলেন, 'এ ভিটায় আর কখনও জলস্পর্শ করিব না'।"

বিদ্যাসাগরের হৃদয়বৃত্তির মধ্যে যে বলিষ্ঠতা দেখা যায়, তাঁহার বুদ্ধি-বৃত্তির মধ্যেও তাহার পরিপূর্ণ প্রভাব প্রকাশ পায়। বাঙালীর বুদ্ধি সহজেই অত্যন্ত সূক্ষ্ম। তাহার দ্বারা চুল চেরা যায়, কিন্তু বড় বড় গ্রন্থি ছেদন করা যায় না। তাহা সুনিপুণ, কিন্তু সবল নহে। আমাদের বুদ্ধি ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মতো অতি সূক্ষ্ম তর্কের বাহাদুরীতে ছোটে ভালো, কিন্তু কর্ম্মের পথে গাড়ি লইয়া চলে না। বিদ্যাসাগর যদিচ ব্রাহ্মণ, এবং ন্যায়শাস্ত্রও যথোচিত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তথাপি যাহাকে বলে কাণ্ডজ্ঞান, সেটা তাঁহার যথেষ্ট ছিল। এই কাণ্ডজ্ঞানটি যদি না থাকিত, তবে যিনি একসময় ছোলা ও বাতাসা জলপান করিয়া পাঠ-শিক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি অকুতোভয়ে চাকরী ছাড়িয়া দিয়া স্বাধীন-জীবিকা অবলম্বন করিয়া জীবনের মধ্যপথে সচ্ছলস্বচ্ছন্দাবস্থায় উত্তীর্ণ হইতে পারিতেন না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, দয়ার অনুরোধে

যিনি ভূরিভূরি স্বার্থত্যাগ করিয়াছেন, যিনি স্বার্থের অনুরোধে আপন মহোচ্চ আত্মসম্মানকে মুহূর্ত্তের জন্য তিলমাত্র অবনত হইতে দেন নাই, যিনি আপনার ন্যায়সঙ্কল্পের ঋজুরেখা হইতে কোনো মন্ত্রণায়, কোনো প্রলোভনে দক্ষিণে-বামে কেশাগ্রপরিমাণ হেলিতে চাহেন নাই, তিনি কিরূপ প্রশস্তবুদ্ধি এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞার বলে সঙ্গতিসম্পন্ন হইয়া সহস্রের আশ্রয়দাতা হইয়াছিলেন। গিরিশৃঙ্গের দেবদারুদ্রুম যেমন শুষ্ক শিলাস্তরের মধ্যে অঙ্কুরিত হইয়া, প্রাণঘাতক হিমানীবৃষ্টি শিরোধার্য্য করিয়া, নিজের আভ্যন্তরীণ কঠিনশক্তির দ্বারা আপনাকে প্রচুরসরসশাখাপল্লবসম্পন্ন সরলমহিমায় অভ্রভেদী করিয়া তুলে—তেম্‌নি এই ব্রাহ্মণতনয় জন্ম-দারিদ্র্য এবং সর্ব্বপ্রকার প্রতিকূলতার মধ্যেও কেবল নিজের মজ্জাগত অপর্য্যাপ্ত বলবুদ্ধির দ্বারা নিজেকে যেন অনায়াসেই এমন সরল, এমন প্রবল, এমন সমুন্নত, এমন সর্ব্বসম্পৎশালী করিয়া তুলিয়াছিলেন।

মেট্রপলিটান্‌-বিদ্যালয়কে তিনি যে একাকী সর্ব্বপ্রকার বিঘ্নবিপত্তি হইতে রক্ষা করিয়া তাহাকে সগৌরবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিলেন—ইহাতে বিদ্যাসাগরের কেবল লোকহিতৈষা ও অধ্যবসায় নহে, তাঁহার সজাগ ও সহজ কর্ম্মবুদ্ধি প্রকাশ পায়। এই বুদ্ধিই যথার্থ পুরুষের বুদ্ধি,—এই বুদ্ধি সুদূরসম্ভবপর কাল্পনিক বাধাবিঘ্ন ও ফলাফলের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারজালের দ্বারা আপনাকে নিরুপায় অকর্ম্মণ্যতার মধ্যে জড়ীভূত করিয়া বসে না; এই বুদ্ধি, কেবল সূক্ষ্মভাবে নহে, প্রত্যুত প্রশস্তভাবে, সমগ্রভাবে কর্ম্ম ও কর্ম্মক্ষেত্রের আদ্যোপান্ত দেখিয়া লইয়া, দ্বিধা বিসর্জ্জন দিয়া, মুহূর্ত্তের মধ্যে উপস্থিত বাধার মর্ম্মস্থল আক্রমণ করিয়া, বীরের মতো কাজ করিয়া যায়। এই সবল কর্ম্মবুদ্ধি বাঙালীর মধ্যে বিরল।

যেমন কর্ম্মবুদ্ধি, তেম্‌নি ধর্ম্মবুদ্ধির মধ্যেও একটা সবল কাণ্ডজ্ঞান থাকিলে, তাহার দ্বারা যথার্থ কাজ পাওয়া যায়। কবি বলিয়াছেন—

"ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা গতিঃ"। ধর্ম্মের গতি সূক্ষ্ম হইতে পারে, কিন্তু ধর্ম্মের নীতি সরল ও প্রশস্ত। কারণ, তাহা বিশ্বসাধারণের এবং নিত্যকালের। তাহা পণ্ডিতের ও তার্কিকের নহে। কিন্তু মনুষ্যের দুর্ভাগ্যক্রমে মানুষ আপন সংস্রবের সকল জিনিষকেই অলক্ষিতভাবে কৃত্রিম ও জটিল করিয়া তুলে। যাহা সরল, যাহা স্বাভাবিক, যাহা উন্মুক্ত-উদার, যাহা মূল্য দিয়া কিনিতে হয় না, বিধাতা যাহা আলোক বায়ুর ন্যায় মনুষ্য-সাধারণকে অযাচিত দান করিয়াছেন, মানুষ আপনি তাহাকে দুর্ম্মূল্য-দুর্গম করিয়া দেয়। সেইজন্য সহজ কথা ও সরল ভাব প্রচারের জন্য লোকোত্তর মহত্ত্বের অপেক্ষা করিতে হয়।

বিদ্যাসাগর বালবিধবাবিবাহের ঔচিত্যসম্বন্ধে যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাও অত্যন্ত সহজ ; তাহার মধ্যে কোনো নূতনত্বের অসামান্য নৈপুণ্য নাই। তিনি প্রত্যক্ষব্যাপারকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া এক অমূলক কল্পনা-লোক সৃজন করিতে আপন শক্তির অপব্যয় করেন নাই। তিনি তাঁহার বিধবাবিবাহগ্রন্থে আমাদিগকে সম্বোধন করিয়া যে আক্ষেপোক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিলেই আমার কথাটি পরিষ্কার হইবে।

"হা ভারতবর্ষীয় মানবগণ!......অভ্যাসদোষে তোমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তিসকল এরূপ কলুষিত হইয়া গিয়াছে ও অভিভূত হইয়া রহিয়াছে যে, হতভাগা বিধবাদিগের দুরবস্থাদর্শনে, তোমাদের চিরশুষ্ক হৃদয়ে কারুণ্যরসের সঞ্চার হওয়া কঠিন, এবং ব্যভিচারদোষের ও ভ্রূণহত্যাপাপের প্রবল স্রোতে দেশ উচ্ছলিত হইতে দেখিয়াও, মনে ঘৃণার উদয় হওয়া অসম্ভাবিত। তোমরা প্রাণতুল্য কন্যা প্রভৃতিকে অসহ্য বৈধব্যযন্ত্রণানলে দগ্ধ করিতে সম্মত আছ ; তাহারা দুর্নিবার-রিপু-বশীভূত হইয়া, ব্যভিচারদোষে দূষিত হইলে, তাহার পোষকতা করিতে সম্মত আছ ; ধর্ম্মলোপভয়ে জলাঞ্জলি দিয়া, কেবল লোকলজ্জাভয়ে, তাহাদের ভ্রূণহত্যার সহায়তা করিয়া স্বয়ং সপরিবারে পাপপঙ্কে কলঙ্কিত

হইতে সম্মত আছ ; কিন্তু, কি আশ্চর্য্য ! শাস্ত্রের বিধি অবলম্বনপূর্ব্বক, পুনরায় বিবাহ দিয়া তাহাদিগকে দুঃসহ বৈধব্যযন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ করিতে, এবং আপনাদিগকেও সকল বিপদ্ হইতে মুক্ত করিতে, সম্মত নহ। তোমরা মনে কর, পতিবিয়োগ হইলেই স্ত্রীজাতির শরীর পাষাণ-ময় হইয়া যায়; দুঃখ আর দুঃখ বলিয়া বোধ হয় না ; যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা বলিয়া বোধ হয় না ; দুর্জ্জয় রিপুবর্গ এককালে নির্ম্মূল হইয়া যায়। কিন্তু, তোমাদের এই সিদ্ধান্ত যে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক, পদে পদে তাহার উদাহরণ প্রাপ্ত হইতেছ। ভাবিয়া দেখ, এই অনবধানদোষে, সংসার-তরুর কি বিষময় ফলভোগ করিতেছ !”

রমণীর দেবীত্ব ও বালিকার ব্রহ্মচর্য্যমাহাত্ম্যের সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর আকাশগামী ভাবুকতার ভূরিপরিমাণ সজল বাষ্প সৃষ্টি করিতে বসেন নাই ; তিনি তাঁহার পরিষ্কার সবল বুদ্ধি ও সরল সহৃদয়তা লইয়া সমাজের যথার্থ অবস্থা ও প্রকৃত বেদনায় সকরুণ হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। কেবলমাত্র মধুর বাক্যরসে চিঁড়াকে সরস করিতে সে-ই চায়, যাহার দধি নাই। কিন্তু বিদ্যাসাগরের দধির অভাব না থাকাতে বাক্‌পটুতার প্রয়োজন হয় নাই। দয়া আপনি দুঃখের স্থানে গিয়া আকৃষ্ট হয়। বিদ্যাসাগর স্পষ্ট দেখিতেছেন যে, প্রকৃত সংসারে বিধবা হইবামাত্র বালিকা হঠাৎ দেবী হইয়া উঠে না, এবং আমরাও তাহার চতুর্দ্দিকে নিষ্কলঙ্ক দেবলোক সৃষ্টি করিয়া বসিয়া নাই ; এমন অবস্থায় সে-ও দুঃখ পায়, সমাজেরও রাশিরাশি অমঙ্গল ঘটে, ইহা প্রতিদিনের প্রত্যক্ষ সত্য। সেই দুঃখ, সেই অকল্যাণ নিবারণের উপযুক্ত উপায় অবলম্বন না করিয়া বিদ্যাসাগর থাকিতে পারেন না ; আমরা সেস্থলে সুনিপুণ কাব্যকলা প্রয়োগপূর্ব্বক একটা স্বকপোলকল্পিত জগতের আদর্শ-বৈধব্য কল্পনা করিয়া তৃপ্তিলাভ করি। কারণ, তাঁহার সরল ধর্ম্মবুদ্ধিতে তিনি সহজেই যে বেদনা বোধ করিয়াছেন, আমরা সেই বেদনা যথার্থরূপে হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করি

না। সেইজন্য এসম্বন্ধে আমাদের রচনায় নৈপুণ্য প্রকাশ পায়, সরলতা প্রকাশ পায় না। যথার্থ সবলতার সঙ্গে সঙ্গেই একটা সুবৃহৎ সরলতা থাকে।

এই সরলতা, কেবল মতামতে নহে, লোকব্যবহারেও প্রকাশ পায়। বিদ্যাসাগর পিতৃদর্শনে কাশীতে গমন করিলে সেখানকার অর্থলোলুপ কতকগুলি ব্রাহ্মণ তাঁহাকে টাকার জন্য ধরিয়া-পড়িয়াছিল। বিদ্যাসাগর তাহাদের অবস্থা ও স্বভাব দৃষ্টে তাহাদিগকে দয়া অথবা ভক্তির পাত্র বলিয়া জ্ঞান করেন নাই, সেইজন্য তৎক্ষণাৎ অকপটচিত্তে উত্তর দিলেন—"এখানে আছেন বলিয়া আপনাদিগকে যদি আমি ভক্তি বা শ্রদ্ধা করিয়া বিশ্বেশ্বর বলিয়া মান্য করি, তাহা হইলে আমার মত নরাধম আর নাই।" …………ইহা শুনিয়া কাশীর ব্রাহ্মণেরা ক্রোধান্ধ হইয়া বলেন, "তবে আপনি কী মানেন?" বিদ্যাসাগর উত্তর করিলেন—"আমার বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা উপস্থিত এই পিতৃদেব ও জননীদেবী বিরাজমান।"*

যে বিদ্যাসাগর হীনতমশ্রেণীর লোকেরও দুঃখমোচনে অর্থব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না, তিনি কৃত্রিম কপটভক্তি দেখাইয়া কাশীর ব্রাহ্মণের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে পারিলেন না। ইহাই বলিষ্ঠ সরলতা, ইহাই যথার্থ পৌরুষ।

নিজের অশনবসনেও বিদ্যাসাগরের একটি অটল সরলতা ছিল। এবং সেই সরলতার মধ্যেও দৃঢ় বলের পরিচয় পাওয়া যায়। পূর্ব্বেই দৃষ্টান্ত দেখান গিয়াছে, নিজের তিলমাত্র সম্মানরক্ষার প্রতিও তাঁহার লেশমাত্র শৈথিল্য ছিল না। আমরা সাধারণত প্রবল সাহেবী অথবা প্রচুর নবাবী দেখাইয়া সম্মানলাভের চেষ্টা করিয়া থাকি। কিন্তু আড়ম্বরের চাপল্য বিদ্যাসাগরের উন্নত-কঠোর আত্মসম্মানকে কখনো স্পর্শ করিতে পারিত না। ভূষণহীন সারল্যই তাঁহার রাজভূষণ ছিল।

* সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত বিদ্যাসাগরজীবনচরিত।

ঈশ্বরচন্দ্র যখন কলিকাতায় অধ্যয়ন করিতেন, তখন তাঁহার দরিদ্রা "জননীদেবী চরকাসূতা কাটিয়া পুত্রদ্বয়ের বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া কলিকাতায় পাঠাইতেন।" * সেই মোটা কাপড়, সেই মাতৃস্নেহমণ্ডিত দারিদ্র্য তিনি চিরকাল সগৌরবে সর্ব্বাঙ্গে ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বন্ধু তদানীন্তন লেফ্‌টেনাণ্ট্ গবর্ণর হ্যালিডেসাহেব তাঁহাকে রাজসাক্ষাতের উপযুক্ত সাজ করিয়া আসিতে অনুরোধ করেন। বন্ধুর অনুরোধে বিদ্যাসাগর কেবল দুইএকদিন চোগা-চাপকান পরিয়া সাহেবের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু সে লজ্জা আর সহ্য করিতে পারিলেন না। বলিলেন, "আমাকে যদি এই বেশে আসিতে হয়, তবে এখানে আর আমি আসিতে পারিব না।" হ্যালিডে তাঁহাকে তাঁহার অভ্যস্তবেশে আসিতে অনুমতি দিলেন। ব্রাহ্মণপণ্ডিত যে চটিজুতা ও মোটা ধুতিচাদর পরিয়া সর্ব্বত্র সম্মানলাভ করেন, বিদ্যাসাগর রাজদ্বারেও তাহা ত্যাগ করিবার আবশ্যকতা বোধ করেন নাই। তাঁহার নিজের সমাজে যখন ইহাই ভদ্রবেশ, তখন তিনি অন্য সমাজে অন্য বেশ পরিয়া আপন সমাজের ও সেই সঙ্গে আপনার অবমাননা করিতে চাহেন নাই। শাদা ধুতি ও শাদা চাদরকে ঈশ্বরচন্দ্র যে গৌরব অর্পণ করিয়াছিলেন, আমাদের বর্ত্তমান রাজাদের ছদ্মবেশ পরিয়া আমরা আপনাদিগকে সে গৌরব দিতে পারি না; বরঞ্চ এই কৃষ্ণচর্ম্মের উপর দ্বিগুণতর কৃষ্ণকলঙ্ক লেপন করি। আমাদের এই অবমানিত দেশে ঈশ্বরচন্দ্রের মত এমন অখণ্ড পৌরুষের আদর্শ কেমন করিয়া জন্মগ্রহণ করিল, আমরা বলিতে পারি না। কাকের বাসায় কোকিলে ডিম পাড়িয়া যায়,—মানব-ইতিহাসের বিধাতা সেইরূপ গোপনে কৌশলে বঙ্গভূমির প্রতি বিদ্যাসাগরকে মানুষ করিবার ভার দিয়াছিলেন।

সেইজন্য বিদ্যাসাগর এই বঙ্গদেশে একক ছিলেন। এখানে যেন

* সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত বিদ্যাসাগরজীবনচরিত।

তাঁহার স্বজাতি-সোদর কেহ ছিল না। এদেশে তিনি তাঁহার সমযোগ্য সহযোগীর অভাবে আমৃত্যুকাল নির্ব্বাসন ভোগ করিয়া গিয়াছেন। তিনি সুখী ছিলেন না। তিনি নিজের মধ্যে যে এক অকৃত্রিম মনুষ্যত্ব সর্ব্বদাই অনুভব করিতেন, চারিদিকের জনমণ্ডলীর মধ্যে তাহার আভাস দেখিতে পান নাই। তিনি উপকার করিয়া কৃতঘ্নতা পাইয়াছেন, কার্য্যকালে সহায়তা প্রাপ্ত হন নাই ;—তিনি প্রতিদিন দেখিয়াছেন, আমরা আরম্ভ করি, শেষ করি না ; আড়ম্বর করি, কাজ করি না ; যাহা অনুষ্ঠান করি, তাহা বিশ্বাস করি না ; যাহা বিশ্বাস করি, তাহা পালন করি না ; ভূরিপরিমাণ বাক্যরচনা করিতে পারি, তিলপরিমাণ আত্মত্যাগ করিতে পারি না ; আমরা অহঙ্কার দেখাইয়া পরিতৃপ্ত থাকি, যোগ্যতালাভের চেষ্টা করি না ; আমরা সকল কাজেই পরের প্রত্যাশা করি, অথচ পরের ত্রুটি লইয়া আকাশ বিদীর্ণ করিতে থাকি ;—পরের অনুকরণে আমাদের গর্ব্ব, পরের অনুগ্রহে আমাদের সম্মান, পরের চক্ষে ধূলিনিক্ষেপ করিয়া আমাদের পলিটিক্স্, এবং নিজের বাক্‌চাতুর্য্যে নিজের প্রতি ভক্তি-বিহ্বল হইয়া উঠাই আমাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। এই দুর্ব্বল, ক্ষুদ্র, হৃদয়হীন, কর্ম্মহীন, দাম্ভিক, তার্কিকজাতির প্রতি বিদ্যাসাগরের এক সুগভীর ধিক্কার ছিল। কারণ, তিনি সর্ব্ববিষয়েই ইহাদের বিপরীত ছিলেন। বৃহৎ বনস্পতি যেমন ক্ষুদ্র বনজঙ্গলের পরিবেষ্টন হইতে ক্রমেই শূন্য আকাশে মস্তক তুলিয়া উঠে—বিদ্যাসাগর সেইরূপ বয়োবৃদ্ধিসহকারে বঙ্গসমাজের সমস্ত অস্বাস্থ্যকর ক্ষুদ্রতাজাল হইতে ক্রমশই শব্দহীন সুদূর নির্জ্জনে উত্থান করিয়াছিলেন ; সেখান হইতে তিনি তাপিতকে ছায়া এবং ক্ষুধিতকে ফলদান করিতেন ; কিন্তু আমাদের শতসহস্র ক্ষণজীবী সভাসমিতির ঝিল্লীঝঙ্কার হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিলেন। ক্ষুধিত-পীড়িত অনাথ-অসহায়দের জন্য আজ তিনি বর্ত্তমান নাই,—কিন্তু তাঁহার মহৎ চরিত্রের যে অক্ষয়বট তিনি বঙ্গভূমিতে রোপণ করিয়া গিয়া-

ছেন, তাহার তলদেশ সমস্ত বাঙালীজাতির তীর্থস্থান হইয়াছে। আমরা সেইখানে আসিয়া আমাদের তুচ্ছতা, ক্ষুদ্রতা, নিষ্ফল আড়ম্বর ভুলিয়া, সূক্ষ্মতম তর্কজাল এবং স্থূলতম জড়ত্ব বিচ্ছিন্ন করিয়া, সরল, সবল, অটল মাহাত্ম্যের শিক্ষা লাভ করিয়া যাইব। আজ আমরা বিদ্যাসাগরকে কেবল বিদ্যা ও দয়ার আধার বলিয়া জানি, এই বৃহৎ পৃথিবীর সংস্রবে আসিয়া যতই আমরা মানুষ হইয়া উঠিব, যতই আমরা পুরুষের মতো দুর্গম-বিস্তীর্ণ কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে থাকিব, বিচিত্র শৌর্য্য-বীর্য্য-মহত্ত্বের সহিত যতই আমাদের প্রত্যক্ষ সন্নিহিতভাবে পরিচয় হইবে, ততই আমরা নিজের অন্তরের মধ্যে অনুভব করিতে থাকিব যে, দয়া নহে, বিদ্যা নহে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্রে প্রধান গৌরব তাঁহার অজেয় পৌরুষ, তাঁহার অক্ষয় মনুষ্যত্ব এবং যতই তাহা অনুভব করিব, ততই আমাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ ও বিধাতার উদ্দেশ্য সফল হইবে, এবং বিদ্যাসাগরের চরিত্র বাঙালীর জাতীয়জীবনে চিরদিনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে।

১৩০২।

২

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বিদ্যাসাগরের জীবনীসম্বন্ধে যে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার আরম্ভে যোগবাশিষ্ঠ হইতে নিম্নলিখিত শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন—

"তরবোঽপি হি জীবন্তি জীবন্তি মৃগপক্ষিণঃ।
স জীবতি মনো যস্য মননেন হি জীবতি॥"

'তরুলতাও জীবনধারণ করে, পশুপক্ষীও জীবনধারণ করে; কিন্তু সে-ই প্রকৃতরূপে জীবিত, যে মননের দ্বারা জীবিত থাকে।'

মনের জীবন মননক্রিয়া এবং সেই জীবনেই মনুষ্যত্ব।

প্রাণ সমস্ত দেহকে ঐক্যদান করিয়া তাহার বিচিত্র কার্য্যসকলকে একতন্ত্রে নিয়মিত করে। প্রাণ চলিয়া গেলে দেহ পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়, তাহার ঐক্য ছিন্ন হইয়া মাটির অংশ মাটিতে, জলের অংশ জলে মিশিয়া যায়। নিয়তক্রিয়াশীল নিরলস প্রাণই এই শরীরটাকে মাটি হইতে, জল হইতে উচ্চ করিয়া, স্বতন্ত্র করিয়া, এক করিয়া, স্বতশ্চালিত এক অপূর্ব্ব ইন্দ্রজাল রচনা করে।

মনের যে জীবন, শাস্ত্রে যাহাকে মনন বলিতেছে, তাহাও সেইরূপ মনকে এক করিয়া তাহাকে তাহার সমস্ত তুচ্ছতা, সমস্ত অসম্বদ্ধতা হইতে উদ্ধার করিয়া খাড়া করিয়া গড়িয়া তোলে, সেই মননদ্বারা ঐক্য প্রাপ্ত মন বিচ্ছিন্নভাবে বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে না, সে মন বাহ্যপ্রবাহের মুখে জড়পুঞ্জের মতো ভাসিয়া যায় না।

কোনো মনস্বী ইংরাজলেখক বলিয়াছেন—"এমন লোকটি পাওয়া দুর্লভ, যিনি নিজের পায়ের উপর খাড়া হইয়া দাঁড়াইতে পারেন, যিনি নিজের চিত্তবৃত্তিসম্বন্ধে সচেতন, কর্ম্মস্রোতকে প্রবাহিত এবং প্রতিহত করিবার মতো বল যাঁহার আছে, যিনি ধাবমান জনতা হইতে আপনাকে উর্দ্ধে রাখিতে পারেন এবং সেই জনতাপ্রবাহ কোথা হইতে আসিতেছে ও কোথায় তাহার গতি, তৎসম্বন্ধে যাঁহার একটি পরিষ্কৃত সংস্কার আছে"।

উক্ত লেখক যাহা বলিয়াছেন, তাহাকে সংক্ষেপে বলিতে হইলে বলা যায় যে, এমন লোক দুর্লভ,—"মনো যস্য মননেন হি জীবতি।"

সাধারণ লোকের মধ্যে মন-নামক যে একটা ব্যাপার আছে বলিয়া ভ্রম হয়, তাহাকে খাড়া রাখিয়াছে কিসে? কেবল প্রথা এবং অভ্যাসে। তাহার জড় অঙ্গগুলি অভ্যাসের আটা দিয়া জোড়া—তাহা প্রাণের বন্ধনে এক হইয়া নাই। তাহার গতি চিরকালপ্রবাহিত দশজনের গতি, তাহার অদ্যতন দিন কল্যতন দিনের অভ্যস্ত অন্ধ পুনরাবৃত্তিমাত্র।

জলের মধ্যে তৃণ যেমন করিয়া ভাসিয়া যায়, মাছ তেমন করিয়া

ভাসে না। তৃণের পথ এবং মাছের পথ সর্ব্বদাই এক নহে। মাছকে খাদ্যের অনুসরণে, আত্মরক্ষার উত্তেজনায় নিয়ত আপনার পথ আপনি খুঁজিয়া লইতে হয়, তৃণ সে প্রয়োজন অনুভবই করে না।

মননক্রিয়াদ্বারা যে মন জীবিত, তাহাকেও আত্মরক্ষার জন্যই নিজের পথ নিজে খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়। দশজনের মধ্যে ভাসিয়া চলা তাহার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব।

সাধারণ বাঙালীর সহিত বিদ্যাসাগরের যে একটি জাতিগত সুমহান্ প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়, সে প্রভেদ শাস্ত্রিমহাশয় যোগবাশিষ্ঠের একটিমাত্র শ্লোকের দ্বারা পরিস্ফুট করিয়াছেন। আমাদের অপেক্ষা বিদ্যাসাগরের একটা জীবন অধিক ছিল। তিনি কেবল দ্বিজ ছিলেন না, তিনি দ্বিগুণ-জীবিত ছিলেন।

সেইজন্য তাঁহার লক্ষ্য, তাঁহার আচরণ, তাঁহার কার্য্যপ্রণালী আমাদের মতো ছিল না। আমাদের সম্মুখে আছে আমাদের ব্যক্তিগত সুখদুঃখ, ব্যক্তিগত লাভক্ষতি; তাঁহার সম্মুখেও অবশ্য সেগুলা ছিল, কিন্তু তাহার উপরও ছিল তাঁহার অন্তর্জীবনের সুখদুঃখ, মনোজীবনের লাভক্ষতি। সেই সুখদুঃখ-লাভক্ষতির নিকট বাহ্য সুখদুঃখ-লাভক্ষতি কিছুই নহে।

আমাদের বহির্জীবনেরও একটা লক্ষ্য আছে, তাহাকে সমস্ত জড়াইয়া এক কথায় স্বার্থ বলা যায়। আমাদের খাওয়া-পরা-শোওয়া, কাজকর্ম্ম করা, সমস্ত স্বার্থের অঙ্গ। ইহাই আমাদের বহির্জীবনের মূলগ্রন্থি।

মননের দ্বারা আমরা যে অন্তর্জীবন লাভ করি, তাহার মূললক্ষ্য পরমার্থ। এই আম্‌মহল ও খাস্‌মহলের দুই কর্ত্তা—স্বার্থ ও পরমার্থ, ইহাদের সামঞ্জস্যসাধন করিয়া চলাই মানবজীবনের আদর্শ। কিন্তু মধ্যে মধ্যে সংসারের বিপাকে পড়িয়া যে অবস্থায় 'অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ', তখন

পরমার্থকে রাখিয়া স্বার্থই পরিত্যাজ্য, এবং যাঁহার মনোজীবন প্রবল, তিনি অবলীলাক্রমে সেই কাজ করিয়া থাকেন।

অধিকাংশের মন সজীব নয় বলিয়া শাস্ত্রে এবং লোকাচারে আমাদের মনঃপুত্তলীযন্ত্রে দম দিয়া তাহাকে একপ্রকার কৃত্রিম গতি দান করে। কেবল সেই জোরে আমরা বহুকাল ধরিয়া দয়া করি না, দান করি; ভক্তি করি না, পূজা করি; চিন্তা করি না, কর্ম্ম করি; বোধ করি না, অথচ সেইজন্যই কোন্‌টা ভালো ও কোন্‌টা মন্দ তাহা অত্যন্ত জোরের সহিত অতিশয় সংক্ষেপে চোখ বুঁজিয়া ঘোষণা করি। ইহাতে সজীব-দেবতা-স্বরূপ পরমার্থ আমাদের মনে জাগ্রত না থাকিলেও তাহার জড়প্রতিমা কোনোমতে আপনার ঠাট বজায় রাখে।

এই নির্জ্জীবতা ধরা পড়ে বাঁধা-নিয়মের নিশ্চেষ্ট অনুসরণ দ্বারা। যে সমাজে একজন অবিকল আর একজনের মতো এবং এক কালের সহিত অন্য কালের বিশেষ প্রভেদ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, সে সমাজে পরমার্থ সজীব নাই এবং মননক্রিয়া একেবারে বন্ধ হইয়া গেছে, এ কথা নিশ্চয় বলা যাইতে পারে।

আমাদের দেশের কবি তাই বলিয়াছেন—"গতানুগতিকো লোকো ন লোকঃ পারমার্থিকঃ।" অর্থাৎ লোকে গতানুগতিক। লোক যে পারমার্থিক নহে এবং পারমার্থিক লোক গতানুগতিক হইয়া থাকিতে পারেন না, কবি এই নিগূঢ় কথাটি অনুভব করিয়াছেন।

বিদ্যাসাগর আর যাহাই হউন্, গতানুগতিক ছিলেন না। কেন ছিলেন না? তাহার প্রধান কারণ, মননজীবনই তাঁহার মুখ্যজীবন ছিল।

অবশ্য, সকল দেশেই গতানুগতিকের সংখ্যা বেশি। কিন্তু যে দেশে স্বাধীনতার স্ফূর্ত্তি ও বিচিত্র কর্ম্মের চাঞ্চল্য সর্ব্বদা বর্ত্তমান, সেখানে লোকসমাজমন্থনে সেই অমৃত উঠে,—যাহাতে মনকে জীবনদান করে, মননক্রিয়াকে সতেজ করিয়া তোলে।

তথাপি সকলেই জানেন, কার্লাইলের ন্যায় লেখক তাঁহাদের দেশের সাধারণ জনসমাজের অন্ধ মূঢ়তাকে কিরূপ সুতীব্র ভৎ‍র্সনা করিয়াছেন।

কার্লাইল যাহাকে hero অর্থাৎ বীর বলেন, তিনি কে? The hero is he who lives in the inward sphere of things, in the True, Divine and Eternal, which exists always, unseen to most, under the Temporary, Trivial: his being is in that; he declares that abroad; by act or speech as it may be, in declaring himself abroad. অর্থাৎ তিনিই বীর, যিনি বিষয়পুঞ্জের অন্তরতর রাজ্যে সত্য, এবং দিব্য এবং অনন্তকে আশ্রয় করিয়া আছেন;—যে সত্য, দিব্য ও অনন্ত পদার্থ অধিকাংশের অগোচরে চারিদিকের তুচ্ছ এবং ক্ষণিক ব্যাপারের অভ্যন্তরে নিত্যকাল বিরাজ করিতেছেন; সেই অন্তররাজ্যেই তাঁহার অস্তিত্ব; কর্ম্মদ্বারা অথবা বাক্যদ্বারা নিজেকে বাহিরে প্রকাশ করিয়া তিনি সেই অন্তররাজ্যকেই বাহিরে বিস্তার করিতেছেন। কার্লাইলের মতে ইঁহারা কাপড় ঝুলাইবার আল্‌না বা হজম করিবার যন্ত্র নহেন, ইঁহারা সজীব মনুষ্য, অর্থাৎ সেই একই কথা—"স জীবতি মনো যস্য মননেন হি জীবতি"। অথবা অন্য কবির ভাষায় ইঁহারা গতানুগতিকমাত্র নহেন, ইঁহারা পারমার্থিক।

আমরা স্বার্থকে যেমন সহজে এবং সুতীব্রভাবে অনুভব করি, মনন-জীবিগণ পরমার্থকে ঠিক্ তেম্‌নি সহজে অনুভব করেন এবং তাহার দ্বারা তেম্‌নি অনায়াসে চালিত হন। তাঁহাদের দ্বিতীয় জীবন, তাঁহাদের অন্তরতর প্রাণ যে খাদ্য চায়, যে বেদনা বোধ করে, যে আনন্দামৃতে সাংসারিক ক্ষতি এবং মৃত্যুর বিরুদ্ধেও অমর হইয়া উঠে, আমাদের নিকট তাহার অস্তিত্বই নাই।

পৃথিবীর এমন একদিন ছিল, যখন সে কেবল আপনার দ্রবীভূত

ধাতুপ্রস্তরময় ভূপিণ্ড লইয়া সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিত। বহুযুগ পরে তাহার নিজের অভ্যন্তরে এক অপরূপ প্রাণশক্তির বিকাশে জীবনে এবং সৌন্দর্য্যে তাহার স্থলজল পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

মানবসমাজেও মননশক্তিদ্বারা মনঃসৃষ্টি বহুযুগের এক বিচিত্র-ব্যাপার। তাহার সৃষ্টিকার্য্য অনবরত চলিতেছে, কিন্তু এখনো সর্ব্বত্র যেন দানা বাঁধিয়া উঠে নাই। মাঝে মাঝে এক এক স্থানে যখন তাহা পরিস্ফুট হইয়া উঠে, তখন চারিদিকের সহিত তাহার পার্থক্য অত্যন্ত বেশি বোধ হয়।

বাংলাদেশে বিদ্যাসাগরকে সেইজন্য সাধারণ হইতে অত্যন্ত পৃথক্ দেখিতে হইয়াছে। সাধারণত আমরা-যে পরমার্থের প্রভাব একেবারেই অনুভব করি না, তাহা নহে; মধ্যে মধ্যে বহুকাল গুমটের পর হঠাৎ একদিন ভিতর হইতে একটা আধ্যাত্মিক ঝড়ের বেগ আমাদিগকে স্বার্থ ও সুবিধা লঙ্ঘন করিয়া আরাম ও অভ্যাসের বাহিরে ক্ষণকালের জন্য আকর্ষণ করে, কিন্তু সে সকল দম্‌কা-হাওয়া চলিয়া গেলে সে কথা আর মনেও থাকে না; আবার সেই আহারবিহার-আমোদপ্রমোদের নিত্যচক্রের মধ্যে ঘুরিতে আরম্ভ করি।

ইহার কারণ, মনোজীবন আমাদের মধ্যে পরিণতিলাভ করে নাই,—আগাগোড়া বাঁধিয়া যায় নাই। চেতনা ও বেদনার আভাস সে অনুভব করে, কিন্তু তাহার স্থায়িত্ব নাই। অনুভূতি হইতে কার্য্যসম্পাদন পর্য্যন্ত অবিচ্ছেদ যোগ ও অনিবার্য্য বেগ থাকে না। কাজের সহিত ভাবের ও ভাবের সহিত মনের সচেতন নাড়ীজালের সজীববন্ধন স্থাপিত হয় নাই।

যাঁহাদের মধ্যে সেই বন্ধন স্থাপিত হইয়াছে, যাঁহারা সেই দ্বিতীয়-জীবন লাভ করিয়াছেন, পরমার্থদ্বারা শেষ পর্য্যন্ত চালিত না হইয়া তাঁহাদের থাকিবার জো নাই। তাঁহাদের একটা দ্বিতীয় চেতনা আছে—সে চেতনার সমস্ত বেদনা আমাদের অনুভবের অতীত।

বিদ্যাসাগর সেই দ্বিতীয় চেতনা লইয়া সংসারে জন্মগ্রহণ করাতে তাঁহার বেদনার অন্ত ছিল না। চারিদিকের অসাড়তার মধ্যে এই ব্যথিত বিশালহৃদয় কেবল নিঃসহায়ভাবে, কেবল আপনার প্রাণের জোরে, কেবল আপনার বেদনার উত্তাপে একাকী আপন কাজ করিয়াছেন।

সাধারণলোকের হিসাবে সে সমস্ত কাজের কোনো প্রয়োজন ছিল না। তিনি কেবলমাত্র পাণ্ডিত্যে এবং বিদ্যালয়পাঠ্য-গ্রন্থবিক্রয়দ্বারা ধনোপার্জ্জনে সংসারে যথেষ্ট সম্মানপ্রতিপত্তি লাভ করিয়া যাইতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার নিজের হিসাবে এ সমস্ত কাজের একান্ত প্রয়োজন ছিল;—নতুবা তিনি যে-অধিক-জীবন বহন করিতেন, সে জীবনের নিশ্বাসরোধ হইত;—তাঁহার ধনোপার্জ্জন ও সম্মানলাভে তাহাকে রক্ষা করিতে পারিত না।

বালবিধবার দুঃখে দুঃখবোধ আমাদের পক্ষে একটি ক্ষণিক ভাবোদ্রেক মাত্র। তাহাদের বেদনা আমাদের জীবনকে স্পর্শ করে না। কারণ, আমরা গতানুগতিক; যেখানে দশজনের বেদনাবোধ নাই, সেখানে আমরা অচেতন। আমরা প্রকৃতরূপে, প্রত্যক্ষরূপে, অব্যবহিত-রূপে, তাহাদের বঞ্চিত জীবনের সমস্ত দুঃখ ও অবমাননাকে আপনার দুঃখ ও অবমাননারূপে অনুভব করিতে পারি না। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে আপন অতিচেতনার দণ্ডবহন করিতে হইয়াছিল। অভ্যাস, লোকাচার ও অসাড়তার পাষাণব্যবধান আশ্রয় করিয়া পরের দুঃখ হইতে তিনি আপনাকে রক্ষা করিতে পারেন নাই। এইজন্য আমরা যেমন ব্যাকুলভাবে আপনার দুঃখ মোচন করিতে চেষ্টা করিয়া থাকি, তিনি যেন তাহা অপেক্ষা অধিক প্রাণপণে দ্বিগুণতর প্রতিজ্ঞাসহকারে বিধবাগণকে অতলস্পর্শ অচেতন নিষ্ঠুরতা হইতে উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। আমাদের

পক্ষে স্বার্থ যেমন প্রবল, পরমার্থ তাঁহার পক্ষে ততোধিক প্রবল ছিল।

এমন একটি দৃষ্টান্ত দিলাম। কিন্তু তাঁহার জীবনের সকল কার্য্যেই দেখা গিয়াছে, তিনি যে চেতনারাজ্যে, যে মননলোকে বাস করিতেন, আমরা তাহা হইতে বহুদূরে অবস্থিত; তাঁহার চিন্তা ও চেষ্টা, বুদ্ধি ও বেদনা গতানুগতিকের মত ছিল না, তাহা পারমাথিক ছিল।

তাঁহার মত লোক পারমার্থিকতাভ্রষ্ট বঙ্গদেশে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া, চতুর্দ্দিকের নিঃসাড়তার পাষাণখণ্ডে বারংবার আহত-প্রতিহত হইয়াছিলেন বলিয়া বিদ্যাসাগর তাঁহার কর্ম্মসঙ্কুল জীবন যেন চিরদিন ব্যথিতক্ষুব্ধভাবে যাপন করিয়াছেন। তিনি যেন সৈন্যহীন বিদ্রোহীর মতো তাঁহার চতুর্দ্দিক্‌কে অবজ্ঞা করিয়া জীবনরণরঙ্গভূমির প্রান্ত পর্য্যন্ত জয়ধ্বজা নিজের স্কন্ধে একাকী বহন করিয়া লইয়া গেছেন। তিনি কাহাকেও ডাকেন নাই, তিনি কাহারো সাড়াও পান নাই, অথচ বাধা ছিল পদে পদে। তাঁহার মননজীবী অন্তঃকরণ তাঁহাকে প্রবল আবেগে কাজ করাইয়াছিল, কিন্তু গতজীবন বহিঃসংসার তাঁহাকে আশ্বাস দেয় নাই। তিনি যে শব সাধনায় প্রবৃত্ত ছিলেন, তাহার উত্তরদায়কও ছিলেন তিনি নিজে।

আধুনিক ইংলণ্ডে বিদ্যাসাগরের ঠিক উপমা পাওয়া যায় না। কেবল জন্‌সনের সহিত কতকগুলি বিষয়ে তাঁহার অত্যন্ত সাদৃশ্য দেখিতে পাই। সে সাদৃশ্য বাহিরের কাজে ততটা নয়—কারণ, কাজে বিদ্যাসাগর জন্‌সন্ অপেক্ষা অনেক বড় ছিলেন; কিন্তু এই সাদৃশ্য অন্তরের সরল, প্রবল এবং অকৃত্রিম মনুষ্যত্বে। জন্‌সন্‌ও বিদ্যাসাগরের ন্যায় বাহিরে রূঢ় ও অন্তরে সুকোমল ছিলেন; জন্‌সন্‌ও পাণ্ডিত্যে অসামান্য, বাক্যালাপে সুরসিক, ক্রোধে উদ্দীপ্ত, স্নেহরসে আর্দ্র, মতে নির্ভীক, হৃদয়ভাবে অকপট এবং পরহিতৈষায় আত্মবিস্মৃত ছিলেন। দুর্ব্বিষহ দারিদ্র্যও মুহূর্ত্ত-কালের জন্য তাঁহার আত্মসম্মান আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই। সুবিখ্যাত

ইংরাজিলেখক লেস্‌লি ষ্টীফন্‌ জন্‌সন্‌ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ অনুবাদ করিয়া দিলাম।

'মতের পরিবর্তে কেবল কথামাত্রদ্বারা তাঁহাকে ভুলাইবার জো ছিল না, এবং তিনি এমন কোনো মতবাদও গ্রাহ্য করিতেন না,—যাহা অকৃত্রিম-আবেগ-উৎপাদনে অক্ষম। ইহা ব্যতীত তাঁহার হৃদয়বৃত্তিসকল যেমন অকৃত্রিম, তেম্‌নি গভীর এবং সুকোমল ছিল। তাঁহার বৃদ্ধা এবং কুশ্রী স্ত্রীর প্রতি তাঁহার প্রেম কি পবিত্র ছিল। যেখানে কিছুমাত্র উপকারে লাগিত, সেখানে তাঁহার করুণা কিরূপ সবেগে অগ্রসর হইত, "গ্রাব্‌ ষ্ট্রীটে"র সর্ব্বপ্রকার প্রলোভন হইতে তিনি কিরূপ পুরুষোচিত আত্ম-সম্মানের সহিত আপন সম্ভ্রমরক্ষা করিয়াছিলেন, সে সব কথার পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নাই। কিন্তু বোধ করি, এ সকল গুণের একান্ত দুর্লভতা-সম্বন্ধে মনোযোগ আকর্ষণ করা ভালো। বোধ হয় অনেকেই আপন পিতাকে ভালোবাসে; সৌভাগ্যক্রমে তাহা সত্য; কিন্তু কটা লোক আছে, যাহার পিতৃভক্তি ক্ষ্যাপামি-অপবাদের আশঙ্কা অতিক্রম করিতে পারে? কয়জন আছেন, যাঁহারা বহুদিনগত এক অবাধ্যতা-অপরাধের প্রায়শ্চিত্তসাধনের জন্য যুট্‌কৃসিটারের হাটে পিতার মৃত্যুর বহুবৎসর পরেও যাত্রা করিতে পারেন? সমাজত্যক্তা রমণী পথপ্রান্তে নিরাশ্রয়ভাবে পড়িয়া আছে দেখিলে আমাদের অনেকেরই মনে ক্ষণিক দয়ার আবেশ হয়। আমরা হয় তো পুলিস্‌কে ডাকি, কিংবা ঠিকাগাড়িতে চড়াইয়া দিয়া তাহাকে সরকারী দরিদ্রাশ্রমে পাঠাই, অথবা বড়ো জোর সরকারী দরিদ্রপালনব্যবস্থার অসম্পূর্ণতার বিরুদ্ধে টাইমস্‌পত্রে প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাই। কিন্তু এ প্রশ্ন বোধ করি জিজ্ঞাসা না করাই ভালো যে, কয়জন সাধু আছেন, যাঁহারা তাহাকে কাঁধে করিয়া নিজের বাড়িতে লইয়া যাইতে পারেন, এবং তাহার অভাবসকল মোচন করিয়া দিয়া তাহার জীবনযাত্রার সুব্যবস্থা করিয়া দেন। অনেক বড়োলোকের জীবনে

আমরা সাধুভাব ও সদাচার দেখিতে পাই ; কিন্তু ভালোলোকের মধ্যেও এমন আদর্শ সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না, যাঁহার জীবন প্রচলিত লোকাচারের দ্বারা গঠিত নহে, অথবা যাঁহার হৃদয়বৃত্তি চিরাভ্যস্ত শিষ্ট-প্রথার বাঁধা-খাল উদ্বেল করিয়া উঠিতে পারে। জন্‌সনের চরিত্রের প্রতি আমাদের যে প্রীতি জন্মে, তাহার প্রধান কারণ, তাঁহার জীবন যে নেমি আশ্রয় করিয়া আবর্ত্তিত হইত, তাহা মহত্ত্ব, তাহা প্রথামাত্রের দাসত্ব নহে। * * * অ্যাডিসন্ দেখাইয়াছিলেন, খৃষ্টানের মরণ কিরূপ ;—কিন্তু তাঁহার জীবন আরামের অবস্থা ও ষ্টেট্‌সেক্রেটারির পদ এবং কাউণ্টেসের সহিত বিবাহের মধ্য দিয়া অতি অবাধে প্রবাহিত হইয়াছিল ; মাঝে মাঝে পোর্ট্ মদিরার অতিসেবন ছাড়া আর কিছুতেই তাঁহার নাড়ি ও তাঁহার মেজাজকে চঞ্চল করিতে পারে নাই। কিন্তু আর একজন কঠিন বৃদ্ধ তীর্থযাত্রী, যিনি অন্তর এবং বাহিরের দুঃখরাশিসত্ত্বেও যুদ্ধ করিয়া জীবনকে শান্তির পথে লইয়া গেছেন, যিনি এই সংসারের মায়ার হাটে উপহসিত হইয়া মৃত্যুচ্ছায়ার অন্ধগুহামধ্যে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এবং যিনি নৈরাশ্যদৈত্যের বন্ধন হইতে বহু চেষ্টায়, বহু কষ্টে উদ্ধার পাইয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুশয্যায় আমাদের মনে গভীরতর ভাবাবেগ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। যখন দেখিতে পাই, এই লোকের অন্তিমকালের হৃদয়বৃত্তি কিরূপ কোমল, গম্ভীর এবং সরল, তখন আমরা স্বতই অনুভব করি যে, যে-নিরীহ ভদ্রলোকটি পরম শিষ্টাচার রক্ষা করিয়া বাঁচিয়াছিলেন ও মরিয়াছিলেন, তাঁহার অপেক্ষা উন্নততর সত্তার সন্নিধানে বর্ত্তমান আছি।'

এই বর্ণনা পাঠ করিলে বিদ্যাসাগরের সহিত জন্‌সনের সাদৃশ্য সহজেই মনে পড়ে। বিদ্যাসাগরও কেবল ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ অভ্যস্ত ভব্যতার মধ্য দিয়া চলিতে পারেন নাই, তাঁহারও স্নেহভক্তিদয়া, তাঁহার বিপুল-বিস্তীর্ণ হৃদয় সমস্ত আদবকায়দাকে বিদীর্ণ করিয়া কেমন অসামান্য আকারে

ব্যক্ত হইত, তাহা তাঁহার জীবনচরিতে নানা ঘটনায় প্রকাশ পাইয়াছে।

এইখানে জন্‌সন্‌সম্বন্ধে কার্লাইল্ যাহা লিখিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ অনুবাদ করি।

'তিনি বলিষ্ঠচেতা এবং মহৎ-লোক ছিলেন। শেষ পর্য্যন্তই অনেক জিনিষ তাঁহার মধ্যে অপরিণত থাকিয়া গিয়াছিল; অনুকূল উপকরণের মধ্যে তিনি কি না হইতে পারিতেন—কবি, ঋষি, রাজাধিরাজ। কিন্তু মোটের উপরে, নিজের 'উপকরণ', নিজের 'কাল' এবং ঐগুলা লইয়া নালিস করিবার প্রয়োজন কোনো লোকেরই নাই; উহা একটা নিষ্ফল আক্ষেপমাত্র। তাঁহার কালটা খারাপ ছিল, ভালোই, তিনি সেটাকে আরো ভালো করিবার জন্যই আসিয়াছেন! জন্‌সনের কৈশোরকাল ধনহীন, সঙ্গহীন, আশাহীন এবং দুর্ভাগ্যজালে বিজড়িত ছিল। তা থাক্, কিন্তু বাহ্য অবস্থা অনুকূলতম হইলেও জন্‌সনের জীবন দুঃখের জীবন হওয়া ছাড়া আর কিছু হওয়া সম্ভবপর হইত না। প্রকৃতি তাঁহার মহত্ত্বের প্রতিদানস্বরূপ তাঁহাকে বলিয়াছিল, রোগাতুর দুঃখরাশির মধ্যে বাস করো। না, বোধ করি, দুঃখ এবং মহত্ত্ব ঘনিষ্ঠভাবে এমন কি, অচ্ছেদ্যভাবে পরস্পর জড়িত ছিল। যে কারণেই হৌক্, অভাগা জন্‌সন্‌কে নিয়তই রোগাবিষ্টতা, শারীরিক ও আধ্যাত্মিক বেদনা কোমরে বাঁধিয়া ফিরিতে হইত। তাঁহাকে একবার কল্পনা করিয়া দেখ, তাঁহার সেই রুগ্‌ণশরীর, তাঁহার ক্ষুধিত প্রকাণ্ড হৃদয় এবং অনির্ব্বচনীয় উদ্বর্ত্তিত চিন্তাপুঞ্জ লইয়া পৃথিবীতে বিপদাকীর্ণ বিদেশীর মত ফিরিতেছেন, ব্যগ্রভাবে গ্রাস করিতেছেন যে-কোন পারমার্থিক পদার্থ তাঁহার সম্মুখে আসিয়া পড়ে, আর যদি কিছুই না পান, তবে অন্তত বিদ্যালয়ের ভাষা এবং কেবলমাত্র ব্যাকরণের ব্যাপার। সমস্ত ইংলণ্ডের মধ্যে বিপুলতম অন্তঃকরণ যাহা ছিল, তাঁহারই ছিল, অথচ তাঁহার জন্য বরাদ্দ ছিল

সাড়ে চার-আনা করিয়া প্রতিদিন। তবু সে হৃদয় ছিল অপরাজিত মহাবলী, প্রকৃত মনুষ্যের হৃদয়! অক্সফোর্ডে তাঁহার সেই জুতাজোড়ার গল্পটা সর্ব্বদাই মনে পড়ে; মনে পড়ে, কেমন করিয়া সেই দাগকাটা মুখ, হাড়-বাহির-করা কলেজের দীনছাত্র শীতের সময় জীর্ণ জুতা লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; কেমন করিয়া এক কৃপালু সচ্ছল ছাত্র গোপনে একজোড়া জুতা তাঁহার দরজার কাছে রাখিয়া দিল, এবং সেই হাড়-বাহির-করা দরিদ্র ছাত্র সেটা তুলিল, কাছে আনিয়া তাহার বহুচিন্তাজালে অস্ফুট-দৃষ্টির নিকট ধরিল এবং তাহার পরে জানালার বাহিরে দূর করিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিল। ভিজা পা বলো, পঙ্ক বলো, বরফ বলো, ক্ষুধা বলো, সবই সহ্য হয়, কিন্তু ভিক্ষা নহে; আমরা ভিক্ষা সহ্য করিতে পারি না! এখানে কেবল রূঢ় সুদৃঢ় আত্মসহায়তা। দৈন্যমালিন্য, উদ্ভ্রান্ত বেদনা এবং অভাবের অন্ত নাই, তথাপি অন্তরের মহত্ত্ব এবং পৌরুষ! এই যে জুতা ছুঁড়িয়া ফেলা, ইহাই এ মানুষটির জীবনের ছাঁচ। একটি স্বকীয়তন্ত্র (original) মানুষ, এ তোমার গতানুগতিক, ঋণপ্রার্থী, ভিক্ষাজীবী লোক নহে। আর যাই হোক্, আমরা আমাদের নিজের ভিত্তির উপরেই যেন স্থিতি করি,—সেই জুতা পায়ে দিয়াই দাঁড়ান যাক্ যাহা আমরা নিজে জোটাইতে পারি। যদি তেমনই ঘটে, তবে পাঁকের উপর চলিব, বরফের উপরেই চলিব, কিন্তু উন্নতভাবে চলিব; প্রকৃতি আমাদিগকে যে সত্য দিয়াছেন, তাহারই উপর চলিব; অপরকে যাহা দিয়াছেন, তাহারই নকলের উপর চলিব না।'

কার্লাইল্ যাহা লিখিয়াছেন, তাহার ঘটনাসম্বন্ধে না মিলুক, তাহার মর্ম্মকথাটুকু বিদ্যাসাগরের অবিকল খাটে। তিনি গতানুগতিক ছিলেন না, তিনি স্বতন্ত্র, সচেতন, পারমার্থিক ছিলেন; শেষদিন পর্য্যন্ত তাঁহার জুতা তাঁহার নিজেরই চটিজুতা ছিল। আমাদের কেবল আক্ষেপ এই যে, বিদ্যাসাগরের বস্‌ওয়েল্ কেহ ছিল না, তাঁহার মনের তীক্ষ্ণতা, সবলতা,

গভীরতা ও সহৃদয়তা তাঁহার বাক্যালাপের মধ্যে প্রতিদিন অজস্র বিকীর্ণ হইয়া গেছে, অদ্য সে আর উদ্ধার করিবার উপায় নাই। বস্‌ওয়েল্‌ না থাকিলে জন্‌সনের মনুষ্যত্ব লোকসমাজে স্থায়ী আদর্শ দান করিতে পারিত না। সৌভাগ্যক্রমে বিদ্যাসাগরের মনুষ্যত্ব তাঁহার কাজের মধ্যে আপনার ছাপ রাখিয়া যাইবে, কিন্তু তাঁহার অসামান্য মনস্বিতা, যাহা তিনি অধিকাংশসময়ে মুখের কথায় ছড়াইয়া দিয়াছেন, তাহা কেবল অপরিস্ফুট জনশ্রুতির মধ্যে অসম্পূর্ণ আকারে বিরাজ করিবে।

১৩০৫।

রামমোহন রায়

মহাপুরুষেরা সমস্ত মানবজাতির গৌরবের ও আদর্শের স্থল বটেন, কিন্তু তাঁহারা জাতিবিশেষের বিশেষ গৌরবের স্থল, তাহার আর সন্দেহ নাই। গৌরবের স্থল বলিলে যে কেবলমাত্র সামান্য অহঙ্কারের স্থল বুঝায়, তাহা নহে, গৌরবের স্থল বলিলে শিক্ষার স্থল, বললাভের স্থল বুঝায়। মহাপুরুষদিগের মহৎকার্য্যসকল দেখিয়া কেবলমাত্র সম্ভ্রমমিশ্রিত বিস্ময়ের উদ্রেক হইলেই যথেষ্ট ফললাভ হয় না—তাঁহাদিগকে যতই 'আমার' মনে করিয়া তাঁহাদের প্রতি যতই প্রেমের উদ্রেক হয়, ততই তাঁহাদের কথা, তাঁহাদের কার্য্য, তাঁহাদের চরিত্র আমাদের নিকট জীবন্ত হইয়া উঠে। যাঁহাদিগকে লইয়া আমরা গৌরব করি, তাঁহাদিগকে শুদ্ধমাত্র যে আমরা ভক্তি করি, তাহা নহে, তাঁহাদিগকে 'আমার' বলিয়া মনে করি। এইজন্য তাঁহাদের মহত্ত্বের আলোক বিশেষরূপে আমাদেরই উপরে আসিয়া পড়ে, বিশেষরূপে আমাদেরই মুখ উজ্জ্বল করে। শিশু যেমন সহস্র বলবান্‌ ব্যক্তিকে ফেলিয়া বিপদের সময় পিতার কোলে

আশ্রয় লইতে যায়, তেমনি আমরা দেশের দুর্গতির দিনে আর সকলকে ফেলিয়া আমাদের স্বদেশীয় মহাপুরুষদিগের অটল আশ্রয় অবলম্বন করিবার জন্য ব্যাকুল হই। তখন আমাদের নিরাশহৃদয়ে তাঁহারা যেমন বলবিধান করিতে পারেন, এমন আর কেহই নহে। ইংলণ্ডের দুর্গতি কল্পনা করিয়া কবি ওয়ার্ড্‌স্বার্থ্‌ পৃথিবীর আর সমস্ত মহাপুরুষকে ফেলিয়া কাতরস্বরে মিল্টন্‌কেই ডাকিলেন, কহিলেন—"মিল্টন্‌, আহা, তুমি যদি আজ বাঁচিয়া থাকিতে! তোমাকে ইংলণ্ডের বড়ই আবশ্যক হইয়াছে।" যে জাতির মধ্যে স্বদেশীয় মহাপুরুষ জন্মান নাই, সে জাতি কাহার মুখ চাহিবে, তাহার কি দুর্দ্দশা! কিন্তু যে জাতির মধ্যে মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তথাপি যে জাতি কল্পনার জড়তা, হৃদয়ের পক্ষাঘাত বশতঃ তাঁহার মহত্ত্ব কোনোমতে অনুভব করিতে পারে না, তাহার কি দুর্ভাগ্য!

আমাদের কি দুর্ভাগ্য! আমরা বঙ্গসমাজের বড় বড় যশোবুদ্বুদ-দিগকে বালুকার সিংহাসনের উপর বসাইয়া দুইদিনের মতো পুষ্পচন্দন দিয়া মহত্ত্বপূজার স্পৃহা খেলাচ্ছলে চরিতার্থ করিতেছি, বিদেশীয়দের অনুকরণে কথায় কথায় সভা ডাকিয়া চাঁদা তুলিয়া মহত্ত্বপূজার একটা ভাণ ও আড়ম্বর করিতেছি!

রামমোহন রায়ের চরিত্র আলোচনা করিবার একটি গুরুতর আবশ্যকতা আছে। আমাদের এখনকার কালে তাঁহার মতো আদর্শের নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। আমরা কাতরস্বরে তাঁহাকে বলিতে পারি —"রামমোহন রায়, আহা, তুমি যদি আজ বাঁচিয়া থাকিতে! তোমাকে বঙ্গদেশের বড়ই আবশ্যক হইয়াছে! আমরা বাক্‌পটু লোক—আমা-দিগকে তুমি কাজ করিতে শিখাও। আমরা আত্মম্ভরী—আমাদিগকে আত্মবিসর্জ্জন দিতে শিখাও। আমরা লঘুপ্রকৃতি—বিপ্লবের স্রোতে চরিত্রগৌরবের প্রভাবে আমাদিগকে অটল থাকিতে শিখাও। আমরা

বাহিরের প্রখর আলোকে অন্ধ, হৃদয়ের অভ্যন্তরস্থ চিরোজ্জ্বল আলোকের সাহায্যে ভালমন্দ নির্ব্বাচন করিতে, ও স্বদেশের পক্ষে যাহা স্থায়ী ও যথার্থ মঙ্গল, তাহাই অবলম্বন করিতে শিক্ষা দাও!"

রামমোহন রায় যথার্থ কাজ করিয়াছেন। তাঁহার সময়ে প্রগল্‌ভা রসনার এত শ্রীবৃদ্ধি হয় নাই, সুতরাং তাহার এত সমাদরও ছিল না। কিন্তু আর একটা কথা দেখিতে হইবে। এক একটা সময়ে কাজের ভিড় পড়িয়া যায়, কাজের হাট বসিয়া যায়, তখন কাজ করিতে অথবা কাজের ভাণ করিতে একটা আমোদ আছে। তখন সেই কার্য্যাড়ম্বর নাট্যরস জন্মাইয়া মানুষকে মত্ত করিয়া তুলে, বিশেষত একটা তুমুল কোলাহলে সকলে বাহ্যজ্ঞান বিস্মৃত হইয়া একপ্রকার বিহ্বল হইয়া পড়েন। কিন্তু রামমোহন রায়ের সময়ে বঙ্গসমাজের সে অবস্থা ছিল না। তখন কাজে মত্ততাসুখ ছিল না, একাকী ধীরভাবে সমস্ত কাজ করিতে হইত। সঙ্গিহীন সুগম্ভীর সমুদ্রের গর্ভে যেমন নীরবে অতি ধীরে ধীরে দ্বীপ নির্ম্মিত হইয়া উঠে, সঙ্কল্প তেম্‌নি অবিশ্রাম নীরবে গভীর হৃদয় পরিপূর্ণ করিয়া কার্য্য-আকারে পরিস্ফুট হইয়া উঠিত। মহত্ত্বের প্রভাবে, হৃদয়ের অনুরাগের প্রভাবে কাজ না করিলে কাজ করিবার আর কোনো প্রবর্ত্তনাই তখন বর্ত্তমান ছিল না। অথচ কাজের ব্যাঘাত এখনকার চেয়ে ঢের বেশি ছিল। রামমোহন রায়ের যশের প্রলোভন কিছুমাত্র ছিল না। তিনি যতগুলি কাজ করিয়াছিলেন, কোনো কাজেই তাঁহার সমসাময়িক স্বদেশীয়দিগের নিকট হইতে যশের প্রত্যাশা করেন নাই। নিন্দাগ্লানি শ্রাবণের বারিধারার ন্যায় তাঁহার মাথার উপরে অবিশ্রাম বর্ষিত হইয়াছে—তবুও তাঁহাকে তাঁহার কার্য্য হইতে বিরত করিতে পারে নাই। নিজের মহত্ত্বে তাঁহার কি অটল আশ্রয় ছিল, নিজের মহত্ত্বের মধ্যেই তাঁহার হৃদয়ের কি সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি ছিল, স্বদেশের প্রতি তাঁহার কি স্বার্থশূন্য সুগভীর প্রেম ছিল। তাঁহার

স্বদেশীয় লোকেরা তাঁহার সহিত যোগ দেয় নাই,— তিনিও তাঁহার সময়ের স্বদেশীয় লোকদের হইতে বহুদূরে ছিলেন ; তথাপি তাঁহার বিপুল হৃদয়ের প্রভাবে স্বদেশের যথার্থ মর্ম্মস্থলের সহিত আপনার সুদৃঢ় যোগরক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। বিদেশীয় শিক্ষায় সে বন্ধন ছিন্ন করিতে পারে নাই এবং তদপেক্ষা গুরুতর যে স্বদেশীয়ের উৎপীড়ন, তাহাতেও সে বন্ধন বিচ্ছিন্ন হয় নাই। এই অভিমানশূন্য বন্ধনের প্রভাবে তিনি স্বদেশের জন্য সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জ্জন করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি কী না করিয়াছিলেন? শিক্ষা বলো, রাজনীতি বলো, বঙ্গভাষা বলো, বঙ্গসাহিত্য বলো, সমাজ বলো, ধর্ম্ম বলো, বঙ্গসমাজের যে-কোনো বিভাগে উত্তরোত্তর যতই উন্নতি হইতেছে, সে কেবল তাঁহারই হস্তাক্ষর কালের নূতন নূতন পৃষ্ঠায় উত্তরোত্তর পরিস্ফুটতর হইয়া উঠিতেছে মাত্র। বঙ্গসমাজের সর্ব্বত্রই তাঁহার স্মরণস্তম্ভ মাথা তুলিয়া উঠিতেছে ; তিনি এই মরুস্থলে যে সকল বীজ রোপণ করিয়াছিলেন, তাহারা বৃক্ষ হইয়া শাখাপ্রশাখায় প্রতিদিন বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে। তাহারই বিপুল ছায়ায় বসিয়া আমরা কি তাঁহাকে স্মরণ করিব না?

তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার মহত্ত্ব প্রকাশ পায় ; আবার তিনি যাহা না করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার মহত্ত্ব আরো প্রকাশ পায়। তিনি যে এত কাজ করিয়াছেন, কিছুরই মধ্যে তাঁহার আত্মপ্রতিষ্ঠা করেন নাই। তিনি যে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়াছেন, তাহাতে নিজের অথবা আর কাহারো প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তিনি গড়িয়া-পিটিয়া একটা নূতন ধর্ম্ম বানাইতে পারিতেন, তাহা না করিয়া পুরাতন ধর্ম্ম প্রচার করিলেন। তিনি নিজেকে গুরু বলিয়া চালাইতে পারিতেন, তাহা না করিয়া প্রাচীন ঋষিদিগকে গুরু বলিয়া মানিলেন। তিনি তাঁহার কাজ স্থায়ী করিবার জন্য প্রাণপণ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার নাম স্থায়ী করিবার জন্য কিছুমাত্র চেষ্টা করেন নাই, বরং তাহার

প্রতিকূলতা করিয়াছেন। এরূপ আত্মবিলোপ এখন তো দেখা যায় না। বড় বড় সংবাদপত্রপুট পরিপূর্ণ করিয়া অবিশ্রাম নিজের নামসুধাপানে একপ্রকার মত্ততা জন্মাইয়া আমাদের কাজের উৎসাহ জাগাইয়া রাখিতে হয়,—দেশের জন্য যে সামান্য কাজটুকু করি, তাহাও বিদেশী-আকারে সমাধা করি, চেষ্টা করি,—যাহাতে সে কাজটা বিদেশীয়দের নয়ন-আকর্ষণ পণ্যদ্রব্য হইয়া উঠে। স্তুতিকোলাহল ও দলস্থ লোকের অবিশ্রাম একমন্ত্রোচ্চারণশব্দে বিব্রত থাকিয়া স্থিরভাবে কোনো বিষয়ের যথার্থ ভালমন্দ বুঝিবার শক্তিও থাকে না, ততটা ইচ্ছাও থাকে না, একটা গোলযোগের আবর্ত্তের মধ্যে মহানন্দে ঘুরিতে থাকি ও মনে করিতে থাকি, বিদ্যুদ্‌বেগে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছি।

আমরা যে আত্মবিলোপ করিতে পারি না, তাহার কারণ, আমরা আপনাকে ধারণ করিতে পারি না। সামান্যমাত্র ভাবের প্রবাহ উপস্থিত হইলেই আমরাই সর্ব্বোপরি ভাসিয়া উঠি। আত্মগোপন করিতে পারি না বলিয়াই সর্ব্বদা ভাবিতে হয়, আমাকে কেমন দেখিতে হইতেছে। যাঁহারা মাঝারি রকমের বড়োলোক, তাঁহারা নিজের শুভসঙ্কল্প সিদ্ধ করিতে চান বটে, কিন্তু তৎসঙ্গে আপনাকেও প্রচলিত করিতে চান। এ বড়ো বিষম অবস্থা। আপনিই যখন আপনার সঙ্কল্পের প্রতিযোগী হইয়া উঠে, তখন সঙ্কল্পের অপেক্ষা আপনার প্রতি আদর স্বভাবতই কিঞ্চিৎ অধিক হইয়া পড়ে। তখন সঙ্কল্প অনেকসময়ে হীনবল, লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। কথায় কথায় তাহার পরিবর্ত্তন হয়। কিছু-কিছু ভালো কাজ সম্পন্ন হয়, কিন্তু সর্ব্বাঙ্গসুন্দর কাজটি হইয়া উঠে না। যে আপনার পায়ে আপনি বাধাস্বরূপ বিরাজ করিতে থাকে, সংসারের সহস্র বাধা সে অতিক্রম করিবে কী করিয়া? যে ব্যক্তি আপনাকে ছাড়িয়া সংসারের মধ্যস্থলে নিজের শুভকার্য্য স্থাপন করে, সে স্থায়ী ভিত্তির উপরে নিজের মঙ্গল-সঙ্কল্প প্রতিষ্ঠিত করে। আর যে নিজের উপরেই সমস্ত কার্য্যের প্রতিষ্ঠা

করে, সে যখন চলিয়া যায়, তাহার অসম্পূর্ণ কার্য্যও তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া যায় ; যদি-বা বিশৃঙ্খল ভগ্নাবশেষ ধূলির উপরে পড়িয়া থাকে, তবে তাহার ভিত্তি কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। রামমোহন রায় আপনাকে ভুলিয়া নিজের মহতী ইচ্ছাকে বঙ্গসমাজের মধ্যে রোপণ করিয়াছিলেন, এইজন্য তিনি না থাকিলেও আজ তাঁহার সেই ইচ্ছা সজীবভাবে প্রতিদিন বঙ্গসমাজের চারিদিকে অবিশ্রাম কাজ করিতেছে। সমস্ত বঙ্গবাসী তাঁহার স্মৃতি হৃদয়পট হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারে, কিন্তু তাঁহার সেই অমর ইচ্ছার বংশ বঙ্গসমাজ হইতে বিলুপ্ত করিতে পারে না।

রামমোহন রায়ের আত্মধারণাশক্তি কিরূপ অসাধারণ ছিল, তাহা কল্পনা করিয়া দেখুন। অতি বাল্যকালে যখন তিনি হৃদয়ের পিপাসায় ভারতবর্ষের চতুর্দ্দিকে আকুল হইয়া ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন তাঁহার অন্তরে-বাহিরে কী সুগভীর অন্ধকার বিরাজ করিতেছিল ! যখন এই মহানিশীথিনীকে মুহূর্ত্তে দগ্ধ করিয়া ফেলিয়া তাঁহার হৃদয়ে প্রখর আলোক দীপ্ত হইয়া উঠিল, তখন তাহাতে তাঁহাকে বিপর্য্যস্ত করিতে পারে নাই। সে তেজ, সে আলোক তিনি হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিলেন। যুগযুগান্তরের সঞ্চিত অন্ধকারময় অঙ্গারের খনিতে যদি বিদ্যুৎশিখা প্রবেশ করে, তবে সে কী কাণ্ডই উপস্থিত হয়, ভূগর্ভ শতধা বিদীর্ণ হইয়া যায়। তেম্‌নি সহসা জ্ঞানের নূতন উচ্ছ্বাস কয়জন সহজে ধারণ করিতে পারেন ? কিন্তু রামমোহন রায় অত্যন্ত মহৎ ছিলেন, এইজন্য এই জ্ঞানের বন্যায় তাঁহার হৃদয় অটল ছিল ; এই জ্ঞানের বিপ্লবের মধ্যে মাথা তুলিয়া, যাহা আমাদের দেশে ধ্রুব মঙ্গলের কারণ হইবে, তাহা নির্ব্বাচন করিতে পারিয়াছিলেন। এ সময়ে ধৈর্য্যরক্ষা করা যায় কি ? আজিকার কালে আমরা তো ধৈর্য্য কাহাকে বলে, জানিই না। কিন্তু রামমোহন রায়ের কি অসামান্য ধৈর্য্যই ছিল। তিনি আর সমস্ত ফেলিয়া পর্ব্বতপ্রমাণ স্তূপাকার ভস্মের মধ্যে আচ্ছন্ন যে অগ্নি, ফুৎকার দিয়া

তাহাকেই প্রজ্বলিত করিতে চাহিয়াছিলেন। তাড়াতাড়ি চমক লাগাইবার জন্য বিদেশী দেশালাই কাঠি জ্বালাইয়া যাদুগিরি করিতে চাহেন নাই। তিনি জানিতেন, ভস্মের মধ্যে যে অগ্নিকণিকা অবশিষ্ট আছে, তাহা ভারতবাসীর হৃদয়ের গূঢ় অভ্যন্তরে নিহিত, সে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলে আর নিভিবে না।

রামমোহন রায় যখন ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেন, তখন এখানে চতুর্দ্দিকে কালরাত্রির অন্ধকার বিরাজ করিতেছিল। মিথ্যা ও মৃত্যুর বিরুদ্ধে তাঁহাকে সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। মিথ্যা ও মৃত্যু নামক মায়াবী রাজাদের প্রকৃত বল নাই, অমোঘ অস্ত্র নাই, কোথাও তাহাদের দাঁড়াইবার স্থল নাই, কেবল নিশীথের অন্ধকার ও একপ্রকার অনির্দ্দেশ্য বিভীষিকার উপরে তাহাদের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত। আমাদের অজ্ঞান, আমাদের হৃদয়ের দুর্ব্বলতাই তাহাদের বল। অতি-বড়ো ভীরুও প্রভাতের আলোকে প্রেতের নাম শুনিলে হাসিতে পারে, কিন্তু অন্ধকার নিশীথিনীতে একটি শুষ্কপত্রের শব্দ, একটি তৃণের ছায়াও অবসর পাইয়া আমাদের হৃদয়ে নিষ্ঠুর আধিপত্য করিতে থাকে। যথার্থ দস্যুভয় অপেক্ষা সেই মিথ্যা অনির্দ্দেশ্য ভয়ের শাসন প্রবলতর। অজ্ঞানের মধ্যে মানুষ যেমন নিরুপায়, যেমন অসহায়, এমন আর কোথায়! রামমোহন রায় যখন জাগ্রত হইয়া বঙ্গসমাজের চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, তখন বঙ্গসমাজ সেই প্রেতভূমি ছিল। তখন শ্মশানস্থলে প্রাচীনকালের হিন্দু-ধর্ম্মের প্রেতমাত্র রাজত্ব করিতেছিল। তাহার জীবন নাই, অস্তিত্ব নাই, কেবল অনুশাসন ও ভয় আছে মাত্র। সেই নিশীথে শ্মশানে সেই ভয়ের বিপক্ষে 'মা ভৈঃ' শব্দ উচ্চারণ করিয়া যিনি একাকী অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাঁহার মাহাত্ম্য আমরা আজিকার এই দিনের আলোকে হয় তো ঠিক অনুভব করিতে পারিব না। যে ব্যক্তি সর্পবধ করিতে অগ্রসর হয়, তাহার কেবলমাত্র জীবনের আশঙ্কা থাকে, কিন্তু যে ব্যক্তি বাস্তুসর্প

মারিতে যায়, তাহার জীবনের আশঙ্কার অপেক্ষা অনির্দ্দেশ্য অমঙ্গলের আশঙ্কা বলবত্তর হইয়া উঠে। তেম্‌নি রামমোহন রায়ের সময়ে হিন্দু-সমাজের ভগ্নভিত্তির সহস্র ছিদ্রে সহস্র বাস্তু-অমঙ্গল উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধমান বংশপরম্পরা লইয়া প্রাচীনতা ও জড়তার প্রভাবে অতিশয় স্থূলকায় হইয়া উঠিতেছিল। রামমোহন রায় সমাজকে এই সহস্র নাগ-পাশবন্ধন হইতে মুক্ত করিতে নির্ভয়ে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু এই নিদারুণ বন্ধন অনুরাগবন্ধনের ন্যায় সমাজকে জড়াইয়াছিল, এইজন্য সমস্ত বঙ্গসমাজ আর্ত্তনাদ করিয়া রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধে উত্থান করিল। আজি আমাদের বালকেরাও সেইসকল মৃতসর্পের উপরে হাস্যমুখে পদাঘাত করে, আমরা তাহাদিগকে নির্ব্বিষ ঢোঁড়াসাপ বলিয়া উপহাস করি—ইহাদের প্রবলপ্রতাপ, ইহাদের চক্ষের মোহ-আকর্ষণ, ইহাদের সুদীর্ঘ লাঙ্গুলের ভীষণ আলিঙ্গনের আশঙ্কা আমরা বিস্মৃত হইয়াছি।

একবার ভাঙ্‌চুর করিতে আরম্ভ করিলে একটা নেশা চড়িয়া যায়। সৃজনের যেমন আনন্দ আছে, প্রলয়ের তেম্‌নি একপ্রকার ভীষণ আনন্দ আছে। যাঁহারা রাজনারায়ণবাবুর "একাল ও সেকাল" পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, নূতন ইংরাজিশিক্ষা লাভ করিয়া বাঙালী-ছাত্রেরা যখন হিন্দুকালেজ হইতে বাহির হইলেন, তখন তাঁহাদের কিরূপ মত্ততা জন্মিয়াছিল। তাঁহারা দলবদ্ধ হইয়া গুরুতর আঘাতে হিন্দুসমাজের হৃদয় হইতে রক্তপাত করিয়া তাহাই লইয়া প্রকাশ্যপথে আবীর খেলাইতেন। কঠোর অট্টহাস্য ও নিষ্ঠুর উৎসবের কোলাহল তুলিয়া তখনকার শ্মশানদৃশ্য তাঁহারা আরো ভীষণতর করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহাদের নিকট হিন্দুসমাজের কিছুই ভালো, কিছুই পবিত্র ছিল না। হিন্দুসমাজের যে সকল কঙ্কাল ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ছিল, তাহাদের ভালরূপ সৎকার করিয়া শেষ ভস্মমুষ্টি গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করিয়া বিষণ্নমনে যে গৃহে ফিরিয়া আসিবেন,প্রাচীন হিন্দুসমাজের স্মৃতির প্রতি তাঁহাদের তত-

টুকুও শ্রদ্ধা ছিল না। তাঁহারা কালভৈরবের অনুচর ভূতপ্রেতের ন্যায় শ্মশানের নরকপালে মদিরাপান করিয়া বিকট উল্লাসে উন্মত্ত হইতেন। সে-সময়কার অবস্থা বিবেচনা করিলে তাঁহাদের ততটা দোষ দেওয়া যায় না। প্রথম বিপ্লবের সময় এইরূপই ঘটিয়া থাকে। একবার ভাঙিবার দিকে মন দিলে প্রলয়ের আনন্দ উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠে। সে সময়ে খানিকটা খারাপ লাগিলেই সমস্তটা খারাপ লাগে, বাহিরটা খারাপ লাগিলেই ভিতরটা খারাপ লাগে। কিন্তু বর্ত্তমান বঙ্গসমাজে বিপ্লবের আগ্নেয়-উচ্ছ্বাস সর্ব্বপ্রথমে যিনি উৎসারিত করিয়া দিলেন—সেই রাম-মোহন রায়—তাঁহার তো এরূপ মত্ততা জন্মে নাই। তিনি তো স্থির-চিত্তে ভালমন্দ সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। তিনি আলোক জ্বালাইয়া দিলেন, কিন্তু চিতালোক তো জ্বালান নাই। ইহাই রাম-মোহন রায়ের প্রধান মহত্ত্ব। কেবলমাত্র বাহ্য অনুষ্ঠান ও জীবন-হীন তন্ত্রমন্ত্রের মধ্যে জীবন্তে সমাহিত হিন্দুধর্ম্মের পুনরুদ্ধার করিলেন। যে মৃতভারে আচ্ছন্ন হইয়া হিন্দুধর্ম্ম দিনদিন অবসন্ন মুমূর্ষু হইয়া পড়িতে-ছিল, যে জড় পাষাণস্তূপে পিষ্ট হইয়া হিন্দুধর্ম্মের হৃদয় হতচেতন হইয়া পড়িতেছিল, সেই মৃতভার, সেই জড়স্তূপে রামমোহন রায় প্রচণ্ড-বলে আঘাত করিলেন, তাহার ভিত্তি কম্পিত হইয়া উঠিল, তাহার আপাদ-মস্তক বিদীর্ণ হইয়া গেল। হিন্দুধর্ম্মের বিপুলায়তন প্রাচীনমন্দির জীর্ণ হইয়া প্রতিদিন ভাঙিয়া পড়িতেছিল, অবশেষে হিন্দুধর্ম্মের দেবপ্রতিমা আর দেখা যাইতেছিল না, কেবল মন্দিরেরই কাষ্ঠ-লোষ্ট্র-ধূলিস্তূপ অত্যন্ত উচ্চ হইয়া উঠিয়াছিল; তাহার গর্ভের মধ্যে অন্ধকার ঘনীভূত হইতে-ছিল, ছোটবড় নানাবিধ সরীসৃপগণ গুহানির্ম্মাণ করিতেছিল, তাহার ইতস্তত প্রতিদিন কণ্টকাকীর্ণ গুল্মসকল উদ্ভিন্ন হইয়া সহস্র শিকড়ের দ্বারা নূতন নূতন বন্ধনে সেই পুরাতন ভগ্নাবশেষকে একত্রে বাঁধিয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেছিল। হিন্দুসমাজ দেবপ্রতিমাকে ভুলিয়া এই জড়-

স্তূপকে পূজা করিতেছিল ও পর্ব্বতপ্রমাণ জড়ত্বের তলে পড়িয়া প্রতিদিন চেতনা হারাইতেছিল। রামমোহন রায় সেই ভগ্নমন্দির ভাঙিলেন, সকলে বলিল, তিনি হিন্দুধর্ম্মের উপরে আঘাত করিলেন। কিন্তু তিনিই হিন্দু-ধর্ম্মের জীবনরক্ষা করিলেন। সমস্ত ভারতবর্ষ এইজন্য তাঁহার নিকটে কৃতজ্ঞ। কী সঙ্কটের সময়েই তিনি জন্মিয়াছিলেন। তাঁহার একদিকে হিন্দুসমাজের তটভূমি জীর্ণ হইয়া পড়িতেছিল, আর একদিকে বিদেশীয় সভ্যতাসাগরের প্রচণ্ডবন্যা বিদ্যুদ্‌বেগে অগ্রসর হইতেছিল, রামমোহন রায় তাঁহার অটল মহত্বে মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি যে বাঁধ নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন, খৃষ্টীয়বিপ্লব সেখানে আসিয়া প্রতিহত হইয়া গেল। সে সময়ে তাঁহার মতো মহৎ-লোক না জন্মাইলে এতদিন বঙ্গদেশে হিন্দু-সমাজে এক অতি শোচনীয় মহাপ্লাবন উপস্থিত হইত।

এইখানে রামমোহন রায়ের উদারতা সম্বন্ধে হয় তো দু'একটা কথা উঠিতে পারে। ভস্মস্তূপের মধ্যে ঋষিদের হৃদয়জাত যে অমর-অগ্নি প্রচ্ছন্ন ছিল, ভস্ম উড়াইয়া দিয়া তিনি তাহাই বাহির করিয়াছেন। কিন্তু এত করিবার কি প্রয়োজন ছিল? তাহার উত্তর এই—বিজ্ঞানদর্শনের ন্যায় ধর্ম্ম যদি কেবলমাত্র জ্ঞানের বিষয় হইত, হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিবার, লাভ করিবার, সঞ্চয় করিবার বিষয় না হইত, ধর্ম্ম যদি গৃহের অলঙ্কারের ন্যায় কেবল গৃহভিত্তিতে ঢুলাইয়া রাখিবার সামগ্রী হইত, আমাদের সংসারের প্রত্যেক ক্ষুদ্রকাজের প্রবর্ত্তক-নিবর্ত্তক না হইত, তাহা হইলে এরূপ না করিলেও চলিত; তাহা হইলে নানাবিধ বিদেশী অলঙ্কারে গৃহ সাজাইয়া রাখা যাইত। কিন্তু ধর্ম্ম নাকি হৃদয়ে পাইবার ও সংসারের কাজে ব্যবহার করিবার দ্রব্য, দূরে রাখিবার নহে, এই-জন্যই স্বদেশের ধর্ম্ম স্বদেশের জন্য বিশেষ উপযোগী। ব্রহ্ম সমস্ত জগতের ঈশ্বর, কিন্তু তিনি বিশেষরূপে ভারতবর্ষেরই ব্রহ্ম। অন্য কোনো দেশের লোকে তাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানে না, ব্রহ্ম বলিতে আমরা ঈশ্বরকে

যেরূপভাবে বুঝি, ঈশ্বরের অন্য কোনো বিদেশীয় নামে বিদেশীয়েরা কখনই তাঁহাকে ঠিক সেরূপভাবে বুঝে না। বুঝে বা না বুঝে, জানি না, কিন্তু ব্রহ্ম বলিতে আমাদের মনে যে ভাবের উদয় হইবে, ঈশ্বরের অন্য কোনো বিদেশীয় নামে আমাদের মনে সে ভাব কখনই উদয় হইবে না। ব্রহ্ম একটি কথার কথা নহে, যে ইচ্ছা পাইতে পারে না, যাহাকে ইচ্ছা দেওয়া যায় না। ব্রহ্ম আমাদের পিতামহদের অনেক সাধনার ধন ;—সমস্ত সংসার বিসর্জ্জন দিয়া, সমস্ত জীবন ক্ষেপণ করিয়া, নিভৃত অরণ্যে ধ্যান-ধারণা করিয়া আমাদের ঋষিরা আমাদের ব্রহ্মকে পাইয়াছিলেন। আমরা তাঁহাদের সেই আধ্যাত্মিক সম্পদের উত্তরাধিকারী। আর কোনো জাতি ঠিক এমন সাধনা করে নাই, ঠিক এমন অবস্থায় পড়ে নাই, এইজন্য ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয় নাই। প্রত্যেক জাতি বিশেষ সাধনা অনুসারে বিশেষ ফল প্রাপ্ত হয়, সেই ফল তাহারা অন্য জাতিকে দান করে। এইরূপে সমস্ত পৃথিবীর উপকার হয়। আমাদের এত সাধনার ফল কি আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক অবহেলা করিয়া ফেলিয়া দিব ?

উদ্ভিজ্জ ও পশুমাংসের মধ্যে যে জীবনী-শক্তি আছে, তাহা যে আমরা স্বায়ত্ত করিতে পারি, তাহার কারণ, আমাদের নিজের জীবন আছে। আমাদের নিজের প্রাণ না থাকিলে আমরা নূতন প্রাণ উপার্জ্জন করিতে পারি না। আমাদের প্রাণ না থাকিলে উদ্ভিজ্জ, পশু, পক্ষী, কীট প্রভৃতি অন্য প্রাণীরা আমাদিগকে গ্রহণ করিত। এ জগতে মৃত টিকিতে পারে না, জীবিতের মধ্যে বিলীন হইয়া যায়। রামমোহন রায় যদি দেখিতেন, আমাদের জীবন নাই, তবে পারসীক মৃতদেহের ন্যায় আমাদিগকে মৃতভবনে ফেলিয়া রাখিতে দিতেন, খৃষ্টধর্ম্ম প্রভৃতি অন্যান্য জীবিত প্রাণীর উদরস্থ হইতে দিতেন। কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি চিকিৎসা সুরু করিয়া দিলেন। তিনি দেখিলেন, জীবন আমাদের মধ্যে আচ্ছন্ন হইয়া আছে, তাহাকেই তিনি জাগ্রত করিয়া তুলিলেন।

আমাদের চেষ্টা হউক্ আমাদের এই জীবনকে সতেজ করিয়া তুলি, তবে আমরা ক্রমে বিদেশীয় সত্য আপনার করিতে পারিব। এইজন্যই বলি, প্রাচীন ঋষিদের উপনিষদের ব্রহ্মনাম উচ্চারণ করিয়া আমাদের দেশে ঈশ্বরের সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিয়া লই, সার্ব্বভৌমিকতা আপনিই তাহার মধ্যে বিরাজ করিবে। ঈশ্বর যেমন সকলের ঈশ্বর, তেম্‌নি তিনি প্রত্যেকের ঈশ্বর; যেমন তিনি জ্ঞানের ঈশ্বর, তেম্‌নি তিনি হৃদয়ের ঈশ্বর; তিনি যেমন সমস্ত জগতের দেবতা, তেম্‌নি আমাদের গৃহদেবতা। তাঁহাকে রাজা বলিয়াও দেখিতে পারি, তাঁহাকে পিতা বলিয়াও দেখিতে পারি। কিন্তু পিতা ঈশ্বর আমাদের যত নিকটের, তিনি আমাদের হৃদয়ের যত অভাব মোচন করেন, এমন রাজা ঈশ্বর নহেন। তেম্‌নি ব্রহ্মই ভারতবর্ষের সাধনালব্ধ চিরন্তন আশ্রয়, জিহোবা, গড্ অথবা আল্লা সেরূপ নহেন। রামমোহন রায় হৃদয়ের উদারতাবশতই ইহা বুঝিয়াছিলেন।

১২৯১।

মহর্ষির জন্মোৎসব *

পূজনীয় পিতৃদেবের আজ অষ্টাশীতিতম সাংবৎসরিক জন্মোৎব। এই উৎসবদিনের পবিত্রতা আমরা বিশেষভাবে হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করিব।

বহুতর দেশকে সঞ্জীবনস্পর্শে উর্ব্বর করিয়া, পুণ্যধারায় বহুতর গ্রামনগরীর পিপাসা মিটাইয়া, অবশেষে জাহ্নবী যেখানে মহাসমুদ্রের প্রত্যক্ষসম্মুখে আপন সুদীর্ঘ পর্য্যটন অতলস্পর্শ-শান্তির মধ্যে সমাপ্ত করিতে উদ্যত হন, সেই সাগরসঙ্গমস্থল তীর্থস্থান। পিতৃদেবের পূত-জীবন অদ্য আমাদের সম্মুখে সেই তীর্থস্থান অবারিত করিয়াছে। তাঁহার

* ৬ই বৈশাখ? জ্যৈষ্ঠ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জন্মোৎসবে পঠিত।

পুণ্যকর্ম্মরত দীর্ঘজীবনের একাগ্রধারা অদ্য যেখানে তটহীন, সীমাশূন্য, বিপুল বিরামসমুদ্রের সম্মুখীন হইয়াছে, সেইখানে আমরা ক্ষণকালের জন্য নতশিরে স্তব্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হইব। আমরা চিন্তা করিয়া দেখিব, বহুকাল পূর্ব্বে একদিন স্বর্গ হইতে কোন্ শুভ সূর্য্যকিরণের আঘাতে অকস্মাৎ সুপ্তি হইতে জাগ্রত হইয়া কঠিন তুষারবেষ্টনকে অশ্রুধারায় বিগলিত করিয়া এই জীবন আপন কল্যাণযাত্রা আরম্ভ করিয়াছিল— তখন ইহার ক্ষীণ স্বচ্ছধারা কখনো আলোক, কখনো অন্ধকার, কখনো আশা, কখনো নৈরাশ্যের মধ্য দিয়া দুর্গম পথ কাটিয়া কাটিয়া চলিতেছিল। বাধা প্রতিদিন বৃহদাকার হইয়া দেখা দিতে লাগিল—কঠিন প্রস্তরপিণ্ড-সকল পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল—কিন্তু সে সকল বাধায় স্রোতকে রুদ্ধ না করিতে পারিয়া দ্বিগুণবেগে উদ্বেল করিয়া তুলিল—দুঃসাধ্য দুর্গমতা সেই দুর্ব্বার বলের নিকট মস্তক নত করিয়া দিল। এই জীবনধারা ক্রমশ বৃহৎ হইয়া, বিস্তৃত হইয়া লোকালয়ের মধ্যে অবতরণ করিল, দুই কূলকে নবজীবনে অভিষিক্ত করিয়া চলিল, বাধা মানিল না, বিশ্রাম করিল না, কিছুতেই তাহাকে লক্ষ্য হইতে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিল না— অবশেষে আজ সেই একনিষ্ঠ অনন্যপরায়ণ জীবনস্রোত সংসারের দুই কূলকে আচ্ছন্ন করিয়া অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছে—আজ সে তাহার সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত চাঞ্চল্যকে পরমপরিণামের সম্মুখে প্রশান্ত করিয়া পরিপূর্ণ আত্মবিসর্জ্জনের দিকে আপনাকে প্রসারিত করিয়াছে—অনন্ত জীবনসমুদ্রের সহিত সার্থক জীবনধারার এই সুগম্ভীর সম্মিলনদৃশ্য অদ্য আমাদের ধ্যাননেত্রের সম্মুখে উদ্ঘাটিত হইয়া আমাদিগকে ধন্য করুক্।

অমৃতপিপাসা ও অমৃতসন্ধানের পথে ঐশ্বর্য্য একটি প্রধান অন্তরায়। সামান্য সোনার প্রাচীর উচ্চ হইয়া উঠিয়া আমাদের দৃষ্টি হইতে অনন্ত আকাশের অমৃত-আলোককে রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইতে পারে। ধনসম্পদের মধ্যেই দীনহৃদয় আপনার সার্থকতা উপলব্ধি করিতে থাকে—সে বলে,

এই তো আমি কৃতার্থ হইয়াছি, দশে আমার স্তব করিতেছে, দেশে আমার প্রতাপ বিকীর্ণ হইতেছে, বাহিরে আমার আড়ম্বর অভ্রভেদ করিতেছে, ঘরে আমার আরামশয়ন প্রতিদিন স্তরে স্তরে রাশীকৃত হইয়া উঠিতেছে, আমার আর কী চাই! হায় রে দরিদ্র, নিখিল মানবের অন্তরাত্মা যখন ক্রন্দন করিয়া উঠিয়াছে—যাহাতে আমি অমর না হইব, তাহা লইয়া আমি কী করিব—

"যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্"—

সপ্তলোক যখন অন্তরীক্ষে উর্দ্ধকররাজি প্রসারিত করিয়া প্রার্থনা করিতেছে, আমাকে সত্য দাও, আলোক দাও, অমৃত দাও, "অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়"—তখন তুমি বলিতেছ: আমার ধন আছে, আমার মান আছে, আমার আরাম আছে, আমি প্রভু, আমি অধিপতি, আমার আর কী চাই! ঐশ্বর্য্যের ইহাই বিড়ম্বনা —দীনাত্মার কাছে ঐশ্বর্য্যই চরমসার্থকতার রূপ ধারণ করে। অদ্যকার উৎসবে আমরা যাঁহার মাহাত্ম্য স্মরণ করিবার জন্য সমবেত হইয়াছি—একদা প্রথমযৌবনেই তাঁহার অধ্যাত্মদৃষ্টি এই কঠিন ঐশ্বর্য্যের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর অতিক্রম করিয়া অনন্তের দিকে উন্মীলিত হইয়াছিল—যখন তিনি ধনমানের দ্বারা নীরন্ধ্রভাবে আবৃত-আচ্ছন্ন ছিলেন, তখনি ধনসম্পদের স্থূলতম আবরণ ভেদ করিয়া, স্তাবকগণের বন্দনাগানকে অধঃকৃত করিয়া, আরাম-আমোদ-আড়ম্বরের ঘন যবনিকা বিচ্ছিন্ন করিয়া, এই অমৃতবাণী তাঁহার কর্ণে কেমন করিয়া প্রবেশলাভ করিল যে, "ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং"—যাহা-কিছু সমস্তকেই ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছন্ন দেখিবে, ধনের দ্বারা নহে, স্বার্থের দ্বারা নহে, আত্মাভিমানের দ্বারা নহে—যিনি "ঈশানং ভূতভব্যস্য" —যিনি আমাদের অনন্তকালের ঈশ্বর, আমাদের ভূতভবিষ্যতের প্রভু—তাঁহাকে এই ধনিসন্তান কেমন করিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে ঐশ্বর্য্যপ্রভাবের উর্দ্ধে, সমস্ত প্রভুত্বের উচ্চে আপনার একমাত্র প্রভু বলিয়া প্রত্যক্ষ করিতে

পারিলেন—সংসারের মধ্যে তাঁহার নিজের প্রভুত্ব, সমাজের মধ্যে তাঁহার ধনমর্য্যাদার সম্মান—তাঁহাকে অন্ধ করিয়া রাখিতে পারিল না!

আবার যে দিন এই প্রভূত ঐশ্বর্য্য অকস্মাৎ এক দুর্দ্দিনের বজ্রাঘাতে বিপুল আয়োজন-আড়ম্বর লইয়া তাঁহার চতুর্দ্দিকে সশব্দে ভাঙিয়া পড়িতে লাগিল—ঋণ যখন মুহূর্ত্তের মধ্যেই বৃহদাকার ধারণ করিয়া তাঁহার গৃহদ্বার, তাঁহার সুখসমৃদ্ধি, তাঁহার অশনবসন, সমস্তই গ্রাস করিবার উপক্রম করিল—তখনো পদ্ম যেমন আপন মৃণালবৃন্ত দীর্ঘতর করিয়া জলপ্লাবনের ঊর্দ্ধে আপনাকে সূর্য্যকিরণের দিকে নির্ম্মল সৌন্দর্য্যে উন্মেষিত করিয়া রাখে, তেম্‌নি করিয়া তিনি সমস্ত বিপদ্‌বন্যার ঊর্দ্ধে আপনার অম্লানহৃদয়কে ধ্রুবজ্যোতির দিকে উদ্‌ঘাটিত করিয়া রাখিলেন। সম্পদ্‌ যাঁহাকে অমৃতলাভ হইতে তিরস্কৃত করিতে পারে নাই, বিপদ্‌ও তাঁহাকে অমৃতসঞ্চয় হইতে বঞ্চিত করিতে পারিল না। সেই দুঃসময়কেই তিনি আত্মজ্যোতির দ্বারা সুসময় করিয়া তুলিয়াছিলেন—যখন তাঁহার ধনসম্পদ্‌ ধূলিশায়ী, তখনই তিনি তাঁহার দৈন্যের ঊর্দ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া পরমাত্মসম্পদ্‌বিতরণের উপলক্ষ্যে সমস্ত ভারতবর্ষকে মুহুর্মুহু আহ্বান করিতেছিলেন। সম্পদের দিনে তিনি ভুবনেশ্বরের দ্বারে রিক্তহস্তে ভিক্ষু হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, বিপদের দিনে তিনি আত্মৈশ্বর্য্যের গৌরবে ব্রহ্মসত্র খুলিয়া বিশ্বপতির প্রসাদসুধাবণ্টনের ভারগ্রহণ করিয়াছিলেন।

ঐশ্বর্য্যের সুখশয্যা হইতে তুলিয়া লইয়া ধর্ম্ম ইঁহাকে তাহার পথের মধ্যে দাঁড় করাইয়া দিল—"ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি"—কবিরা বলেন, সেই পথ ক্ষুরধারনিশিত অতি দুর্গম পথ। লোকাচারপ্রচলিত চিরাভ্যস্ত ধর্ম্ম, আরামের ধর্ম্ম, তাহা অন্ধভাবে, জড়ভাবেও পালন করিয়া যাওয়া চলে এবং তাহা পালন করিয়া লোকের নিকট সহজেই যশোলাভ করিতে পারা যায়। ধর্ম্মের সেই আরাম, সেই

সম্মানকেও পিতৃদেব পরিহার করিয়াছিলেন। ক্ষুরধারনিশিত দুরতিক্রম্য পথেই তিনি নির্ভয়ে পদনিক্ষেপ করিলেন। লোকসমাজের আনুগত্য করিতে গিয়া তিনি আত্মবিদ্রোহী, আত্মঘাতী হইলেন না।

ধনিগৃহে যাঁহাদের জন্ম, পৈতৃককাল হইতেই সমাজের নিকট সম্মান-লাভে যাঁহারা অভ্যস্ত, সমাজপ্রচলিত সংস্কারের নিবিড়ব্যূহ ভেদ করিয়া নিজের অন্তর্লব্ধ সত্যের পতাকাকে শত্রুমিত্রের ধিক্কার, লাঞ্ছনা ও প্রতি-কূলতার বিরুদ্ধে অবিচলিত দৃঢ়মুষ্টিতে ধারণ করিয়া রাখা তাঁহাদের পক্ষে কোনোমতেই সহজ নহে—বিশেষত বৈষয়িক সঙ্কটের সময় সকলের আনুকূল্য যখন অত্যাবশ্যক হইয়া উঠে, তখন তাহা যে কিরূপ কঠিন, সে কথা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। সেই তরুণবয়সে, বৈষয়িক দুর্যোগের দিনে, সম্ভ্রান্তসমাজে তাঁহার যে বংশগত প্রভূত প্রতিপত্তি ছিল, তাহার প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া, পিতৃদেব ভারতবর্ষের ঋষিবন্দিত চিরন্তন ব্রহ্মের, সেই অপ্রতিম দেবাদিদেবের আধ্যাত্মিক পূজা প্রতিকূল সমাজের নিকট মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন।

তাহার পরে তাঁহার জীবনে আর এক গুরুতর সংগ্রামের দিন উপ-স্থিত হইল। সকলেই জানেন, বৈচিত্র্যই জগতে ঐক্যকে প্রমাণ করে—বৈচিত্র্য যতই সুনির্দ্দিষ্ট হয়, ঐক্য ততই সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। ধর্ম্মও সেইরূপ নানাসমাজের ইতিহাসকে আশ্রয় করিয়া নানা বিভিন্নকণ্ঠে নানা বিচিত্র আকারে এক নিত্যসত্যকে চারিদিক্ হইতে সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেছে। ভারতবর্ষ বিশেষসাধনায় বিশেষভাবে যাহা লাভ করিয়াছে, তাহার ভারতবর্ষীয় আকার বিলুপ্ত করিয়া, তাহাকে ভারত-বর্ষের ইতিহাস হইতে উৎপাটিত করিয়া, তাহাকে অন্যদেশীয় আকৃতি-প্রকৃতির সহিত মিশ্রিত করিয়া দিবার চেষ্টা করিলে জগতের ঐক্যমূলক বৈচিত্র্যের ধর্ম্মকে লঙ্ঘন করা হয়। প্রত্যেক লোক যখন আপনার প্রকৃতি অনুসারে পরিপূর্ণ উৎকর্ষ লাভ করে, তখনই সে মনুষ্যত্বলাভ

করে—সাধারণ মনুষ্যত্ব ব্যক্তিগত বিশেষত্বের ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত। মনুষ্যত্ব হিন্দুর মধ্যে এবং খৃষ্টানের মধ্যে বস্তুত একই, তথাপি হিন্দুবিশেষত্ব মনুষ্যত্বের একটি বিশেষ সম্পদ্, এবং খৃষ্টানবিশেষত্বও মনুষ্যত্বের একটি বিশেষ লাভ; তাহার কোনোটা সম্পূর্ণ বর্জ্জন করিলে মনুষ্যত্ব দৈন্যপ্রাপ্ত হয়। ভারতবর্ষের যাহা শ্রেষ্ঠধন তাহাও সার্ব্বভৌমিক, য়ুরোপের যাহা শ্রেষ্ঠধন তাহাও সার্ব্বভৌমিক, তথাপি ভারতবর্ষীয়তা এবং য়ুরোপীয়তা উভয়ের স্বতন্ত্র সার্থকতা আছে বলিয়া উভয়কে একাকার করিয়া দেওয়া চলে না। মেঘ আকাশ হইতে জলবর্ষণ করে, এবং সরোবর ভূতলে থাকিয়া জলদান করে—যদিও দানের সামগ্রী একই, তথাপি এই পার্থক্যবশতই মেঘ আপন প্রকৃতি অনুসারে বিশেষভাবে ধন্য এবং সরোবরও আপন প্রকৃতি অনুসারে বিশেষভাবে কৃতার্থ। ইহারা উভয়ে এক হইয়া গেলে জলের পরিমাণ মোটের উপরে কমে না, কিন্তু জগতে ক্ষতির কারণ ঘটে।

তরুণ ব্রাহ্মসমাজ যখন পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রভাবে এই কথা ভুলিয়াছিল, যখন ধর্ম্মের স্বদেশীয়রূপ রক্ষা করাকে সে সঙ্কীর্ণতা বলিয়া জ্ঞান করিত—যখন সে মনে করিয়াছিল, বিদেশীয় ইতিহাসের ফল ভারতবর্ষীয় শাখায় ফলাইয়া তোলা সম্ভবপর এবং সেই চেষ্টাতেই যথার্থভাবে ঔদার্য্য-রক্ষা হয়, তখন পিতৃদেব সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের স্বদেশীয় প্রকৃতিকে একটা বিমিশ্রিত একাকারত্বের মধ্যে বিসর্জ্জন দিতে অস্বীকার করিলেন—ইহাতে তাঁহার-অনুবর্ত্তী অসামান্যপ্রতিভাশালী ধর্ম্মোৎসাহী অনেক তেজস্বী যুবকের সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ ঘটিল। এই বিচ্ছেদ স্বীকার করিতে যে দৃঢ়তা, যে সাহস, যে বলের প্রয়োজন হয়, সমস্ত মতামতের কথা বিস্মৃত হইয়া আজ তাহাই যেন আমরা স্মরণ করি। আধুনিক হিন্দুসমাজের প্রচলিত লোকাচারের প্রবল প্রতিকূলতার মুখে আপন অনুবর্ত্তী সমাজের ক্ষমতাশালী সহায়গণকে পরিত্যাগ করিয়া নিজেকে

সকল দিক্ হইতেই রিক্ত করিতে কে পারে—যাঁহার অন্তঃকরণ জগতের আদিশক্তির অক্ষয় নির্ঝরধারায় অহরহ পূর্ণ হইয়া না উঠিতেছে।

ইঁহাকে যেমন আমরা সম্পদে-বিপদে অভয় আশ্রয়ে অবিচলিত দেখিয়াছি—তেম্‌নি একবার বর্ত্তমান সমাজের প্রতিকূলে, আর একবার হিন্দুসমাজের অনুকূলে তাঁহাকে সত্যে-বিশ্বাসে দৃঢ় থাকিতে দেখিলাম—দেখিলাম, উপস্থিত গুরুতর ক্ষতির আশঙ্কা তাঁহাকে টলাইতে পারিল না—হিন্দুসমাজের মধ্যে তিনি পরম তুর্দ্দিনেও একাকী দাঁড়াইয়াছিলেন, ব্রাহ্মসমাজে তিনি নব আশা, নব উৎসাহের অভ্যুদয়ের মুখে পুনর্ব্বার সমস্ত ত্যাগ করিয়া একাকী দাঁড়াইলেন। তাঁহার কেবল এই প্রার্থনা রহিল, "মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ"—আমি ব্রহ্মকে ত্যাগ করিলাম না, ব্রহ্ম আমাকে ত্যাগ না করুন!

ধনসম্পদের স্বর্ণস্তূপরচিত ঘনান্ধকার ভেদ করিয়া, নবযৌবনের অপরিতৃপ্ত প্রবৃত্তির পরিবেষ্টনের মধ্যে দিব্যজ্যোতি যাঁহার ললাটস্পর্শ করিয়াছিল, ঘনীভূত বিপদের ভ্রূকুটীকুটিল রুদ্রচ্ছায়ায় আসন্ন দারিদ্র্যের উদ্যত বজ্রদণ্ডের সম্মুখেও ঈশ্বরের প্রসন্ন মুখচ্ছবি যাঁহার অনিমেষ অন্তর্দৃষ্টির সম্মুখে অচঞ্চল ছিল, তুর্দ্দিনের সময়েও সমস্ত লোকভয় অতিক্রম করিয়া যাঁহার কর্ণে ধর্ম্মের 'মা ভৈঃ'বাণী সুস্পষ্ট ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল, বলবৃদ্ধি-দর্পপুষ্টির মুখে যিনি বিশ্বাসের বলে সমস্ত সহায় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নিঃসঙ্কোচে পরম সহায়ের আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছিলেন, অদ্য তাঁহার পুণ্যচেষ্টাভূয়িষ্ঠ সুদীর্ঘ জীবনদিনের সায়াহ্নকাল সমাগত হইয়াছে। অদ্য তাঁহার ক্লান্তকণ্ঠের স্বর ক্ষীণ, কিন্তু তাঁহার সম্পূর্ণপ্রায় জীবনের নিঃশব্দ-বাণী সুস্পষ্টতর, অদ্য তাঁহার ইহজীবনের কর্ম্ম সমাপ্ত, কিন্তু তাঁহার জীবনব্যাপী কর্ম্মচেষ্টার মূলদেশ হইতে যে একাগ্রনিষ্ঠা উর্দ্ধলোকে উঠিয়াছে, তাহা আজ নিস্তব্ধভাবে প্রকাশমান। অদ্য তিনি তাঁহার এই বৃহৎ সংসারের বহির্দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, কিন্তু সংসারের সমস্ত

সুখদুঃখ-বিচ্ছেদমিলনের মধ্যে যে অচলা শান্তি জননীর আশীর্ব্বাদের ন্যায় চিরদিন তাঁহার অন্তরে ধ্রুব হইয়া ছিল, তাহা দিনান্তকালের রমণীয় সূর্য্যাস্তচ্ছটার ন্যায় অদ্য তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া উদ্ভাসিত। কর্ম্মশালায় তিনি তাঁহার জীবনেশ্বরের আদেশপালন করিয়া অদ্য বিশ্রামশালায় তিনি তাঁহার হৃদয়েশ্বরের সহিত নির্বাধমিলনের পথে যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। এই পুণ্যক্ষণে আমরা তাঁহাকে প্রণাম করিবার জন্য, তাঁহার সার্থকজীবনের শান্তিসৌন্দর্য্যমণ্ডিত শেষ রশ্মিচ্ছটা মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করিবার জন্য, এখানে সমাগত হইয়াছি।

বন্ধুগণ, যাঁহার জীবন আপনাদের জীবনশিখাকে ক্ষণে ক্ষণে উজ্জ্বল করিয়াছে, যাঁহার বাণী অবসাদের সময় আপনাদিগকে বল ও বিষাদের সময় আপনাদিগকে সান্ত্বনা দিয়াছে, তাঁহার জন্মদিনকে উৎসবের দিন করিয়া আপনারা ভক্তিকে চরিতার্থ করিতে আসিয়াছেন, এইখানে আমি আমার পুত্রসম্বন্ধ লইয়া এই উৎসবদিনে যদি ক্ষণকালের জন্য পিতার নিকট বিশেষভাবে উপস্থিত হই, তবে আমাকে মার্জ্জনা করিবেন। সন্নিকটবর্ত্তী মহাত্মাকে সমগ্রভাবে, সম্পূর্ণভাবে দেখিবার অবসর আত্মীয়দের প্রায় ঘটে না। সংসারের সম্বন্ধ বিচিত্র সম্বন্ধ, বিচিত্র স্বার্থ, বিচিত্র মত, বিচিত্র প্রবৃত্তি—ইহার দ্বারা বিচারশক্তির বিশুদ্ধতা রক্ষা করা কঠিন হয়, ছোটো জিনিষ বড়ো হইয়া উঠে, অনিত্যজিনিষ নিত্য-জিনিষকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, সংসারের নানা ঘাতপ্রতিঘাতে প্রকৃত পরিচয় প্রত্যহ খণ্ডিত হইয়া যায়—এইজন্যই পিতৃদেবের এই জন্মদিনের উৎসব তাঁহার আত্মীয়দের পক্ষে একটি বিশেষ শুভ অবসর—যে-পরিমাণ দূরে দাঁড়াইলে মহত্ত্বকে আদ্যোপান্ত অখণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়, অদ্যকার এই উৎসবের সুযোগে বাহিরের ভক্তমণ্ডলীর সহিত একাসনে বসিয়া আমরা সেইপরিমাণ দূরে আসিব, তাঁহাকে ক্ষুদ্র সংসারের সমস্ত তুচ্ছ সম্বন্ধজাল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিব, আমাদের সঙ্কীর্ণ জীবনের

প্রাত্যহিক ব্যবহারোৎক্ষিপ্ত সমস্ত ধূলিরাশিকে অপসারিত করিয়া তাঁহাকে বৃহৎ আকাশের মধ্যে, নির্ম্মল শান্তির মধ্যে, দেবপ্রসাদের অক্ষুন্ন আনন্দ-রশ্মির মধ্যে, তাঁহার যথার্থ মহিমায় তাঁহাকে তাঁহার জীবনের নিত্য-প্রতিষ্ঠার উপরে সমাসীন দেখিব। সংসারের আবর্ত্তে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া যত বিদ্রোহ, যত চপলতা, যত অন্যায় করিয়াছি, অদ্য তাহার জন্য তাঁহার শ্রীচরণে একান্তচিত্তে ক্ষমাপ্রার্থনা করিব—আজ তাঁহাকে আমাদের সংসারের, আমাদের সর্ব্বপ্রয়োজনের অতীত করিয়া তাঁহাকে বিশ্বভুবনের ও বিশ্বভুবনেশ্বরের সহিত বৃহৎ নিত্যসম্বন্ধে যুক্ত করিয়া দেখিব এবং তাঁহার নিকট এই আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিব যে, যে চির-জীবনের ধনকে তিনি নিজের জীবনের মধ্যে সঞ্চিত করিয়াছেন, সেই সঞ্চয়কেই যেন আমরা সর্ব্বপ্রধান পৈতৃকসম্পত্তি বলিয়া গণ্য করি, তাঁহার জীবনের দৃষ্টান্ত যেন আমাদিগকে ধনসম্পদের অন্ধতা হইতে রক্ষা করে, বিপদের বিভীষিকা হইতে উদ্ধার করে, বিশ্বাসের দৃঢ়তার মধ্যে আমাদিগকে ধারণ করিয়া রাখে এবং তিনি ঋষিদের যে মন্ত্র আমাদের কর্ণে ধ্বনিত করিয়াছেন, তাহা যেন কোনো আরামের জড়ত্বে, কোনো নৈরাশ্যের অবসাদে বিস্মৃত না হই—

'মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ।
অনিরাকরণমস্তু অনিরাকরণং মেঽস্তু।'

বন্ধুগণ, ভ্রাতৃগণ, এই সপ্তাশীতিবর্ষীয় জীবনের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আনন্দিত হও, আশান্বিত হও। ইহা জান যে, 'সত্যমেব জয়তে নানৃতম্' —ইহা জান যে, ধর্ম্মই ধর্ম্মের সার্থকতা। ইহা জান যে, আমরা যাহাকে সম্পদ্ বলিয়া উন্মত্ত হই, তাহা সম্পদ্ নহে ; যাহাকে বিপদ বলিয়া ভীত হই, তাহা বিপদ্ নহে ; আমাদের অন্তরাত্মা সম্পদ্‌বিপদের অতীত যে পরমা শান্তি, তাহাকে আশ্রয় করিবার অধিকারী। 'ভূমা ত্বের বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ'—সমস্ত জীবন দিয়া ভূমাকেই জানিতে ইচ্ছা করো, এবং সমস্ত জীবনের মধ্যে

ভূমাকেই সপ্রমাণ করো। এই প্রার্থনা করো, 'আবিরাবীর্ম্ম এধি'—হে স্বপ্রকাশ আমার নিকটে প্রকাশিত হও—আমার নিকটে প্রকাশিত হইলে সেই প্রকাশ আমাকে অতিক্রম করিয়া সমস্ত মানবের নিকট সহজে দীপ্যমান হইয়া উঠিবে—এইরূপে আমার জীবন সমস্ত মানবের নিত্য-জীবনের মধ্যে উৎসর্গীকৃত হইয়া থাকিবে; আমার এই কয়দিনের মানবজন্ম চিরদিনের জন্য সার্থক হইবে।

১৩১১।

মহর্ষির আদ্যকৃত্য উপলক্ষ্যে প্রার্থনা

"হে পরমপিতঃ, হে পিতৃতমঃ পিতৃণাম্", এ সংসারে যাঁহার পিতৃভাবের মধ্য দিয়া তোমাকে পিতা বলিয়া জানিয়াছি—অদ্য একাদশ দিন হইল, তিনি ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়াছেন। তাঁহার সমস্ত জীবন হোম-হুতাশনের ঊর্দ্ধমুখী পবিত্র শিখার ন্যায় তোমার অভিমুখে নিয়ত উত্থিত হইয়াছে। অদ্য তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনযাত্রার অবসানে তুমি তাঁহাকে কী শান্তিতে, কী অমৃতে অভিষিক্ত করিয়াছ—যিনি স্বর্গকামনা করেন নাই, কেবল "ছায়াতপয়োরিব" ব্রহ্মলোকে তোমার সহিত যুক্ত হইবার জন্য যাঁহার চরমাকাঙ্ক্ষা ছিল, অদ্য তাঁহাকে তুমি কিরূপ সুধাময় চরিতার্থতার মধ্যে বেষ্টন করিয়াছ, তাহা আমাদের মননের অগোচর, তথাপি হে মঙ্গলময়, তোমার পরিপূর্ণ মঙ্গল-ইচ্ছার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাসস্থাপন করিয়া তোমাকে বারবার নমস্কার করি। তুমি অনন্তসত্য, তোমার মধ্যে আমাদের সমস্ত সত্যচিন্তা নিঃশেষে সার্থক হয়,—তুমি অনন্তকল্যাণ, তোমার মধ্যে আমাদের সমস্ত শুভকর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে সফল হয়,—আমাদের সমস্ত অকৃত্রিম প্রেম, হে আনন্দস্বরূপ, তোমারই মধ্যে সুন্দরভাবে ধন্য

হয়,—আমাদের পিতৃদেবের জীবনের সমস্ত সত্য, সমস্ত মঙ্গল, সমস্ত প্রেম তোমার মধ্যে অনির্ব্বচনীয়রূপে পরিপূর্ণ হইয়াছে, ইহা জানিয়া আমরা ভ্রাতাভগিনীগণ করজোড়ে তোমার জয়োচ্চারণ করিতেছি।

পৃথিবীতে অধিকাংশ সম্বন্ধই দানপ্রতিদানের অপেক্ষা রাখে—কিন্তু পিতামাতার স্নেহ প্রতিদানপ্রত্যাশার অতীত। তাহা পাপ, অপরাধ, কদর্য্যতা, কৃতঘ্নতা, সমস্তকেই অতিক্রম করিয়া আপনাকে প্রকাশ করে। তাহা ঋণ নহে, তাহা দান। তাহা আলোকের ন্যায়, সমীরণের ন্যায়—তাহা শিশুকাল হইতে আমাদিগকে নিয়ত রক্ষা করিয়াছে, কিন্তু তাহার মূল্য কেহ কখনো চাহে নাই। পিতৃস্নেহের সেই অযাচিত, সেই অপর্য্যাপ্ত মঙ্গলের জন্য, হে বিশ্বপিতঃ, আজ তোমাকে প্রণাম করি।

আজ প্রায় পঞ্চাশবৎসর অতীত হইল, আমাদের পিতামহের মৃত্যুর পরে এই গৃহের উপরে সহসা ঋণরাশিভারাক্রান্ত কী দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা সকলেই জানেন। পিতৃদেব একাকী বহুবিধ প্রতিকূলতার মধ্যে দুস্তর ঋণসমুদ্র সন্তরণপূর্ব্বক কেমন করিয়া যে কূলে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন—আমাদের অদ্যকার অন্নবস্ত্রের সংস্থান কেমন করিয়া যে তিনি ধ্বংসের মুখ হইতে বাঁচাইয়া আমাদের জন্য রক্ষা করিয়াছেন, আজ তাহা আমাদের পক্ষে কল্পনা করাও কঠিন। সেই ঝঞ্ঝার ইতিহাস আমরা কি জানি! কতকাল ধরিয়া তাঁহাকে কী দুঃখ, কী চিন্তা, কী চেষ্টা, কী দশাবিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়া প্রতিদিন, প্রতিরাত্রি যাপন করিতে হইয়াছে, তাহা মনে করিতে গেলে শরীর কণ্টকিত হয়। তিনি অতুল বৈভবের মধ্যে লালিতপালিত হইয়াছিলেন—অকস্মাৎ ভাগ্যপরিবর্ত্তনের সম্মুখে কেমন করিয়া তিনি অবিচলিত বীর্য্যের সহিত দণ্ডায়মান হইলেন! যাহারা অপর্য্যাপ্ত ধনসম্পদ্ ও বাধাহীন ভোগসুখের মধ্যে মানুষ হইয়া উঠে, দুঃখসংঘাতের অভাবে, বিলাসলালিত্যের সংবেষ্টনে বাল্যকাল হইতে যাহাদের শক্তির চর্চ্চা অসম্পূর্ণ, সঙ্কটের সময় তাহাদের মতো অসহায় কে

আছে! বাহিরের বিপদের অপেক্ষা নিজের অপরিণত চারিত্রবল ও অসংযত প্রবৃত্তি তাহাদের পক্ষে গুরুতর শত্রু। এই সময়ে এই অবস্থায় যে ধনপতির পুত্র নিজের চিরাভ্যাসকে খর্ব্ব করিয়া, ধনিসমাজের প্রভূত প্রতিপত্তিকে তুচ্ছ করিয়া শান্তসংযত শৌর্য্যের সহিত এই সুবৃহৎ পরিবারকে স্কন্ধে লইয়া দুঃসহ দুঃসময়ের বিরুদ্ধে যাত্রা করিয়াছেন ও জয়ী হইয়াছেন, তাঁহার সেই অসামান্য বীর্য্য, সেই সংযম, সেই দৃঢ়-চিত্ততা, সেই প্রতিমুহূর্ত্তের ত্যাগস্বীকার আমরা মনের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধিই বা করিব কী করিয়া এবং তদনুরূপ কৃতজ্ঞতাই বা কেমন করিয়া অনুভব করিব! আমাদের অদ্যকার সমস্ত অন্ন-বস্ত্র-আশ্রয়ের পশ্চাতে তাঁহার সেই বিপত্তিতে অকম্পিত বলিষ্ঠ দক্ষিণহস্ত ও সেই হস্তের মঙ্গল আশিস্‌স্পর্শ আমরা যেন নিয়ত নম্রভাবে অনুভব করি।

আমাদের সর্ব্বপ্রকার অভাবমোচনের পক্ষে প্রচুর এই যে সম্পত্তি তিনি সম্পূর্ণ নিজের বলে রক্ষা করিয়াছেন, ইহা যদি অধর্ম্মের সহায়তায় ঘটিত, তবে অদ্য অন্তর্যামীর সম্মুখে সেই পিতার নিকটে শ্রদ্ধানিবেদন করিতে আমাদিগকে কুণ্ঠিত হইতে হইত। সর্ব্বাগ্রে তিনি ধর্ম্মকে রক্ষা করিয়া পরে তিনি ধনরক্ষা করিয়াছেন—অদ্য আমরা যাহা লাভ করিয়াছি, তাহার সহিত তিনি অসত্যের গ্লানি মিশ্রিত করিয়া দেন নাই—আজ আমরা যাহা ভোগ করিতেছি, তাহাকে দেবতার প্রসাদস্বরূপ নির্ম্মলচিত্তে নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করিবার অধিকারী হইয়াছি।

সেই বিপদের দিনে তাঁহার বিষয়ী বন্ধুর অভাব ছিল না—তিনি ইচ্ছা করিলে হয় তো কৌশলপূর্ব্বক তাঁহার পূর্ব্বসম্পত্তির বহুতর অংশ এমন করিয়া উদ্ধার করিতে পারিতেন যে, ধনগৌরবে বঙ্গীয় ধনীদের ঈর্ষাভাজন হইয়া থাকিতেন। তাহা করেন নাই বলিয়া আজ যেন আমরা তাঁহার নিকটে দ্বিগুণতর কৃতজ্ঞ হইতে পারি।

ঘোর সঙ্কটের সময় একদিন তাঁহার সম্মুখে একইকালে শ্রেয়ের পথ

ও শ্রেয়ের পথ উদ্ঘাটিত হইয়াছিল। তখন সর্ব্বস্ব হারাইবার সম্ভাবনা তাঁহার সম্মুখে ছিল—তাঁহার স্ত্রীপুত্র ছিল, তাঁহার মানসম্ভ্রম ছিল, তৎসত্ত্বে যেদিন তিনি শ্রেয়ের পথ নির্ব্বাচন করিয়া লইলেন, সেই মহা-দিনের কথা আজ যেন আমরা একবার স্মরণ করিবার চেষ্টা করি, তাহা হইলে আমাদের বিষয়লালসার তীব্রতা শান্ত হইয়া আসিবে এবং সন্তোষের অমৃতে আমাদের হৃদয় অভিষিক্ত হইবে। অর্জ্জনের দ্বারা তিনি যাহা আমাদিগকে দিয়াছেন, তাহা আমরা গ্রহণ করিয়াছি; বর্জ্জনের দ্বারা তিনি যাহা আমাদিগকে দিয়াছেন, তাহাও যেন গৌরবের সহিত গ্রহণ করিবার যোগ্য আমরা হইতে পারি।

তিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ ছিলেন,—কিন্তু তিনি যদি শুদ্ধমাত্র বিষয়ী হইতেন, তবে তাঁহার উদ্ধারপ্রাপ্ত সম্পত্তিখণ্ডকে উত্তরোত্তর সঞ্চয়ের দ্বারা বহুলরূপে বিস্তৃত করিতে পারিতেন। কিন্তু বিষয়বিস্তারের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ঈশ্বরের সেবাকে তিনি বঞ্চিত করেন নাই। তাঁহার ভাণ্ডার ধর্ম্মপ্রচারের জন্য মুক্ত ছিল—কতো অনাথ পরিবারের তিনি আশ্রয় ছিলেন, কতো দরিদ্র গুণীকে তিনি অভাবের পেষণ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, দেশের কতো হিতকর্ম্মে তিনি বিনা আড়ম্বরে গোপনে সাহায্য দিয়াছেন। এইদিকে কৃপণতা করিয়া তিনি কোনোদিন তাঁহার সন্তান-দিগকে বিলাসভোগ বা ধনাভিমানচর্চ্চায় প্রশ্রয় দেন নাই;—ধর্ম্মপরায়ণ গৃহস্থ যেমন সমস্ত অতিথিবর্গের আহারশেষে নিজে ভোজন করেন, তিনি সেইরূপ তাঁহার ভাণ্ডারদ্বারের সমস্ত অতিথিবর্গের পরিবেষণশেষ লইয়া নিজের পরিবারকে প্রতিপালন করিয়াছেন। এইরূপে তিনি আমাদিগকে ধনসম্পদের মধ্যে রাখিয়াও আড়ম্বর ও ভোগোন্মত্ততার হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছেন, এবং এইরূপে যদি তাঁহার সন্তানগণের সম্মুখ হইতে লক্ষ্মীর স্বর্ণপিঞ্জরের অবরোধদ্বার কিছুমাত্র শিথিল হইয়া থাকে, যদি তাঁহারা ভাবলোকের মুক্ত-আকাশে অবাধবিহারের কিছুমাত্র

অধিকারী হইয়া থাকেন, তবে নিশ্চয়ই তাঁহারা পিতার পুণ্যপ্রসাদে বহুতর লক্ষপতির অপেক্ষা সৌভাগ্যবান্ হইয়াছেন।

আজ এই কথা বলিয়া আমরা সকলের কাছে গৌরব করিতে পারি যে, এতকাল আমাদের পিতা যেমন আমাদিগকে দারিদ্র্য হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, তেম্‌নি ধনের গণ্ডীর মধ্যেও আমাদিগকে বদ্ধ করিয়া রাখেন নাই। পৃথিবী আমাদের সম্মুখে মুক্ত ছিল—ধনীদরিদ্র সকলেরই গৃহে আমাদের যাতায়াতের পথ সমান প্রশস্ত ছিল। সমাজে যাঁহাদের অবস্থা আমাদের অপেক্ষা হীন ছিল, তাঁহারা সুহৃদ্‌ভাবেই আমাদের পরিবারে অভ্যর্থনা প্রাপ্ত হইয়াছেন, পারিষদভাবে নহে—ভবিষ্যতে আমরা ভ্রষ্ট হইতে পারি, কিন্তু আমরা ভ্রাতাগণ দারিদ্র্যের অসম্মানকে এই পরিবারের ধর্ম্ম বলিয়া জানিতে পাই নাই। ধনের সঙ্কীর্ণতা ভেদ করিয়া মনুষ্যসাধারণের অকুণ্ঠিত সংস্রবলাভ যাঁহার প্রসাদে আমাদের ঘটিয়াছে, তাঁহাকে আজ আমরা নমস্কার করি।

তিনি আমাদিগকে যে কী পরিমাণে স্বাধীনতা দিয়াছেন, তাহা আমরা ছাড়া আর কে জানিবে! যে ধর্ম্মকে তিনি ধ্যাকুল সন্ধানের দ্বারা পাইয়াছেন, যে ধর্ম্মকে তিনি উৎকট বিপদের মধ্যেও রক্ষা করিয়াছেন, যে ধর্ম্মের উদ্দেশে তিনি তাঁহার সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, সেই ধর্ম্মকে তিনি আপনার গৃহের মধ্যেও শাসনের বস্তু করেন নাই। তাঁহার দৃষ্টান্ত আমাদের সম্মুখে ছিল, তাঁহার উপদেশ হইতে আমরা বঞ্চিত হই নাই, কিন্তু কোনো নিয়মের শাসনে তিনি আমাদের বুদ্ধিকে, আমাদের কর্ম্মকে বদ্ধ করেন নাই। তিনি কোনো বিশেষ মতকে অভ্যাস বা অনুশাসনের দ্বারা আমাদের উপরে স্থাপন করিতে চান নাই—ঈশ্বরকে ধর্ম্মকে স্বাধীনভাবে সন্ধান করিবার পথ তিনি আমাদের সম্মুখে মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। এই স্বাধীনতার দ্বারা তিনি আমাদিগকে পরম সম্মানিত করিয়াছেন—তাঁহার প্রদত্ত সেই সম্মানের যোগ্য হইয়া,

সত্য হইতে যেন স্খলিত না হই, ধর্ম্ম হইতে যেন স্খলিত না হই, কুশল হইতে যেন স্খলিত না হই! পৃথিবীতে কোনো পরিবার কখনই চিরদিন একভাবে থাকিতে পারে না,—ধন ও খ্যাতিকে কোনো বংশ চিরদিন আপনার মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না—ইন্দ্রধনুর বিচিত্র বর্ণচ্ছটার ন্যায় এই গৃহের সমৃদ্ধি নিশ্চয়ই একদিন দিগন্তরালে বিলীন হইয়া যাইবে, ক্রমে নানা ছিদ্রযোগে বিচ্ছেদবিশ্লেষের বীজ প্রবেশ করিয়া কোন্ একদিন এই পরিবারের ভিত্তিকে শতধা বিদীর্ণ করিয়া দিবে—কিন্তু এই পরিবারের মধ্য দিয়া যিনি অচেতন সমাজকে ধর্ম্মজিজ্ঞাসায় সজীব করিয়া দিয়াছেন, যিনি নূতন ইংরাজিশিক্ষার ঔদ্ধত্যের দিনে শিশু বঙ্গভাষাকে বহুযত্নে কৈশোরে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছেন, যিনি দেশকে তাহার প্রাচীন ঐশ্বর্য্যের ভাণ্ডার উদ্ঘাটিত করিতে প্রবৃত্ত করিয়াছেন, যিনি তাঁহার তপঃপরায়ণ একলক্ষ্য জীবনের দ্বারা আধুনিক বিষয়লুব্ধ সমাজে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের আদর্শ পুনঃস্থাপিত করিয়া গিয়াছেন, তিনি এই পরিবারকে সমস্ত মনুষ্যপরিবারের সহিত সংযুক্ত করিয়া-দিয়া, ইহার সর্ব্বোচ্চ লাভকে সমস্ত মনুষ্যের লাভ করিয়া-দিয়া, ইহার পরম ক্ষতিকে সমস্ত মনুষ্যের ক্ষতি করিয়া-দিয়া আমাদিগকে যে গৌরব দান করিয়াছেন, অন্য সমস্ত ক্ষুদ্র মানমর্য্যাদা বিস্মৃত হইয়া অদ্য আমরা তাহাই স্মরণ করিব ও একান্ত ভক্তির সহিত তাঁহার নিকটে আপনাকে প্রণত করিয়া দিব ও যাঁহার মধ্যে তিনি আশ্রয়লাভ করিয়াছেন, সমস্ত ধনমানের ঊর্দ্ধে, খ্যাতিপ্রতিপত্তির ঊর্দ্ধে তাঁহাকেই দর্শন করিব।

হে বিশ্ববিধাতা, আজ আমাদের সমস্ত বিষাদ-অবসাদ দূর করিয়া দাও—মৃত্যু সহসা যে যবনিকা অপসারণ করিয়াছে, তাহার মধ্য দিয়া তোমার অমৃতলোকের আভাস আমাদিগকে দেখিতে দাও! সংসারের নিয়ত উত্থানপতন, ধনমানজীবনের আবির্ভাবতিরোভাবের মধ্যে তোমার "আনন্দরূপমমৃতং" প্রকাশ কর। কত বৃহৎ সাম্রাজ্য ধূলিসাৎ হইতেছে,

কত প্রবল প্রতাপ অস্তমিত হইতেছে, কত লোকবিশ্রুত খ্যাতি বিস্মৃতি-মগ্ন হইতেছে, কত কুবেরের ভাণ্ডার ভগ্নস্তূপের বিভীষিকা রাখিয়া অন্তর্হিত হইতেছে—কিন্তু হে আনন্দময়, এই সমস্ত পরিবর্ত্তনপরম্পরার মধ্যে "মধু বাতা ঋতায়তে" বায়ু মধুবহন করিতেছে, "মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ" সমুদ্রসকল মধুক্ষরণ করিতেছে—তোমার অনন্ত মাধুর্য্যের কোনো ক্ষয় নাই—তোমার সেই বিশ্বব্যাপিনী মাধুরী সমস্ত শোকতাপবিক্ষোভের কুহেলিকা ভেদ করিয়া অদ্য আমাদের চিত্তকে অধিকার করুক্!

মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ, মধু নক্তম্ উতোষস, মধুমৎ পার্থিবং রজঃ, মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা, মধুমান্নো বনস্পতিঃ, মধুমান্ অস্তু সূর্য্যঃ, মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ।

ওষধি আমাদের পক্ষে মাধ্বী হউক্, রাত্রি এবং উষা আমাদের পক্ষে মধু হউক্, পৃথিবীর ধূলি আমাদের পক্ষে মধুমান্ হউক্, এই যে আকাশ পিতার ন্যায় সমস্ত জগৎকে ধারণ করিয়া আছে, ইহা আমাদের পক্ষে মধু হউক্, সূর্য্য মধুমান্ হউক্ এবং গাভীরা আমাদের জন্য মাধ্বী হউক্!

১৩১১।

মহাপুরুষ *

জগতে যে সকল মহাপুরুষ ধর্ম্মসমাজ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা যাহা দিতে চাহিয়াছেন, তাহা আমরা নিতে পারি নাই, এ কথা স্বীকার করিতে হইবে। শুধু পারি নাই যে, তাহা নয়, আমরা এক লইতে হয় তো আর লইয়া বসিয়াছি। ধর্ম্মের আসনে সাম্প্রদায়িকতাকে বরণ করিয়া হয় তো নিজেকে সার্থক জ্ঞান করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আছি।

তাহার একটা কারণ, আমাদের গ্রহণ করিবার শক্তি সকলের এক

* মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের শ্রাদ্ধসভায় পঠিত।

রকমের নয়। আমার মন যে পথে সহজে চলে, অন্যের মন সে পথে বাধা পায়। আমাদের এই মানসিক বৈচিত্র্যকে অস্বীকার করিয়া সকল মানুষের জন্যই একই বাঁধা রাজপথ বানাইয়া দিবার চেষ্টা আমাদের মনে আসে। কারণ, তাহাতে কাজ সহজ হইয়া যায়। সে চেষ্টা এ পর্য্যন্ত সফল হয় নাই। সফল হওয়া যে অসাধ্য, তাহাও আমরা ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই। সেইজন্য যে পথে আমি চলিয়া অভ্যস্ত বা আমার পক্ষে যাহা সহজ, সেই পথই যে সকলের একমাত্র পথ নয়, কাহারো পক্ষে যে তাহা দুর্গম হইতে পারে, এ কথা আমরা মনেও করিতে পারি না। এইজন্যই, এই পথেই সব মানুষকে টানা আমরা জগতের একমাত্র মঙ্গল বলিয়া মনে করি। এই টানাটানিতে কেহ আপত্তিপ্রকাশ করিলে আমরা আশ্চর্য্যবোধ করি, মনে করি—সে লোকটা, হয় ইচ্ছা করিয়া নিজের হিত পরিত্যাগ করিতেছে, নয়, তাহার মধ্যে এমন একটা হীনতা আছে, যাহা অবজ্ঞার যোগ্য।

কিন্তু ঈশ্বর আমাদের মনের মধ্যে গতিশক্তির যে বৈচিত্র্য দিয়াছেন, আমরা কোনো কৌশলেই তাহাকে একাকার করিয়া দিতে পারিব না। গতির লক্ষ্য এক, কিন্তু তাহার পথ অনেক। সব নদীই সাগরের দিকে চলিয়াছে, কিন্তু সবাই এক নদী হইয়া চলে নাই। চলে নাই, সে আমাদের ভাগ্য।

ঈশ্বর কোনোমতেই আমাদের সকলকেই একটা বাঁধা-পথে চলিতে দিবেন না। অনায়াসে চোখ বুঁজিয়া আমরা একজনের পশ্চাতে আর একজন চলিব, ঈশ্বর আমাদের পথকে এত সহজ কোনোদিন করিবেন না। কোনো ব্যক্তি—তাঁহার যতো-বড়ো ক্ষমতাই থাক্‌, পৃথিবীর সমস্ত মানবাত্মার জন্য নিশ্চেষ্ট জড়ত্বের সুগমতা চিরদিনের জন্য বানাইয়া দিয়া যাইবেন, মানুষের এমন দুর্গতি বিশ্ববিধাতা কখনই সহ্য করিতে পারেন না।

এইজন্ম প্রত্যেক মানুষের মনের গভীরতর স্তরে ঈশ্বর একটি স্বাতন্ত্র্য দিয়াছেন; অন্তত সেখানে একজনের উপর আর একজনের কোনো অধিকার নাই। সেখানেই তাহার অমরতার বীজকোষ বড়ো সাবধানে রক্ষিত; সেইখানেই তাহাকে নিজের শক্তিতে নিজে সার্থক হইতে হইবে। সহজের প্রলোভনে এই জায়গাটার দখল যে ব্যক্তি ছাড়িয়া দিতে চায়, সে লাভে-মূলে সমস্তই হারায়। সেই ব্যক্তিই ধর্ম্মের বদলে সম্প্রদায়কে, ঈশ্বরের বদলে গুরুকে, বোধের বদলে গ্রন্থকে লইয়া চোখ বুঁজিয়া বসিয়া থাকে। শুধু বসিয়া থাকিলেও বাঁচিতাম, দল বাড়াইবার চেষ্টায় পৃথিবীতে অনেক ব্যর্থতা এবং অনেক বিরোধের সৃষ্টি করে।

এইজন্ম বলিতেছিলাম, মহাপুরুষেরা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করিয়া যান, আর আমরা তাহার মধ্য হইতে সম্প্রদায়টাই লই, ধর্ম্মটা লই না। কারণ, বিধাতার বিধানে ধর্ম্মজিনিষটাকে নিজের স্বাধীনশক্তির দ্বারাই পাইতে হয়, অন্তের কাছ হইতে তাহা আরামে ভিক্ষা মাগিয়া লইবার জো নাই। কোনো সত্যপদার্থই আমরা আর কাহারো কাছ হইতে কেবল হাত পাতিয়া চাহিয়া পাইতে পারি না। যেখানে সহজ রাস্তা ধরিয়া ভিক্ষা করিতে গিয়াছি, সেখানেই ফাঁকিতে পড়িয়াছি। তেমন করিয়া যাহা পাইয়াছি, তাহাতে আত্মার পেট ভরে নাই, কিন্তু আত্মার জাত গিয়াছে।

তবে ধর্ম্মসম্প্রদায়ব্যাপারটাকে আমরা কি চোখে দেখিব? তাহাকে এই বলিয়াই জানিতে হইবে যে, তাহা তৃষ্ণা মিটাইবার জল নহে, তাহা জল খাইবার পাত্র। সত্যকার তৃষ্ণা যাহার আছে, সে জলের জন্তই ব্যাকুল হইয়া ফিরে, সে উপযুক্ত সুযোগ পাইলে গণ্ডূষে করিয়াই পিপাসা-নিবৃত্তি করে। কিন্তু যাহার পিপাসা নাই, সে পাত্রটাকেই সব চেয়ে দামী বলিয়া জানে। সেইজন্তই জল কোথায় পড়িয়া থাকে, তাহার ঠিক নাই, পাত্র লইয়াই পৃথিবীতে বিষম মারামারি বাধিয়া যায়। তখন যে

ধর্ম্ম বিষয়বুদ্ধির ফাঁস আল্‌গা করিবে বলিয়া আসিয়াছিল, তাহা জগতে একটা নূতনতর বৈষয়িকতার সূক্ষ্মতর জাল সৃষ্টি করিয়া বসে, সে জাল কাটানো শক্ত।

ধর্ম্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতারা নিজের নিজের সাধ্যানুসারে আমাদের জন্য, মাটির হৌক্ আর সোনার হৌক্, একএকটা পাত্র গড়িয়া দিয়া যান। আমরা যদি মনে করি, সেই পাত্রটা গড়িয়া-দিয়া যাওয়াই তাঁহাদের মাহাত্ম্যের সব চেয়ে বড়ো পরিচয়, তবে সেটা আমাদের ভুল হইবে। কারণ, পাত্রটি আমাদের কাছে যতই প্রিয় এবং যতই সুবিধাকর হউক, তাহা কখনই পৃথিবীর সকলেরই কাছে সমান প্রিয় এবং সমান সুবিধাকর হইতে পারে না। ভক্তির মোহে অন্ধ হইয়া, দলের গর্ব্বে মত্ত হইয়া, এ কথা ভুলিলে চলিবে না। কথামালার গল্প সকলেই জানেন—শৃগাল থালায় ঝোল রাখিয়া সারসকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল, লম্বা ঠোঁট্ লইয়া সারস তাহা খাইতে পারে নাই। তার পর সারস যখন সরুমুখ চোঙের মধ্যে ঝোল রাখিয়া শৃগালকে ফিরিয়া নিমন্ত্রণ করিল, তখন শৃগালকে ক্ষুধা লইয়াই ফিরিতে হইয়াছিল। সেইরূপ এমন সর্ব্বজনীন ধর্ম্মসমাজ আমরা কল্পনা করিতে পারি না, যাহা তাহার মত ও অনুষ্ঠান লইয়া সকলেরই বুদ্ধি, রুচি ও প্রয়োজনকে পরিতৃপ্ত করিতে পারে।

অতএব শাস্ত্রীয় ধর্ম্মমত ও আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মসমাজ স্থাপনের দিক হইতে পৃথিবীর ধর্ম্মগুরুদিগকে দেখা তাঁহাদিগকে ছোটো করিয়া দেখা। তেমন করিয়া কেবল দলের লোকেরাই দেখিতে পারে এবং তাহাতে করিয়া কেবল দলাদলিকেই বাড়াইয়া তোলা হয়। তাঁহাদের মধ্যে নিশ্চয়ই এমন একটি দেখিবার আছে, যাহা লইয়া সকল দেশে সকল কালে সকল মানুষকেই আহ্বান করা যায়। যাহা প্রদীপপাত্র নহে, যাহা আলো।

সেটি কী? না, যেটি তাঁহারা নিজেরা পাইয়াছেন। যাহা গড়িয়াছেন,

তাহা নহে। যাহা পাইয়াছেন, সে তো তাঁহাদের নিজের সৃষ্টি নহে, যাহা গড়িয়াছেন, তাহা তাঁহাদের নিজের রচনা।

আজ যাঁহার স্মরণার্থ আমরা সকলে এখানে সমবেত হইয়াছি, তাঁহাকেও যাহাতে কোনো-একটা দলের দিক হইতে না দেখি, ইহাই আমার নিবেদন। সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরা সম্প্রদায়ের ধ্বজাকেই সর্ব্বোচ্চ করিয়া ধরিতে গিয়া পাছে গুরুকেও তাহার কাছে খর্ব্ব করিয়া দেন, এ আশঙ্কা মন হইতে কিছুতেই দূর হয় না—অন্তত আজিকার দিনে নিজেদের সেই সঙ্কীর্ণতা তাঁহার প্রতি যেন আরোপ না করি।

অবশ্যই, কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহার প্রকৃতির বিশেষত্ব নানারূপে দেখা দিয়াছে। তাঁহার ভাষায়, তাঁহার ব্যবহারে, তাঁহার কর্ম্মে তিনি বিশেষভাবে নিজেকে আমাদের কাছে প্রকাশ করিয়াছেন—তাঁহার সেই স্বাভাবিক বিশেষত্ব জীবনচরিত-আলোচনা-কালে উপাদেয়, সন্দেহ নাই। সেই আলোচনায় তাঁহার সংস্কার, তাঁহার শিক্ষা, তাঁহার প্রতি তাঁহার দেশের ও কালের প্রভাবসম্বন্ধীয় সমস্ত তথ্য আমাদের কৌতূহলনিবৃত্তি করে। কিন্তু সেই সমস্ত বিশেষভাবকে আচ্ছন্ন করিয়া-দিয়া তাঁহার জীবন কি আর কাহাকেও আমাদের কাছে প্রকাশ করিতেছে না? আলো কি প্রদীপকে প্রকাশ করিবার জন্য, না প্রদীপ আলোকে প্রচার করিবার জন্য? তিনি যাঁহাকে দেখিতেছেন ও দেখাইতেছেন, যদি আজ সেইদিকেই আমাদের সমস্ত দৃষ্টি না যায়, আজ যদি তাঁহার নিজের বিশেষত্বের দিকে আমাদের দৃষ্টি কোনো অংশে ঠেকিয়া যায়, তবে গুরুর অবমাননা হইবে।

মহর্ষি একদিন পরিপূর্ণ-ভোগের মাঝখানে জাগিয়া-উঠিয়া বিলাসমন্দিরের সমস্ত আলোকে অন্ধকার দেখিয়াছিলেন। সেইদিন তিনি তৃষার্ত্তচিত্ত লইয়া পিপাসা মিটাইবার জন্য দুর্গমপথে যাত্রা করিয়াছিলেন, সে কথা সকলেই জানেন। যেখান হইতে অমৃত-উৎস নিঃসৃত হইয়া

সমস্ত জগৎকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে, সেই তীর্থস্থানে তিনি না গিয়া ছাড়েন নাই। সেই তীর্থের জল তিনি আমাদের জন্যও পাত্রে ভরিয়া আনিয়াছিলেন। এ পাত্র আজ-বাদে-কাল ভাঙিয়া যাইতেও পারে, তিনি যে ধর্ম্মসমাজ দাঁড় করাইয়াছেন, তাহার বর্ত্তমান আকৃতি স্থায়ী না হইতেও পারে; কিন্তু তিনি সেই যে অমৃত-উৎসের ধারে গিয়া নিজের জীবনকে ভরিয়া লইয়াছেন, ইহাই আমাদের প্রত্যেকের লাভ। এই লাভ নষ্ট হইবে না, শেষ হইবে না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ঈশ্বরকে আর কাহারো হাত দিয়া আমরা পাইব না। তাঁহার কাছে নিজে যাইতে হইবে, তাঁহাকে নিজে পাইতে হইবে। দুঃসাধ্য হয় সেও ভাল, বিলম্ব হয় তাহাতে ক্ষতি নাই। অন্যের মুখে শুনিয়া, উপদেশ পাইয়া, সমাজবিহিত অনুষ্ঠান পালন করিয়া আমরা মনে করি, যেন আমরা চরিতার্থতা লাভ করিলাম, কিন্তু সে তো ঘটির জল, সে তো উৎস নহে। তাহা মলিন হয়, তাহা ফুরাইয়া যায়, তাহাতে আমাদের সমস্ত জীবন অভিষিক্ত হয় না এবং তাহা লইয়া আমরা বিষয়ীলোকের মতোই অহঙ্কার ও দলাদলি করিতে থাকি। এমন ঘটির জলে আমাদের চলিবে না—সেই উৎসের কাছে আমাদের প্রত্যেক-কেই যাইতে হইবে—ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের নিজের একান্ত সম্বন্ধ তাঁহার সম্মুখে গিয়া আমাদিগকে নিজে স্বীকার করিতে হইবে। সম্রাট্ যখন আমাকে দরবারে ডাকেন, তখন প্রতিনিধি পাঠাইয়া কি কাজ সারিতে পারি? ঈশ্বর যে আমাদের প্রত্যেককে ডাক দিয়াছেন, সেই ডাকে সাড়া দিয়া একেবারে সম্পূর্ণভাবে তাঁহার কাছে আত্মসমর্পণ করিতে না পারিলে কোনোমতেই আমাদের সার্থকতা নাই!

মহাপুরুষদের জীবন হইতে এই কথাটাই আমরা জানিতে পারি। যখন দেখি, তাঁহারা হঠাৎ সকল কাজ ফেলিয়া তাড়াতাড়ি ছুটিয়াছেন, তখন বুঝিতে পারি, তবে তো আহ্বান আসিতেছে,—আমরা শুনিতে পাই

নাই, কিন্তু তাঁহারা শুনিতে পাইয়াছেন। তখন চারিদিকের কোলাহল হইতে ক্ষণকালের জন্য মনটাকে টানিয়া লই, আমরাও কান পাতিয়া দাঁড়াই। অতএব মহাপুরুষদের জীবন হইতে আমরা প্রথমে স্পষ্ট জানিতে পারি, আত্মার প্রতি পরমাত্মার আহ্বান কতখানি সত্য। এই জানিতে পারাটাই লাভ।

তার পরে আর একদিন তাঁহাদিগকে দেখিতে পাই, সুখে-দুঃখে তাঁহারা শান্ত, প্রলোভনে তাঁহারা অবিচলিত, মঙ্গলব্রতে তাঁহারা দৃঢ়-প্রতিষ্ঠ। দেখিতে পাই, তাঁহাদের মাথার উপর দিয়া কত ঝড় চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু তাঁহাদের হাল ঠিক আছে; সর্ব্বস্বক্ষতির সম্ভাবনা তাঁহাদের সম্মুখে বিভীষিকারূপে আবির্ভূত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহারা অনায়াসেই তাহাকে স্বীকার করিয়া ন্যায়পথে ধ্রুব হইয়া আছেন; আত্মীয়বন্ধুগণ তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিতেছে, কিন্তু তাঁহারা প্রসন্ন-চিত্তে সে সকল বিচ্ছেদ বহন করিতেছেন; তখনই আমরা বুঝিতে পারি, আমরা কী পাই নাই, আর তাঁহারা কী পাইয়াছেন। সে কোন্ শান্তি, কোন্ বন্ধু, কোন্ সম্পদ্! তখন বুঝিতে পারি, আমাদিগকেও নিতান্তই কি পাওয়া চাই, কোন্ লাভে আমাদের সকল অন্বেষণ শান্ত হইয়া যাইবে।

অতএব মহাপুরুষদের জীবনে আমরা প্রথমে দেখি, তাঁহারা কোন্ আকর্ষণে সমস্ত ত্যাগ করিয়া চলিয়াছেন; তাহার পরে দেখিতে পাই, কোন্ লাভে তাঁহাদের সমস্ত ত্যাগ সার্থক হইয়াছে! এইদিকে আমাদের মনের জাগরণটাই আমাদের লাভ। কারণ, এই জাগরণের অভাবেই কোনো লাভই সম্পন্ন হইতে পারে না।

তার পরে যদি ভাবিয়া দেখি, পাইবার ধন কোথায় পাওয়া যাইবে, কেমন করিয়া পাইব, তবে এই প্রশ্নই করিতে হইবে, তাঁহারা কোথায় গিয়াছেন, কেমন করিয়া পাইয়াছেন!

মহর্ষির জীবনে এই প্রশ্নের কী উত্তর পাই? দেখিতে পাই, তিনি তাঁহার পূর্ব্বতন সমস্ত সংস্কার, সমস্ত আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া একেবারে রিক্তহস্তে বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। সমাজের প্রচলিত প্রথা তাঁহাকে ধরিয়া রাখে নাই, শাস্ত্র তাঁহাকে আশ্রয় দেয় নাই। তাঁহার ব্যাকুলতাই তাঁহাকে পথ দেখাইয়া চলিয়াছে। সে পথ তাঁহার নিজেরই প্রকৃতির গভীর গোপন-পথ। সব পথ ছাড়িয়া সেই পথ তাঁহাকে নিজে আবিষ্কার করিয়া লইতে হইয়াছে। এ আবিষ্কার করিবার ধৈর্য্য ও সাহস তাঁহার থাকিত না, তিনিও পাঁচজনের পথে চলিয়া, ধর্ম্ম না হউক্, ধার্ম্মিকতা লাভ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতেন। কিন্তু তাঁহার পক্ষে যে না পাইলে নয় হইয়া উঠিয়াছিল, সেইজন্য তাঁহাকে নিজের পথ নিজেকে বাহির করিতে হইয়াছিল। সেজন্য তাঁহাকে যত দুঃখ, যত তিরস্কার হউক্, সমস্ত স্বীকার করিতে হইয়াছিল—ইহা বাঁচাইবার জো নাই। ঈশ্বর যে তাহাই চান। তিনি বিশ্বের ঈশ্বর হইয়াও আমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে একটি নিতান্ত একমাত্র স্বতন্ত্র সম্বন্ধে ধরা দিবেন—সেইজন্য আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে তিনি একটি দুর্ভেদ্য স্বাতন্ত্র্যকে চারিদিকের আক্রমণ হইতে নিয়ত রক্ষা করিয়াছেন—এই অতি নির্ম্মল নির্জ্জন-নিভৃত স্বাতন্ত্র্যের মধ্যেই তাঁহার সঙ্গে আমাদের মিলনের স্থান নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। সেইখানকার দ্বার যখন আমরা নিজের চেষ্টায় খুলিয়া তাঁহার কাছে আমাদের সেই চরম স্বাতন্ত্র্যের অধিকার একেবারে ছাড়িয়া দিব, বিশ্বের মধ্যে যাহা আমি ছাড়া আর কাহারো নহে, সেইটেই যখন তাঁহার কাছে সমর্পণ করিতে পারিব, তখনই আর আমার কিছু বাকি থাকিবে না, তখনই তাঁহাকে পাওয়া হইবে। এই যে আমাদের স্বাতন্ত্র্যের দ্বার, ইহার প্রত্যেকের চাবি স্বতন্ত্র; একজনের চাবি দিয়া আর একজনের দ্বার খুলিবে না। পৃথিবীতে যাঁহারা ঈশ্বরকে না পাওয়া পর্য্যন্ত থামেন নাই, তাঁহারা সকলেই ব্যাকুলতার নির্দ্দেশ মানিয়া নিজের চাবি নিজে যেমন করিয়া পারেন

সন্ধান করিয়া বাহির করিয়াছেন। কেবল পরের প্রতি নির্ভর করিয়া আলস্যবশত এ যাঁহারা না করিয়াছেন, তাঁহারা কোনো-একটা ধর্ম্মমত, ধর্ম্মগ্রন্থ বা ধর্ম্মসম্প্রদায়ে আসিয়া ঠেকিয়াছেন ও সেইখানেই তরঙ্গিত হইয়া উঠিয়া কলরব করিতেছেন, শেষ পর্য্যন্ত গিয়া পৌছেন নাই।

আমাদের শক্তি যদি ক্ষীণ হয়, আমাদের আকাঙ্ক্ষা যদি সত্য না হয়, তবে আমরা শেষ পর্য্যন্ত কবে গিয়া পৌছিব, জানি না—কিন্তু মহাপুরুষদের জীবন যেদিন আলোচনা করিতে বসিব, সেদিন যেন সেই শেষলক্ষ্যের কথাটাই সম্মুখে রাখি—তাঁহাদের স্মৃতি যেন আমাদিগকে পারের ঘাটের আলো দেখায়—তাহাকে যেন আমরা কোনোদিন সাম্প্রদায়িক অভিযানের মশাল করিয়া না তুলি। তাঁহাদের দৃষ্টান্ত আমাদিগকে বন্ধন হইতে উদ্ধার করিয়া দিবে, পরবশতা হইতে উত্তীর্ণ করিয়া দিবে, আমাদিগকে নিজের সত্যশক্তিতে, সত্যচেষ্টায়, সত্যপথে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিবে; আমাদিগকে ভিক্ষা দিবে না, সন্ধান দিবে; আশ্রয় দিবে না, অভয় দিবে; অনুসরণ করিতে বলিবে না, অগ্রসর হইতে উৎসাহিত করিবে। এক কথায়, মহাপুরুষ তাঁহার নিজের রচনার দিকে আমাদিগকে টানিতেছেন না, ঈশ্বরের দিকে আহ্বান করিতেছেন। আজ আমরা যেন মনকে স্তব্ধ করি, শান্ত করি;—যাহা প্রতিদিন ভাঙিতেছে-গড়িতেছে, যাহা লইয়া তর্কবিতর্ক-বিরোধবিদ্বেষের অন্ত নাই, যেখানে মানুষের বুদ্ধির, রুচির, অভ্যাসের অনৈক্য, সে সমস্তকেই মৃত্যুর সম্মুখে যেন আজ ক্ষুদ্র করিয়া দেখিতে পারি; কেবল আমাদের আত্মার যে শক্তিকে ঈশ্বর আমাদের জীবনমৃত্যুর নিত্যসম্বলরূপে আমাদিগকে দান করিয়াছেন, তাঁহার যে বাণী আমাদের সুখ-দুঃখে, উত্থানে-পতনে, জয়ে-পরাজয়ে চিরদিন আমাদের অন্তরাত্মায় ধ্বনিত হইতেছে, তাঁহার যে সম্বন্ধ নিগূঢ়রূপে, নিত্যরূপে, একান্তরূপে আমারই, তাহাই আজ নির্ম্মলচিত্তে উপলব্ধি করিব; মহাপুরুষের সমস্ত সাধনা যাহাতে সার্থক

হইয়াছে, সমাপ্ত হইয়াছে ; সমস্ত কর্ম্মের খণ্ডতা, সমস্ত চেষ্টার ভঙ্গুরতা, সমস্ত প্রকাশের অসম্পূর্ণতা যে এক পরম পরিণামের মধ্যে পরিপূর্ণ হইয়াছে, সেই দিকেই আজ আমাদের শান্তদৃষ্টিকে স্থির রাখিব। সম্প্রদায়ের লোকদিগকে এই কথা বিশেষভাবে স্মরণ করাইয়া-দিয়া আমরা সেই পরলোকগত মহাত্মার নিকট আমাদের বিনম্রহৃদয়ের শ্রদ্ধা নিবেদন করি, তাঁহার স্মৃতিশিখরের ঊর্দ্ধে করজোড়ে সেই ধ্রুবতারার মহিমা নিরীক্ষণ করি—যে শাশ্বতজ্যোতি সম্পদ্‌বিপদের দুর্গম সমুদ্রপথের মধ্য দিয়া দীর্ঘদিনের অবসানে তাঁহার জীবনকে তাহার চরম বিশ্রামের তীর্থে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছে।

১৩১৩।

জাপান-যাত্রী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়
২১০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়
২১০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
প্রকাশক—রায় সাহেব শ্রীজগদানন্দ রায়।

জাপান-যাত্রী

—

১ম সংস্করণ ... শ্রাবণ, ১৩২৬ সাল।

* * * *

পুনর্মুদ্রণ (১১০০) ... চৈত্র, ১৩৩৪ সাল।

—

মূল্য এক টাকা

শান্তিনিকেতন প্রেস। শান্তিনিকেতন, (বীরভূম)।
রায় সাহেব শ্রীজগদানন্দ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু

জাপান-যাত্রী

১

বম্বাই থেকে যতবার যাত্রা করেছি জাহাজ চল্‌তে দেরি করে নি। কলকাতার জাহাজে যাত্রার আগের রাত্রে গিয়ে ব'সে থাক্‌তে হয়। এটা ভালো লাগে না। কেননা যাত্রা করার মানেই মনের মধ্যে চলার বেগ সঞ্চয় করা। মন যখন চলবার মুখে, তখন তাকে দাঁড় করিয়ে রাখা তার এক‑শক্তির সঙ্গে তার আর-এক শক্তির লড়াই বাধানো। মানুষ যখন ঘরের মধ্যে জমিয়ে ব'সে আছে, তখন বিদায়ের আয়োজনটা এই জন্যেই কষ্টকর; কেন না, থাকার সঙ্গে যাওয়ার সন্ধিস্থলটা মনের পক্ষে মুস্কিলের জায়গা,—সেখানে তাকে দুই উল্টো দিক সামলাতে হয়,—সে একরকমের কঠিন ব্যায়াম।

বাড়ির লোকেরা সকলেই জাহাজে চড়িয়ে দিয়ে বাড়ি ফিরে গেল, বন্ধুরা ফুলের মালা গলায় পরিয়ে দিয়ে বিদায় দিলে, কিন্তু জাহাজ চল্‌ল না। অর্থাৎ যারা থাকবার তারাই

গেল, আর যেটা চলবার সেটাই স্থির হ'য়ে রইল,—বাড়ি গেল সরে', আর তরী রইল দাঁড়িয়ে।

বিদায় মাত্রেরই একটা ব্যথা আছে,—সে ব্যথাটার প্রধান কারণ এই, জীবনে যা-কিছুকে সব চেয়ে নির্দ্দিষ্ট ক'রে পাওয়া গেছে, তাকে অনির্দ্দিষ্টের আড়ালে সমর্পণ ক'রে যাওয়া। তার বদলে হাতে হাতে আর একটা কিছুকে পাওয়া না গেলে এই শূন্যতাটাই মনের মধ্যে বোঝা হ'য়ে দাঁড়ায়। সেই পাওনাটা হ'চ্চে অনির্দ্দিষ্টকে ক্রমে ক্রমে নির্দ্দিষ্টের ভাণ্ডারের মধ্যে পেয়ে চল্‌তে থাকা। অপরিচয়কে ক্রমে ক্রমে পরিচয়ের কোঠার মধ্যে ভুক্ত ক'রে নিতে থাকা। সেই জন্যে যাত্রার মধ্যে যে দুঃখ আছে, চলাটাই হ'চ্চে তার ওষুধ। কিন্তু যাত্রা ক'র্‌লুম অথচ চল্লুম না—এটা সহ্য করা শক্ত।

অচল জাহাজের ক্যাবিন হ'চ্চে বন্ধনদশার দ্বিগুণ-চোলাই-করা কড়া আরক। জাহাজ চলে ব'লেই তার কাম্‌রার সঙ্কীর্ণতাকে আমরা ক্ষমা করি। কিন্তু জাহাজ যখন স্থির থাকে তখন ক্যাবিনে স্থির থাকা, মৃত্যুর ঢাকনাটার নীচে আবার গোরের ঢাকনার মতো।

ডেকের উপরেই শোবার ব্যবস্থা করা গেল। ইতিপূর্ব্বে অনেকবার জাহাজে চড়েচি, অনেক কাপ্তেনের সঙ্গে ব্যবহার করেচি। আমাদের এই জাপানি কাপ্তেনের একটু বিশেষত্ব আছে। মেলামেশায় ভালমানুষিতে হঠাৎ মনে হয় ঘোরো লোকের মতো। মনে হয় এঁকে অনুরোধ ক'রে যা-খুসি-তাই

করা যেতে পারে,—কিন্তু কাজের বেলায় দেখা যায় নিয়মের লেশমাত্র নড়চড় হবার জো নাই। আমাদের সহযাত্রী ইংরেজ বন্ধু ডেকের উপরে তাঁর ক্যাবিনের গদি আনবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কর্তৃপক্ষের ঘাড় নড়্‌ল, সে ঘটে উঠ্‌ল না। সকালে ব্রেক্‌ফাষ্টের সময় তিনি যে-টেবিলে বসেছিলেন, সেখানে পাখা ছিল না; আমাদের টেবিলে জায়গা ছিল, সেই দেখে তিনি আমাদের টেবিলে বসবার ইচ্ছা জানালেন। অনুরোধটা সামান্য, কিন্তু কাপ্তেন বল্লেন, এবেলাকার মতো বন্দোবস্ত হ'য়ে গেছে, ডিনারের সময় দেখা যাবে। আমাদের টেবিলে চৌকি খালি রইল, কিন্তু তবু নিয়মের ব্যত্যয় হ'ল না। বেশ বোঝা যাচ্চে, অতি অল্পমাত্রও ঢিলেঢালা কিছু হ'তে পারবে না।

রাত্রে বাইরে শোওয়া গেল, কিন্তু এ কেমনতরো বাইরে? জাহাজের মাস্তুলে মাস্তুলে আকাশটা যেন ভীষ্মের মতো শর-শয্যায় শুয়ে মৃত্যুর অপেক্ষা ক'র্‌চে। কোথাও শূন্যরাজ্যের ফাঁকা নেই। অথচ বস্তুরাজ্যের স্পষ্টতাও নেই। জাহাজের আলোগুলো মস্ত একটা আয়তনের সূচনা করেচে, কিন্তু কোনো আকারকে দেখ্‌তে দিচ্চে না।

কোনো একটি কবিতায় প্রকাশ করেছিলুম যে, আমি নিশীথরাত্রির সভাকবি। আমার বরাবর একথাই মনে হয় যে দিনের বেলাটা মর্ত্ত্যলোকের, আর রাত্রিবেলাটা সুরলোকের। মানুষ ভয় পায়, মানুষ কাজকর্ম্ম করে, মানুষ তার পায়ের

কাছের পথটা স্পষ্ট ক'রে দেখ্‌তে চায়, এই জন্যে এত বড়ো একটা আলো জ্বালতে হয়েচে। দেবতার ভয় নেই, দেবতার কাজ নিঃশব্দে গোপনে, দেবতার চলার সঙ্গে স্তব্ধতার কোনো বিরোধ নেই, এই জন্যেই অসীম অন্ধকার দেবসভার আস্তরণ। দেবতা রাত্রেই আমাদের বাতায়নে এসে দেখা দেন।

কিন্তু মানুষের কারখানা যখন আলো জ্বালিয়ে সেই রাত্রি-কেও অধিকার ক'র্‌তে চায়, তখন কেবল যে মানুষই ক্লিষ্ট হয় তা নয়,—দেবতাকেও ক্লিষ্ট ক'রে তোলে। আমরা যখন থেকে বাতি জ্বেলে রাত জেগে এগ্‌জামিন পাশ ক'র্‌তে প্রবৃত্ত হয়েচি, তখন থেকে সূর্য্যের আলোয় সুস্পষ্ট নির্দ্দিষ্ট নিজের সীমানা লঙ্ঘন ক'র্‌তে লেগেচি, তখন থেকেই সুর-মানবের যুদ্ধ বেধেচে। মানুষের কারখানা-ঘরের চিম্‌নিগুলো ফুঁ দিয়ে দিয়ে নিজের অন্তরের কালীকে দ্যুলোকে বিস্তার ক'র্‌চে, সে অপরাধ তেমন গুরুতর নয়,—কেন না দিনটা মানুষের নিজের, তার মুখে সে কালী মাখালেও দেবতা তা নিয়ে নালিশ করবেন না। কিন্তু রাত্রির অখণ্ড অন্ধকারকে মানুষ যখন নিজের আলো দিয়ে ফুটো ক'রে দেয়, তখন দেবতার অধিকারে সে হস্তক্ষেপ করে। সে যেন নিজের দখল অতিক্রম ক'রে আলোকের খুঁটি গেড়ে দেবলোকে আপন সীমানা চিহ্নিত ক'র্‌তে চায়।

সেদিন রাত্রে গঙ্গার উপরে সেই দেববিদ্রোহের বিপুল আয়োজন দেখ্‌তে পেলুম। তাই মানুষের ক্লান্তির উপর সুর-লোকের শান্তির আশীর্ব্বাদ দেখা গেল না। মানুষ বল্‌তে

চাচ্চে আমিও দেবতার মতো, আমার ক্লান্তি নেই। কিন্তু সেটা মিথ্যা কথা—এইজন্যে সে চারিদিকের শান্তি নষ্ট ক'র্‌চে। এইজন্যে অন্ধকারকেও সে অশুচি ক'রে তুলচে।

দিন আলোকের দ্বারা আবিল, অন্ধকারই পরম নির্ম্মল। অন্ধকার রাত্রি সমুদ্রের মতো,—তা অঞ্জনের মতো কালো, কিন্তু তবু নিরঞ্জন। আর দিন নদীর মতো,—তা কালো নয়, কিন্তু পঙ্কিল। রাত্রির সেই অতলস্পর্শ অন্ধকারকেও সেদিন সেই খিদিরপুরের জেটির উপর মলিন দেখ্‌লুম। মনে হ'ল, দেবতা স্বয়ং মুখ মলিন ক'রে রয়েচেন।

এম্‌নি খারাপ লেগেছিল এডেনের বন্দরে। সেখানে মানুষের হাতে বন্দী হ'য়ে সমুদ্রও কলুষিত। জলের উপরে তেল ভাস্‌চে, মানুষের আবর্জ্জনাকে স্বয়ং সমুদ্রও বিলুপ্ত ক'র্‌তে পার্‌চে না। সেই রাত্রে জাহাজের ডেকের উপর শুয়ে অসীম রাত্রিকেও যখন কলঙ্কিত দেখ্‌লুম তখন মনে হ'ল একদিন ইন্দ্রলোক দানবের আক্রমণে পীড়িত হ'য়ে ব্রহ্মার কাছে নালিশ জানিয়েছিলেন—আজ মানবের অত্যাচার থেকে দেবতাদের কোন্ রুদ্র রক্ষা করবেন?

২

জাহাজ ছেড়ে দিলে। মধুর বহিছে বায়ু ভেসে চলি রঙ্গে। কিন্তু এর রঙ্গটা কেবলমাত্র ভেসে চলার মধ্যেই নয়। ভেসে চলার একটি বিশেষ দৃষ্টি ও সেই বিশেষ দৃষ্টির বিশেষ

রস আছে। যখন হেঁটে চলি তখন কোনো অখণ্ড ছবি চোখে পড়ে না। ভেসে চলার মধ্যে দুই বিরোধের পূর্ণ সামঞ্জস্য হয়েচে—বসেও আছি, চল্‌চিও। সেই জন্যে চলার কাজ হ'চ্চে, অথচ চলার কাজে মনকে লাগাতে হ'চ্চে না। তাই মন, যা সাম্‌নে দেখ্‌চে তাকে পূর্ণ ক'রে দেখ্‌চে। জল স্থল আকাশের সমস্তকে এক ক'রে মিলিয়ে দেখ্‌তে পাচ্চে।

ভেসে চলার মধ্যে দিয়ে দেখার আর একটা গুণ হ'চ্চে এই যে, তা মনোযোগকে জাগ্রত করে, কিন্তু মনোযোগকে বদ্ধ করে না। না দেখ্‌তে পেলেও চ'ল্‌তো, কোনো অসুবিধে হ'ত না, পথ ভুল্‌তুম না, গর্ত্তয় পড়্‌তুম না। এই জন্যে ভেসে চলার দেখাটা হ'চ্চে নিতান্তই দায়িত্ববিহীন দেখা,—দেখাটাই তার চরম লক্ষ্য—এই জন্যেই এই দেখাটা এমন বৃহৎ, এমন আনন্দময়।

এতদিনে এইটুকু বোঝা গেছে যে, মানুষ নিজের দাসত্ব করতে বাধ্য, কিন্তু নিজের সম্বন্ধেও দায়ে-পড়া কাজে তার প্রীতি নেই। যখন চলাটাকেই লক্ষ্য ক'রে পায়চারি করি, তখন সেটা বেশ; কিন্তু যখন কোথাও পৌঁছবার দিকে লক্ষ্য করে চল্‌তে হয়, তখন সেই চলার বাধ্যতা থেকে মুক্তি পাওয়ার শক্তিতেই মানুষের সম্পদ প্রকাশ পায়। ধন জিনিষটার মানেই এই—তাতে মানুষের প্রয়োজন কমায় না কিন্তু নিজের প্রয়োজন সম্বন্ধে তার নিজের বাধ্যতা কমিয়ে দেয়। খাওয়া পরা, দেওয়া নেওয়ার দরকার তাকে মেটাতেই হয়, কিন্তু তার

বাইরে যেখানে তার উদ্বৃত্ত সেইখানেই মানুষ মুক্ত, সেইখানেই সে বিশুদ্ধ নিজের পরিচয় পায়। সেই জন্যেই ঘটিবাটি প্রভৃতি দরকারী জিনিষকেও মানুষ সুন্দর ক'রে গ'ড়ে তুল্‌তে চায়—কারণ, ঘটিবাটির উপযোগিতা মানুষের প্রয়োজনের পরিচয় মাত্র কিন্তু তার সৌন্দর্য্যে মানুষের নিজেরই রুচির নিজেরই আনন্দের পরিচয়। ঘটিবাটির উপযোগিতা বল্‌চে মানুষের দায় আছে, ঘটিবাটির সৌন্দর্য্য বল্‌চে মানুষের আত্মা আছে।

আমার না হ'লেও চল্‌ত, কেবল আমি ইচ্ছা ক'রে কর্‌চি এই যে মুক্ত কর্ত্তৃত্বের ও মুক্ত ভোক্তৃত্বের অভিমান, যে অভিমান বিশ্বস্রষ্টার এবং বিশ্বরাজ্যেশ্বরের,—সেই অভিমানই মানুষের সাহিত্যে এবং আর্টে। এই রাজ্যটি মুক্ত মানুষের রাজ্য, এখানে জীবনযাত্রার দায়িত্ব নেই।

আজ সকালে যে প্রকৃতি সবুজ পাড়-দেওয়া গেরুয়া নদীর সাড়ি প'বে আমার সাম্‌নে দাঁড়িয়েছে, আমি তাকে দেখচি। এখানে আমি বিশুদ্ধ দ্রষ্টা। এই দ্রষ্টা আমিটি যদি নিজেকে ভাষায় বা রেখায় প্রকাশ ক'র্‌ত, তাহলে সেইটেই হ'ত সাহিত্য, সেইটেই হ'ত আর্ট। খামকা বিরক্ত হ'য়ে এমন কথা কেউ ব'ল্‌তে পারে "তুমি দেখ্‌চ তাতে আমার গরজ কী? তাতে আমার পেটও ভরবে না, আমার ম্যালেরিয়াও ঘুচবে না, তাতে আমার ফসল-ক্ষেতে বেশি ক'রে ফসল ধর্‌বার উপায় হবে না।" ঠিক কথা। আমি যে দেখচি এতে তোমার

কোনো গরজ নেই। অথচ আমি যে শুদ্ধমাত্র দ্রষ্টা, এ সম্বন্ধে বস্তুতই যদি তুমি উদাসীন হও—তাহলে জগতে আর্ট এবং সাহিত্য সৃষ্টির কোনো মানে থাকে না।

আমাকে তোমরা জিজ্ঞাসা করতে পার, আজ এতক্ষণ ধ'রে তুমি যে লেখাটা লিখ্‌চ, ওটাকে কী বল্‌বে? সাহিত্য, না তত্ত্বালোচনা।

নাই বল্লুম তত্ত্বালোচনা। তত্ত্বালোচনায় যে-ব্যক্তি আলোচনা করে, সে প্রধান নয়, তত্ত্বটাই প্রধান। সাহিত্যে সেই ব্যক্তিটাই প্রধান, তত্ত্বটা উপলক্ষ্য। এই যে শাদা মেঘের ছিটে-দেওয়া নীল আকাশের নীচে শ্যামল-ঐশ্বর্য্যময়ী ধরণীর আঙিনার সামনে দিয়ে সন্ন্যাসী জলের স্রোত উদাসী হ'য়ে চলেচে, তার মাঝখানে প্রধানত প্রকাশ পাচ্চে দ্রষ্টা আমি। যদি ভূতত্ত্ব বা ভূবৃত্তান্ত প্রকাশ করতে হ'ত, তাহলে এই আমিকে স'রে দাঁড়াতে হ'ত। কিন্তু এক-আমির পক্ষে আর-এক আমির অহেতুক প্রয়োজন আছে, এই জন্য সময় পেলেই আমরা ভূতত্ত্বকে সরিয়ে রেখে সেই আমির সন্ধান করি।

তেম্‌নি করেই কেবলমাত্র দৃশ্যের মধ্যে নয়, ভাবের মধ্যেও যে ভেসে চলেচে, সেও সেই দ্রষ্টা-আমি। সেখানে যা বল্‌চে সেটা উপলক্ষ্য, যে বল্‌চে সেই লক্ষ্য। বাহিরের বিশ্বের রূপধারার দিকেও আমি যেমন তাকাতে তাকাতে চলেচি, আমার অন্তরের চিন্তাধারা ভাবধারার দিকেও আমি তেমনি

চিত্তদৃষ্টি দিয়ে তাকাতে তাকাতে চলেচি। এই ধারা কোনো বিশেষ কর্ম্মের বিশেষ প্রয়োজনের সূত্রে বিধৃত নয়। এই ধারা প্রধানত লজিকের দ্বারাও গাঁথা নয়, এর গ্রন্থনসূত্র মুখ্যত আমি। সেইজন্যে আমি কেয়ারমাত্র করিনে সাহিত্য সম্বন্ধে বক্ষ্যমান রচনাটিকে লোক পাকা কথা ব'লে গ্রহণ ক'র্‌বে কি না। বিশ্বলোকে এবং চিত্তলোকে "আমি দেখচি" এই অনাবশ্যক আনন্দের কথাটা বলাই হ'চ্চে আমার কাজ। এই কথাটা যদি ঠিক ক'রে বল্‌তে পারি তাহলে অন্য সকল আমির দলও বিনা প্রয়োজনে খুসি হ'য়ে উঠবে।

উপনিষদে লিখচে, এক-ডালে দুই পাখী আছে, তার মধ্যে এক পাখী খায়, আর এক পাখী দেখে। যে-পাখী দেখচে তারি আনন্দ বড়ো আনন্দ ; কেন না, তার সে বিশুদ্ধ আনন্দ, মুক্ত আনন্দ। মানুষের নিজের মধ্যেই এই দুই পাখী আছে। এক পাখীর প্রয়োজন আছে, আর-এক পাখীর প্রয়োজন নেই। এক পাখী ভোগ করে আর-এক পাখী দেখে। যে-পাখী ভোগ করে সে নির্ম্মাণ করে, যে-পাখী দেখে সে সৃষ্টি করে। নির্ম্মাণ করা মানে মাপে তৈরি করা ; অর্থাৎ যেটা তৈরি করা হ'চ্চে সেইটেই চরম নয়, সেইটেকে অন্য কিছুর মাপে তৈরি করা,—নিজের প্রয়োজনের মাপে বা অন্যের প্রয়োজনের মাপে। আর সৃষ্টি করা অন্য কোনো-কিছুর মাপের অপেক্ষা করে না, সে হ'চ্চে নিজেকে সর্জ্জন করা, নিজেকেই প্রকাশ করা। এই জন্যে ভোগী পাখী যে সমস্ত উপকরণ নিয়ে কাজ

কর্‌চে তা প্রধানত বাইরের উপকরণ, আর দ্রষ্টা পাখীর উপকরণ হ'চ্চে আমি পদার্থ। এই আমির প্রকাশই সাহিত্য, আর্ট। তার মধ্যে কোনো দায়ই নেই, কর্ত্তব্যের দায়ও না।

পৃথিবীতে সব চেয়ে বড়ো রহস্য, দেখবার বস্তুটি নয়, যে দেখে সেই মানুষটি। এই রহস্য আপনি আপনার ইয়ত্তা পাচ্চে না,—হাজার হাজার অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে আপনাকে দেখ্‌তে চেষ্টা ক'র্‌চে। যা-কিছু ঘট্‌চে এবং যা-কিছু ঘট্‌তে পারে, সমস্তর ভিতর দিয়ে নিজেকে বাজিয়ে দেখ্‌চে।

এই যে আমার এক-আমি, এ বহুর মধ্যে দিয়ে চ'লে চ'লে নিজেকে নিত্য উপলব্ধি কর্‌তে থাকে। বহুর সঙ্গে মানুষের সেই একের মিলনজাত রসের উপলব্ধিই হ'চ্চে সাহিত্যের সামগ্রী। অর্থাৎ দৃষ্ট বস্তু নয়, দ্রষ্টা আমিই তার লক্ষ্য।

তোসামারু জাহাজ,
২০শে বৈশাখ, ১৩২৩।

৩

বৃহস্পতিবার বিকেলে সমুদ্রের মোহানায় পাইলট নেবে গেল। এর কিছু আগে থাক্‌তেই সমুদ্রের রূপ দেখা দিয়েচে। তার কূলের বেড়ি খ'সে গেচে। কিন্তু এখনও তার মাটীর রং ঘোচে নি। পৃথিবীর চেয়ে আকাশের সঙ্গেই যে তার আত্মীয়তা বেশি, সে কথা এখনো প্রকাশ হয় নি,—কেবল

দেখা গেল জলে আকাশে এক-দিগন্তের মালা বদল করেচে। মেঘ-ঢেউ দিয়েচে, নদীর ঢেউয়ের ছন্দের মতো তার ছোটো ছোটো পদ বিভাগ নয়; এ যেন মন্দাক্রান্তা—কিন্তু এখনো সমুদ্রের শার্দ্দূল বিক্রীড়িত সুরু হয় নি।

আমাদের জাহাজের নীচের তলার ডেকে অনেকগুলি ডেক্ প্যাসেঞ্জার; তাদের অধিকাংশ মাদ্রাজি, এবং তারা প্রায় সকলেই রেঙ্গুনে যাচ্চে। তাদের পরে এই জাহাজের লোকের ব্যবহারে কিছুমাত্র কঠোরতা নেই, তারা বেশ স্বচ্ছন্দে আছে। জাহাজের ভাণ্ডার থেকে তারা প্রত্যেকে একখানি ক'রে ছবি আঁকা কাগজের পাখা পেয়ে ভারি খুসি হয়েচে।

এরা অনেকেই হিন্দু, সুতরাং এদের পথের কষ্ট ঘোচান কারো সাধ্য নয়। কোনো মতে আখ চিবিয়ে, চিঁড়ে খেয়ে এদের দিন যাচ্চে। একটা জিনিষ ভারি চোখে লাগে, সে হ'চ্চে এই যে, এরা মোটের উপর পরিষ্কার—কিন্তু সেটা কেবল বিধানের গণ্ডির মধ্যে,—বিধানের বাইরে এদের নোংরা হবার কোনো বাধা নেই। আখ চিবিয়ে তার ছিব্‌ড়ে অতি সহজেই সমুদ্রে ফেলে দেওয়া যায়, কিন্তু সেটুকু কষ্ট নেওয়া এদের বিধানে নেই,—যেখানে ব'সে খাচ্চে তা'র নেহাৎ কাছে ছিব্‌ড়ে ফেলচে;—এমনি ক'রে চারিদিকে কত আবর্জ্জনা যে জমে উঠ্‌চে তা'তে এদের ভ্রূক্ষেপ নেই। সব চেয়ে আমাকে পীড়া দেয় যখন দেখি থুথু ফেলা সম্বন্ধে

এরা বিচার করে না। অথচ বিধান অনুসারে শুচিতা রক্ষা করবার বেলায় নিতান্ত সামান্য বিষয়েও এরা অসামান্য রকম কষ্ট স্বীকার করে। আচারকে শক্ত ক'রে তুল্লে বিচারকে ঢিলে ক'র্‌তেই হয়। বাইরে থেকে মানুষকে বাঁধলে মানুষ আপনাকে আপনি বাঁধবার শক্তি হারায়।

এদের মধ্যে কয়েকজন মুসলমান আছে; পরিষ্কার হওয়া সম্বন্ধে তারা যে বিশেষ সতর্ক তা নয়, কিন্তু পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে তাদের ভারি সতর্কতা। ভালো কাপড়টি প'রে টুপিটি বাগিয়ে তারা সর্ব্বদা প্রস্তুত থাক্‌তে চায়। একটু মাত্র পরিচয় হ'লেই অথবা না হ'লেও তা'রা দেখা হ'লেই প্রসন্ন মুখে সেলাম ক'রে। বোঝা যায় তা'রা বাইরের সংসারটাকে মানে। কেবলমাত্র নিজের জাতের গণ্ডির মধ্যে যারা থাকে, তাদের কাছে সেই গণ্ডির বাইরেকার লোকালয় নিতান্ত ফিকে। তাদের সমস্ত বাঁধাবাঁধি জাত-রক্ষার বন্ধন। মুসলমান জাতে বাঁধা নয় ব'লে বাহিরের সংসারের সঙ্গে তার ব্যবহারের বাঁধাবাঁধি আছে। এই জন্যে আদব কায়দা মুসলমানের। আদব কায়দা হ'চ্চে সমস্ত মানুষের সঙ্গে ব্যবহারের সাধারণ নিয়ম। মনুতে পাওয়া যায় মা মাসী মামা পিসের সঙ্গে কী রকম ব্যবহার ক'র্‌তে হবে, গুরুজনের গুরুত্বের মাত্রা কার কতদূর, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের মধ্যে পরস্পরের ব্যবহার কী রকম হবে;—কিন্তু সাধারণভাবে মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবহার কী রকম হওয়া উচিত, তার বিধান নেই।

এই জন্যে সম্পর্ক-বিচার ও জাতি-বিচারের বাইরে মানুষের সঙ্গে ভদ্রতা রক্ষার জন্যে, পশ্চিম ভারত, মুসলমানের কাছ থেকে সেলাম শিক্ষা করেচে। কেননা, প্রণাম নমস্কারের সমস্ত বিধি কেবল জাতের মধ্যেই খাটে। বাহিরের সংসারটাকে ইতিপূর্ব্বে আমরা অস্বীকার ক'রে চলেছিলুম ব'লেই সাজসজ্জা সম্বন্ধে পরিচ্ছন্নতা, হয় আমরা মুসলমানের কাছ থেকে নিয়েচি, নয় ইংরাজের কাছ থেকে নিচ্চি। ওটাতে আমাদের আরাম নেই। সেই জন্যে ভদ্রতার সাজ সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত আমাদের পাকাপাকি কিছুই ঠিক হ'ল না। বাঙালী ভদ্রসভায় সাজসজ্জার যে এমন অদ্ভুত বৈচিত্র্য, তার কারণই এই। সব সাজই আমাদের সাজ। আমাদের নিজের সাজ, মণ্ডলীর ভিতরকার সাজ,—সুতরাং বাহিরের সংসারের হিসাবে সেটা বিবসন বল্লেই হয়,—অন্তঃপুরের মেয়েদের বসনটা যে-রকম, অর্থাৎ দিগ্‌বসনের সুন্দর অনুকরণ। বাইরের লোকের সঙ্গে আমরা ভাই খুড়ো দিদি মাসী প্রভৃতি কোন-একটা সম্পর্ক পাতাবার জন্যে ব্যস্ত থাকি,—নইলে আমরা থই পাইনে। হয় অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা, নয় অত্যন্ত দূরত্ব,—এর মাঝখানে যে একটা প্রকাণ্ড জায়গা আছে, সেটা আজো আমাদের ভালো ক'রে আয়ত্ত হয় নি। এমন কি, সেখানকার বিধিবন্ধনকে আমরা হৃদ্যতার অভাব ব'লে নিন্দা করি। এ কথা ভুলে যাই, যে-সব মানুষকে হৃদয় দিতে পারিনে, তাদেরও কিছু দেবার আছে। এই দানটাকে

আমরা কৃত্রিম ব'লে গাল দিই, কিন্তু জাতের কৃত্রিম খাঁচার মধ্যে মানুষ ব'লেই এই সাধারণ আদব-কায়দাকে আমাদের কৃত্রিম ব'লে ঠেকে। বস্তুত ঘরের মানুষকে আত্মীয় ব'লে, এবং তার বাইরের মানুষকে আপন সমাজের ব'লে, এবং তারো বাইরের মানুষকে মানব সমাজের ব'লে স্বীকার করা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। হৃদয়ের বন্ধন, শিষ্টাচারের বন্ধন, এবং আদবকায়দার বন্ধন,—এই তিনই মানুষের প্রকৃতিগত।

কাপ্তেন ব'লে রেখেচেন, আজ সন্ধ্যাবেলায় ঝড় হবে, ব্যারোমিটার নাবচে। কিন্তু শান্ত আকাশে সূর্য্য অস্ত গেল। বাতাসে যে-পরিমাণ বেগ থাক্‌লে তাকে মন্দ পবন বলে, অর্থাৎ যুবতীর মন্দ গমনের সঙ্গে কবিরা তুলনা ক'র্‌তে পারে,—এ তার চেয়ে বেশি ; কিন্তু ঢেউগুলোকে নিয়ে রুদ্রতালের করতাল বাজাবার মতো আসর জমেনি,—যেটুকু খোলের বোল দিচ্চে তাতে ঝড়ের গৌরচন্দ্রিকা ব'লেও মনে হয়নি। মনে ক'র্‌লুম মানুষের কুষ্ঠির মতো, বাতাসের কুষ্ঠি গণনার সঙ্গে ঠিক মেলে না,—এ যাত্রা ঝড়ের ফাঁড়া কেটে গেল। তাই পাইলটের হাতে আমাদের ডাঙায় চিঠিপত্র সমর্পণ ক'রে দিয়ে প্রসন্ন সমুদ্রকে অভ্যর্থনা ক'র্‌বার জন্যে ডেক-চেয়ার টেনে নিয়ে পশ্চিমমুখো হ'য়ে ব'স্‌লুম।

হোলির রাত্রে হিন্দুস্থানী দরোয়ানদের খচমচির মতো বাতাসের লয়টা ক্রমেই দ্রুত হ'য়ে উঠল। জলের উপর

সূর্য্যাস্তের আলপনা-আঁকা আসনটি আচ্ছন্ন ক'রে নীলাম্বরীর ঘোমটা-পরা সন্ধ্যা এসে ব'স্‌ল। আকাশে তখনও মেঘ নেই, আকাশ-সমুদ্রের ফেনার মতোই ছায়াপথ জ্বল্‌জ্বল্‌ ক'র্‌তে লাগ্‌ল।

ডেকের উপর বিছানা ক'রে যখন শুলুম, তখন বাতাসে এবং জলে বেশ একটা কবির লড়াই চ'ল্‌চে—একদিকে সোঁ সোঁ শব্দে তান লাগিয়েচে, আর একদিকে ছল্ ছল্ শব্দে জবাব দিচ্চে, কিন্তু ঝড়ের পালা ব'লে মনে হ'লনা। আকাশের তারাদের সঙ্গে চোখোচোখি ক'রে কখন্ এক সময় চোখ বুজে এলো।

রাত্রে স্বপ্ন দেখ্‌লুম আমি যেন মৃত্যু সম্বন্ধে কোন একটি বেদমন্ত্র আবৃত্তি ক'রে সেইটে কাকে বুঝিয়ে ব'ল্‌চি। আশ্চর্য্য তার রচনা, যেন একটা বিপুল আর্ত্তস্বরের মতো, অথচ তা'র মধ্যে মরণের একটা বিরাট বৈরাগ্য আছে। এই মন্ত্রের মাঝখানে জেগে উঠে দেখি আকাশ এবং জল তখন উন্মত্ত হ'য়ে উঠেচে। সমুদ্র চামুণ্ডার মতো ফেনার জিব মেলে প্রচণ্ড অট্টহাস্যে নৃত্য ক'র্‌চে।

আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি মেঘগুলো মরিয়া হ'য়ে উঠেচে, যেন তাদের কাণ্ডজ্ঞান নেই,—ব'ল্‌চে, যা' থাকে কপালে। আর জলে যে বিষম গর্জ্জন উঠ্‌চে, তাতে মনের ভাবনাও যেন শোনা যায় না, এমনি বোধ হ'তে লাগ্‌ল। মাল্লারা ছোটো ছোটো লণ্ঠন হাতে ব্যস্ত হ'য়ে এদিকে

ওদিকে চলাচল ক'র্‌চে,—কিন্তু নিঃশব্দে। মাঝে মাঝে এঞ্জিনের প্রতি কর্ণধারের সঙ্কেত-ঘণ্টাধ্বনি শোনা যাচ্চে।

এবার বিছানায় শুয়ে ঘুমোবার চেষ্টা ক'র্‌লুম। কিন্তু বাইরে জলবাতাসের গর্জ্জন, আর আমার মনের মধ্যে সেই স্বপ্নলব্ধ মরণমন্ত্র ক্রমাগত বাজ্‌তে লাগ্‌ল। আমার ঘুমের সঙ্গে জাগরণ ঠিক যেন ঐ ঝড় এবং ঢেউয়ের মতোই এলো-মেলো মাতামাতি ক'র্‌তে থাক্‌ল,—ঘুমচ্চি কি জেগে আছি বুঝতে পারচি নে।

রাগী মানুষ কথা কইতে না পার্‌লে যেমন ফুলে ফুলে ওঠে, সকাল-বেলাকার মেঘগুলোকে তেমনি বোধ হ'লো। বাতাস কেবলই শ ষ স, এবং জল কেবলি বাকি অন্তঃস্থ বর্ণ য র ল ব হ নিয়ে চণ্ডীপাঠ বাধিয়ে দিলে, আর মেঘগুলো জটা দুলিয়ে ভ্রূকুটি ক'রে বেড়াতে লাগ্‌ল। অবশেষে মেঘের বাণী জলধারায় নেবে পড়্‌ল। নারদের বীণাধ্বনিতে বিষ্ণু গঙ্গা-ধারায় বিগলিত হয়েছিলেন একবার, আমার সেই পৌরাণিক কথা মনে এসেছিল। কিন্তু এ কোন্ নারদ প্রলয়-বীণা বাজাচ্চে? এর সঙ্গে নন্দী ভৃঙ্গীর যে মিল দেখি, আর ওদিকে বিষ্ণুর সঙ্গে রুদ্রের প্রভেদ ঘুচে গেচে।

এপর্য্যন্ত জাহাজের নিত্যক্রিয়া এক রকম চ'লে যাচ্চে, এমন কি আমাদের প্রাতরাশেরও ব্যাঘাত হ'ল না। কাপ্তেনের মুখে কোনো উদ্বেগ নেই। তিনি বল্লেন এই সময়টাতে এমন

একটু আড়ষ্ট হ'য়ে থাকে ;—আমরা যেমন যৌবনের চাঞ্চল্য দেখে ব'লে থাকি, ওটা বয়সের ধর্ম্ম।

ক্যাবিনের মধ্যে থাকলে ঝুমঝুমির ভিতরকার কড়াই-গুলোর মতো নাড়া খেতে হবে তার চেয়ে খোলাখুলি ঝড়ের সঙ্গে মোকাবিলা করাই ভালো। আমরা শাল কম্বল মুড়ি দিয়ে জাহাজের ডেকের উপর গিয়েই বস্‌লুম। ঝড়ের ঝাপট পশ্চিম দিক থেকে আসচে, সেইজন্যে পূর্ব্বদিকের ডেকে বসা দুঃসাধ্য ছিল না।

ঝড় ক্রমেই বেড়ে চল্ল। মেঘের সঙ্গে ঢেউয়ের সঙ্গে কোনো ভেদ রইল না। সমুদ্রের সে নীল রং নেই,—চারিদিক ঝাপসা, বিবর্ণ। ছেলেবেলায় আরব্য উপন্যাসে পড়েছিলুম, জেলের জালে যে-ঘড়া উঠেছিল তার ঢাক্‌না খুল্‌তে তার ভিতর থেকে ধোঁয়ার মতো পাকিয়ে পাকিয়ে প্রকাণ্ড দৈত্য বেরিয়ে পড়ল। আমার মনে হ'ল, সমুদ্রের নীল ঢাকনাটা কে খুলে ফেলেচে, আর ভিতর থেকে ধোঁয়ার মতো লাখো লাখো দৈত্য পরস্পর ঠেলাঠেলি ক'র্‌তে ক'র্‌তে আকাশে উঠে পড়েচে।

জাপানী মাল্লারা ছুটোছুটি ক'র্‌চে কিন্তু তাদের মুখে হাসি লেগেই আছে। তাদের ভাব দেখে মনে হয়, সমুদ্র যেন অট্টহাস্যে জাহাজটাকে ঠাট্টা ক'র্‌চে মাত্র ;—পশ্চিম দিকের ডেকের দরজা প্রভৃতি সমস্ত বন্ধ, তবু সে-সব বাধা ভেদ ক'রে এক একবার জলের ঢেউ হুড়মুড় ক'রে এসে পড়্‌চে, আর তাই

দেখে ওরা হো হো ক'রে উঠচে। কাপ্তেন আমাদের বারবার বল্লেন,—ছোট ঝড় সামান্য ঝড়। এক সময় আমাদের ষ্টুয়ার্ড এসে টেবিলের উপর আঙুল দিয়ে এঁকে ঝড়ের খাতিরে জাহাজের কী রকম পথ বদল হয়েচে, সেইটে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করলে। ইতিমধ্যে বৃষ্টির ঝাপটা লেগে শাল কম্বল সমস্ত ভিজে শীতে কাঁপুনি ধরিয়ে দিয়েচে। আর কোথাও সুবিধা না দেখে কাপ্তেনের ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিলুম। কাপ্তেনের যে কোনো উৎকণ্ঠা আছে, বাইরে থেকে তার কোনো লক্ষণ দেখতে পেলুম না।

ঘরে আর ব'সে থাক্‌তে পারলুম না। ভিজে শাল মুড়ি দিয়ে আবার বাইরে এসে বস্‌লুম। এত তুফানেও যে আমাদের ডেকের উপর আছড়ে আছড়ে ফেলচে না, তার কারণ জাহাজ আকণ্ঠ বোঝাই। ভিতরে যার পদার্থ নেই তার মতো দোলায়িত অবস্থা আমাদের জাহাজের নয়। মৃত্যুর কথা অনেকবার মনে হ'ল। চারিদিকেই তো মৃত্যু, দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্য্যন্ত মৃত্যু—আমার প্রাণ এর মধ্যে এতটুকু। এই অতি ছোটটার উপরেই কি সমস্ত আস্থা রাখব, আর এই এত বড়োটাকে কিছু বিশ্বাস ক'রব না?—বড়োর উপরে ভরসা রাখাই ভালো।

ডেকে ব'সে থাকা আর চল্‌চে না। নীচে নাবতে গিয়ে দেখি সিঁড়ি পর্য্যন্ত জুড়ে সমস্ত রাস্তা ঠেসে ভর্ত্তি ক'রে ডেক-প্যাসেঞ্জার ব'সে। বহু কষ্টে তাদের ভিতর দিয়ে পথ ক'রে

ক্যাবিনের মধ্যে গিয়ে শুয়ে পড়্‌লুম। এইবার সমস্ত শরীর মন ঘুলিয়ে উঠ্‌ল। মনে হ'ল দেহের সঙ্গে প্রাণের আর বন্‌তি হ'চ্চে না; দুধ মথন কর্‌লে মাখন যে রকম ছিন্ন হ'য়ে আসে প্রাণটা যেন তেমনি হ'য়ে এসেচে। জাহাজের উপর-কার দোলা সহ্য করা যায়, জাহাজের ভিতরকার দোলা সহ্য করা শক্ত। কাঁকরের উপর দিয়ে চলা, আর জুতার ভিতরে কাঁকর নিয়ে চলার যে তফাৎ, এ যেন তেমনি। একটাতে মার আছে বন্ধন নেই, আর একটাতে বেঁধে মার।

ক্যাবিনে শুয়ে শুয়ে শুন্‌তে পেলুম ডেকের উপর কী যেন হুড়্‌মুড়্‌ ক'রে ভেঙে ভেঙে পড়চে। ক্যাবিনের মধ্যে হাওয়া আসবার জন্যে যে ফানেলগুলো ডেকের উপর হাঁ ক'রে নিশ্বাস নেয়, ঢাকা দিয়ে তাদের মুখ বন্ধ ক'রে দেওয়া হ'য়েচে,—কিন্তু ঢেউয়ের প্রবল চোটে তার ভিতর দিয়েও ঝলকে ঝলকে ক্যাবিনের মধ্যে জল এসে পড়চে। বাইরে উনপঞ্চাশ বায়ুর নৃত্য, অথচ ক্যাবিনের মধ্যে গুমট। একটা ইলেকট্রিক পাখা চল্‌চে তাতে তাপটা যেন গায়ের উপর ঘুরে ঘুরে লেজের ঝাপটা দিতে লাগ্‌ল।

হঠাৎ মনে হয় এ একেবারে অসহ্য। কিন্তু মানুষের মধ্যে শরীর মন প্রাণের চেয়েও বড় একটা সত্তা আছে। ঝড়ের আকাশের উপরেও যেমন শান্ত আকাশ, তুফানের সমুদ্রের নীচে যেমন শান্ত সমুদ্র—সেই আকাশ সেই সমুদ্রই যেমন বড়ো, মানুষের অন্তরের গভীরে এবং সমুচ্চে সেইরকম একটি

বিরাট শান্ত পুরুষ আছে—বিপদ এবং দুঃখের ভিতর দিয়ে তাকিয়ে দেখ্‌লে তাকে পাওয়া যায়—দুঃখ তার পায়ের তলায়, মৃত্যু তাকে স্পর্শ করে না।

সন্ধ্যার সময় ঝড় থেমে গেল। উপরে গিয়ে দেখি জাহাজটা সমুদ্রের কাছে এতক্ষণ ধ'রে যে চড় চাপড় খেয়েচে, তার অনেক চিহ্ন আছে। কাপ্তেনের ঘরের একটা প্রাচীর ভেঙে গিয়ে তাঁর আসবাবপত্র সমস্ত ভিজে গেছে। একটা বাঁধা লাইফ-বোট জখম হয়েচে। ডেকে প্যাসেঞ্জারদের একটা ঘর এবং ভাণ্ডারের একটা অংশ ভেঙে পড়েচে। জাপানী মাল্লারা এমন সকল কাজে প্রবৃত্ত ছিল যাতে প্রাণ সংশয় ছিল। জাহাজ বরাবর আসন্ন সঙ্কটের সঙ্গে লড়াই করেচে, তার একটা স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেল—জাহাজের ডেকের উপর কর্কের তৈরি সাঁতার দেবার জামাগুলো সাজানো। এক সময়ে এগুলো বের করবার কথা কাপ্তেনের মনে এসেছিল।—কিন্তু ঝড়ের পালার মধ্যে সব চেয়ে স্পষ্ট ক'রে আমার মনে পড়্‌চে জাপানী মাল্লাদের হাসি।

শনিবার দিনে আকাশ প্রসন্ন কিন্তু সমুদ্রের আক্ষেপ এখনো ঘোচে নি। আশ্চর্য্য এই, ঝড়ের সময় জাহাজ এমন দোলে নি, ঝড়ের পর যেমন তা'র দোলা। কালকেকার উৎপাতকে কিছুতেই যেন সে ক্ষমা ক'র্‌তে পারচে না, ক্রমাগতই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে উঠচে। শরীরের অবস্থাটাও অনেকটা

সেই রকম,—ঝড়ের সময় সে একরকম শক্ত ছিল, কিন্তু পরের দিন ভুল্‌তে পার্‌চে না তার উপর দিয়ে ঝড় গিয়েচে।

আজ রবিবার। জলের রং ফিকে হ'য়ে উঠেচে। এত-দিন পরে আকাশে একটি পাখী দেখ্‌তে পেলুম—এই পাখী-গুলিই পৃথিবীর বাণী আকাশে বহন ক'রে নিয়ে যায়—আকাশ দেয় তার আলো, পৃথিবী দেয় তার গান। সমুদ্রের যা'-কিছু গান সে কেবল তার নিজের ঢেউয়ের—তার কোলে জীব আছে যথেষ্ট, পৃথিবীর চেয়ে অনেক বেশি, কিন্তু তাদের কারো কণ্ঠে সুর নেই—সেই অসংখ্য বোবা জীবের হ'য়ে সমুদ্র নিজেই কথা ক'চ্চে। ডাঙার জীবেরা প্রধানত শব্দের দ্বারাই মনের ভাব প্রকাশ করে, জলচরদের ভাষা হ'চ্চে গতি। সমুদ্র হ'চ্চে নৃত্যলোক, আর পৃথিবী হ'চ্চে শব্দলোক।

আজ বিকেলে চারটে পাঁচটার সময় রেঙ্গুনে পৌঁছবার কথা। মঙ্গলবার থেকে শনিবার পর্য্যন্ত পৃথিবীতে নানা খবর চলাচল করছিল, আমাদের জন্যে সেগুলো সমস্ত জমে রয়েচে;—বাণিজ্যের ধনের মতো নয় প্রতিদিন যার হিসাব চ'ল্‌চে; কোম্পানির কাগজের মতো, অগোচরে যার সুদ জম্‌চে।

২৪শে বৈশাখ, ১৩২৩।

৪

২৪শে বৈশাখ অপরাহ্ণে রেঙ্গুনে পৌঁছন গেল।

চোখের পিছনে চেয়ে দেখার একটা পাকযন্ত্র আছে, সেইখানে দেখাগুলো বেশ ক'রে হজম হ'য়ে না গেলে সেটাকে নিজের ক'রে দেখানো যায় না। তা' নাইবা দেখানো গেল—এমন কথা কেউ ব'ল্‌তে পারেন। যেখানে যাওয়া গেছে সেখানকার মোটামুটি বিবরণ দিতে দোষ কি?

দোষ না থাক্‌তে পারে,—কিন্তু আমার অভ্যাস অন্যরকম। আমি টুঁকে যেতে টেঁকে যেতে পারিনে। কখনো কখনো নোট নিতে ও রিপোর্ট দিতে অনুরুদ্ধ হয়েচি, কিন্তু সে সমস্ত টুক্‌রো কথা আমার মনের মুঠোর ফাঁক দিয়ে গলে ছড়িয়ে পড়ে যায়। প্রত্যক্ষটা একবার আমার মনের নেপথ্যে অপ্রত্যক্ষ হ'য়ে গিয়ে তার পরে যখন প্রকাশের মঞ্চে এসে দাঁড়ায় তখনই তা'র সঙ্গে আমার ব্যবহার।

ছুটতে ছুটতে তাড়াতাড়ি দেখে দেখে বেড়ানো আমার পক্ষে ক্লান্তিকর এবং নিষ্ফল। অতএব আমার কাছ থেকে বেশ ভ্রমণ বৃত্তান্ত তোমরা পাবে না। আদালতে সত্যপাঠ ক'রে আমি সাক্ষী দিতে পারি যে, রেঙ্গুন নামক এক সহরে আমি এসেছিলুম; কিন্তু যে-আদালতে আরো বড়ো রকমের সত্যপাঠ ক'র্‌তে হয়, সেখানে আমাকে ব'ল্‌তেই হবে রেঙ্গুনে এসে পৌঁছই নি।

এমন হ'তেও পারে রেঙ্গুন সহরটা খুব একটা সত্য বস্তু নয়। রাস্তাগুলি সোজা, চওড়া, পরিষ্কার, বাড়িগুলি তক্‌তক্ ক'র্‌চে, রাস্তায় ঘাটে মাদ্রাজি, পাঞ্জাবী, গুজরাটি ঘুরে বেড়াচ্চে, তা'র মধ্যে হঠাৎ কোথাও যখন রঙীন রেশমের কাপড়-পরা ব্রহ্মদেশের পুরুষ বা মেয়ে দেখ্‌তে পাই, তখন মনে হয় এরাই বুঝি বিদেশী। আসল কথা গঙ্গার পুলটা যেমন গঙ্গার নয়, বরঞ্চ সেটা গঙ্গার গলার ফাঁসি—রেঙ্গুন সহরটা তেমনি ব্রহ্মদেশের সহর নয়, ওটা যেন সমস্ত দেশের প্রতিবাদের মতো।

প্রথমত ইরাবতী নদী দিয়ে সহরের কাছাকাছি যখন আসচি, তখন ব্রহ্মদেশের প্রথম পরিচয়টা কী? দেখি তীরে বড়ো বড়ো সব কেরোসিন তেলের কারখানা লম্বা লম্বা চিমনি আকাশে তুলে দিয়ে ঠিক যেন চিৎ হ'য়ে প'ড়ে বর্ম্মা চুরুট খাচ্চে। তার পরে যত এগোতে থাকি, দেশ বিদেশের জাহাজের ভিড়। তারপর যখন ঘাটে এসে পৌঁছই, তখন তট ব'লে পদার্থ দেখা যায় না—সারি সারি জেটিগুলো যেন বিকটাকার লোহার জোঁকের মতো ব্রহ্মদেশের গায়ে একেবারে ছেঁকে ধরেচে। তারপরে আপিস, আদালত, দোকান বাজারের মধ্যে দিয়ে আমার বাঙালী বন্ধুদের বাড়ীতে গিয়ে উঠলুম, কোনো ফাঁক দিয়ে ব্রহ্মদেশের কোনো চেহারাই দেখ্‌তে পেলুম না। মনে হ'ল রেঙ্গুন ব্রহ্মদেশের ম্যাপে আছে, কিন্তু দেশে নেই। অর্থাৎ

এ সহর দেশের মাটি থেকে গাছের মতো ওঠে নি, এ সহর কালের স্রোতে ফেনার মতো ভেসেছে,—সুতরাং এর পক্ষে এ জায়গাও যেমন, অন্য জায়গাও তেমনি।

আসল কথা পৃথিবীতে যে-সব সহর সত্য তা' মানুষের মমতার দ্বারা তৈরি হ'য়ে উঠেচে। দিল্লি বল, আগ্রা বল, কাশী বল, মানুষের আনন্দ তা'কে সৃষ্টি ক'রে তুলেচে। কিন্তু বাণিজ্যলক্ষ্মী নির্ম্মম, তার পায়ের নীচে মানুষের মানস-সরোবরের সৌন্দর্য্য-শতদল ফোটে না। মানুষের দিকে সে তাকায় না, সে কেবল দ্রব্যকে চায়,—যন্ত্র তার বাহন। গঙ্গা দিয়ে যখন আমাদের জাহাজ আস্‌ছিল, তখন বাণিজ্য-শ্রীর নির্লজ্জ নির্দ্দয়তা নদীর দুই ধারে দেখ্‌তে দেখ্‌তে এসেচি। ওর মনে প্রীতি নেই ব'লেই বাংলা দেশের এমন সুন্দর গঙ্গার ধারকে এত অনায়াসে নষ্ট ক'র্‌তে পেরেচে।

আমি মনে করি আমার পরম সৌভাগ্য এই যে, কদর্য্যতার লৌহ-বন্যা যখন কলকাতার কাছাকাছি দুই তীরকে, মেটেবুরুজ থেকে হুগলি পর্য্যন্ত, গ্রাস কর্‌বার জন্যে ছুটে আস্‌ছিল, আমি তার আগেই জন্মেছি। তখনো গঙ্গার ঘাটগুলি গ্রামের স্নিগ্ধ বাহুর মতো গঙ্গাকে বুকের কাছে আপন ক'রে ধ'রে রেখেছিল, কুঠির নৌকাগুলি তখনো সন্ধ্যাবেলায় তীরে তীরে ঘাটে ঘাটে ঘরের লোকগুলিকে ঘরে ঘরে ফিরিয়ে আনত। একদিকে দেশের হৃদয়ের

ধারা, আর একদিকে দেশের এই নদীর ধারা, এর মাঝখানে কোনো কঠিন কুৎসিৎ বিচ্ছেদ দাঁড়ায় নি।

তখনো কলকাতার আশেপাশে বাংলাদেশের যথার্থ রূপটিকে দুই চোখ ভ'রে দেখবার কোনো বাধা ছিল না। সেই জন্যেই কলকাতা আধুনিক সহর হ'লেও কোকিল শিশুর মতো তার পালন-কর্ত্রীর নীড়কে একেবারে রিক্ত ক'রে অধিকার করে নি। কিন্তু তারপরে বাণিজ্য-সভ্যতা যতই প্রবল হ'য়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল, ততই দেশের রূপ আচ্ছন্ন হ'তে চ'ল্‌ল। এখন কলকাতা বাংলা দেশকে আপনার চারিদিক থেকে নির্ব্বাসিত ক'রে দিচ্চে,—দেশ ও কালের লড়াইয়ে দেশের শ্যামল শোভা পরাভূত হ'লো, কালের করাল মূর্ত্তিই লোহার দাঁত নখ মেলে কালো নিঃশ্বাস ছাড়্‌তে লাগ্‌ল।

এক সময়ে মানুষ ব'লেছিল, "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ"। তখন মানুষ লক্ষ্মীর যে-পরিচয় পেয়েছিল সে তো কেবল ঐশ্বর্য্যে নয়, তার সৌন্দর্য্যে। তার কারণ, বাণিজ্যের সঙ্গে তখন মনুষ্যত্বের বিচ্ছেদ ঘটে নি। তাঁতের সঙ্গে তাঁতীর, কামারের হাতুড়ির সঙ্গে কামারের হাতের, কারিগরের সঙ্গে তার কারুকার্য্যের মনের মিল ছিল। এইজন্যে বাণিজ্যের ভিতর দিয়ে মানুষের হৃদয় আপনাকে ঐশ্বর্য্যে বিচিত্র ক'রে সুন্দর ক'রে ব্যক্ত ক'র্‌ত। নইলে লক্ষ্মী তাঁর পদ্মাসন পেতেন কোথা থেকে? যখন থেকে কল হ'ল বাণিজ্যের বাহন, তখন থেকে বাণিজ্য হ'ল শ্রীহীন। প্রাচীন

ভেনিসের সঙ্গে আধুনিক ম্যাঞ্চেষ্টরের তুলনা ক'র্‌লেই তফাৎটা স্পষ্ট দেখ্‌তে পাওয়া যাবে। ভেনিসে সৌন্দর্য্যে এবং ঐশ্বর্য্যে মানুষ আপনারই পরিচয় দিয়েচে, ম্যাঞ্চেষ্টরে মানুষ সব দিকে আপনাকে খর্ব্ব ক'রে আপনার কলের পরিচয় দিয়েচে। এই জন্য কল-বাহন বাণিজ্য যেখানেই গেছে সেখানেই আপনার কালিমায় কদর্য্যতায় নির্ম্মমতায় একটা লোলুপতার মহামারী সমস্ত পৃথিবীতে বিস্তীর্ণ ক'রে দিচ্চে। তাই নিয়ে কাটাকাটি হানাহানির আর অন্ত নেই; তাই নিয়ে অসত্যে লোকালয় কলঙ্কিত এবং রক্তপাতে ধরাতল পঙ্কিল হ'য়ে উঠ্‌ল। অন্নপূর্ণা আজ হয়েচেন কালী; তাঁর অন্ন পরিবেষণের হাতা আজ হয়েচে রক্তপান ক'র্‌বার খর্পর। তাঁর স্মিতহাস্য আজ অট্টহাস্যে ভীষণ হ'ল। যাই হোক্‌, আমার বল্‌বার কথা এই যে, বাণিজ্য মানুষকে প্রকাশ করে না, মানুষকে প্রচ্ছন্ন করে।

তাই বল্‌চি, রেঙ্গুন তো দেখলুম কিন্তু সে কেবল চোখের দেখা, সে দেখার মধ্যে কোনো পরিচয় নেই;—সেখান থেকে আমার বাঙালী বন্ধুদের আতিথ্যের স্মৃতি নিয়ে এসেছি, কিন্তু ব্রহ্মদেশের হাত থেকে কোনো দক্ষিণা আন্‌তে পারি নি। কথাটা হয়ত একটু অত্যুক্তি হ'য়ে পড়ল। আধুনিকতার এই প্রাচীরের মধ্যে দেশের একটা গবাক্ষ হঠাৎ একটু খোলা পেয়েছিলুম। সোমবার দিনে সকালে আমার বন্ধুরা এখানকার বিখ্যাত বৌদ্ধ মন্দিরে নিয়ে গেলেন।

এতক্ষণে একটা কিছু দেখ্‌তে পেলুম। এতক্ষণ যার মধ্যে ছিলুম সে একটা এব্‌স্‌ট্রাক্‌শন্‌ সে একটা আচ্ছিন্ন পদার্থ। সে একটা সহর, কিন্তু কোনো-একটা সহরই নয়। এখন যা দেখচি, তার নিজেরই একটা বিশেষ চেহারা আছে। তাই সমস্ত মন খুসি হ'য়ে, সজাগ হ'য়ে উঠ্‌ল। আধুনিক বাঙালীর ঘরে মাঝে মাঝে খুব ফ্যাশানওয়ালা মেয়ে দেখ্‌তে পাই; তারা খুব গট্‌গট্‌ ক'রে চলে, খুব চট্‌পট্‌ ক'রে ইংরেজি কয়—দেখে মস্ত একটা অভাব মনে বাজে,—মনে হয় ফ্যাশানটাকেই বড়ো করে দেখ্‌চি,বাঙালীর মেয়েটিকে নয়; এমন সময় হঠাৎ ফ্যাশানজালমুক্ত সরল সুন্দর স্নিগ্ধ বাঙালী-ঘরের কল্যাণীকে দেখ্‌লে তখনি বুঝ্‌তে পারি এ তো মরীচিকা নয়, স্বচ্ছ গভীর সরোবরের মতো এর মধ্যে একটি তৃষাহরণ পূর্ণতা আপন পদ্মবনের পাড়টি নিয়ে টলমল ক'র্‌চে। মন্দিরের মধ্যে ঢুকতেই আমার মনে তেমনি একটি আনন্দের চমক লাগ্‌ল; মনে হ'ল, যাই হোক না কেন, এটা ফাঁকা নয়—যেটুকু চোখে পড়চে এ তার চেয়ে আরো অনেক বেশি। সমস্ত রেঙ্গুন সহরটা এর কাছে ছোট হ'য়ে গেল—বহুকালের বৃহৎ ব্রহ্মদেশ এই মন্দিরটুকুর মধ্যে আপনাকে প্রকাশ ক'র্‌লে।

প্রথমেই বাইরের প্রখর আলো থেকে একটি পুরাতন কালের পরিণত ছায়ার মধ্যে এসে প্রবেশ কর্‌লুম। থাকে থাকে প্রশস্ত সিঁড়ি উঠে চলেচে—তার উপরে আচ্ছাদন। এই সিঁড়ির দুই ধারে ফল, ফুল, বাতি, পূজার অর্ঘ্য বিক্রি

চল্‌চে। যারা বেচ্‌চে তারা অধিকাংশই ব্রহ্মীয় মেয়ে। ফুলের রঙের সঙ্গে তাদের রেশমের কাপড়ের রঙের মিল হ'য়ে মন্দিরের ছায়াটি সূর্য্যাস্তের আকাশের মতো বিচিত্র হ'য়ে উঠেচে। কেনাবেচার কোনো নিষেধ নেই, মুসলমান দোকানদারেরা বিলাতি মণিহারির দোকান খুলে ব'সে গেছে। মাছ মাংসেরও বিচার নেই, চারিদিকে খাওয়া দাওয়া ঘরকন্না চল্‌চে। সংসারের সঙ্গে মন্দিরের সঙ্গে ভেদমাত্র নেই—একেবারে মাখামাখি। কেবল, হাটবাজারে যে-রকম গোলমাল, এখানে তা' দেখা গেল না। চারিদিক নিরালা নয়, অথচ নিভৃত; স্তব্ধ নয়, শান্ত। আমাদের সঙ্গে ব্রহ্মদেশীয় একজন ব্যারিষ্টার ছিলেন, এই মন্দির সোপানে মাছ-মাংস কেনাবেচা এবং খাওয়া চল্‌চে, এর কারণ তাঁকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বল্লেন, বুদ্ধ আমাদের উপদেশ দিয়েচেন—তিনি ব'লে দিয়েচেন কিসে মানুষের কল্যাণ, কিসে তার বন্ধন; তিনি তো জোর ক'রে কারো ভালো ক'র্‌তে চান নি; বাহিরের শাসনে কল্যাণ নেই অন্তরের ইচ্ছাতেই মুক্তি; এই জন্যে আমাদের সমাজে বা মন্দিরে আচার সম্বন্ধে জবরদস্তি নেই।

সিঁড়ি বেয়ে উপরে যেখানে গেলুম সেখানে খোলা জায়গা, তারই নানাস্থানে নানারকমের মন্দির। সে মন্দিরে গাম্ভীর্য্য নেই, কারুকার্য্যের ঠেসাঠেসি ভিড়—সমস্ত যেন ছেলেমানুষের খেলনার মতো। এমন অদ্ভুত পাঁচমিশালি ব্যাপার আর

কোথাও দেখা যায় না—এ যেন ছেলে-ভুলোনো ছড়ার মতো; তার ছন্দটা একটানা বটে, কিন্তু তার মধ্যে যা'-খুসি-তাই এসে পড়েচে, ভাবে পরস্পর-সামঞ্জস্যের কোনো দরকার নেই। বহুকালের পুরাতন শিল্পের সঙ্গে এখানকার নিতান্ত সস্তাদরের তুচ্ছতা একেবারে গায়ে গায়ে সংলগ্ন। ভাবের অসঙ্গতি ব'লে যে কোনো পদার্থ আছে, এরা তা' যেন একেবারে জানেই না। আমাদের কলকাতায় বড়মানুষের ছেলের বিবাহ-যাত্রায় রাস্তা-দিয়ে যেমন সকল রকমের অদ্ভুত অসামঞ্জস্যের বন্যা ব'য়ে যায়—কেবলমাত্র পুঞ্জীকরণটাই তার লক্ষ্য, সজ্জীকরণ নয়,—এও সেই রকম। এক ঘরে অনেক-গুলো ছেলে থাক্‌লে যেমন গোলমাল করে, সেই গোলমাল করাতেই তাদের আনন্দ—এই মন্দিরের সাজসজ্জা, প্রতিমা নৈবেদ্য, সমস্ত যেন সেইরকম, ছেলেমানুষের উৎসব—তার মধ্যে অর্থ নেই, শব্দ আছে। মন্দিরের ঐ সোনা-বাঁধানো পিতল-বাঁধানো চূড়াগুলি ব্রহ্মদেশের ছেলেমেয়েদের আনন্দের উচ্চহাস্য মিশ্রিত হো হো শব্দ—আকাশে ঢেউ খেলিয়ে উঠ্‌চে। এদের যেন বিচার করবার গম্ভীর হবার বয়স হয়নি। এখান-কার এই রঙিন মেয়েরাই সব চেয়ে চোখে পড়ে। এদেশের শাখাপ্রশাখা ভরে এরা যেন ফুল ফুটে রয়েচে। ভুঁইচাঁপার মতো এরাই দেশের সমস্ত—আর কিছু চোখে পড়ে না।

লোকের কাছে শুন্‌তে পাই, এখানকার পুরুষেরা অলস ও আরামপ্রিয়; অন্য দেশের পুরুষের কাজ প্রায় সমস্তই

এখানে মেয়েরা ক'রে থাকে। হঠাৎ মনে আসে এটা বুঝি মেয়েদের উপরে জুলুম করা হয়েচে। কিন্তু ফলে তো তার উল্টোই দেখ্‌তে পাচ্চি—এই কাজকর্ম্মের হিল্লোলে মেয়েরা আরো যেন বেশি ক'রে বিকশিত হ'য়ে উঠেচে। কেবল বাইরে বেরতে পারাই যে মুক্তি তা' নয়, অবাধে কাজ ক'র্‌তে পাওয়া মানুষের পক্ষে তার চেয়ে বড়ো মুক্তি। পরাধীনতাই সব চেয়ে বড়ো বন্ধন নয়, কাজের সঙ্কীর্ণতাই হ'চ্চে সব চেয়ে কঠোর খাঁচা।

এখানকার মেয়েরা সেই খাঁচা থেকে ছাড়া পেয়ে এমন পূর্ণতা এবং আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করেচে। তারা নিজের অস্তিত্ব নিয়ে নিজের কাছে সঙ্কুচিত হ'য়ে নেই রমণীর লাবণ্যে যেমন তারা প্রেয়সী, শক্তির মুক্তিগৌরবে তেমনি তারা মহিয়সী। কাজেই যে মেয়েদের যথার্থ শ্রী দেয়, সাঁওতাল মেয়েদের দেখে তা' আমি প্রথম 'বুঝতে পেরেছিলুম। তারা কঠিন পরিশ্রম করে—কিন্তু কারিগর যেমন কঠিন আঘাতে মূর্ত্তিটিকে সুব্যক্ত ক'রে তোলে তেমনি এই পরিশ্রমের আঘাতেই এই সাঁওতাল মেয়েদের দেহ এমন নিটোল, এমন সুব্যক্ত হ'য়ে ওঠে, তাদের সকল প্রকার গতিভঙ্গিতে এমন একটা মুক্তির মহিমা প্রকাশ পায়। কবি কীট্‌স্‌ বলেচেন, সত্যই সুন্দর। অর্থাৎ সত্যের বাধামুক্ত সুসম্পূর্ণতাতেই সৌন্দর্য্য। সত্য মুক্তি লাভ ক'র্‌লে আপনিই সুন্দর হ'য়ে প্রকাশ পায়। প্রকাশের পূর্ণতাই সৌন্দর্য্য, এই কথাটাই আমি উপনিষদের

এই বাণীতে অনুভব করি—আনন্দ-রূপমমৃতং যদ্বিভাতি ; অনন্তস্বরূপ যেখানে প্রকাশ পাচ্চেন, সেইখানেই তাঁর অমৃত-রূপ আনন্দরূপ। মানুষ ভয়ে, লোভে, ঈর্ষায় মূঢ়তায়, প্রয়োজনের সঙ্কীর্ণতায় এই প্রকাশকে আচ্ছন্ন করে, বিকৃত করে ; এবং সেই বিকৃতিকেই অনেক সময় বড়ো নাম দিয়ে বিশেষ ভাবে আদর ক'রে থাকে।

তোসা-মারু জাহাজ,
২৭শে বৈশাখ, ১৩২৩।

৫

২৯ বৈশাখ। বিকেলের দিকে যখন পিনাঙের বন্দরে ঢুকচি, আমাদের সঙ্গে যে-বালকটি এসেচে, তার নাম মুকুল, সে ব'লে উঠ্‌ল, ইস্কুলে একদিন পিনাং সিঙাপুর মুখস্থ ক'রে মরেচি—এ সেই পিনাং। তখন আমার মনে হ'ল ইস্কুলের ম্যাপে পিনাং দেখা যেমন সহজ ছিল, এ তার চেয়ে বেশি শক্ত নয়। তখন মাষ্টার ম্যাপে আঙুল বুলিয়ে দেশ দেখাতেন, এ হ'চ্চে জাহাজ বুলিয়ে দেখানো।

এরকম ভ্রমণের মধ্যে "বস্তুতন্ত্রতা" খুব সামান্য। ব'সে ব'সে স্বপ্ন দেখ্‌বার মতো। না ক'র্‌চি চেষ্টা, না ক'র্‌চি চিন্তা, চোখের সামনে আপনা-আপনি সব জেগে উঠ্‌চে। এই সব দেশ বের ক'র্‌তে, এর পথ ঠিক ক'রে রাখ্‌তে, এর

রাস্তাঘাট পাকা ক'রে তুল্তে, অনেক মানুষকে অনেক ভ্রমণ এবং অনেক ছঃসাহস ক'র্তে হয়েছে, আমরা সেই সমস্ত ভ্রমণ ও ছঃসাহসের বোতলে-ভরা মোরব্বা উপভোগ কর্‌চি যেন। এতে কোনো কাঁটা নেই, খোসা নেই, আঁটি নেই,—কেবল শাসটুকু আছে, আর তার সঙ্গে যতটা সম্ভব চিনি মেশানো। অকূল সমুদ্র ফুলে ফুলে উঠ্‌চে, দিগন্তের উপর দিগন্তের পর্দ্দা উঠে উঠে যাচ্চে, ছুর্গমতার একটা প্রকাণ্ড মূর্ত্তি চোখে দেখ্‌তে পাচ্চি ; অথচ আলিপুরে খাঁচার সিংহটার মতো তাকে দেখে আমোদ বোধ করচি ; ভীষণও মনোহর হ'য়ে দেখা দিচ্চে।

আরব্য-উপন্যাসে আলাদিনের প্রদীপের কথা যখন পড়েছিলুম, তখন সেটাকে ভারি লোভনীয় মনে হ'য়েছিল। এ তো সেই প্রদীপেরই মায়া। জলের উপরে স্থলের উপরে সেই প্রদীপটা ঘস্‌চে, আর অদৃশ্য দৃশ্য হ'চ্চে, দূর নিকটে এসে প'ড়্‌চে। আমরা এক জায়গায় ব'সে আছি, আর জায়গাগুলোই আমাদের সামনে এসে প'ড়্‌চে।

কিন্তু মানুষ ফলটাকেই যে মুখ্যভাবে চায় তা নয়, ফলিয়ে তোলানোটাই তার সব চেয়ে বড়ো জিনিষ। সেই জন্যে, এই যে ভ্রমণ কর্‌চি, এর মধ্যে মন একটা অনুভব করচে—সেটি হ'চ্চে এই যে, আমরা ভ্রমণ ক'র্‌চিনে। সমুদ্রপথে আস্‌তে আস্‌তে মাঝে মাঝে দূরে দূরে এক-একটা পাহাড় দেখা দিচ্ছিল, আগাগোড়া গাছে ঢাকা ; ঠিক যেন কোন্ দানব-লোকের প্রকাণ্ড জন্তু তার কোঁকড়া সবুজ রোঁয়া নিয়ে

সমুদ্রের ধারে ঝিমতে ঝিমতে রোদ পোয়াচ্চে ; মুকুল তাই দেখে বল্লে ঐখানে নেবে যেতে ইচ্ছা করে। ঐ ইচ্ছাটা হ'চ্চে সত্যকার ভ্রমণ করবার ইচ্ছা অন্য কর্ত্তৃক দেখিয়ে দেওয়ার বন্ধন হ'তে মুক্ত হ'য়ে নিজে দেখার ইচ্ছা। ঐ পাহাড়-ওয়ালা ছোটো ছোটো দ্বীপগুলোর নাম জানিনে, ইস্কুলের ম্যাপে ও-গুলোকে মুখস্থ ক'র্‌তে হয় নি ; দূর থেকে দেখে মনে হয় ওরা একেবারে তাজা রয়েচে, সার্কুলেটিং লাইব্রেরির বইগুলোর মতো মানুষের হাতে হাতে ফিরে নানা চিহ্নে চিহ্নিত হ'য়ে যায় নি ; সেই জন্যে মনকে টানে। অন্যের পরে মানুষের বড়ো ঈর্ষা। যাকে আর কেউ পায় নি, মানুষ তাকে পেতে চায়। তাতে যে পাওয়ার পরিমাণ বাড়ে তা নয়, কিন্তু পাওয়ার অভিমান বাড়ে।

সূর্য্য যখন অস্ত যাচ্চে, তখন পিনাঙের বন্দরে জাহাজ এসে পৌঁছল। মনে হ'ল বড়ো সুন্দর এই পৃথিবী। জলের সঙ্গে স্থলের যেন প্রেমের মিলন দেখ্‌লুম। ধরণী তার দুই বাহু মেলে সমুদ্রকে আলিঙ্গন ক'র্‌চে। মেঘের ভিতর দিয়ে নীলাভ পাহাড়গুলির উপরে যে একটি সুকোমল আলো পড়্‌চে সে যেন অতি সূক্ষ্ম সোনালি রঙের ওড়নার মতো— তাতে বধূর মুখ ঢেকেচে, না প্রকাশ ক'র্‌চে, তা' বলা যায় না। জলে স্থলে আকাশ মিলে এখানে সন্ধ্যাবেলাকার স্বর্ণ-তোরণের থেকে স্বর্গীয় নহবৎ বাজতে লাগল।

পালতোলা সমুদ্রের নৌকাগুলির মতো মানুষের সুন্দর

সৃষ্টি অতি অল্পই আছে। যেখানে প্রকৃতির ছন্দে লয়ে মানুষকে চল্‌তে হ'য়েচে, সেখানে মানুষের সৃষ্টি সুন্দর না হ'য়ে থাক্‌তে পারে না। নৌকাকে জল বাতাসের সঙ্গে সন্ধি ক'র্‌তে হয়েচে, এই জন্তেই জল বাতাসের শ্রীটুকু সে পেয়েচে। কল যেখানে নিজের জোরে প্রকৃতিকে উপেক্ষা ক'র্‌তে পারে, সেইখানেই সেই ঔদ্ধত্যে মানুষের রচনা কুশ্রী হ'য়ে উঠ্‌তে লজ্জামাত্র করে না। কলের জাহাজে পালের জাহাজের চেয়ে সুবিধা আছে, কিন্তু সৌন্দর্য্য নেই। জাহাজ যখন আস্তে আস্তে বন্দরের গা ঘেঁসে এল, যখন প্রকৃতির চেয়ে মানুষের দুশ্চেষ্টা বড়ো হ'য়ে দেখা দিল, কলের চিম্‌নিগুলো প্রকৃতির বাঁকা ভঙ্গিমার উপর তার সোজা আঁচড় কাটতে লাগ্‌ল, তখন দেখ্‌তে পেলুম মানুষের রিপু জগতে কী কুশ্রীতাই সৃষ্টি ক'রেচে। সমুদ্রের তীরে তীরে, বন্দরে বন্দরে, মানুষের লোভ কদর্য্য ভঙ্গীতে স্বর্গকে ব্যঙ্গ ক'র্‌চে—এম্‌নি ক'রেই নিজেকে স্বর্গ থেকে নির্ব্বাসিত ক'রে দিচ্চে।

তোসা-মারু, পিনাং বন্দর।

৬

২রা জ্যৈষ্ঠ। উপরে আকাশ, নীচে সমুদ্র। দিনে রাত্রে আমাদের দুই চক্ষুর বরাদ্দ এর বেশি নয়। আমাদের চোখ দুটো মা-পৃথিবীর আদর পেয়ে পেটুক হ'য়ে গেচে। তার

পাতে নানা রকমের জোগান দেওয়া চাই। তার অধিকাংশই সে স্পর্শও করে না, ফেলা যায়। কত যে নষ্ট হ'চ্চে বলা যায় না, দেখবার জিনিষ অতিরিক্ত পরিমাণে পাই ব'লেই দেখবার জিনিষ সম্পূর্ণ ক'রে দেখি নে। এই জন্যে মাঝে মাঝে আমাদের পেটুক চোখের পক্ষে এই রকমের উপবাস ভালো।

আমাদের সামনে মস্ত দুটো ভোজের থালা, আকাশ আর সাগর। অভ্যাস দোষে প্রথমটা মনে হয় এ দুটো বুঝি একেবারে শূন্য থালা। তারপর দুই একদিন লঙ্ঘনের পর ক্ষুধা একটু বাড়লেই তখন দেখ্‌তে পাই, যা' আছে তা' নেহাৎ কম নয়। মেঘ ক্রমাগত নতুন নতুন রঙে সরস হ'য়ে আস্‌চে, আলো ক্ষণে ক্ষণে নতুন নতুন স্বাদে আকাশকে এবং জলকে পূর্ণ ক'রে তুল্‌চে।

আমরা দিনরাত পৃথিবীর কোলে কাঁখে থাকি ব'লেই আকাশের দিকে তাকাইনে, আকাশের দিগ্‌বসনকে বলি উলঙ্গতা। যখন দীর্ঘকাল ঐ আকাশের সঙ্গে মুখোমুখি ক'রে থাক্‌তে হয়, তখন তার পরিচয়ের বিচিত্রতায় অবাক্ হ'য়ে থাকি। ওখানে মেঘে মেঘে রূপের এবং রঙের অহেতুক বিকাশ। এ যেন গানের আলাপের মতো, রূপ-রঙের রাগ-রাগিণীর আলাপ চল্‌চে—তাল নেই, আকার আয়তনের বাঁধাবাঁধি নেই, কোনো অর্থবিশিষ্ট বাণী নেই, কেবলমাত্র মুক্ত সুরের লীলা। সেই সঙ্গে সমুদ্রের অপ্সর-নৃত্য ও মুক্ত ছন্দের নাচ। তার মৃদঙ্গে যে বোল বাজচে তার ছন্দ এমন

বিপুল যে, তার লয় খুঁজে পাওয়া যায় না। তাতে নৃত্যের উল্লাস আছে, অথচ নৃত্যের নিয়ম নেই।

এই বিরাট রঙ্গশালায় আকাশ এবং সমুদ্রের যে রঙ্গ, সেইটি দেখবার শক্তি ক্রমে আমাদের বেড়ে ওঠে। জগতে যা'-কিছু মহান, তার চারিদিকে একটা বিরলতা আছে, তার পট-ভূমিকা (back ground) সাদাসিদে। সে আপনাকে দেখাবার জন্যে আর কিছুর সাহায্য নিতে চায় না। নিশীথের নক্ষত্রসভা অসীম অন্ধকারের অবকাশের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করে। এই সমুদ্র-আকাশের যে বৃহৎ প্রকাশ, সেও বহু-উপকরণের দ্বারা আপন মর্য্যাদা নষ্ট করে না। এরা হ'ল জগতের বড়ো ওস্তাদ, ছলাকলায় আমাদের মন ভোলাতে এরা অবজ্ঞা করে। মনকে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আপন হ'তে অগ্রসর হ'য়ে এদের কাছে যেতে হয়। মন যখন নানা ভোগে জীর্ণ হ'য়ে অলস এবং "অন্যথাবৃত্তি" হ'য়ে থাকে, তখন এই ওস্তাদের আলাপ তার পক্ষে অত্যন্ত ফাঁকা।

আমাদের সুবিধে হয়েচে, সাম্‌নে আমাদের আর কিছু নেই। অন্যবারে যখন বিলিতি যাত্রী-জাহাজে সমুদ্র পাড়ি দিয়েচি, তখন যাত্রীরাই ছিল এক দৃশ্য। তারা নাচে গানে খেলায় গোলেমালে অনন্তকে আচ্ছন্ন ক'রে রাখ্‌ত। এক মুহূর্ত্তও তারা ফাঁকা ফেলে রাখ্‌তে চাইত না। তার উপরে সাজসজ্জা, কায়দাকানুনের উপসর্গ ছিল। এখানে জাহাজের ডেকের সঙ্গে সমুদ্র-আকাশের কোনো প্রতিযোগিতা নেই।

যাত্রীর সংখ্যা অতি সামান্য, আমরাই চারজন ; বাকী দু-তিন জন ধীর প্রকৃতির লোক। তারপরে ঢিলাঢালা বেশেই ঘুমচ্চি, জাগচি, খেতে যাচ্চি, কারো কোনো আপত্তি নেই ; তার প্রধান কারণ, এমন কোনো মহিলা নেই, আমাদের অপরিচ্ছন্নতায় যাঁব অসম্ভ্রম হ'তে পারে।

এই জন্যেই প্রতিদিন আমরা বুঝ্‌তে পারচি, জগতে সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত সামান্য ব্যাপাব নয়, তার অভ্যর্থনার জন্যে স্বর্গ মর্ত্ত্যে রাজকীয় সমারোহ। প্রভাতে পৃথিবী তার ঘোম্‌টা খুলে দাঁড়ায়, তার বাণী নানা সুরে জেগে উঠে ; সন্ধ্যায় স্বর্গলোকের যবনিকা উঠে যায়, এবং দ্যুলোক আপন জ্যোতি-রোমাঞ্চিত নিঃশব্দতার দ্বারা পৃথিবীর সম্ভাষণের উত্তর দেয়। স্বর্গমর্ত্ত্যেব এই মুখোমুখি আলাপ যে কত গম্ভীর এবং কত মহীয়ান, এই আকাশ ও সমুদ্রের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তা' আমরা বুঝতে পারি।

দিগন্ত থেকে দেখতে পাই মেঘগুলো নানা ভঙ্গীতে আকাশে উঠে চলেচে, যেন সৃষ্টিকর্ত্তার আঙিনার আকার-ফোয়ারার মুখ খুলে গেচে। বস্তু প্রায় কিছুই নেই, কেবল আকৃতি, কোনোটার সঙ্গে কোনোটার মিল নেই। নানা বকমের আকার ;—কেবল সোজা লাইন নেই। সোজা লাইনটা মানুষের হাতের কাজের। তার ঘরের দেওয়ালে, তার কার-খানা-ঘরের চিম্‌নিতে মানুষের জয়স্তম্ভ একেবারে সোজা খাড়া। বাঁকা রেখা জীবনের রেখা, মানুষ সহজে তাকে আয়ত্ত

ক'রতে পারে না। সোজা রেখা জড় রেখা সে সহজেই মানুষের শাসন মানে; সে মানুষের বোঝা বয়, মানুষের অত্যাচার সয়।

যেমন আকৃতির হরির লুঠ, তেমনি রঙের। রং যে কত-রকম হ'তে পারে, তার সীমা নেই। রঙের তান উঠ্‌চে, তানের উপর তান; তাদের মিলও যেমন, তাদের অমিলও তেমনি; তারা বিরুদ্ধ নয়, অথচ বিচিত্র। রঙের সমারোহেও যেমন প্রকৃতির বিলাস, রঙের শান্তিতেও তেম্‌নি। সূর্য্যাস্তের মুহূর্ত্তে পশ্চিম আকাশ যেখানে রঙের ঐশ্বর্য্য পাগলের মতো দুই হাতে বিনা প্রয়োজনে ছড়িয়ে দিচ্চে সেও যেমন আশ্চর্য্য, পূর্ব্ব আকাশে যেখানে শান্তি এবং সংযম, সেখানেও রঙের পেলবতা, কোমলতা, অপরিমেয় গভীরতা তেমনি আশ্চর্য্য। প্রকৃতির হাতে অপর্য্যাপ্তও যেমন মহৎ হ'তে পারে, পর্য্যাপ্তও তেমনি; সূর্য্যাস্তে সূর্য্যোদয়ে প্রকৃতি আপনার ডাইনে বাঁয়ে একই কালে সেটা দেখিয়ে দেয়; তার খেয়াল আর ধ্রুপদ একই সঙ্গে বাজ্‌তে থাকে, অথচ কেউ কারো মহিমাকে আঘাত করে না।

তার পরে, রঙের আভায়-আভায় জল যে কত বিচিত্র কথাই ব'ল্‌তে পারে তা' কেমন ক'রে বর্ণনা ক'র্‌ব। সে তার জল-তরঙ্গে রঙের যে গৎ বাজাতে থাকে, তাতে সুরের চেয়ে শ্রুতি অসংখ্য। আকাশ যে-সময়ে তার প্রশান্ত স্তব্ধতার উপর রঙের মহতোমহীয়ানকে দেখায়, সমুদ্র সেই সময় তার ছোটো

ছোটো লহরীর কম্পনে রঙের অণোরণীয়ান্‌কে দেখাতে থাকে, তখন আশ্চর্য্যের অন্ত পাওয়া যায় না।

সমুদ্র-আকাশের গীতিনাট্য-লীলায় রুদ্রের প্রকাশ কী-রকম দেখা গেছে, সে পূর্ব্বেই বলেছি। আবার কালও তিনি তাঁর ডমরু বাজিয়ে অট্টহাস্যে আর এক ভঙ্গীতে দেখা দিয়ে গেলেন। সকালে আকাশ জুড়ে নীল মেঘ এবং ধোঁয়ালো মেঘ স্তরে স্তরে পাকিয়ে পাকিয়ে ফুলে ফুলে উঠ্‌ল। মুষলধারে বৃষ্টি। বিদ্যুৎ আমাদের জাহাজের চারিদিকে তার তলোয়ার খেলিয়ে বেড়াতে লাগ্‌ল। তার পিছনে পিছনে বজ্রের গর্জ্জন। একটা বজ্র ঠিক আমাদের সাম্‌নে জলের উপর পড়্‌ল, জল থেকে একটা বাষ্প-রেখা সাপের মতো ফোঁস ক'রে উঠ্‌ল। আর একটা বজ্র পড়্‌ল আমাদের সাম্‌নেকার মাস্তুলে। রুদ্র যেন সুইট্‌জারল্যাণ্ডের ইতিহাস-বিশ্রুত বীর উইলিয়ম টেলের মতো তাঁর অদ্ভুত ধনুর্বিদ্যার পরিচয় দিয়ে গেলেন, মাস্তুলের ডগাটায় তাঁর বাণ লাগ্‌ল, আমাদের স্পর্শ ক'র্‌ল না। এই ঝড়ে আমাদের সঙ্গী আর একটা জাহাজের প্রধান মাস্তুল বিদীর্ণ হ'য়েচে শুনলুম। মানুষ যে বাঁচে এই আশ্চর্য্য।

৭

এই কয়দিন আকাশ এবং সমুদ্রের দিকে চোখ ভরে দেখ্‌চি, আর মনে হ'চ্চে অন্তরের রং তো শুভ্র নয়, তা

কালো কিম্বা নীল। এই আকাশ খানিক দূর পর্য্যন্ত আকাশ অর্থাৎ প্রকাশ—ততটা সে সাদা। তারপরে সে অব্যক্ত, সেইখান থেকে সে নীল। আলো যতদূর, সীমার রাজ্য সেই পর্য্যন্ত; তারপরেই অসীম অন্ধকার। সেই অসীম অন্ধকারের বুকের উপরে এই পৃথিবীর আলোকময় দিনটুকু যেন কৌস্তুভমণির হার দুল্‌চে।

এই প্রকাশের জগৎ, এই গৌরাঙ্গী, তার বিচিত্র রঙের সাজ প'রে অভিসারে চলেচে—ঐ কালোর দিকে, ঐ অনির্ব্বচনীয় অব্যক্তর দিকে। বাঁধা নিয়মের মধ্যে বাঁধা থাকাতেই তার মরণ—সে কুলকেই সর্ব্বস্ব ক'রে চুপ ক'রে ব'সে থাক্‌তে পারে না, সে কুল খুইয়ে বেরিয়ে পড়েচে। এই বেরিয়ে যাওয়া বিপদের যাত্রা, পথে কাঁটা, পথে সাপ, পথে ঝড় বৃষ্টি,—সমস্তকে অতিক্রম ক'রে, বিপদকে উপেক্ষা ক'রে সে যে চলেচে, সে কেবল ঐ অব্যক্ত অসীমের টানে। অব্যক্তর দিকে, "আরোর" দিকে প্রকাশের এই কুল-খোয়ানো অভিসার-যাত্রা,—প্রলয়ের ভিতর দিয়ে, বিপ্লবের কাঁটাপথে পদে পদে রক্তের চিহ্ন এঁকে।

কিন্তু কেন চলে, কোন্ দিকে চলে, ওদিকে তো পথের চিহ্ন নেই, কিছু তো দেখ্‌তে পাওয়া যায় না?—না, দেখা যায় না, সব অব্যক্ত। কিন্তু শূন্য তো নয়,—কেননা ঐ দিক থেকেই বাঁশির সুর আস্‌চে। আমাদের চলা, এ চোখে দেখে চলা নয়, এ সুরের টানে চলা। যেটুকু চোখে দেখে

চলি, সে তো বুদ্ধিমানের চলা,—তা'র হিসাব আছে, তার প্রমাণ আছে: সে ঘুরে ঘুরে কূলের মধ্যেই চলা। সে চলায় কিছুই এগোয় না। আর যেটুকু বাঁশি শুনে পাগল হ'য়ে চলি, যে-চলায় মরা বাঁচা জ্ঞান থাকে না, সেই পাগলের চলাতেই জগৎ এগিয়ে চলেচে। সেই চলাকে নিন্দার ভিতর দিয়ে, বাধার ভিতর দিয়ে চল্‌তে হয়, কোনো নজির মান্‌তে গেলেই তাকে থম্‌কে দাঁড়াতে হয়। তার এই চলার বিরুদ্ধে হাজার রকম যুক্তি আছে, সে যুক্তি তর্কের দ্বারা খণ্ডন করা যায় না; তার এই চলার কেবল একটিমাত্র কৈফিয়ৎ আছে,—সে ব'ল্‌চে ঐ অন্ধকারের ভিতর দিয়ে বাঁশি আমাকে ডাক্‌চে। নইলে কেউ কি সাধ ক'রে আপনার সীমা ডিঙিয়ে যেতে পারে?

যেদিক থেকে ঐ মনোহরণ অন্ধকারের বাঁশি বাজ্‌চে, ঐ দিকেই মানুষের সমস্ত আরাধনা, সমস্ত কাব্য, সমস্ত শিল্পকলা, সমস্ত বীরত্ব, সমস্ত আত্মত্যাগ মুখ ফিরিয়ে আছে; ঐ দিকে চেয়েই মানুষ রাজ্যসুখ জলাঞ্জলি দিয়ে বিরাগী হ'য়ে বেরিয়ে গেছে, মরণকে মাথায় ক'রে নিয়েচে। ঐ কালোকে দেখে মানুষ ভুলেচে। ঐ কালোর বাঁশিতেই মানুষকে উত্তর মেরু দক্ষিণ মেরুতে টানে, অণুবীক্ষণ দূরবীক্ষণের রাস্তা বেয়ে মানুষের মন দুর্গমের পথে ঘুরে বেড়ায়, বারবার ম'র্‌তে ম'র্‌তে আকাশ-পারের ডানা মেল্‌তে থাকে।

মানুষের মধ্যে যে-সব মহাজাতি কুলত্যাগিনী, তারাই এগচ্চে,—ভয়ের ভিতর থেকে অভয়ে, বিপদের ভিতর দিয়ে সম্পদে। যারা সর্ব্বনাশা কালোর বাঁশি শুন্‌তে পেলে না, তারা কেবল পুঁথির নজির জড় ক'রে কুল আঁকড়ে ব'সে রইল—তারা কেবল শাসন মান্‌তেই আছে। তারা কেন বৃথা এই আনন্দলোকে জন্মেচে, যেখানে সীমা কাটিয়ে অসীমের সঙ্গে নিত্য লীলাই হ'চ্চে জীবন-যাত্রা, যেখানে বিধানকে ভাসিয়ে দিতে থাকাই হ'চ্চে বিধি।

আবার উল্টোদিক থেকে দেখ্‌লে দেখ্‌তে পাই, ঐ কালো অনন্ত আস্‌চেন তাঁর আপনার শুভ্র জ্যোতির্ম্ময়ী আনন্দমূর্ত্তির দিকে। অসীমের সাধনা এই সুন্দরীর জন্যে, সেই জন্যেই তাঁর বাঁশি বিরাট অন্ধকারের ভিতর দিয়ে এমন ব্যাকুল হ'য়ে বাজচে, অসীমের সাধনা এই সুন্দরীকে নূতন নূতন মালায় নূতন ক'রে সাজাচ্চে। ঐ কালো এই রূপসীকে এক মুহূর্ত্ত বুকের থেকে নামিয়ে রাখ্‌তে পারেন না,—কেননা এ যে তাঁর পরমা সম্পদ। ছোটোর জন্যে বড়োর এই সাধনা যে কী অসীম, তা ফুলের পাপড়িতে পাপড়িতে, পাখীর পাখায় পাখায়, মেঘের রঙে রঙে, মানুষের হৃদয়ের অপরূপ লাবণ্যে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ধরা পড়্‌চে। রেখায় রেখায়, রঙে রঙে, রসে রসে তৃপ্তির আর শেষ নেই। এই আনন্দ কিসের?—অব্যক্ত যে ব্যক্তর মধ্যে কেবলই আপনাকে

প্রকাশ ক'র্‌চেন, আপনাকে ত্যাগ ক'রে ক'রে ফিরে পাচ্চেন।

এই অব্যক্ত কেবলি যদি নাম-মাত্র, শূন্যমাত্র হ'তেন,—তাহ'লে প্রকাশের কোনো অর্থ ই থাক্‌ত না, তাহ'লে বিজ্ঞানের অভিব্যক্তি কেবল একটা শব্দমাত্র হ'ত। ব্যক্ত যদি অব্যক্তেরই প্রকাশ না হ'ত, তাহ'লে যা-কিছু আছে তা নিশ্চল হ'য়ে থাক্‌ত, কেবলি আরো-কিছুর দিকে আপনাকে নূতন ক'রে তুল্‌ত না। এই আরো-কিছুর দিকেই সমস্ত জগতের আনন্দ কেন—এই অজানা আরো-কিছুর বাঁশি শুনেই সে কুল ত্যাগ করে কেন ? ঐ দিকে শূন্য নয় ব'লেই, ঐ দিকেই সে পূর্ণকে অনুভব করে ব'লেই। সেই জন্যই উপনিষদ ব'লেচেন—ভূমৈব সুখং, ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ। সেইজন্যই তো সৃষ্টির এই লীলা দেখ্‌চি, আলো এগিয়ে চলেচে অন্ধকারের অকূলে, অন্ধকার নেমে আস্‌চে আলোয় কূলে। আলোর মন ভুল্‌চে কালোয়, কালোর মন ভুলেচে আলোয়।

মানুষ যখন জগৎকে না-এর দিক থেকে দেখে, তখন তার রূপক একেবারে উল্টে যায়। প্রকাশের একটা উল্টো পিঠ আছে, সে হ'চ্চে প্রলয়। মৃত্যুর ভিতর দিয়ে ছাড়া প্রাণের বিকাশ হ'তেই পারে না। হ'য়ে-ওঠার মধ্যে দুটো জিনিষ থাকাই চাই,—যাওয়া এবং হওয়া। হওয়াটাই হ'চ্চে মুখ্য, যাওয়াটাই গৌণ।

কিন্তু মানুষ যদি উল্টো পিঠেই চোখ রাখে,—বলে সবই

যাচ্চে, কিছুই থাক্‌চে না ; বলে জগৎ বিনাশেরই প্রতিরূপ, সমস্তই মায়া, যা-কিছু দেখ্‌চি, এ-সমস্তই "না" ; তাহ'লে এই প্রকাশের রূপকেই সে কালো ক'রে, ভয়ঙ্কর ক'রে দেখে ; তখন সে দেখে, এই কালো কোথাও এগচ্চে না, কেবল বিনাশের বেশে নৃত্য ক'র্‌চে। আর অনন্ত র'য়েচেন আপনাতে আপনি নির্লিপ্ত, এই কালিমা তাঁর বুকের উপর মৃত্যুর ছায়ার মতো চঞ্চল হ'য়ে বেড়াচ্চে, কিন্তু স্তব্ধকে স্পর্শ ক'র্‌তে পার্‌চে না। এই কালো দৃশ্যত আছে, কিন্তু বস্তুত নেই—আর যিনি কেবলমাত্র আছেন, তিনি স্থির, ঐ প্রলয়-রূপিণী না-থাকা তাঁকে লেশমাত্র বিক্ষুব্ধ করে না। এখানে আলোর সঙ্গে কালোর সেই সম্বন্ধ, থাকার সঙ্গে না-থাকার যে সম্বন্ধ। কালোর সঙ্গে আলোর আনন্দের লীলা নেই, এখানে যোগের অর্থ হ'চ্চে প্রেমের যোগ নয়, জ্ঞানের যোগ। দুইয়ের যোগে এক নয়, একের মধ্যেই এক। মিলনে এক নয়, প্রলয়ে এক।

কথাটাকে আর একটু পরিষ্কার ক'র্‌বার চেষ্টা করি।

একজন লোক ব্যবসা ক'র্‌চে। সে লোক ক'র্‌চে কী ?—তার মূলধনকে, অর্থাৎ পাওয়া-সম্পদকে, সে মুনফা, অর্থাৎ না-পাওয়া সম্পদের দিকে প্রেরণ ক'র্‌চে। পাওয়া-সম্পদটা সীমাবদ্ধ ও ব্যক্ত, না-পাওয়া সম্পদটা অসীম ও অব্যক্ত। পাওয়া-সম্পদ সমস্ত বিপদ স্বীকার ক'রে না-পাওয়া সম্পদের অভিসারে চলেচে। না-পাওয়া সম্পদ অদৃশ্য ও অলব্ধ বটে,

কিন্তু তার বাঁশি বাজচে,—সেই বাঁশি ভূমার বাঁশি। যে বণিক সেই বাঁশি শোনে, সে আপন ব্যাঙ্কে জমানো কোম্পানি-কাগজের কুল ত্যাগ ক'রে; সাগর গিরি ডিঙিয়ে বেরিয়ে পড়ে। এখানে কী দেখ্‌চি?—না, পাওয়া-সম্পদের সঙ্গে না-পাওয়া সম্পদের একটি লাভের যোগ আছে। এই যোগে উভয়ত আনন্দ। কেননা, এই যোগে পাওয়া না-পাওয়াকে পাচ্চে, এবং না-পাওয়া পাওয়ার মধ্যে ক্রমাগত আপনাকেই পাচ্চে।

কিন্তু মনে করা যাক্, একজন ভীতু লোক বণিকের খাতায় ঐ খরচের দিকের হিসাবটাই দেখ্‌চে। বণিক কেবলি আপনার পাওয়া-টাকা খরচ ক'রেই চলেছে, তার অন্ত নেই। তার গা শিউরে ওঠে! সে বলে, এই তো প্রলয়! খরচের হিসাবের কালো অঙ্কগুলো রক্তলোলুপ রসনা দুলিয়ে কেবলি যে নৃত্য ক'র্‌চে। যা খরচ,—অর্থাৎ বস্তুত যা নেই,—তাই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অঙ্ক-বস্তুর আকার ধ'রে খাতা জুড়ে বেড়ে বেড়েই চলেচে। একেই তো বলে মায়া। বণিক মুগ্ধ হ'য়ে এই মায়া-অঙ্কটির চিরদীর্ঘায়মান শৃঙ্খল কাটাতে পার্‌চে না। এস্থলে মুক্তিটা কী?—না, ঐ সচল অঙ্কগুলোকে একেবারে লোপ ক'রে দিয়ে খাতার নিশ্চল নির্ব্বিকার শুভ্র কাগজের মধ্যে নিরাপদ ও নিরঞ্জন হ'য়ে স্থিরত্ব লাভ করা। দেওয়া ও পাওয়ার মধ্যে যে-একটি আনন্দময় সম্বন্ধ আছে, সে সম্বন্ধ থাকার দরুণ মানুষ দুঃসাহসের পথে যাত্রা ক'রে মৃত্যুর মধ্য

দিয়ে জয়লাভ করে, ভীতু মানুষ তাকে দেখ্‌তে পায় না। তাই বলে—

মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা
ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা।

চীন সমুদ্র
তোসা-মারু
৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩।

৮

শুনেছিলুম, পারস্যের রাজা যখন ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন, তখন হাতে-খাওয়ার প্রসঙ্গে তিনি ইংরেজকে বলেছিলেন, কাঁটাচামচ দিয়ে খেতে গিয়ে তোমরা খাওয়ার একটা আনন্দ থেকে বঞ্চিত হও।' যারা ঘটকের হাত দিয়ে বিয়ে করে তারা কোর্টশিপের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়। হাত দিয়ে স্পর্শ করেই খাবারের সঙ্গে কোর্টশিপ আরম্ভ হয়। আঙুলের ডগা দিয়েই স্বাদগ্রহণের সুরু।

আমার তেমনি জাহাজ থেকেই জাপানের স্বাদ সুরু হয়েচে। যদি ফরাসী-জাহাজে ক'রে জাপানে যেতুম, তা'হলে আঙুলের ডগা দিয়ে পরিচয় আরম্ভ হ'ত না।

এর আগে অনেকবার বিলিতি জাহাজে ক'রে সমুদ্র যাত্রা করেচি—তার সঙ্গে এই জাহাজের বিস্তর তফাৎ। সে সব

জাহাজের কাপ্তেন ঘোরতর কাপ্তেন। যাত্রীদের সঙ্গে খাওয়া দাওয়া হাসি তামাসা যে তার বন্ধ—তা নয়; কিন্তু কাপ্তেনীটা খুব টকটকে রাঙা। এত জাহাজে আমি ঘুরেচি, তার মধ্যে কোনো কাপ্তেনকেই আমার মনে পড়ে না। কেননা তারা কেবলমাত্র জাহাজের অঙ্গ। জাহাজ-চালানোর মাঝখান দিয়ে তাদের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ।

হ'তে পারে আমি যদি য়ুরোপীয় হতুম, তাহলে তারা যে কাপ্তেন ছাড়াও আর কিছু—তারা যে মানুষ—এটা আমার অনুভব ক'রতে বিশেষ বাধা হ'ত না। কিন্তু এ জাহাজেও আমি বিদেশী,—একজন য়ুরোপীয়ের পক্ষেও আমি যা, একজন জাপানীর পক্ষেও আমি তাই।

এ জাহাজে চড়ে অবধি দেখতে পাচ্ছি, আমাদের কাপ্তেনের কাপ্তেনীটা কিছুমাত্র লক্ষ্যগোচর নয়, একেবারেই সহজ মানুষ। যাঁরা তাঁর নিম্নতর কর্ম্মচারী, তাঁদের সঙ্গে তাঁর কর্ম্মের সম্বন্ধ এবং দূরত্ব আছে, কিন্তু যাত্রীদের সঙ্গে কিছুমাত্র নেই। ঘোরতর ঝড়ঝাপটের মধ্যেও তাঁর ঘরে গেছি,—দিব্যি সহজ ভাব। কথায় বার্ত্তায় ব্যবহারে তাঁর সঙ্গে আমাদের যে জমে গিয়েচে, সে কাপ্তেন-হিসাবে নয়, মানুষ-হিসাবে। এ যাত্রা আমাদের শেষ হ'য়ে যাবে, তাঁর সঙ্গে জাহাজ-চলার সম্বন্ধ আমাদের ঘুচে যাবে, কিন্তু তাঁকে আমাদের মনে থাক্‌বে।

আমাদের ক্যাবিনের যে ষ্টুয়ার্ড আছে, সেও দেখি তার

কাজকর্ম্মের সীমাটুকুর মধ্যেই শক্ত হ'য়ে থাকে না। আমরা আপনাদের মধ্যে কথাবার্ত্তা কচ্চি, তার মাঝখানে এসে সেও ভাঙা ইংরাজিতে যোগ দিতে বাধা বোধ করে না। মুকুল ছবি আঁক্‌চে, সে এসে খাতা চেয়ে নিয়ে তার মধ্যে ছবি আঁক্‌তে লেগে গেল।

আমাদের জাহাজের যিনি খাজাঞ্চি, তিনি একদিন এসে আমাকে বল্লেন,—আমার মনে অনেক বিষয়ে প্রশ্ন আসে, তোমার সঙ্গে তার বিচার ক'র্‌তে ইচ্ছে করি; কিন্তু আমি ইংরাজি এত কম জানি যে, মুখে মুখে আলোচনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তুমি যদি কিছু না মনে কর, তবে আমি মাঝে মাঝে কাগজে আমার প্রশ্ন লিখে এনে দেব, তুমি অবসরমত সংক্ষেপে দু'চার কথায় তার উত্তর লিখে দিয়ো।— তারপর থেকে রাষ্ট্রের সঙ্গে সমাজের সম্বন্ধ কী, এই নিয়ে তাঁর সঙ্গে আমার প্রশ্নোত্তর চল্‌চে।

অন্য কোন জাহাজের খাজাঞ্চি এই সব প্রশ্ন নিয়ে যে মাথা বকায়, কিম্বা নিজের কাজকর্ম্মের মাঝখানে এরকম উপসর্গের সৃষ্টি করে, এরকম আমি মনে ক'র্‌তে পারিনে। এদের দেখে আমার মনে হয় এরা নূতন-জাগ্রত জাতি,—এরা সমস্তই নূতন ক'রে জান্‌তে, নূতন ক'রে ভাবতে উৎসুক। ছেলেরা নতুন জিনিষ দেখ্‌লে যেমন ব্যগ্র হ'য়ে ওঠে, আইডিয়া সম্বন্ধে এদের যেন সেইরকম ভাব।

তা ছাড়া আর একটা বিশেষত্ব এই যে, একপক্ষে

জাহাজের যাত্রী. আর এক পক্ষে জাহাজের কর্ম্মচারী, এর মাঝখানকার গণ্ডিটা তেমন শক্ত নয়। আমি যে এই খাজাঞ্চির প্রশ্নের উত্তর লিখ্‌তে বসব, এ কথা মনে ক'র্‌তে তার কিছু বাধেনি,—আমি ছুটো কথা শুন্‌তে চাই, তুমি ছুটো কথা বল্‌বে; এতে বিঘ্ন কী আছে? মানুষের উপর মানুষের যে একটি দাবী আছে, সেই দাবীটা সরলভাবে উপস্থিত ক'র্‌লে মনের মধ্যে আপনি সাড়া দেয়, তাই আমি খুসি হ'য়ে আমার সাধ্যমত এই আলোচনায় যোগ দিয়েচি।

আর একটা জিনিষ আমার বিশেষ ক'রে চোখে লাগ্‌চে। মুকুল বালকমাত্র, সে ডেকের প্যাসেঞ্জার। কিন্তু জাহাজের কর্ম্মচারীরা তার সঙ্গে অবাধে বন্ধুত্ব ক'র্‌চে। কি ক'রে জাহাজ চালায়, কি ক'রে সমুদ্রে পথ নির্ণয় করে, কি ক'রে গ্রহনক্ষত্র পর্য্যবেক্ষণ ক'র্‌তে হয়, কাজ ক'র্‌তে ক'র্‌তে তারা এই সমস্ত তাকে বোঝায়। তা ছাড়া নিজেদের কাজকর্ম্ম আশাভরসার কথাও ওর সঙ্গে হয়। মুকুলের সখ গেল, জাহাজের এঞ্জিনের ব্যাপার দেখ্‌বে। ওকে কাল রাত্রি এগারোটার সময় জাহাজের পাতালপুরীর মধ্যে নিয়ে গিয়ে, এক ঘণ্টা ধরে সমস্ত দেখিয়ে আন্‌লে।

কাজের সম্বন্ধের ভিতর দিয়েও মানুষের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্বন্ধ—এইটেই বোধ হয় আমাদের পূর্ব্বদেশের জিনিষ। পশ্চিমদেশ কাজকে খুব শক্ত ক'রে খাড়া ক'রে রাখে, সেখানে মানব-সম্বন্ধের দাবী ঘেঁষতে পারে না। তাতে কাজ খুব পাকা

হয় সন্দেহ নেই। আমি ভেবেছিলুম জাপান তো য়ুরোপের কাছ থেকে কাজের দীক্ষা গ্রহণ করেচে, অতএব তার কাজের গণ্ডিও বোধ হয় পাকা। কিন্তু এই জাপানী জাহাজে কাজ দেখতে পাচ্চি, কাজের গণ্ডিগুলোকে দেখতে পাচ্চিনে। মনে হ'চ্চে যেন আপনার বাড়ীতে আছি—কোম্পানির জাহাজে নেই। অথচ ধোওয়া মাজা প্রভৃতি জাহাজের নিত্যকর্ম্মের কোনো খুঁৎ নেই।

প্রাচ্যদেশে মানবসমাজের সম্বন্ধগুলি বিচিত্র এবং গভীর। পূর্ব্বপুরুষ যাঁরা মারা গিয়েছেন, তাঁদের সঙ্গেও আমাদের সম্বন্ধ ছিন্ন হয় না। আমাদের আত্মীয়তার জাল বহুবিস্তৃত। এই নানা সম্বন্ধের নানা দাবী মেটানো আমাদের চিরাভ্যস্ত, সেই জন্যে তাতে আমাদের আনন্দ। আমাদের ভৃত্যেরাও কেবল বেতনের নয়, আত্মীয়তার দাবী করে। সেই জন্যে যেখানে আমাদের কোনো দাবী চলেনা, যেখানে কাজ অত্যন্ত খাড়া, সেখানে আমাদের প্রকৃতি কষ্ট পায়। অনেক সময়ে ইংরেজ মুনিবের সঙ্গে বাঙালী কর্ম্মচারীর যে বোঝাপড়ার অভাব ঘটে, তার কারণ এই,—ইংরেজি কর্ত্তা বাঙালী কর্ম্মচারীর দাবী বুঝ্‌তে পারে না, বাঙালী কর্ম্মচারী ইংরেজ কর্ত্তার কাজের কড়া শাসন বুঝ্‌তে পারে না। কর্ম্মশালার কর্ত্তা যে কেবলমাত্র কর্ত্তা হবে, তা নয়—মা বাপ হবে, বাঙালী কর্ম্মচারী চিরকালের অভ্যাস বশত এইটে প্রত্যাশা করে ; যখন বাধা পায় তখন আশ্চর্য্য হয়, এবং মনে মনে মনিবকে দোষ না দিয়ে থাকতে পারে না।

ইংরেজ কাজের দাবীকে মান্‌তে অভ্যস্ত, বাঙালী মানুষের দাবীকে মান্‌তে অভ্যস্ত,—এই জন্যে উভয় পক্ষে ঠিকমত মিট্‌মাট্‌ হ'তে চায় না।

কিন্তু কাজের সম্বন্ধ এবং মানুষের সম্বন্ধ, এ দুইয়ের বিচ্ছেদ না হ'য়ে সামঞ্জস্য হওয়াটাই দরকার, এ কথা না মনে ক'রে থাকা যায় না। কেমন ক'রে সামঞ্জস্য হ'তে পারে, বাইরে থেকে তাব কোনো বাঁধা নিয়ম ঠিক ক'রে দেওয়া যায় না। সত্যকার সামঞ্জস্য প্রকৃতিব ভিতর থেকে ঘটে। আমাদের দেশে প্রকৃতিব এই ভিতরকাব সামঞ্জস্য ঘটে ওঠা কঠিন—কেননা যাঁবা আমাদেব কাজের কর্ত্তা, তাঁদের নিয়ম অনুসারেই আমরা কাজ চালাতে বাধ্য।

জাপানে প্রাচ্যমন পাশ্চাত্যের কাছ থেকে কাজের শিক্ষা-লাভ কবেচে, কিন্তু কাজের কর্ত্তা তাবা নিজেই। এই জন্যে মনের ভিতবে একটা আশা হয় যে, জাপানে হয় তো পাশ্চাত্য কাজের সঙ্গে প্রাচ্যভাবেব একটা সামঞ্জস্য ঘটে উঠ্‌তে পারে। যদি সেটা ঘটে, তবে সেইটেই পূর্ণতার আদর্শ হবে। শিক্ষার প্রথম অবস্থায় অনুকরণের ঝাঁজটা যখন কড়া থাকে, তখন বিধিবিধান সম্বন্ধে ছাত্র গুরুর চেয়ে আরো কড়া হয়; কিন্তু ভিতরকার প্রকৃতি আস্তে আস্তে আপনার কাজ ক'র্‌তে থাকে, এবং শিক্ষার কড়া অংশগুলোকে নিজের জারক রসে গলিয়ে আপন ক'রে নেয়। এই জীর্ণ ক'রে নেওযার কাজটা একটু সময়সাধ্য। এই জন্যেই পশ্চিমেব শিক্ষা জাপানে

কী আকার ধারণ ক'র্‌বে, সেটা স্পষ্ট ক'রে দেখাবার সময় এখনো হয় নি। সম্ভবত এখন আমরা প্রাচ্য পাশ্চাত্যের বিস্তর অসামঞ্জস্য দেখ্‌তে পাব, যেটা কুশ্রী। আমাদের দেশেও পদে পদে তা দেখ্‌তে পাওয়া যায়। কিন্তু প্রকৃতির কাজই হ'চ্চে অসামঞ্জস্যগুলোকে মিটিয়ে দেওয়া। জাপানে সেই কাজ চল্‌চে সন্দেহ নেই। অন্ততঃ এই জাহাজ টুকুর মধ্যে আমি তো এই দুই ভাবের মিলনের চিহ্ন দেখ্‌তে পাচ্চি।

৯

২রা জ্যৈষ্ঠে আমাদের জাহাজ সিঙাপুরে এসে পৌঁছল। অনতিকাল পরেই একজন জাপানী যুবক আমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে এলেন; তিনি এখানকার একটি জাপানী কাগজের সম্পাদক। তিনি আমাকে বল্লেন, তাঁদের জাপানের সব চেয়ে বড়ো দৈনিক পত্রের সম্পাদকের কাছ থেকে তাঁরা তার পেয়েচেন যে আমি জাপানে যাচ্চি, সেই সম্পাদক আমার কাছ থেকে একটি বক্তৃতা আদায় কর্‌বার জন্যে অনুরোধ করেচেন। আমি বল্লুম, জাপানে না পৌঁছে আমি এ বিষয়ে আমার সম্মতি জানাতে পারব না। তখনকার মতো এই টুকুতেই মিটে গেল। আমাদের যুবক ইংরেজ বন্ধু পিয়ার্সন এবং মুকুল সহর দেখ্‌তে বেরিয়ে গেলেন। জাহাজ একে-

বারে ঘাটে লেগেচে। এই জাহাজের ঘাটের চেয়ে কুশ্রী বিভীষিকা আর নেই—এরি মধ্যে যেন মেঘ ক'রে বাদলা দেখা দিলে। বিকট ঘড়ঘড় শব্দে জাহাজ থেকে মাল ওঠানো নাবানো চল্‌তে লাগ্‌ল। আমি কুঁড়ে মানুষ, কোমর বেঁধে সহর দেখ্‌তে বেরনো আমার ধাতে নেই। আমি সেই বিষম গোলমালের সাইক্লোনের মধ্যে ডেক্-এ বসে মনকে কোনো-মতে শান্ত ক'রে রাখবার জন্যে লিখ্‌তে ব'সে গেলুম।

খানিক বাদে কাপ্তেন এসে খবর দিলেন যে, একজন জাপানী মহিলা আমার সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে চান। আমি লেখা বন্ধ ক'রে একটি ইংরাজি-বেশ-পরা জাপানী মহিলার সঙ্গে আলাপে প্রবৃত্ত হলুম। তিনিও সেই জাপানী সম্পাদকের পক্ষ নিয়ে, বক্তৃতা করবার জন্যে আমাকে অনুরোধ ক'র্‌তে লাগ্‌লেন। আমি বহু কষ্টে সে অনুরোধ কাটালুম। তখন তিনি বল্লেন, আপনি যদি একটু সহর বেড়িয়ে আস্‌তে ইচ্ছা করেন তো আপনাকে সব দেখিয়ে আন্‌তে পারি। তখন সেই বস্তা তোলার নিরন্তর শব্দ আমার মনটাকে জাঁতার মতো পিষ্‌ছিল, কোথাও পালাতে পার্‌লে বাঁচি,—সুতরাং আমাকে বেশী পীড়াপীড়ি ক'র্‌তে হ'ল না। সেই মহিলাটির মোটর গাড়িতে ক'রে, সহর ছাড়িয়ে রবার গাছের আবাদের ভিতর দিয়ে, উঁচু নীচু পাহাড়ের পথে অনেকটা দূর ঘুরে এলুম। জমি ঢেউ-খেলানো, ঘাস ঘন সবুজ, রাস্তার পাশ দিয়ে একটি ঘোলা জলের স্রোত কল্‌কল্ ক'রে এঁকে বেঁকে

ছুটে চ'লেছে, জলের মাঝে মাঝে আঁটিবাঁধা কাটা বেত ভিজ্‌চে। রাস্তার দুই ধারে সব বাগানবাড়ী। পথে ঘাটে চীনেই বেশী—এখানকার সকল কাজেই তা'রা আছে।

গাড়ি সহরের মধ্যে যখন এলো, মহিলাটি তাঁর জাপানী জিনিষের দোকানে আমাকে নিয়ে গেলেন। তখন সন্ধ্যা হ'য়ে এসেচে, মনে মনে ভাবচি জাহাজে আমাদের সন্ধ্যা-বেলাকার খাবার সময় হ'য়ে এলো; কিন্তু সেখানে সেই শব্দের ঝড়ে বস্তা তোলপাড় ক'র্‌চে কল্পনা ক'রে কোনো মতেই ফির্‌তে মন লাগ্‌ছিল না। মহিলাটি একটি ছোটো ঘরের মধ্যে বসিয়ে, আমাকে ও আমার সঙ্গী ইংরাজটিকে থালায় ফল সাজিয়ে খেতে অনুরোধ ক'র্‌লেন। ফল খাওয়া হ'লে পর তিনি আস্তে আস্তে অনুরোধ ক'র্‌লেন, যদি আপত্তি না থাকে তিনি আমাদের হোটেলে খাইয়ে আন্‌তে ইচ্ছা করেন। তাঁর এ অনুরোধও আমরা লঙ্ঘন করি নি। রাত্রি প্রায় দশটার সময় তিনি আমাদের জাহাজে পৌঁছিয়ে দিয়ে বিদায় নিয়ে গেলেন।

এই রমণীর ইতিহাসে কিছু বিশেষত্ব আছে। এঁর স্বামী জাপানে আইনব্যবসায়ী ছিলেন। কিন্তু সে ব্যবসায় যথেষ্ট লাভজনক ছিল না। তাই আয়ব্যয়ের সামঞ্জস্য হওয়া কঠিন হ'য়ে উঠ্‌ছিল। স্ত্রীই স্বামীকে প্রস্তাব ক'র্‌লেন, এসো আমরা একটা কিছু ব্যবসা করি। স্বামী প্রথমে তাতে নারাজ ছিলেন। তিনি বল্লেন, আমাদের বংশে ব্যবসা

তো কেউ করে নি, ওটা আমাদের পক্ষে একটা হীন কাজ। শেষকালে স্ত্রীর অনুরোধে রাজি হ'য়ে জাপান থেকে তু'জনে মিলে সিঙাপুরে এসে দোকান খুল্‌লেন। সে আজ আঠারো বৎসর হ'ল। আত্মীয়বন্ধু সকলেই একবাক্যে বল্লে, এইবার এরা মজ্‌ল। এই স্ত্রীলোকটির পরিশ্রমে, নৈপুণ্যে এবং লোকের সঙ্গে ব্যবহার-কুশলতায়, ক্রমশই ব্যবসায়ের উন্নতি হ'তে লাগ্‌ল। গত বৎসরে এঁর স্বামীর মৃত্যু হ'য়েচে—এখন এঁকে একলাই সমস্ত কাজ চালাতে হ'চ্চে।

বস্তুত এই ব্যবসাটি এই স্ত্রীলোকেরই নিজের হাতে তৈরি। আমি যে-কথা ব'ল্‌ছিলুম, এই ব্যবসায়ে তা'রই প্রমাণ দেখ্‌তে পাই। মানুষের মন বোঝা এবং মানুষের সঙ্গে সম্বন্ধ রক্ষা করা স্ত্রীলোকের স্বভাবসিদ্ধ—এই মেয়েটির মধ্যে আমরাই তার পরিচয় পেয়েছি। তারপরে কর্ম্ম-কুশলতা মেয়েদের স্বাভাবিক। পুরুষ স্বভাবত কুঁড়ে, দায়ে প'ড়ে তাদের কাজ ক'র্‌তে হয়। মেয়েদের মধ্যে একটা প্রাণের প্রাচুর্য্য আছে, যার স্বাভাবিক বিকাশ হ'চ্চে কর্ম্মপরতা। কর্ম্মের সমস্ত খুঁটিনাটি যে কেবল ওরা সহ্য ক'র্‌তে পারে, তা নয়—তাতে ওরা আনন্দ পায়। তা ছাড়া দেনাপাওনা সম্বন্ধে ওরা সাবধানী। এই জন্যে, যে-সব কাজে দৈহিক বা মানসিক সাহসিকতার দরকার হয় না, সে সব কাজ মেয়েরা পুরুষের চেয়ে ঢের ভালো ক'রে ক'র্‌তে পারে, এই আমার বিশ্বাস। স্বামী যেখানে সংসার ছারখার

ক'রেচে, সেখানে স্বামীর অবর্ত্তমানে স্ত্রীর হাতে সংসার প'ড়ে সমস্ত সুশৃঙ্খলায় রক্ষা পেয়েচে, আমাদের দেশে তার বিস্তর প্রমাণ আছে ; শুনেছি ফ্রান্সের মেয়েরাও ব্যবসায়ে আপনাদের কর্ম্মনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েচে। যে-সব কাজে উদ্ভাবনার দরকার নেই, যে-সব কাজে পটুতা, পরিশ্রম, ও লোকের সঙ্গে ব্যবহারই সব চেয়ে দরকার, সে-সব কাজ মেয়েদের।

৩রা জ্যৈষ্ঠ সকালে আমাদের জাহাজ ছাড়্‌লে। ঠিক এই ছাড়্‌বার সময় একটি বিড়াল জলের মধ্যে প'ড়ে গেল। তখন সমস্ত ব্যস্ততা ঘুচে গিয়ে, ঐ বিড়ালকে বাঁচানই প্রধান কাজ হ'য়ে উঠ্‌ল। নানা উপায়ে নানা কৌশলে তাকে জল থেকে উঠিয়ে তবে জাহাজ ছাড়্‌লে। এতে জাহাজ ছাড়ার নির্দ্দিষ্ট সময় পেরিয়ে গেল। এইটিতে আমাকে বড়ো আনন্দ দিয়েচে।

চীন সমুদ্র
তোঁসা-মারু জাহাজ
৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩

১০

সমুদ্রের উপর দিয়ে আমাদের দিনগুলি ভেসে চলেচে, পালের নৌকার মতো। সে নৌকা কোনো ঘাটে যাবার নৌকা নয়, তা'তে কোনো বোঝাই নেই। কেবলমাত্র ঢেউয়ের

সঙ্গে, বাতাসের সঙ্গে, আকাশের সঙ্গে কোলাকুলি ক'র্‌তে তা'রা বেরিয়েচে। মানুষের লোকালয় মানুষের বিশ্বের প্রতিদ্বন্দ্বী। সেই লোকালয়ের দাবী মিটিয়ে সময় পাওয়া যায় না, বিশ্বের নিমন্ত্রণ আর রাখ্‌তে পারিনে। চাঁদ যেমন তার একটা মুখ সূর্য্যের দিকে ফিরিয়ে রেখেচে, তার আর একটা মুখ অন্ধকার—তেমনি লোকালয়ের প্রচণ্ড টানে মানুষের সেই দিকের পিঠটাতেই চেতনার সমস্ত আলো খেল্‌চে, অন্য একটা এদিক আমরা ভুলেই গেচি; বিশ্ব যে মানুষের কতখানি, সে আমাদের খেয়ালেই আসে না।

সত্যকে যেদিকে ভুলি, কেবল যে সেই দিকেই লোকসান, তা নয়—সে লোকসান সকল দিকেই। বিশ্বকে মানুষ যে-পরিমাণে যতখানি বাদ দিয়ে চলে, তার লোকসানের তাপ এবং কলুষ সেই পরিমাণে ততখানি বেড়ে ওঠে। সেই জন্যেই ক্ষণে ক্ষণে মানুষের একেবারে উল্টোদিকে টান আসে। সে বলে "বৈরাগ্যমেবাভয়ং"—বৈরাগ্যের কোনো বালাই নেই। সে ব'লে বসে, সংসার কারাগার; মুক্তি খুঁজতে শান্তি খুঁজতে সে বনে, পর্ব্বতে, সমুদ্রতীরে ছুটে যায়। মানুষ সংসারের সঙ্গে বিশ্বের বিচ্ছেদ ঘটিয়েচে ব'লেই, বড়ো ক'রে প্রাণের নিঃশ্বাস নেবার জন্যে তা'কে সংসার ছেড়ে বিশ্বের দিকে যেতে হয়। এত বড়ো অদ্ভুত কথা তাই মানুষকে ব'ল্‌তে হয়েচে—মানুষের মুক্তির রাস্তা মানুষের কাছ থেকে দূরে।

লোকালয়ের মধ্যে যখন থাকি, অবকাশ জিনিষটাকে তখন ডরাই। কেননা লোকালয় জিনিষটা একটা নিরেট জিনিষ, তার মধ্যে ফাঁক মাত্রই ফাঁকা। সেই ফাঁকাটাকে কোনো মতে চাপা দেবার জন্যে আমাদের মদ চাই,তাস পাশা চাই, রাজা-উজির মারা চাই—নইলে সময় কাটে না। অর্থাৎ সময়টাকে আমরা চাইনে, সময়টাকে আমরা বাদ দিতে চাই।

কিন্তু অবকাশ হ'চ্চে বিরাটের সিংহাসন। অসীম অবকাশের মধ্যে বিশ্বের প্রতিষ্ঠা। বৃহৎ যেখানে আছে, অবকাশ সেখানে ফাঁকা নয়,—একেবারে পরিপূর্ণ। সংসারের মধ্যে যেখানে বৃহৎকে আমরা রাখিনি, সেখানে অবকাশ এমন ফাঁকা; বিশ্বে যেখানে বৃহৎ বিরাজমান, সেখানে অবকাশ এমন গভীরভাবে মনোহর। গায়ে কাপড় না থাক্‌লে মানুষের যেমন লজ্জা সংসারে অবকাশ আমাদের তেমনি লজ্জা দেয়, কেননা, ওটা কিনা শূন্য, তাই ওকে আমরা বলি জড়তা, আলস্য;—কিন্তু সত্যকার সন্ন্যাসীর পক্ষে অবকাশে লজ্জা নেই, কেননা তার অবকাশ পূর্ণতা,—সেখানে উলঙ্গতা নেই।

এ কেমনতর—যেমন প্রবন্ধ এবং গান। প্রবন্ধে কথা যেখানে থামে, সেখানে কেবলমাত্র ফাঁকা। গানে কথা যেখানে থামে, সেখানে সুর ভরাট। বস্তুত সুর যতই বৃহৎ হয়, ততই কথার অবকাশ বেশি থাকা চাই। গায়কের সার্থকতা কথার ফাঁকে, লেখকের সার্থকতা কথার ঝাঁকে!

আমরা লোকালয়ের মানুষ এই যে জাহাজে ক'রে চ'লচি, এইবার আমরা কিছুদিনের জন্যে বিশ্বের দিকে মুখ ফেরাতে পেরেচি। সৃষ্টির যে-পিঠে অনেকের ঠেলাঠেলি ভিড়, সেদিক থেকে যে-পিঠে একের আসন, সেদিকে এসেচি। দেখ্তে পাচ্চি, এই যে নীল আকাশ এবং নীল সমুদ্রের বিপুল অবকাশ—এ যেন অমৃতের পূর্ণ ঘট।

অমৃত,—সে যে শুভ্র আলোর মতো পরিপূর্ণ এক। শুভ্র আলোয় বহুবর্ণচ্ছটা একে মিলেচে, অমৃতরসে তেমনি বহুরস একে নিবিড়। জগতে এই এক আলো যেমন নানাবর্ণে বিচিত্র, সংসারে তেমনি এই এক রসই নানা রসে বিভক্ত। এই জন্যে, অনেককে সত্য ক'রে জান্তে হ'লে, সেই একক সঙ্গে সঙ্গে জান্তে হয়। গাছ থেকে যে-ডাল কাটা হ'য়েচে, সে ডালের ভার মানুষকে বইতে হয়, গাছে যে-ডাল আছে সে ডাল মানুষের ভার বইতে পারে। এক থেকে বিচ্ছিন্ন যে অনেক, তা'রই ভার মানুষের পক্ষে বোঝা,—একের মধ্যে বিধৃত যে অনেক, সেই তো মানুষকে সম্পূর্ণ আশ্রয় দিতে পারে।

সংসারে একদিকে আবশ্যকের ভিড়, অন্যদিকে অনাবশ্যকের। আবশ্যকের দায় আমাদের বহন ক'র্তেই হবে, তাতে আপত্তি ক'র্লে চ'ল্বে না। যেমন ঘরে থাক্তে হ'লে দেয়াল না হ'লে চলে না,—এও তেমনি। কিন্তু সবটাই তো দেয়াল নয়। অন্তত খানিকটা ক'রে জানালা থাকে—

সেই ফাঁক দিয়ে আমরা আকাশের সঙ্গে আত্মীয়তা রক্ষা করি। কিন্তু সংসারে দেখ্‌তে পাই লোকে ঐ জানালাটুকু সইতে পারে না। ঐ ফাঁকটুকু ভরিয়ে দেবার জন্যে যতরকম সাংসারিক অনাবশ্যকের সৃষ্টি। ঐ জানালাটার উপর বাজে কাজ, বাজে চিঠি, বাজে সভা, বাজে বক্তৃতা, বাজে হাঁস্‌ফাঁস্ মেরে দিয়ে, দশে মিলে ঐ ফাঁকটাকে একেবারে বুজিয়ে ফেলা হয়। নারকেলের ছিব্‌ড়ের মতো, এই অনাবশ্যকের পরিমাণটাই বেশি। ঘরে, বাইরে, ধর্ম্মে, কর্ম্মে, আমোদে, আহ্লাদে, সকল বিষয়েই এরই অধিকার সব চেয়ে বড়ো— এর কাজই হ'চ্চে ফাঁক বুজিয়ে বেড়ানো।

কিন্তু কথা ছিল ফাঁক বোজাব না, কেননা ফাঁকের ভিতর দিয়ে ছাড়া পূর্ণকে পাওয়া যায় না। ফাঁকের ভিতর দিয়েই আলো আসে, হাওয়া আসে। কিন্তু আলো হাওয়া আকাশ যে মানুষের তৈরি জিনিষ নয়, তাই লোকালয় পারৎপক্ষে তাদের জন্যে জায়গা রাখ্‌তে চায় না—তাই আবশ্যক বাদে যেটুকু নিরালা থাকে, সেটুকু অনাবশ্যক দিয়ে ঠেসে ভর্ত্তি ক'রে দেয়। এম্‌নি ক'রে মানুষ আপনার দিনগুলোকে তো নিরেট ক'রে তুলেইচে, রাত্রিটাকেও যতখানি পারে ভরাট ক'রে দেয়। ঠিক যেন কল্‌কাতার ম্যুনিসিপালিটির আইন। যেখানে যত পুকুর আছে বুজিয়ে ফেল্‌তে হবে,—রাবিশ দিয়ে হোক্, যেমন ক'রে হোক্। এমন কি, গঙ্গাকেও যতখানি পারা যায় পুল-চাপা, জেটি-চাপা, জাহাজ-চাপা দিয়ে গলা

টিপে মার্‌বার চেষ্টা। ছেলেবেলাকার কল্‌কাতা মনে পড়ে, ঐ পুকুরগুলোই ছিল আকাশের স্যাঙাৎ, সহরের মধ্যে ঐখানটাতে দ্যুলোক এবং ভূলোকে একটুখানি পা ফেল্‌বার জায়গা পেত, ঐখানেই আকাশের আলোকের আতিথ্য কর্‌বার জন্য পৃথিবী আপন জলের আসনগুলি পেতে রেখেছিল।

আবশ্যকের একটা সুবিধা এই যে, তা'র একটা সীমা আছে। সে সম্পূর্ণ বেতালা হ'তে পারে না, সে দশটা-চারটেকে স্বীকার করে, তার পার্ব্বণের ছুটি আছে, সে রবিবারকে মানে, পারৎ-পক্ষে রাত্রিকে সে ইলেক্‌ট্রিক্‌ লাইট্‌ দিয়ে একেবারে হেসে উড়িতে দিতে চায় না। কেননা, সে যেটুকু সময় নেয়, আয়ু দিয়ে অর্থ দিয়ে তার দাম চুকিয়ে দিতে হয়—সহজে কেউ তার অপব্যয় ক'র্‌তে পারে না। কিন্তু অনাবশ্যকের তাল-মানের বোধ নেই, সে সময়কে উড়িয়ে দেয়, অসময়কে টিঁক্‌তে দেয় না। সে সদর রাস্তা দিয়ে ঢোকে, খিড়কির রাস্তা দিয়ে ঢোকে আবার জানালা দিয়ে ঢুকে পড়ে। সে কাজের সময় দরজায় ঘা মারে, ছুটির সময় হুড়্‌মুড়্‌ ক'রে আসে, রাত্রে ঘুম ভাঙিয়ে দেয়। তার কাজ নেই ব'লেই তার ব্যস্ততা আরো বেশি।

আবশ্যক কাজের পরিমাণ আছে, অনাবশ্যক কাজের পরিমাণ নেই—এইজন্যে অপরিমেয়ের আসনটি ঐ লক্ষ্মীছাড়াই জুড়ে বসে, ওকে ঠেলে ওঠানো দায় হয়। তখনই মনে হয়

দেশ ছেড়ে পালাই, সন্ন্যাসী হ'য়ে বেরই, সংসারে আর টেঁকা যায় না!

যাক্, যেমনি বেরিয়ে পড়েচি, অমনি বুঝতে পেরেচি বিরাট বিশ্বের সঙ্গে আমাদের যে আনন্দের সম্বন্ধ, সেটাকে দিনরাত অস্বীকার ক'রে কোনো বাহাতুরি নেই। এই যে ঠেলাঠেলি ঠেসাঠেসি নেই, অথচ সমস্ত কানায় কানায় ভরা, এইখানকার দর্পণটিতে যেন নিজের মুখের ছায়া দেখ্‌তে পেলুম। "আমি আছি" এই কথাটা গলির মধ্যে, ঘরবাড়ীর মধ্যে ভারি ভেঙে চুরে বিকৃত হ'য়ে দেখা দেয়। এই কথাটাকে এই সমুদ্রের উপর, আকাশের উপর সম্পূর্ণ ছড়িয়ে দিয়ে দেখ্‌লে তবে তার মানে বুঝতে পারি—তখন আবশ্যককে ছাড়িয়ে, অনাবশ্যককে পেরিয়ে আনন্দলোকে তার অভ্যর্থনা দেখ্‌তে পাই,—তখন স্পষ্ট ক'রে বুঝি, ঋষি কেন মানুষদের অমৃতস্য পুত্রাঃ ব'লে আহ্বান করেছিলেন।

১১

সেই খিদিরপুরের ঘাট থেকে আরম্ভ ক'রে আর এই হংকংএর ঘাট পর্য্যন্ত, বন্দরে বন্দরে বাণিজ্যের চেহারা দেখে আসচি! সে যে কী প্রকাণ্ড, এমন ক'রে তাকে চোখে না দেখ্‌লে বোঝা যায় না—শুধু প্রকাণ্ড নয়, সে একটা জবড়জঙ্গ ব্যাপার। কবিকঙ্কণচণ্ডীতে ব্যাধের আহারের যে বর্ণনা

আছে,—সে এক-এক গ্রাসে এক-এক তাল গিল্‌চে, তার ভোজন উৎকট, তার শব্দ উৎকট,—এও সেই রকম। এই বাণিজ্যব্যাধটাও হাঁস্‌ফাঁস্ ক'র্‌তে ক'র্‌তে এক-এক পিণ্ড মুখে যা পূর্‌চে, সে দেখে ভয় হয়—তার বিরাম নেই, আর তার শব্দই বা কী! লোহার হাত দিয়ে মুখে তুল্‌চে, লোহার দাঁত দিয়ে চিবচ্চে, লোহার পাকযন্ত্রে চিরপ্রদীপ্ত জঠরানলে হজম ক'র্‌চে, এবং লোহার শিরা উপশিরার ভিতর দিয়ে তা'র জগৎজোড়া কলেবরের সর্ব্বত্র সোনার রক্তস্রোত চালান ক'রে দিচ্চে।

এ'কে দেখে মনে হয় যে এ একটা জন্তু, এ যেন পৃথিবীর প্রথম যুগের দানব-জন্তুগুলোর মতো। কেবলমাত্র তার ল্যাজের আয়তন দেখ্‌লেই শরীর আঁৎকে ওঠে। তারপরে সে জলচর হবে, কি স্থলচর হবে, কি পাখী হবে, এখনো তা স্পষ্ট ঠিক হয় নি,—সে খানিকটা সরীসৃপের মতো, খানিকটা বাদুড়ের মতো, খানিকটা গণ্ডারের মতো। অঙ্গসৌষ্ঠব বল্‌তে যা বোঝায়, তা তার কোথাও কিছুমাত্র নেই। তার গায়ের চামড়া ভয়ঙ্কর স্থূল; তার থাবা যেখানে পড়ে, সেখানে পৃথিবীর গায়ের কোমল সবুজ চামড়া উঠে গিয়ে একেবারে তা'র হাড় বেরিয়ে পড়ে; চলবার সময় তার বৃহৎ বিরূপ ল্যাজটা যখন নড়তে থাকে, তখন তার গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে সংঘর্ষ হ'য়ে এমন আওয়াজ হ'তে থাকে যে, দিগঙ্গনারা মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়ে। তারপরে, কেবলমাত্র তার এই বিপুল দেহটা

রক্ষা কর্‌বার জন্যে এত রাশি রাশি খাদ্য তা'র দরকার হয় যে, ধরিত্রী ক্লিষ্ট হ'য়ে ওঠে। সে যে কেবলমাত্র খাবা খাবা জিনিষ খাচ্চে তা নয়, সে মানুষ খাচ্চে,—স্ত্রী পুরুষ ছেলে কিছুই সে বিচার করে না।

কিন্তু জগতের সেই প্রথম যুগের দানব-জন্তুগুলো টিঁক্‌ল না। তাদের অপরিমিত বিপুলতাই পদে পদে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেওয়াতে, বিধাতার আদালতে তাদের প্রাণদণ্ডের বিধান হ'ল। সৌষ্ঠব জিনিষটা কেবলমাত্র সৌন্দর্য্যের প্রমাণ দেয় না, উপযোগিতারও প্রমাণ দেয়। হাঁস্‌ফাঁস্‌টা যখন অত্যন্ত বেশি চোখে পড়ে, আয়তনটার মধ্যে যখন কেবলমাত্র শক্তি দেখি, শ্রী দেখিনে,—তখন বেশ বুঝ্‌তে পারা যায় বিশ্বের সঙ্গে তা'র সামঞ্জস্য নেই; বিশ্বশক্তির সঙ্গে তা'র শক্তির নিরন্তর সংঘর্ষ হ'তে হ'তে, একদিন তাকে হার মেনে হাল ছেড়ে তলিয়ে যেতে হবেই। প্রকৃতির গৃহিণীপনা কখনই কদর্য্য অমিতাচারকে অধিক দিন সইতে পারে না— তার ঝাঁটা এসে পড়ল ব'লে! বাণিজ্য-দানবটা নিজের বিরূপতায়, নিজের প্রকাণ্ড ভাবের মধ্যে নিজের প্রাণদণ্ড বহন ক'র্‌চে। একদিন আস্‌চে যখন তার লোহার কঙ্কাল-গুলোকে আমাদের যুগের স্তরের মধ্যে থেকে আবিষ্কার ক'রে পুরাতত্ত্ববিদ্‌রা এই সর্ব্বভুক দানবটার অদ্ভুত বিষমতা নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ ক'র্‌বে।

প্রাণীজগতে মানুষের যে যোগ্যতা, সে তার দেহের

প্রাচুর্য্য নিয়ে নয়! মানুষের চামড়া নরম, তার গায়ের জোর অল্প, তার ইন্দ্রিয় শক্তিও পশুদের চেয়ে কম বই বেশি নয়। কিন্তু সে এমন একটি বল পেয়েচে যা চোখে দেখা যায় না, যা জায়গা জোড়ে না, যা কোনো স্থানের উপর ভর না ক'রেও সমস্ত জগতে আপন অধিকার বিস্তার ক'র্‌চে। মানুষের মধ্যে দেহ-পরিধি দৃশ্যজগৎ থেকে সরে গিয়ে অদৃশ্যের মধ্যে প্রবল হ'য়ে উঠেচে। বাইবেলে আছে, যে নম্র সে-ই পৃথিবীকে অধিকার ক'র্‌বে—তার মানেই হ'চ্চে নম্রতার শক্তি বাইরে নয়, ভিতরে; সে যত কম আঘাত দেয়, ততই সে জয়ী হয়; সে রণক্ষেত্রে লড়াই করে না; অদৃশ্যলোকে বিশ্বশক্তির সঙ্গে সন্ধি ক'রে সে জয়ী হয়।

বাণিজ্য-দানবকেও একদিন তার দানব-লীলা সম্বরণ ক'রে মানব হ'তে হবে! আজ এই বাণিজ্যের মস্তিষ্ক কম, ওর হৃদয় তো একেবারেই নেই, সেইজন্যে পৃথিবীতে ও কেবল আপনার ভার বাড়িয়ে চলেচে। কেবলমাত্র প্রাণপণ শক্তিতে আপনার আয়তনকে বিস্তীর্ণতর ক'রে ক'রেই ও জিত্‌তে চাচ্চে। কিন্তু একদিন যে জয়ী হবে তার আকার ছোট, তার কর্ম্মপ্রণালী সহজ; মানুষের হৃদয়কে, সৌন্দর্য্য-বোধকে, ধর্ম্মবুদ্ধিকে সে মানে; সে নম্র, সে সুশ্রী, সে কদর্য্যভাবে লুব্ধ নয়; তার প্রতিষ্ঠা অন্তরের সুব্যবস্থায়, বাইরের আয়তনে না; সে কাউকে বঞ্চিত ক'রে বড়ো নয়, সে সকলের সঙ্গে সন্ধি ক'রে বড়ো। আজকের দিনে পৃথিবীতে

মানুষের সকল অনুষ্ঠানের মধ্যে এই বাণিজ্যের অনুষ্ঠান সব চেয়ে কুশ্রী, আপন ভারের দ্বারা পৃথিবীকে সে ক্লান্ত ক'র্‌চে, আপন শব্দের দ্বারা পৃথিবীকে বধির ক'র্‌চে, আপন আবর্জ্জনার দ্বারা পৃথিবীকে মলিন ক'র্‌চে, আপন লোভের দ্বারা পৃথিবীকে আহত ক'র্‌চে। এই যে পৃথিবীব্যাপী কুশ্রীতা, এই যে বিদ্রোহ,—রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ এবং মানব-হৃদয়ের বিরুদ্ধে,—এই যে লোভকে বিশ্বের রাজসিংহাসনে বসিয়ে তার কাছে দাসখত লিখে দেওয়া, এ প্রতিদিনই মানুষের শ্রেষ্ঠ মনুষ্যত্বকে আঘাত কর্‌চেই, তার সন্দেহ নেই। মুনফার নেশায় উন্মত্ত হয়ে এই বিশ্বব্যাপী দ্যূতক্রীড়ায় মানুষ নিজেকে পণ রেখে কতদিন খেলা চালাবে? এ খেলা ভাঙতেই হবে। যে-খেলায় মানুষ লাভ কর্‌বার লোভে নিজেকে লোকসান ক'রে চলেচে, সে কখনই চল্‌বে না!

৯ই জ্যৈষ্ঠ। মেঘ বৃষ্টি, বাদল কুয়াশায় আকাশ ঝাপসা হ'য়ে আছে—হংকং বন্দরে পাহাড়গুলো দেখা দিয়েছে তাদের গা বেয়ে বেয়ে ঝরণা ঝ'রে পড়েচে। মনে হ'চ্চে দৈত্যের দল সমুদ্রে ডুব দিয়ে তাদের ভিজে মাথা জলের উপর তুলেচে, তাদের জটা বেয়ে দাড়ি বেয়ে জল ঝর্‌চে! এণ্ড্রুজ সাহেব বল্‌চেন দৃশ্যটা যেন পাহাড়-ঘেরা স্কটল্যাণ্ডের হ্রদের মতো, তেমনিতর ঘন সবুজ বেঁটে বেঁটে পাহাড়, তেম্‌নিতর ভিজে কম্বলের মতো আকাশের মেঘ, তেম্‌নিতর কুয়াসার ন্যাতা বুলিয়ে অল্প অল্প মুছে-ফেলা জলস্থলের মূর্ত্তি। কাল সমস্ত

রাত বৃষ্টি বাতাস গিয়েচে—কাল বিছানা আমার ভার বহন করে নি, আমিই বিছানাটাকে বহন ক'রে ডেকের এধার থেকে ওধারে আশ্রয় খুঁজে খুঁজে ফিরেচি। রাত যখন সাড়ে দুপুর হবে, তখন এই বাদলের সঙ্গে মিথ্যা বিরোধ করবার চেষ্টা না ক'রে তাকে প্রসন্ন মনে মেনে নেবার জন্যে প্রস্তুত হলুম। একধারে দাঁড়িয়ে ঐ বাদলার সঙ্গে তান মিলিয়েই গান ধরলুম "শ্রাবণের ধারার মতো পড়ুক ঝ'রে।" এমনি ক'রে ফিরে ফিরে অনেকগুলো গান গাইলুম,—বানিয়ে বানিয়ে একটা নতুন গানও তৈরি করলুম,—কিন্তু বাদলের সঙ্গে কবির লড়াইয়ে এই মর্ত্ত্যবাসীকেই হার মানতে হ'ল। আমি অত দম পাব কোথায়, আর আমার কবিত্বের বাতিক যতই প্রবল হোক না, বায়ুবলে আকাশের সঙ্গে পেরে উঠব কেন?

কাল রাত্রেই জাহাজের বন্দরে পৌঁছবার কথা ছিল, কিন্তু এইখানটায় সমুদ্রবাহী জলের স্রোত প্রবল হ'য়ে উঠল, এবং বাতাসও বিরুদ্ধ ছিল তাই পদে পদে দেরি হ'তে লাগল। জায়গাটাও সঙ্কীর্ণ এবং সঙ্কটময়। কাপ্তেন সমস্ত রাত জাহাজের উপরতলায় গিয়ে সাবধানে পথের হিসাব ক'রে চলেচেন। আজ সকালেও মেঘবৃষ্টির বিরাম নেই। সূর্য্য দেখা দিল না, তাই পথ ঠিক করা কঠিন। মাঝে মাঝে ঘণ্টা বেজে উঠচে, এঞ্জিন থেমে যাচ্চে, নাবিকের দ্বিধা স্পষ্ট বোঝা যাচ্চে। আজ সকালে আহারের টেবিলে কাপ্তেনকে দেখা গেল না। কাল রাত দুপুরের সময় কাপ্তেন একবার কেবল বর্ষাতি পরে

নেমে এসে আমাকে ব'লে গেলেন, ডেকের কোনো দিকেই শোবার সুবিধা হবে না, কেননা বাতাসের বদল হ'চ্চে।

এর মধ্যে একটি ব্যাপার দেখে আমার মনে বড়ো আনন্দ হয়েছিল।—জাহাজের উপর থেকে একটা দড়িবাঁধা চামড়ার চোঙে ক'রে মাঝে মাঝে সমুদ্রের জল তোলা হয়। কাল বিকেলে এক সময়ে মুকুলের হঠাৎ জান্‌তে ইচ্ছা হ'ল, এর কারণটা কী? সে তখনি উপরতলায় উঠে গেল। এই উপর-তলাতেই জাহাজের হালের চাকা, এবং এখানেই পথনির্ণয়ের সমস্ত যন্ত্র। এখানে যাত্রীদের যাওয়া নিষেধ। মুকুল যখন গেল, তখন তৃতীয় অফিসার কাজে নিযুক্ত। মুকুল তাঁকে প্রশ্ন ক'র্‌তেই, তিনি ওকে বোঝাতে সুরু ক'র্‌লেন। সমুদ্রের মধ্যে অনেকগুলি স্রোতের ধারা বইচে, তাদের উত্তাপের পরিমাণ স্বতন্ত্র। মাঝে মাঝে সমুদ্রের জল তুলে তাপমান দিয়ে পরীক্ষা ক'রে সেই ধারাপথ নির্ণয় করা দরকার। সেই ধারার ম্যাপ বের ক'রে তাদের গতিবেগের সঙ্গে জাহাজের গতিবেগের কী রকম কাটাকাটি হ'চ্চে, তাই তিনি মুকুলকে বোঝাতে লাগ্‌লেন। তাতেও যখন সুবিধা হ'ল না, তখন বোর্ডে খড়ি দিয়ে এঁকে ব্যাপারটাকে যথাসম্ভব সরল ক'রে দিলেন।

বিলিতি জাহাজে মুকুলের মতো বালকের পক্ষে এটা কোনোমতেই সম্ভবপর হ'ত না। সেখানে ওকে অত্যন্ত সোজা ক'রেই বুঝিয়ে দিত যে, ও জায়গায় তার নিষেধ। মোটের

উপরে জাপানী অফিসরের সৌজন্য, কাজের নিয়মবিরুদ্ধ। কিন্তু পূর্ব্বেই ব'লেচি, এই জাপানী জাহাজে কাজের নিয়মের ফাঁক দিয়ে মানুষের গতিবিধি আছে। অথচ নিয়মটা চাপা প'ড়ে যায় নি, তাও বারবার দেখেচি। জাহাজ যখন বন্দরে স্থির ছিল, যখন উপরতলার কাজ বন্ধ, তখন সেখানে ব'সে কাজ ক'র্‌বার জন্যে আমি কাপ্তেনের সম্মতি পেয়েছিলুম। সেদিন পিয়ার্সন সাহেব দুজন ইংরেজ আলাপীকে জাহাজে নিমন্ত্রণ ক'রেছিলেন। ডেকের উপর মাল তোলার শব্দে আমাদের প্রস্তাব উঠ্‌ল, উপরের তলায় যাওয়া যাক। আমি সম্মতির জন্য প্রধান অফিসারকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লুম,—তিনি তখনি বল্লেন, "না"। নিয়ে গেলে কাজের ক্ষতি হ'ত না, কেননা কাজ তখন বন্ধ ছিল। কিন্তু নিয়মভঙ্গের একটা সীমা আছে, সে সীমা বন্ধুর পক্ষে যেখানে, অপরিচিতের পক্ষে সেখানে না।• উপরের তলা ব্যবহারের সম্মতিতেও আমি যেমন খুসি হ'য়েছিলুম, তার বাধাতেও তেমনি খুসি হ'লুম। স্পষ্ট দেখ্‌তে পেলুম, এর মধ্যে দাক্ষিণ্য আছে, কিন্তু দুর্ব্বলতা নেই।

বন্দরে পৌঁছবামাত্র জাপান থেকে কয়েকখানি অভ্যর্থনার টেলিগ্রাম ও পত্র পাওয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে প্রধান অফিসার এসে আমাকে বল্লেন, এ যাত্রায় আমাদের সাঙ্ঘাই যাওয়া হ'ল না, একেবারে এখান থেকে জাপান যাওয়া হবে। আমি জিজ্ঞাসা ক'র্‌লুম, কেন? তিনি বল্লেন, জাপানবাসীরা

আপনাকে অভ্যর্থনা ক'র্‌বার জন্যে প্রস্তুত হ'য়েচে, তাই আমাদের সদর আফিস থেকে টেলিগ্রামে আদেশ এসেচে, অন্য বন্দরে বিলম্ব না ক'রে চ'লে যেতে। সাঙ্ঘাইয়ের সমস্ত মাল আমরা এইখানেই নামিয়ে দেব—অন্য জাহাজে ক'রে সেখানে যাবে।

এই খবরটি আমার পক্ষে যতই গৌরবজনক হোক, এখানে লেখ্‌বার দরকার ছিল না। কিন্তু আমার লেখ্‌বার কারণ হ'চ্চে এই যে, এই ব্যাপারের একটু বিশেষত্ব আছে, সেটা আলোচ্য। সেটা পুনশ্চ ঐ একই কথা। অর্থাৎ ব্যবসার দাবী সচরাচর যে-পাথরের পাঁচিল খাড়া ক'রে আত্মরক্ষা করে, এখানে তার মধ্যে দিয়েও মানব সম্বন্ধের আনাগোনার পথ আছে। এবং সে পথ কম প্রশস্ত নয়।

জাহাজ এখানে দিন দুয়েক থাক্‌বে। সেই দু'দিনের জন্যে সহরে নেবে হোটেলে থাকবার প্রস্তাব আমার মনে নিলে না। আমার মতো কুঁড়ে মানুষের পক্ষে আরামের চেয়ে বিরাম ভালো; আমি বলি, সুখের ল্যাঠা অনেক, সোয়াস্তির বালাই নেই। আমি মাল তোলা-নামার উপদ্রব স্বীকার ক'রেও, জাহাজে র'য়ে গেলুম। সে জন্যে আমার যে বক্‌শিস্ মেলেনি, তা নয়।

প্রথমেই চোখে পড়্‌ল জাহাজের ঘাটে চীনা-মজুরদের কাজ। তাদের একটা ক'রে নীল পায়জামা পরা এবং গা খোলা। এমন শরীরও কোথাও দেখি নি, এমন

কাজও না। একেবারে প্রাণসার দেহ, লেশমাত্র বাহুল্য নেই। কাজের তালে তালে সমস্ত শরীরের মাংসপেশী কেবলি ঢেউ খেলাচ্চে। এরা বড়ো বড়ো বোঝাকে এমন সহজে এবং এমন দ্রুত আয়ত্ত ক'রেচে যে সে দেখে আনন্দ হয়। মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত কোথাও অনিচ্ছা, অবসাদ বা জড়ত্বের লেশমাত্র লক্ষণ দেখা গেল না। বাইরে থেকে তাদের তাড়া দেবার কোনো দরকার নেই। তাদের দেহের বীণাযন্ত্র থেকে কাজ যেন সঙ্গীতের মতো বেজে উঠ্‌চে। জাহাজের ঘাটে মাল তোলা-নামার কাজ দেখ্‌তে যে আমার এতো আনন্দ হবে, একথা আমি পূর্ব্বে মনে ক'র্‌তে পারতুম না। পূর্ণ শক্তির কাজ বড়ো সুন্দর; তার প্রত্যেক আঘাতে আঘাতে শরীরকে সুন্দর ক'র্‌তে থাকে, এবং সেই শরীরও কাজকে সুন্দর ক'রে তোলে। এইখানে কাজের কাব্য এবং মানুষের শরীরের ছন্দ আমার সাম্‌নে বিস্তীর্ণ হ'য়ে দেখা দিলে। এ কথা জোর ক'রে ব'ল্‌তে পারি, ওদের দেহের চেয়ে কোনো স্ত্রীলোকের দেহ সুন্দর হ'তে পারে না,—কেননা শক্তির সঙ্গে সুষমার এমন নিখুঁৎ সঙ্গতি মেয়েদের শরীরে নিশ্চয়ই তুর্লভ। আমাদের জাহাজের ঠিক সাম্‌নেই আর একটা জাহাজে বিকেল বেলায় কাজকর্ম্মের পর সমস্ত চীনা মাল্লা জাহাজের ডেকের উপর কাপড় খুলে ফেলে স্নান ক'র্‌ছিল,—মানুষের শরীরের যে কী স্বর্গীয় শোভা তা আমি এমন ক'রে আর কোনোদিন দেখ্‌তে পাই নি।

কাজের শক্তি, কাজের নৈপুণ্য এবং কাজের আনন্দকে এমন পুঞ্জীভূত ভাবে একত্র দেখ্‌তে পেয়ে, আমি মনে মনে বুঝ্‌তে পার্‌লুম এই বৃহৎ জাতির মধ্যে কতখানি ক্ষমতা সমস্ত দেশ জুড়ে সঞ্চিত হ'চ্চে। এখানে মানুষ পূর্ণপরিমাণে নিজেকে প্রয়োগ ক'র্‌বার জন্যে বহুকাল থেকে প্রস্তুত হ'চ্চে। যে-সাধনায় মানুষ আপনাকে আপনি ষোলো-আনা ব্যবহার ক'রবার শক্তি পায়, তার কৃপণতা ঘুচে যায়, নিজেকে নিজে কোনো অংশে ফাঁকি দেয় না,—সে যে মস্ত সাধনা। চীন সুদীর্ঘকাল সেই সাধনায় পূর্ণভাবে কাজ ক'র্‌তে শিখেচে, সেই কাজের মধ্যেই তার নিজের শক্তি উদারভাবে আপনার মুক্তি এবং আনন্দ পাচ্চে ;—এ একটি পরিপূর্ণতার ছবি। চীনের এই শক্তি আছে ব'লেই আমেরিকা চীনকে ভয় ক'রেচে—কাজের উদ্যমে চীনকে সে জিত্‌তে পারে না, গায়ের জোরে তাকে ঠেকিয়ে রাখ্‌তে চায়।

এই এতবড়ো একটা শক্তি যখন আমাদের আধুনিক কালের বাহনকে পাবে, অর্থাৎ যখন বিজ্ঞান তার আয়ত্ত হবে, তখন পৃথিবীতে তাকে বাধা দিতে পারে এমন কোন্ শক্তি আছে ? তখন তার কর্ম্মের প্রতিভার সঙ্গে তার উপকরণের যোগসাধন হবে। এখন যে-সব জাতি পৃথিবীর সম্পদ ভোগ ক'র্‌চে, তারা চীনের সেই অভ্যুত্থানকে ভয় করে, সেই দিনকে তারা ঠেকিয়ে রাখ্‌তে চায়। কিন্তু যে জাতির যে দিকে যতখানি বড়ো হবার শক্তি আছে, সেদিকে তাকে ততখানি

বড়ো হ'য়ে উঠ্‌তে দিতে বাধা দেওয়া যে স্বজাতিপূজা থেকে জন্মেছে, তা'র মতো এমন সর্ব্বনেশে পূজা জগতে আর কিছুই নেই। এমন বর্ব্বর-জাতির কথা শোনা যায়, যারা নিজের দেশের দেবতার কাছে পরদেশের মানুষকে বলি দেয়,—আধুনিক কালের স্বজাতীয়তা তার চেয়ে অনেক বেশি ভয়ানক জিনিস, সে নিজের ক্ষুধার জন্যে এক-একটা জাতিকে-জাতি দেশকে-দেশ দাবী করে।

আমাদের জাহাজের বাঁ পাশে চীনের নৌকার দল। সেই নৌকাগুলিতে স্বামী স্ত্রী এবং ছেলেমেয়ে সকলে মিলে বাস ক'র্‌চে এবং কাজ ক'র্‌চে। কাজের এই ছবিই আমার কাছে সকলের চেয়ে সুন্দর লাগ্‌ল। কাজের এই মূর্ত্তিই চরম মূর্ত্তি, একদিন এরই জয় হবে। না যদি হয়,—বাণিজ্যদানব যদি মানুষের ঘরকর্‌না, স্বাধীনতা সমস্তই গ্রাস ক'রে চ'ল্‌তে থাকে, এবং বৃহৎ এক দাস-সম্প্রদায়কে সৃষ্টি ক'রে তোলে তারই সাহায্যে অল্প কয়জনের আরাম এবং স্বার্থ সাধন ক'র্‌তে থাকে, তাহ'লে পৃথিবী রসাতলে যাবে। এদের মেয়ে পুরুষ ছেলে, সকলে মিলে কাজ ক'র্‌বার এই ছবি দেখে আমার দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়্‌ল। ভারতবর্ষে এই ছবি কবে দেখ্‌তে পাব? সেখানে মানুষ আপনার বারোআনাকে ফাঁকি দিয়ে কাটাচ্চে। এমন সব নিয়মের জাল, যাতে মানুষ কেবলি বেধে-বেধে গিয়ে জড়িয়ে জড়িয়ে পড়েই নিজের অধিকাংশ শক্তির বাজে খরচ করে এবং বাকি অধিকাংশকে

কাজে খাটাতে পারে না ;—এমন বিপুল জটিলতা এবং জড়তার সমাবেশ পৃথিবীর আর কোথাও নেই। চারিদিকে কেবলি জাতির সঙ্গে জাতির বিচ্ছেদ, নিয়মের সঙ্গে কাজের বিরোধ, আচার-ধর্ম্মের সঙ্গে কাল-ধর্ম্মের দ্বন্দ্ব।

চীন সমুদ্র
তোসা মারু জাহাজ

১২

১৬ই জ্যৈষ্ঠ। আজ জাহাজ জাপানের "কোবে" বন্দরে পৌঁছবে। কয়দিন বৃষ্টিবাদলের বিরাম নেই। মাঝে মাঝে জাপানের ছোটো ছোটো দ্বীপ আকাশের দিকে পাহাড় তুলে সমুদ্র-যাত্রীদের ইসারা ক'র্‌চে—কিন্তু বৃষ্টিতে কুয়াশাতে সমস্ত ঝাপ্‌সা ;—বাদ্‌লার হাওয়ায় সর্দ্দিকাশি হ'য়ে গলা ভেঙে গেলে তার আওয়াজ যেরকম হ'য়ে থাকে, ঐ দ্বীপগুলোর সেইরকম ঘোরতর সর্দ্দির আওয়াজের চেহারা। বৃষ্টির ছাঁট এবং ভিজে হাওয়ার তাড়া এড়াবার জন্যে, ডেকের এধার থেকে ওধারে চৌকি টেনে নিয়ে নিয়ে বেড়াচ্চি।

আমাদের সঙ্গে যে জাপানী যাত্রী দেশে ফির্‌চেন, তিনি আজ ভোরেই তাঁর ক্যাবিন ছেড়ে একবার ডেকের উপর উঠে এসেচেন, জাপানের প্রথম অভ্যর্থনা গ্রহণ কর্‌বার জন্যে। তখন কেবল একটি মাত্র ছোটো নীলাভ পাহাড় মানস-

সরোবরের মস্ত একটি নীল পদ্মের কুঁড়িটির মতো জলের উপরে জেগে রয়েচে। তিনি স্থির নেত্রে এইটুকু কেবল দেখে নীচে নেবে গেলেন, তাঁর সেই চোখে ঐ পাহাড়টুকুকে দেখা আমাদের শক্তিতে নেই—আমরা দেখ্‌চি নূতনকে, তিনি দেখ্‌চেন্ তাঁর চিরন্তনকে : আমরা অনেক তুচ্ছকে বাদ দিয়ে দিয়ে দেখ্‌চি, তিনি ছোটো বড়ো সমস্তকেই তাঁর এক বিরাটের অঙ্গ ক'রে দেখ্‌চেন,—এই জন্যেই ছোটও তাঁর কাছে বড়ো, ভাঙাও তাঁর কাছে জোড়া ; অনেক তাঁর কাছে এক। এই দৃষ্টিই সত্য দৃষ্টি।

জাহাজ যখন একেবারে বন্দরে এসে পৌঁছল, তখন মেঘ কেটে গিয়ে সূর্য্য উঠেচে। বড়ো বড়ো জাপানী অপ্সরা নৌকা, আকাশে পাল উড়িয়ে দিয়ে, যেখানে বরুণদেবের সভাপ্রাঙ্গণে সূর্য্যদেবের নিমন্ত্রণ হয়েচে, সেইখানে নৃত্য কর্‌চে। প্রকৃতির নাট্যমঞ্চে বাদলার যবনিকা উঠে গিয়েচে,—ভাবলুম এইবার ডেকের উপরে রাজার হালে বসে, সমুদ্রের তীরে জাপানের প্রথম প্রবেশটা ভালো ক'রে দেখে নিই।

কিন্তু সে কি হবার জো আছে ? নিজের নামের উপমা গ্রহণ ক'র্‌তে যদি কোনো অপরাধ না থাকে, তাহলে বলি আমার আকাশের মিতা যখন খালাস পেয়েচেন, তখন আমার পালা আরম্ভ হ'ল। আমার চারিদিকে একটু কোথাও ফাঁক দেখ্‌তে পেলুম না। খবরের কাগজের চর তাদের প্রশ্ন এবং তাদের ক্যামেরা নিয়ে আমাকে আচ্ছন্ন ক'রে দিলে।

কোবে সহরে অনেকগুলি ভারতবর্ষীয় বণিক আছেন, তার মধ্যে বাঙালীর ছিটেফোঁটাও কিছু পাওয়া যায়। আমি হংকং সহরে পৌঁছেই এই ভারতবাসীদের টেলিগ্রাম পেয়েছিলুম, তাঁরাই আমার আতিথ্যের ব্যবস্থা করেচেন। তাঁরা জাহাজে গিয়ে আমাকে ধর্‌লেন। ওদিকে জাপানের বিখ্যাত চিত্রকর টাইক্কন এসে উপস্থিত। ইনি যখন ভারতবর্ষে গিয়েছিলেন, আমাদের বাড়ীতে ছিলেন। কাট্‌স্‌টাকেও দেখা গেল, ইনিও আমাদের চিত্রকর বন্ধু। সেই সঙ্গে সানো এসে উপস্থিত,—ইনি এককালে আমাদের শান্তিনিকেতন আশ্রমে জুজুৎসু ব্যায়ামের শিক্ষক ছিলেন। এর মধ্যে কাওয়াগুচিরও দর্শন পাওয়া গেল। এটা বেশ স্পষ্ট বুঝ্‌তে পার্‌লুম, আমাদের নিজের ভাবনা আর ভাবতে হবে না। কিন্তু দেখ্‌তে পেলুম সেই ভাবনার ভার অনেকে মিলে যখন গ্রহণ করেন, তখন ভাবনার অন্ত থাকে না। আমাদের প্রয়োজন অল্প কিন্তু আয়োজন তার চেয়ে অনেক বেশি হ'য়ে উঠ্‌ল। জাপানী পক্ষ থেকে তাঁদের ঘরে নিয়ে যাবার জন্যে আমাকে টানাটানি ক'র্‌তে লাগ্‌লেন—কিন্তু ভারতবাসীর আমন্ত্রণ আমি পূর্ব্বেই গ্রহণ করেচি। এই নিয়ে বিষম একটা সঙ্কট উপস্থিত হ'ল। কোনো পক্ষই হার মান্‌তে চান না। বাদ বিতণ্ডা বচসা চল্‌তে লাগ্‌ল। আবার এরই সঙ্গে সঙ্গে সেই খবরের কাগজের চরের দল আমার চারিদিকে পাক-খেয়ে বেড়াতে লাগ্‌ল। দেশ ছাড়্‌বার মুখে বঙ্গসাগরে পেয়েছিলুম

বাতাসের সাইক্লোন, এখানে জাপানের ঘাটে এসে পৌঁছেই পেলুম মানুষের সাইক্লোন! দুটোর মধ্যে যদি বাছাই কর্‌তেই হয়, আমি প্রথমটাই পছন্দ করি। খ্যাতি জিনিষের বিপদ এই যে, তার মধ্যে যতটুকু আমার দরকার কেবলমাত্র সেইটুকু গ্রহণ ক'রেই নিষ্কৃতি নেই, তার চেয়ে অনেক বেশি নিতে হয়; সেই বেশিটুকুর বোঝা বিষম বোঝা। অনাবৃষ্টি এবং অতিবৃষ্টির মধ্যে কোন্‌টা যে ফসলের পক্ষে বেশি মুস্কিল জানিনে।

এখানকার একজন প্রধান গুজরাটি বণিক মোরারজি—তাঁরই বাড়ীতে আশ্রয় পেয়েচি। সেই সব খবরের কাগজের অনুচররা এখানে এসেও উপস্থিত।

এই উৎপাতটা আশা করিনি। জাপান যে নতুন মদ পান করেচে, এই খবরের কাগজের ফেনিলতা তারই একটা অঙ্গ। এত ফেনা আমেরিকাতেও দেখি নি। এই জিনিষটা কেবলমাত্র কথার হাওয়ার বুদ্বুদপুঞ্জ;—এতে কারো সত্যকার প্রয়োজনও দেখি নে, আমোদও বুঝিনে;—এতে কেবলমাত্র পাত্রটার মাথা শূন্যতায় ভর্ত্তি ক'রে দেয়, মাদকতার ছবিটাকে কেবল চোখের সাম্‌নে প্রকাশ করে। এই মাৎলামিটাই আমাকে সব চেয়ে পীড়া দেয়। যাক্‌গে।

মোরারজির বাড়ীতে আহারে আলাপে অভ্যর্থনায় কাল রাত্তিরটা কেটেচে। এখানকার ঘরকন্নার মধ্যে প্রবেশ ক'রে সব চেয়ে চোখে পড়ে জাপানী দাসী! মাথায় একখানা

ফুলে-ওঠা খোঁপা, গাল দুটো ফুলো ফুলো, চোখ দুটো ছোটো, নাকের একটুখানি অপ্রতুলতা, কাপড় বেশ সুন্দর, পায়ে খড়ের চটি; কবিরা সৌন্দর্য্যের যে-রকম বর্ণনা ক'রে থাকেন, তার সঙ্গে অনৈক্য ঢের; অথচ মোটের উপর দেখ্‌তে ভালো লাগে; যেন মানুষের সঙ্গে পুতুলের সঙ্গে, মাংসের সঙ্গে মোমের সঙ্গে মিশিয়ে একটা পদার্থ; আর সমস্ত শরীরে ক্ষিপ্রতা, নৈপুণ্য, বলিষ্ঠতা। গৃহস্বামী বলেন, এরা যেমন কাজের, তেমনি এরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আমি আমার অভ্যাস বশত ভোরে উঠে জানালার বাইরে চেয়ে দেখ্‌লুম, প্রতিবেশীদের বাড়ীতে ঘরকন্নার হিল্লোল তখন জাগ্‌তে আরম্ভ করেচে—সেই হিল্লোল মেয়েদের হিল্লোল। ঘরে ঘরে এই মেয়েদের কাজের ঢেউ এমন বিচিত্র বৃহৎ এবং প্রবল ক'রে সচরাচর দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। কিন্তু এটা দেখলেই বোঝা যায় এমন স্বাভাবিক আর কিছু নেই। দেহযাত্রা জিনিসটার ভার আদি থেকে অন্ত পর্য্যন্ত মেয়েদেরই হাতে,—এই দেহ-যাত্রার আয়োজন উদ্যোগ মেয়েদের পক্ষে স্বাভাবিক এবং সুন্দর। কাজের এই নিয়ত তৎপরতায় মেয়েদের স্বভাব যথার্থ মুক্তি পায় ব'লে শ্রীলাভ করে। বিলাসের জড়তায় কিম্বা যে-কারণেই হোক্‌, মেয়েরা যেখানে এই কর্ম্মপরতা থেকে বঞ্চিত সেখানে তাদের বিকার উপস্থিত হয়, তাদের দেহমনের সৌন্দর্য্য হানি হ'তে থাকে, এবং তাদের যথার্থ আনন্দের ব্যাঘাত ঘটে। এই যে এখানে সমস্তক্ষণ ঘরে

ঘরে ক্ষিপ্রবেগে মেয়েদের হাতের কাজের স্রোত অবিরত বইচে, এ আমার দেখ্‌তে ভারি সুন্দর লাগ্‌চে। মাঝে মাঝে পাশের ঘর থেকে এদের গলার আওয়াজ এবং হাসির শব্দ শুন্‌তে পাচ্চি, আর মনে মনে ভাব্‌চি মেয়েদের কথা ও হাসি সকল দেশেই সমান। অর্থাৎ সে যেন স্রোতের জলের উপরকার আলোর মতো একটা ঝিকিমিকি ব্যাপার, জীবন-চাঞ্চল্যের অহেতুক লীলা।

কোবে

১৩

নতুনকে দেখ্‌তে হ'লে, মনকে একটু বিশেষ ক'রে বাতি জ্বালাতে হয়। পুরোণোকে দেখ্‌তে হ'লে, ভালো ক'রে চোখ মেল্‌তেই হয় না। সেই জন্যে নতুনকে যত শীঘ্র পারে দেখে নিয়ে, মন আপনার অতিরিক্ত বাতিগুলো নিবিয়ে ফেলে। খরচ বাঁচাতে চায়, মনোযোগকে উস্‌কে রাখ্‌তে চায় না।

মুকুল আমাকে জিজ্ঞাসা কর্‌ছিল,—দেশে থাক্‌তে বই পড়ে', ছবি দেখে' জাপানকে যেরকম বিশেষভাবে নতুন ব'লে মনে হ'ত, এখানে কেন তা হ'চ্চে না?—তার কারণই এই। রেঙ্গুন থেকে আরম্ভ ক'রে, সিঙাপুর, হংকং দিয়ে আস্‌তে আস্‌তে

মনের নতুন দেখার বিশেষ আয়োজনটুকু ক্রমে ক্রমে ফুরিয়ে আসে। যখন বিদেশী সমুদ্রের এ-কোণে ও-কোণে ন্যাড়া ন্যাড়া পাহাড়গুলো উঁকি মার্‌তে থাকে, তখন বল্‌তে থাকি, বাঃ! তখন মুকুল বলে, ঐখানে নেবে গিয়ে থাক্‌তে বেশ মজা! ও মনে করে এই নতুনকে প্রথম দেখার উত্তেজনা বুঝি চিরদিনই থাক্‌বে; ওখানে ঐ ছোটো ছোটো পাহাড়-গুলোর সঙ্গে গলা-ধরাধরি ক'রে সমুদ্র বুঝি চিরদিনই এই নতুন ভাষায় কানাকানি করে; যেন ঐখানে পৌঁছলে পরে সমুদ্রের চঞ্চলনীল, আকাশের শান্তনীল আর ঐ পাহাড়-গুলোর ঝাপ্‌সানীল ছাড়া আর কিছুর দরকারই হয় না। তার পরে বিরল ক্রমে অবিরল হ'তে লাগ্‌ল, ক্ষণে ক্ষণে আমাদের জাহাজ এক-একটা দ্বীপের গা ঘেঁষে চল্‌ল; তখন দেখি দূরবীন টেবিলের উপরে অনাদরে প'ড়ে থাকে, মন আর সাড়া দেয় না। যখন দেখ্‌বার সামগ্রী বেড়ে ওঠে, তখন দেখাটাই কমে যায়। নতুনকে ভোগ ক'রে নতুনের ক্ষিদে ক্রমে কমে' যায়।

হপ্তাখানেক জাপানে আছি, কিন্তু মনে হ'চ্চে যেন অনেক দিন আছি। তার মানে, পথঘাট, গাছপালা, লোকজনের যেটুকু নতুন, সেটুকু তেমন গভীর নয়,—তাদের মধ্যে যেটা পুরোনো সেইটেই পরিমাণে বেশি। অফুরান নতুন কোথাও নেই; অর্থাৎ যার সঙ্গে আমাদের চিরপরিচিত খাপ খায় না, জগতে এমন অসঙ্গত কিছুই নেই। প্রথমে ধাঁ ক'রে চোখে

পড়ে, যেগুলো হঠাৎ আমাদের মনের অভ্যাসের সঙ্গে মেলে না।—তারপরে পুরোণোর সঙ্গে নতুনের যে যে অংশের রঙে মেলে, চেহারায় কাছাকাছি আসে, মন তাড়াতাড়ি সেই-গুলোকে পাশাপাশি সাজিয়ে নিয়ে তাদের সঙ্গে ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয়। তাস খেল্‌তে ব'সে আমরা হাতে কাগজ পেলে রং এবং মূল্য-অনুসারে তাদের পরে পরে সাজিয়ে নিই,—এও সেই রকম। শুধু তো নতুনকে দেখে যাওয়া নয়, তার সঙ্গে যে ব্যবহার কর্‌তে হবে; কাজেই মন তাকে নিজের পুরোণো কাঠামোর মধ্যে যত শীঘ্র পারে গুছিয়ে নেয়। যেই গোছানো হয়, তখন দেখ্‌তে পাই, তত বেশী নতুন নয়, যতটা গোড়ায় মনে হয়েছিল; আসলে পুরোণো, ভঙ্গীটাই নতুন।

তারপরে আর এক মুস্কিল হয়েচে এই যে, দেখ্‌তে পাচ্চি পৃথিবীর সকল সভ্য জাতই বর্ত্তমান কালের ছাঁচে ঢালাই হ'য়ে একই রকম চেহারা অথবা চেহারার অভাব ধারণ করেচে। আমার এই জানালায় ব'সে কোবে সহরের দিকে তাকিয়ে, এই যা দেখ্‌চি, এ তো লোহার জাপান,—এ তো রক্তমাংসের নয়। একদিকে আমার জানলা, আর-একদিকে সমুদ্র, এর মাঝখানে সহর। চীনেরা যেরকম বিকটমূর্ত্তি ড্র্যাগন আঁকে —সেইরকম। আঁকাবাঁকা বিপুল দেহ নিয়ে সে যেন সবুজ পৃথিবীটিকে খেয়ে ফেলেচে। গায়ে গায়ে ঘেঁষাঘেঁষি লোহার চালগুলো ঠিক যেন তারি পিঠের আঁসের মতো রৌদ্রে ঝক্‌ঝক্ ক'র্‌চে। বড়ো কঠিন, বড়ো কুৎসিত,—এই দরকার নামক

দৈত্যটা। প্রকৃতির মধ্যে মানুষের যে অন্ন আছে, তা ফলে-শস্যে বিচিত্র এবং সুন্দর; কিন্তু সেই অন্নকে যখন গ্রাস ক'র্তে যাই, তখন তা'কে তাল পাকিয়ে একটা পিণ্ড ক'রে তুলি; তখন বিশেষত্বকে দরকারের চাপে পিষে ফেলি। কোবে সহরের পিঠের দিকে তাকিয়ে বুঝ্তে পারি, মানুষের দরকার পদার্থটা স্বভাবের বিচিত্রতাকে একাকার ক'রে দিয়েচে। মানুষের দরকার আছে, এই কথাটাই ক্রমাগত বাড়্তে বাড়্তে, হাঁ ক'র্তে ক'র্তে পৃথিবীর অধিকাংশকে গ্রাস ক'রে ফেল্চে। প্রকৃতিও কেবল দরকারের সামগ্রী, মানুষও কেবল দরকারের মানুষ হ'য়ে আস্চে।

যেদিন থেকে ক'ল্কাতা ছেড়ে বেরিয়েচি, ঘাটে ঘাটে দেশে দেশে এইটেই খুব বড়ো ক'রে দেখ্তে পাচ্চি। মানুষের দরকার মানুষের পূর্ণতাকে যে কতখানি ছাড়িয়ে যাচ্চে, এর আগে কোনো দিন আমি সেটা এমন স্পষ্ট ক'রে দেখ্তে পাই নি। এক সময়ে মানুষ এই দরকারকে ছোটো ক'রে দেখেছিল। ব্যবসাকে তারা নীচের জায়গা দিয়েছিল; টাকা রোজগার করাটাকে সম্মান করে নি। দেবপূজা ক'রে, বিদ্যাদান ক'রে, আনন্দ দান ক'রে যারা টাকা নিয়েচে, মানুষ তাদের ঘৃণা করেচে। কিন্তু আজকাল জীবনযাত্রা এতই বেশি দুঃসাধ্য, এবং টাকার আয়তন ও শক্তিই এতই বেশি বড়ো হ'য়ে উঠেছে যে, দরকার এবং দরকারের বাহনগুলোকে মানুষ আর ঘৃণা ক'র্তে সাহস করে না। এখন মানুষ আপনার সকল

জিনিসেরই মুল্যের পরিমাণ, টাকা দিয়ে বিচার ক'র্‌তে লজ্জা করে না। এতে ক'রে সমস্ত মানুষের প্রকৃতি বদল হ'য়ে আস্‌চে—জীবনের লক্ষ্য এবং গৌরব, অন্তর থেকে বাইরের দিকে, আনন্দ থেকে প্রয়োজনের দিকে অত্যন্ত ঝুঁকে পড়্‌চে। মানুষ ক্রমাগত নিজেকে বিক্রি ক'র্‌তে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ ক'র্‌চে না। ক্রমশই সমাজের এমন একটা বদল হ'য়ে আস্‌চে যে টাকাই, মানুষের যোগ্যতারূপে প্রকাশ পাচ্চে। অথচ এটা কেবল দায়ে-পড়ে' ঘট্‌চে, প্রকৃতপক্ষে এটা সত্য নয়। তাই এক সময়ে যে-মানুষ মনুষ্যত্বের খাতিরে টাকাকে অবজ্ঞা ক'র্‌তে জানত, এখন সে টাকার খাতিরে মনুষ্যত্বকে অবজ্ঞা ক'র্‌চে। রাজ্যতন্ত্রে, সমাজতন্ত্রে, ঘরে বাইরে, সর্ব্বত্রই তার পরিচয় কুৎসিত হ'য়ে উঠ্‌চে। কিন্তু বীভৎসতাকে দেখ্‌তে পাচ্চি নে, কেননা লোভে দুই চোখ আচ্ছন্ন।

জাপানে সহরের চেহারায় জাপানিত্ব বিশেষ নেই, মানুষের সাজ সজ্জা থেকেও জাপান ক্রমশঃ বিদায় নিচ্চে। অর্থাৎ, জাপান ঘরের পোষাক ছেড়ে আপিসের পোষাক ধরেচে। আজকাল পৃথিবী-জোড়া একটা আপিস-রাজ্য বিস্তীর্ণ হয়েচে, সেটা কোনো বিশেষ দেশ নয়। যেহেতু আপিসের সৃষ্টি আধুনিক য়ুরোপ থেকে, সেইজন্যে এর বেশ আধুনিক য়ুরোপের। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই বেশে মানুষের বা দেশের পরিচয় দেয় না, আপিস-রাজ্যের পরিচয় দেয়। আমাদের দেশেও ডাক্তার ব'ল্‌চে,—আমার ঐ হ্যাট্‌ কোটের

দরকার আছে; আইনজীবীও তাই ব'ল্‌চে, বণিকও তাই ব'ল্‌চে। এম্‌নি ক'রেই দরকার জিনিষটা বেড়ে চ'ল্‌তে চ'ল্‌তে, সমস্ত পৃথিবীকে কুৎসিতভাবে একাকার ক'রে দিচ্চে।

এইজন্যে জাপানের সহরের রাস্তায় বেরলেই, প্রধানভাবে চোখে পড়ে জাপানের মেয়েরা। তখন বুঝ্‌তে পারি, এরাই জাপানের ঘর, জাপানের দেশ। এরা আপিসের নয়। কারো কারো কাছে শুন্‌তে পাই, জাপানের মেয়েরা এখানকার পুরুষের কাছ থেকে সম্মান পায় না। সে কথা সত্য কি মিথ্যা জানিনে, কিন্তু একটা সম্মান আছে সেটা বাইরে থেকে দেওয়া নয়—সেটা নিজের ভিতরকার। এখানকার মেয়েরাই জাপানের বেশে জাপানের সম্মানরক্ষার ভার নিয়েচে। ওরা দরকারকেই সকলের চেয়ে বড়ো ক'রে খাতির করেনি, সেই জন্যেই ওরা নয়নমনের আনন্দ।

একটা জিনিস্ এখানে পথে ঘাটে চোখে পড়ে। রাস্তায় লোকের ভিড় আছে, কিন্তু গোলমাল একেবারে নেই। এরা যেন চেঁচাতে জানে না, লোকে বলে জাপানের ছেলেরা সুদ্ধ কাঁদে না। আমি এপর্য্যন্ত একটি ছেলেকেও কাঁদতে দেখিনি। পথে মোটরে ক'রে যাবার সময়ে, মাঝে মাঝে যেখানে ঠেলাগাড়ি প্রভৃতি বাধা এসে পড়ে, সেখানে মোটরের চালক শান্তভাবে অপেক্ষা করে,—গাল দেয় না, হাঁকাহাঁকি করে না। পথের মধ্যে হঠাৎ একটা বাইসিক্‌ল্ মোটরের উপরে এসে পড়্‌বার উপক্রম ক'রলে—আমাদের দেশের চালক এ

অবস্থায় বাইসিক্‌ল্‌-আরোহীকে অনাবশ্যক গাল না দিয়ে থাক্‌তে পার্‌ত না। এ লোকটা ভ্রূক্ষেপ মাত্র ক'র্‌লে না। এখানকার বাঙালীদের কাছে শুনতে পেলুম যে, রাস্তায় দুই বাইসিকলে, কিম্বা গাড়ির সঙ্গে বাইসিকলের ঠোকাঠুকি হ'য়ে যখন রক্তপাত হ'য়ে যায়, তখনো উভয় পক্ষ চেঁচামেচি গাল-মন্দ না ক'রে গায়ের ধূলো ঝেড়ে চলে যায়।

আমার কাছে মনে হয়, এইটেই জাপানের শক্তির মূল কারণ জাপানী বাজে চেঁচামেচি ঝগড়াঝাঁটি ক'রে নিজের বলক্ষয় করে না। প্রাণশক্তির বাজে খরচ নেই ব'লে প্রয়োজনের সময় টানাটানি পড়ে না। শরীর মনের এই শান্তি ও সহিষ্ণুতা, ওদের স্বজাতীয় সাধনার একটা অঙ্গ। শোকে দুঃখে, আঘাতে উত্তেজনায়, ওরা নিজেকে সংযত ক'র্‌তে জানে। সেই জন্যেই বিদেশের লোকেরা প্রায় বলে —জাপানীকে বোঝা যায় না, ওরা অত্যন্ত বেশি গূঢ়। এর কারণই হ'চ্চে, এরা নিজেকে সর্ব্বদা ফুটো দিয়ে, ফাঁক দিয়ে গ'লে পড়্‌তে দেয় না।

এই যে নিজের প্রকাশকে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ক'র্‌তে থাকা, —এ ওদের কবিতাতেও দেখা যায়। তিন লাইনের কাব্য জগতের আর কোথাও নেই। এই তিন লাইনই ওদের কবি, পাঠক, উভয়ের পক্ষে যথেষ্ট। সেই জন্যেই এখানে এসে অবধি, রাস্তায় কেউ গান গাচ্চে, এ আমি শুনি নি। এদের হৃদয় ঝরনার জলের মতো শব্দ করে না, সরোবরের জলের

মতো স্তব্ধ। এ পর্য্যন্ত ওদের যত কবিতা শুনেচি সবগুলিই হ'চ্চে ছবি দেখার কবিতা, গান গাওয়ার কবিতা নয়। হৃদয়ের দাহ ক্ষোভ প্রাণকে খরচ করে, এদের সেই খরচ কম। এদের অন্তরের সমস্ত প্রকাশ সৌন্দর্য্য-বোধে। সৌন্দর্য্য-বোধ জিনিসটা স্বার্থনিরপেক্ষ। ফুল, পাখী, চাঁদ, এদের নিয়ে আমাদের কাঁদাকাটা নেই। এদের সঙ্গে আমাদের নিছক সৌন্দর্য্যভোগের সম্বন্ধ—এরা আমাদের কোথাও মারে না, কিছু কাড়ে না—এদের দ্বারা আমাদের জীবনে কোথাও ক্ষয় ঘটে না। সেই জন্যেই তিন লাইনেই এদের কুলোয়, এবং কল্পনাটাতেও এরা শান্তির ব্যাঘাত করে না।

এদের দুটো বিখ্যাত পুরোণো কবিতার নমুনা দেখ্‌লে আমার কথাটা স্পষ্ট হবে ঃ—

পুরোণো পুকুর,
ব্যাঙের লাফ,
জলের শব্দ।

বাস্‌! আর দরকার নেই। জাপানী পাঠকের মনটা চোখে ভরা। পুরোণো পুকুর মানুষের পরিত্যক্ত, নিস্তব্ধ, অন্ধকার। তার মধ্যে একটা ব্যাঙ লাফিয়ে পড়্‌তেই শব্দটা শোনা গেল। শোনা গেল—এতে বোঝা যাবে পুকুরটা কী রকম স্তব্ধ। এই পুরোণো পুকুরের ছবিটা কী ভাবে মনের

মধ্যে এঁকে নিতে হবে সেইটুকু কেবল কবি ইসারা ক'রে দিলে—তার বেশী একেবারে অনাবশ্যক।

আর একটা কবিতা :—

পচা ডাল
একটা কাক,
শরৎ কাল।

আর বেশী না! শরৎকালে গাছের ডালে পাতা নেই, দুই একটা ডাল পচে গেছে, তার উপরে কাক ব'সে। শীতের দেশে শরৎকালটা হ'চ্চে গাছের পাতা ঝ'রে যাবার, ফুল প'ড়ে যাবার, কুয়াশায় আকাশ ম্লান হবার কাল—এই কালটা মৃত্যুর ভাব মনে আনে। পচা ডালে কালো কাক ব'সে আছে, এইটুকুতেই পাঠক শরৎকালের সমস্ত রিক্ততা ও ম্লানতার ছবি মনের সাম্‌নে দেখ্‌তে পায়। কবি কেবল সূত্রপাত ক'রে দিয়েই সরে' দাঁড়ায়। তাকে যে অত অল্পের মধ্যেই সরে' যেতে হয়, তার কারণ এই যে, জাপানি পাঠকের চেহারা দেখার মানসিক শক্তিটা প্রবল।

এইখানে একটা কবিতার নমুনা দিই, যেটা চোখে দেখার চেয়ে বড়ো :—

স্বর্গ এবং মর্ত্ত্য হ'চ্ছে ফুল, দেবতারা এবং বুদ্ধ হচ্চেন ফুল—

মানুষের হৃদয় হ'চ্চে ফুলের অন্তরাত্মা।

আমার মনে হয়, এই কবিতাটিতে জাপানের সঙ্গে ভারত-

বর্ষের মিল হয়েচে। জাপান স্বর্গমর্ত্ত্যকে বিকশিত ফুলের মতো সুন্দর ক'রে দেখ্‌চে—ভারতবর্ষ বল্‌চে, এই যে একবৃন্তে দুই ফুল,—স্বর্গ এবং মর্ত্ত্য, দেবতা এবং বুদ্ধ,—মানুষের হৃদয় যদি না থাকত, তবে এ ফুল কেবলমাত্র বাইরের জিনিস হ'ত;—এই সুন্দরের সৌন্দর্য্যটিই হ'চ্চে মানুষের হৃদয়ের মধ্যে।

যাই হোক্, এই কবিতাগুলির মধ্যে কেবল যে বাক্‌সংযম তা নয়—এর মধ্যে ভাবের সংযম। এই ভাবের সংযমকে হৃদয়ের চাঞ্চল্য কোথাও ক্ষুব্ধ ক'র্‌চে না। আমাদের মনে হয়, এইটেতে জাপানের একটা গভীর পরিচয় আছে। এক কথায় ব'ল্‌তে গেলে, এ'কে বলা যেতে পারে হৃদয়ের মিতব্যয়িতা।

মানুষের একটা ইন্দ্রিয়শক্তিকে খর্ব্ব ক'রে আর-একটাকে বাড়ানো চলে, এ আমরা দেখেচি। সৌন্দর্য্যবোধ এবং হৃদয়াবেগ, এ দুটোই হৃদয়বৃত্তি। আবেগের বোধ এবং প্রকাশকে খর্ব্ব করে', সৌন্দর্য্যের বোধ এবং প্রকাশকে প্রভূত পরিমাণে বাড়িয়ে তোলা যেতে পারে,—এখানে এসে অবধি এই কথাটা আমার মনে হ'য়েচে। হৃদয়োচ্ছ্বাস আমাদের দেশে এবং অন্যত্র বিস্তর দেখেচি, সেইটে এখানে চোখে পড়ে না। সৌন্দর্য্যের অনুভূতি এখানে এত বেশি ক'রে এমন সর্ব্বত্র দেখতে পাই যে, স্পষ্টই বুঝ্‌তে পারি যে, এটা এমন একটা বিশেষ বোধ যা আমরা ঠিক বুঝ্‌তে পারি নে। এ যেন কুকুরের ঘ্রাণশক্তি ও মৌমাছির দিক্-বোধের মতো,

আমাদের উপলব্ধির অতীত। এখানে যে-লোক অত্যন্ত গরীব, সেও প্রতিদিন নিজের পেটের ক্ষুধাকে বঞ্চনা ক'রেও এক আধ পয়সার ফুল না কিনে বাঁচে না। এদের চোখের ক্ষুধা এদের পেটের ক্ষুধার চেয়ে কম নয়।

কাল দুজন জাপানী মেয়ে এসে, আমাকে এ দেশের ফুল সাজানোর বিদ্যা দেখিয়ে গেল। এর মধ্যে কত আয়োজন, কত চিন্তা, কত নৈপুণ্য আছে, তার ঠিকানা নেই। প্রত্যেক পাতা এবং প্রত্যেক ডালটির উপর মন দিতে হয়। চোখে দেখার ছন্দ এবং সঙ্গীত যে এদের কাছে কত প্রবল-ভাবে সুগোচর, কাল আমি ঐ দুজন জাপানী মেয়ের কাজ দেখে বুঝ্‌তে পারছিলুম।

একটা বইয়ে পড়্‌ছিলুম, প্রাচীন কালে বিখ্যাত যোদ্ধা যাঁরা ছিলেন, তাঁরা অবকাশকালে এই ফুল সাজাবার বিদ্যার আলোচনা ক'র্‌তেন। তাঁদের ধারণা ছিল, এতে তাঁদের রণদক্ষতা ও বীরত্বের উন্নতি হয়। এর থেকেই বুঝ্‌তে পার্‌বে, জাপানী নিজের এই সৌন্দর্য্য-অনুভূতিকে সৌখীন জিনিষ ব'লে মনে করে না; ওরা জানে গভীরভাবে এতে মানুষের শক্তিবৃদ্ধি হয়। এই শক্তিবৃদ্ধির মূল কারণটা হ'চ্চে শান্তি; যে-সৌন্দর্য্যের আনন্দ নিরাসক্ত আনন্দ, তাতে জীবনের ক্ষয় নিবারণ করে, এবং যে উত্তেজনাপ্রবণতায় মানুষের মনোবৃত্তি ও হৃদয়বৃত্তিকে মেঘাচ্ছন্ন ক'রে তোলে, এই সৌন্দর্য্যবোধ তাকে পরিশ্রান্ত করে।

সেদিন একজন ধনী জাপানী তাঁর বাড়িতে চা-পান অনুষ্ঠানে আমাদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন। তোমরা ওকাকুরার Book of Tea পড়েচ, তাতে এই অনুষ্ঠানের বর্ণনা আছে। সেদিন এই অনুষ্ঠান দেখে স্পষ্ট বুঝ্‌তে পারলুম, জাপানীর পক্ষে এটা ধর্ম্মানুষ্ঠানের তুল্য; এ ওদের একটা জাতীয় সাধনা। ওরা কোন্ আইডিয়ালকে লক্ষ্য ক'র্‌চে, এর থেকে তা বেশ বোঝা যায়।

কোবে থেকে দীর্ঘ পথ মোটর যানে ক'রে গিয়ে, প্রথমেই একটি বাগানে প্রবেশ করলুম—সে বাগান ছায়াতে, সৌন্দর্য্যে এবং শান্তিতে একেবারে নিবিড়ভাবে পূর্ণ। বাগান জিনিযটা যে কী, তা এরা জানে। কতকগুলো কাঁকর ফেলে আর গাছ পুঁতে, মাটির উপরে জিয়োমেট্রি কষাকেই যে বাগান করা বলে না, তা জাপানী-বাগানে ঢুকলেই বোঝা যায়। জাপানীর চোখ এবং হাত দুইই প্রকৃতির কাছ থেকে সৌন্দর্য্যের দীক্ষা-লাভ করেচে,—যেমন ওরা দেখ্‌তে জানে, তেমনি ওরা গড়্‌তে জানে। ছায়াপথ দিয়ে গিয়ে এক জায়গায় গাছের তলায় গর্ত্ত-করা একটা পাথরের মধ্যে স্বচ্ছ জল আছে, সেই জলে আমরা প্রত্যেকে হাত মুখ ধুলুম। তারপরে একটা ছোট্ট ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে বেঞ্চির উপরে ছোটো ছোটো গোল গোল খড়ের আসন পেতে দিলে, তার উপরে আমরা বস্‌লুম। নিয়ম হ'চ্চে এইখানে কিছুকাল নীরব হ'য়ে ব'সে থাক্‌তে হয়। গৃহস্বামীর সঙ্গে যাবামাত্রই দেখা হয় না। মনকে শান্ত ক'রে

স্থির কর্‌বার জন্যে, ক্রমে ক্রমে নিমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে যাওয়া হয়। আস্তে আস্তে দুটো তিনটে ঘরের মধ্যে বিশ্রাম ক'র্‌তে ক'র্‌তে, শেষে আসল জায়গায় যাওয়া গেল। সমস্ত ঘরই নিস্তব্ধ, যেন চিরপ্রদোষের ছায়াবৃত—কারো মুখে কথা নেই। মনের উপর এই ছায়াঘন নিঃশব্দ নিস্তব্ধতার সম্মোহন ঘনিয়ে উঠ্‌তে থাকে। অবশেষে ধীরে ধীরে গৃহস্বামী এসে নমস্কারের দ্বারা আমাদের অভ্যর্থনা কর্‌লেন।

ঘরগুলিতে আসবাব নেই বল্লেই হয়, অথচ মনে হয় যেন এ সমস্ত ঘর কী-একটাতে পূর্ণ, গম্‌গম্‌ ক'র্‌চে। একটিমাত্র ছবি কিম্বা একটিমাত্র পাত্র কোথাও আছে। নিমন্ত্রিতেরা সেইটি বহুযত্নে দেখে দেখে নীরবে তৃপ্তিলাভ করেন। যে জিনিষ যথার্থ সুন্দর, তার চারিদিকে মস্ত একটি বিরলতার অবকাশ থাকা চাই। ভালো জিনিষগুলিকে ঘেঁসাঘেঁসি ক'রে রাখা তাদের অপমান করা—সে যেন সতী স্ত্রীকে সতীনের ঘর ক'র্‌তে দেওয়ার মতো। ক্রমে ক্রমে অপেক্ষা ক'রে ক'রে, স্তব্ধতা ও নিঃশব্দতার দ্বারা মনের ক্ষুধাকে জাগ্রত ক'রে তুলে, তার পরে এইরকম দুটি একটি ভালো জিনিষ দেখালে, সে যে কী উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে, এখানে এসে তা স্পষ্ট বুঝতে পার্‌লুম। আমার মনে পড়্‌ল, শান্তিনিকেতন আশ্রমে যখন আমি এক-একদিন এক-একটি গান তৈরি ক'রে সকলকে শোনাতুম, তখন সকলেরই কাছে সেই গান তার হৃদয় সম্পূর্ণ উদ্‌ঘাটিত ক'রে দিত। অথচ সেই সব গানকেই তোড়া

বেঁধে কল্‌কাতায় এনে যখন বান্ধব-সভায় ধরেচি, তখন তা'রা আপনার যথার্থ শ্রীকে আবৃত ক'রে রেখেচে। তার মানেই কল্‌কাতার বাড়ীতে গানের চারিদিকে ফাঁকা নেই—সমস্ত লোকজন ঘরবাড়ী, কাজকর্ম্ম, গোলমাল, তার ঘাড়ের উপর গিয়ে পড়েছে। যে-আকাশের মধ্যে তার ঠিক অর্থটি বোঝা যায়, সেই আকাশ নেই।

তারপরে গৃহস্বামী এসে বল্লেন,—চা তৈরি করা এবং পরিবেষণের ভার বিশেষ কারণে তিনি তাঁর মেয়ের উপরে দিয়েচেন। তাঁর মেয়ে এসে, নমস্কার ক'রে, চা তৈরিতে প্রবৃত্ত হলেন। তাঁর প্রবেশ থেকে আরম্ভ করে', চা তৈরির প্রত্যেক অঙ্গ যেন ছন্দের মতো। ধোওয়া মোছা, আগুন-জ্বালা, চা-দানির ঢাকা খোলা, গরম জলের পাত্র নামানো, পেয়ালায় চা ঢালা, অতিথির সম্মুখে এগিয়ে দেওয়া, সমস্ত এমন সংযম এবং সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত যে, সে না দেখ্‌লে বোঝা যায় না। এই চা-পানের প্রত্যেক আস্‌বাবটি দুর্লভ ও সুন্দর। অতিথির কর্ত্তব্য হ'চ্চে, এই পাত্রগুলিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একান্ত মনোযোগ দিয়ে দেখা। প্রত্যেক পাত্রের স্বতন্ত্র নাম এবং ইতিহাস। কত যে তার যত্ন, সে বলা যায় না।

সমস্ত ব্যাপারটা এই। শরীরকে মনকে একান্ত সংযত করে', নিরাসক্ত প্রশান্ত মনে সৌন্দর্য্যকে নিজের প্রকৃতির মধ্যে গ্রহণ করা। ভোগীর ভোগোন্মাদ নয়;—কোথাও

লেশমাত্র উচ্ছৃঙ্খলতা বা অমিতাচার নেই ;—মনের উপর-তলায় সর্ব্বদা যেখানে নানা স্বার্থের আঘাতে, নানা প্রয়োজনের হাওয়ায়, কেবলি ঢেউ উঠ্‌চে,—তার থেকে দূরে, সৌন্দর্য্যের গভীরতার মধ্যে নিজেকে সমাহিত ক'রে দেওয়াই হ'চ্চে এই চা-পান অনুষ্ঠানের তাৎপর্য্য।

এর থেকে বোঝা যায়, জাপানের যে সৌন্দর্য্যবোধ, সে তার একটা সাধনা, একটা প্রবল শক্তি। বিলাস জিনিষটা অন্তরে বাহিরে কেবল খরচ করায়, তাতেই দুর্ব্বল করে। কিন্তু বিশুদ্ধ সৌন্দর্য্যবোধ মানুষের মনকে স্বার্থ এবং বস্তুর সংঘাত থেকে রক্ষা করে। সেই জন্যেই জাপানীর মনে এই সৌন্দর্য্যরসবোধ পৌরুষের সঙ্গে মিলিত হ'তে পেরেচে।

এই উপলক্ষ্যে আর একটি কথা বল্‌বার আছে। এখানে মেয়ে পুরুষের সামীপ্যের মধ্যে কোনো গ্লানি দেখ্‌তে পাইনে। অন্যত্র মেয়েপুরুষের মাঝখানে যে একটা লজ্জা সঙ্কোচের আবিলতা আছে, এখানে তা নেই। মনে হয় এদের মধ্যে মোহের একটা আবরণ যেন কম। তার প্রধান কারণ, জাপানে স্ত্রী-পুরুষের একত্র বিবস্ত্র হ'য়ে স্নান করার প্রথা আছে। এই প্রথার মধ্যে যে লেশমাত্র কলুষ নেই, তার প্রমাণ এই—নিকটতম আত্মীয়েরাও এতে মনে কোনো বাধা অনুভব করে না। এমনি ক'রে, এখানে স্ত্রীপুরুষের দেহ, পরস্পরের দৃষ্টিতে কোনো মায়াকে পালন করে না। দেহ সম্বন্ধে উভয় পক্ষের মন খুব স্বাভাবিক। অন্য দেশের কলুষদৃষ্টি ও দুষ্ট-

বুদ্ধির খাতিরে আজকাল সহরে এই নিয়ম উঠে যাচ্চে। কিন্তু পাড়াগাঁয়ে এখনো এই নিয়ম চলিত আছে। পৃথিবীতে যত সভ্য দেশ আছে, তার মধ্যে কেবল জাপান মানুষের দেহ সম্বন্ধে যে মোহমুক্ত,—এটা আমার কাছে খুব একটা বড়ো জিনিষ ব'লে মনে হয়।

অথচ আশ্চর্য্য এই যে, জাপানের ছবিতে উলঙ্গ স্ত্রীমূর্ত্তি কোথাও দেখা যায় না। উলঙ্গতার গোপনীয়তা ওদের মনে রহস্যজাল বিস্তার করে নি ব'লেই এটা সম্ভবপর হয়েচে। আরো একটা জিনিষ দেখ্‌তে পাই। এখানে মেয়েদের কাপড়েব মধ্যে নিজেকে স্ত্রীলোক ব'লে বিজ্ঞাপন দেবার কিছুমাত্র চেষ্টা নেই। প্রায় সর্ব্বত্রই মেয়েদের বেশের মধ্যে এমন কিছু ভঙ্গী থাকে, যাতে বোঝা যায় তা'রা বিশেষভাবে পুরুষের মোহদৃষ্টির প্রতি দাবী রেখেচে। এখানকার মেয়েদের কাপড় সুন্দর, কিন্তু সে কাপড়ে দেহের পরিচয়কে ইঙ্গিতের দ্বারা দেখাবার কোনো চেষ্টা নেই। জাপানীদের মধ্যে চরিত্র-দৌর্ব্বল্য যে কোথাও নেই তা আমি বল্‌চি নে, কিন্তু স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধকে ঘিরে তুলে প্রায় সকল সভ্যদেশেই মানুষ যে একটা কৃত্রিম মোহ-পরিবেষ্টন রচনা করেচে, জাপানীর মধ্যে অন্তত তার একটা আয়োজন কম ব'লে মনে হ'ল, এবং অন্তত সেই পরিমাণে এখানে স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ স্বাভাবিক এবং মোহমুক্ত।

আর একটি জিনিষ আমাকে বড়ো আনন্দ দেয়, সে হ'চ্চে

জাপানের ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে। রাস্তায় ঘাটে সর্ব্বদা এত বেশি পরিমাণে এত ছোটো ছেলেমেয়ে আমি আর কোথাও দেখি নি। আমার মনে হ'ল, যে-কারণে জাপানীরা ফুল ভালোবাসে, সেই কারণেই ওরা শিশু ভালোবাসে। শিশুর ভালোবাসায় কোনো কৃত্রিম মোহ নেই—আমরা ওদের ফুলের মতোই নিঃস্বার্থ নিরাসক্তভাবে ভালোবাস্‌তে পারি।

কাল সকালেই ভারতবর্ষের ডাক যাবে, এবং আমরাও টোকিয়ো যাত্রা ক'র্‌ব। একটি কথা তোমরা মনে রেখো—আমি যেমন যেমন দেখ্‌চি, তেম্‌নি তেম্‌নি লিখে চলেচি। এ কেবল একটা নতুন দেশের উপর চোখ বুলিয়ে যাবার ইতিহাস মাত্র। এর মধ্যে থেকে তোমরা কেউ যদি অধিক পরিমাণে, এমন কি, অল্প পরিমাণেও "বস্তুতন্ত্রতা" দাবী কর তো নিরাশ হবে। আমার এই চিঠিগুলি জাপানের ভূবৃত্তান্ত-রূপে পাঠ্য-সমিতি নির্ব্বাচন ক'র্‌বেন না, নিশ্চয় জানি। জাপান সম্বন্ধে আমি যা-কিছু মতামত প্রকাশ ক'রে চলেচি, তার মধ্যে জাপান কিছু পরিমাণে আছে, আমিও কিছু পরিমাণে আছি, এইটে তোমরা যদি মনে নিয়ে পড়—তাহ'লেই ঠক্‌বে না। ভুল ব'ল্‌ব না, এমন আমার প্রতিজ্ঞা নয়;—যা মনে হ'চ্চে তাই বল্‌ব, এই আমার মৎলব।

২২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩

কোবে।

১৪

যেমন-যেমন দেখ্‌চি তেম্‌নি-তেম্‌নি লিখে যাওয়া আর সম্ভব নয়। পূর্ব্বেই লিখেচি, জাপানীরা বেশি ছবি দেয়ালে টাঙায় না, গৃহসজ্জায় ঘর ভ'রে ফেলে না। যা তাদের কাছে রমণীয়, তা তা'রা অল্প ক'রে দেখে; দেখা সম্বন্ধে এরা যথার্থ ভোগী ব'লেই, দেখা সম্বন্ধে এদের পেটুকতা নাই। এরা জানে, অল্প ক'রে না দেখ্‌লে পূর্ণ পরিমাণে দেখা হয় না। জাপান-দেখা সম্বন্ধেও আমার তাই ঘট্‌চে;—দেখবার জিনিষ একেবারে হুড়মুড় ক'রে চারিদিক থেকে চোখের উপর চেপে পড়চে;—তাই প্রত্যেকটিকে সুস্পষ্ট ক'রে সম্পূর্ণ ক'রে দেখা এখন আর সম্ভব হয় না। এখন কিছু রেখে কিছু বাদ দিয়ে চল্‌তে হবে।

এখানে এসেই আদর অভ্যর্থনার সাইক্লোনের মধ্যে প'ড়ে গেছি; সেই সঙ্গে খবরের কাগজের চরেরা চারিদিকে তুফান লাগিয়ে দিয়েচে। এদের ফাঁক দিয়ে যে জাপানের আর কিছু দেখব, এমন আশা ছিল না। জাহাজে এরা ছেঁকে ধরে, রাস্তায় এরা সঙ্গে সঙ্গে চলে, ঘরের মধ্যে এরা ঢুকে পড়্‌তে সঙ্কোচ করে না।

এই কৌতূহলীর ভিড় ঠেল্‌তে ঠেল্‌তে, অবশেষে টোকিয়ো সহরে এসে পৌঁছন গেল। এখানে আমাদের চিত্রকর বন্ধু য়োকোয়ামা টাইক্কানের বাড়িতে এসে আশ্রয় পেলুম। এখন

থেকে ক্রমে জাপানের অন্তরের পরিচয় পেতে আরম্ভ করা গেল।

প্রথমেই জুতো জোড়াটাকে বাড়ির দরজার কাছে ত্যাগ ক'র্‌তে হ'ল। বুঝলুম জুতো জোড়াটা রাস্তার, পা জিনিষটাই ঘরের। ধূলো জিনিষটাও দেখ্‌লুম এদের ঘরের নয়, সেটা বাইরের পৃথিবীর। বাড়ির ভিতরকার সমস্ত ঘর এবং পথ মাহুর দিয়ে মোড়া, সেই মাহুরের নীচে শক্ত খড়ের গদি; তাই এদের ঘরের মধ্যে যেমন পায়ের ধূলো পড়ে না, তেমনি পায়ের শব্দও হয় না। দরজাগুলো ঠেলা দরজা, বাতাসে যে ধড়াধ্বড় পড়্‌বে এমন সম্ভাবনা নেই।

আর একটা ব্যাপার এই,—এদের বাড়ি জিনিষটা অত্যন্ত অধিক নয়। দেয়াল, কড়ি, বরগা, জানালা, দরজা, যতদূর পরিমিত হ'তে পারে, তাই। অর্থাৎ বাড়িটা মানুষকে ছাড়িয়ে যায় নি, সম্পূর্ণ তার আয়ত্তের মধ্যে। এ'কে মাজা ঘষা ধোওয়া মোছা দুঃসাধ্য নয়।

তারপরে, ঘরে যেটুকু দরকার, তা ছাড়া আর কিছু নেই। ঘরের দেয়াল মেঝে সমস্ত যেমন পরিস্কার, তেমনি ঘরের ফাঁকটুকুও যেন তক্‌তক্ ক'র্‌চে, তার মধ্যে বাজে জিনিষের চিহ্নমাত্র পড়ে নি। মস্ত সুবিধে এই যে, এদের মধ্যে যাদের সাবেক চাল আছে, তারা চৌকি টেবিল একেবারে ব্যবহার করে না। সকলেই জানে চৌকি টেবিলগুলো জীব নয় বটে, কিন্তু তারা হাত-পা-ওয়ালা। যখন তাদের কোনো দরকার

নেই, তখনো তা'রা দরকারের অপেক্ষায় হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে। অতিথিরা আস্‌চে যাচ্চে, কিন্তু অতিথিদের এই খাপগুলি জায়গা জুড়েই আছে। এখানে ঘরের মেজের উপরে মানুষ বসে, সুতরাং যখন তা'রা চ'লে যায়, তখন ঘরের আকাশে তা'রা কোনো বাধা রেখে যায় না। ঘরের একধারে মাদুর নেই, সেখানে পালিশ করা কাষ্ঠখণ্ড ঝক্‌ঝক্ ক'র্‌চে, সেই দিকের দেয়ালে একটি ছবি ঝুলচে, এবং সেই ছবির সামনে সেই তক্তাটির উপর একটি ফুলদানীর উপরে ফুল সাজানো। ঐ যে ছবিটি আছে, এটা আড়ম্বরের জন্যে নয়, এটা দেখবার জন্যে। সেইজন্যে যাতে ওর গা ঘেঁসে কেউ না বসতে পারে, যাতে ওর সাম্‌নে যথেষ্ট পরিমাণে অব্যাহত অবকাশ থাকে, তারি ব্যবস্থা রয়েচে। সুন্দর জিনিষকে যে ওরা কত শ্রদ্ধা করে, এর থেকেই তা বোঝা যায়। ফুল সাজানোও তেমনি। অন্যত্র নানা ফুল ও পাতাকে ঠেসে একটা তোড়ার মধ্যে বেঁধে ফেলে—ঠিক যেমন ক'রে বারুণীযোগের সময় তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের এক গাড়িতে ভর্ত্তি ক'রে দেওয়া হয়, তেমনি,—কিন্তু এখানে ফুলের প্রতি সে অত্যাচার হবার জো নেই—ওদের জন্যে থার্ডক্লাসের গাড়ি নয়, ওদের জন্যে রিজার্ভ-করা সেলুন। ফুলের সঙ্গে ব্যবহারে এদের না আছে দড়াদড়ি, না আছে ঠেলাঠেলি, না আছে হট্টগোল।

ভোরের বেলা উঠে জানালার কাছে আসন পেতে যখন বসলুম, তখন বুঝ্‌লুম জাপানীরা কেবল যে শিল্পকলায় ওস্তাদ,

তা নয়,—মানুষের জীবনযাত্রাকে এরা একটি কলাবিদ্যার মতো আয়ত্ত করেছে। এরা এটুকু জানে, যে-জিনিষের মূল্য আছে গৌরব আছে, তার জন্যে যথেষ্ট জায়গা ছেড়ে দেওয়া চাই। পূর্ণতার জন্যে রিক্ততা সব চেয়ে দরকারী। বস্তু-বাহুল্য জীবনবিকাশের প্রধান বাধা। এই সমস্ত বাড়িটির মধ্যে কোথাও একটি কোণেও একটু অনাদর নেই, অনাবশ্য-কতা নেই। চোখকে মিছিমিছি কোনো জিনিষ আঘাত ক'র্‌চে না, কানকে বাজে কোনো শব্দ বিরক্ত ক'র্‌চে না,—মানুষের মন নিজেকে যতখানি ছড়াতে চায় ততখানি ছড়াতে পারে, পদে পদে জিনিষপত্রের উপরে ঠোকর খেয়ে পড়ে না।

যেখানে চারিদিকে এলোমেলো, ছড়াছড়ি নানা জঞ্জাল, নানা আওয়াজ,—সেখানে যে প্রতিমুহূর্ত্তেই আমাদের জীবনের এবং মনের শক্তিক্ষয় হ'চ্চে, সে আমরা অভ্যাসবশত বুঝ্‌তে পারি নে। আমাদের চারিদিকে যা-কিছু আছে, সমস্তই আমাদের প্রাণ-মনের কাছে কিছু-না-কিছু আদায় ক'র্‌চেই। যে-সব জিনিষ অদরকারী এবং অসুন্দর, তা'রা আমাদের কিছুই দেয় না—কেবল আমাদের কাছ থেকে নিতে থাকে। এমনি ক'রে নিশিদিন আমাদের যা ক্ষয় হ'চ্চে, সেটাতে আমাদের শক্তির কম অপব্যয় হ'চ্চে না।

সেদিন সকালবেলায় মনে হ'ল আমার মন যেন কানায় কানায় ভ'রে উঠেচে। এতদিন যেরকম ক'রে মনের শক্তি

বহন ক'রেচি, সে যেন চালুনিতে জল ধরা, কেবল গোলমালের ছিদ্র দিয়ে সমস্ত বেরিয়ে গেছে ; আর এখানে এ যেন ঘটের ব্যবস্থা। আমাদের দেশের ক্রিয়াকর্ম্মের কথা মনে হ'ল। কী প্রচুর অপব্যয়! কেবলমাত্র জিনিষপত্রের গণ্ডগোল নয়,—মানুষের কী চেঁচামেচি, ছুটোছুটি, গলা-ভাঙাভাঙি! আমাদের নিজের বাড়ির কথা মনে হ'ল। বাঁকাচোরা উঁচুনীচু রাস্তার উপর দিয়ে গোরুর গাড়ি চলার মতো সেখানকার জীবনযাত্রা। যতটা চল্‌চে তার চেয়ে আওয়াজ হ'চ্চে ঢের বেশি। দরোয়ান হাঁক দিচ্চে, বেহারাদের ছেলেরা চেঁচামেচি ক'র্‌চে, মেথরদের মহলে ঘোরতর ঝগড়া বেধে গেছে, মাড়োয়াড়ি প্রতিবেশিনীরা চীৎকার শব্দে একঘেয়ে গান ধরেচে, তার আর অন্তই নেই। আর ঘরের ভিতরে নানা জিনিসপত্রের ব্যবস্থা এবং অব্যবস্থা,—তার বোঝা কি কম! সেই বোঝা কি কেবল ঘরের মেঝে বহন ক'র্‌চে! তা নয়,— প্রতিক্ষণেই আমাদের মন বহন ক'র্‌চে। যা গোছালো, তার বোঝা কম ; যা অগোছালো, তার বোঝা আরো বেশি,— এই যা তফাৎ। যেখানে একটা দেশের সমস্ত লোকই কম চেঁচায়, কম জিনিষ ব্যবহার করে, ব্যবস্থাপূর্ব্বক কাজ ক'র্‌তে যাদের আশ্চর্য্য দক্ষতা,—সমস্ত দেশ জুড়ে তাদের যে কতখানি শক্তি জ'মে উঠ্‌চে, তার কি হিসেব আছে?

জাপানীরা যে রাগ করে না, তা নয়,—কিন্তু সকলের কাছেই একবাক্যে শুনেছি, এরা ঝগড়া করে না। এদের

গালাগালির অভিধানে একটিমাত্র কথা আছে—বোকা—তার উর্দ্ধে এদের ভাষা পৌঁছয় না! ঘোরতর রাগারাগি মনান্তর হ'য়ে গেল, পাশের ঘরে তার টুঁশব্দ পৌঁছল না,—এইটি হ'চ্চে জাপানী রীতি। শোকদুঃখ সম্বন্ধেও এই রকম স্তব্ধতা।

এদের জীবনযাত্রায় এই রিক্ততা, বিরলতা, মিতাচার কেবলমাত্র যদি অভাবাত্মক হ'ত, তাহ'লে সেটাকে প্রশংসা করবার কোনো হেতু থাক্‌ত না। কিন্তু এইত দেখচি, এরা ঝগড়া করে না বটে, অথচ প্রয়োজনের সময় প্রাণ দিতে প্রাণ নিতে এরা পিছ্‌পাও হয় না। জিনিসপত্রের ব্যবহারে এদের সংযম, কিন্তু জিনিসপত্রের প্রতি প্রভুত্ব এদের তো কম নয়। সকল বিষয়েই এদের যেমন শক্তি, তেমনি নৈপুণ্য, তেমনি সৌন্দর্য্যবোধ।

এ সম্বন্ধে যখন আমি এদের প্রশংসা ক'রেচি, তখন এদের অনেকের কাছেই শুনেছি যে, "এটা আমরা বৌদ্ধধর্ম্মের প্রসাদে পেয়েচি। অর্থাৎ বৌদ্ধধর্ম্মের একদিকে সংযম আর একদিকে মৈত্রী, এই যে সামঞ্জস্যের সাধনা আছে, এতেই আমরা মিতাচারের দ্বারাই অমিত শক্তির অধিকার পাই। বৌদ্ধধর্ম্ম যে মধ্যপথের ধর্ম্ম।"

শুনে আমার লজ্জা বোধ হয়। বৌদ্ধধর্ম্ম তো আমাদের দেশেও ছিল, কিন্তু আমাদের জীবনযাত্রাকে তো এমন আশ্চর্য্য ও সুন্দর সামঞ্জস্যে বেঁধে তুল্‌তে পারে নি। আমাদের

কল্পনায় ও কাজে এমনতর প্রভূত আতিশয্য, ঔদাসীন্য, উচ্ছৃঙ্খলতা কোথা থেকে এলো ?

একদিন জাপানী নাচ দেখে এলুম। মনে হ'ল এ যেন দেহভঙ্গীর সঙ্গীত। এই সঙ্গীত আমাদের দেশের বীণার আলাপ। অর্থাৎ পদে পদে মীড়। ভঙ্গীবৈচিত্র্যের পরস্পরের মাঝখানে কোনো ফাঁক নেই, কিম্বা কোথাও জোড়ের চিহ্ন দেখা যায় না; সমস্ত দেহ পুষ্পিত লতার মতো একসঙ্গে দুল্‌তে দুল্‌তে সৌন্দর্য্যের পুষ্পবৃষ্টি ক'র্‌চে। খাঁটি য়ুরোপীয় নাচ অর্দ্ধনারীশ্বরের মতো, আধখানা ব্যায়াম আধখানা নাচ; তার মধ্যে লম্ফঝম্ফ, ঘুরপাক, আকাশকে লক্ষ্য ক'রে লাথি-ছোঁড়াছোঁড়ি আছে। জাপনী নাচ একেবারে পরিপূর্ণ নাচ। তার সজ্জার মধ্যেও লেশমাত্র উলঙ্গতা নেই। অন্য দেশের নাচে দেহের সৌন্দর্য্যলীলার সঙ্গে দেহের লালসা মিশ্রিত। এখানে নাচের কোনো ভঙ্গীর মধ্যে লালসার ইসারামাত্র দেখা গেল না। আমার কাছে তার প্রধান কারণ এই বোধ হয় যে, সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা জাপানীর মনে এমন সত্য যে, তার মধ্যে কোনোরকমের মিশল তাদের দরকার হয় না, এবং সহ্য হয় না।

কিন্তু এদের সঙ্গীতটা আমার মনে হ'ল বড়ো বেশিদূর এগোয় নি। বোধ হয় চোক আর কান, এই দুইয়ের উৎকর্ষ একসঙ্গে ঘটে না। মনের শক্তিস্রোত যদি এর কোনো একটা রাস্তা দিয়ে অত্যন্ত বেশি আনাগোনা করে, তাহ'লে

অন্য রাস্তাটায় তার ধারা অগভীর হয়। ছবি জিনিসটা হ'চ্চে অবনীর, গান জিনিসটা গগনের। অসীম যেখানে সীমার মধ্যে, সেখানে ছবি; অসীম যেখানে সীমাহীনতায়, সেখানে গান। রূপরাজ্যের কলা ছবি, অপরূপ রাজ্যের কলা গান। কবিতা উভচর, ছবির মধ্যেও চলে, গানের মধ্যেও ওড়ে। কেননা কবিতার উপকরণ হ'চ্চে ভাষা। ভাষার একটা দিকে অর্থ, আর একটা দিকে সুর; এই অর্থের যোগে ছবি গ'ড়ে ওঠে, সুরের যোগে গান।

জাপানী রূপরাজ্যের সমস্ত দখল ক'রেচে। যা-কিছু চোখে পড়ে, তার কোথাও জাপানীর আলস্য নেই, অনাদর নেই; তাব সর্ব্বত্রই সে একেবারে পরিপূর্ণতার সাধন ক'রেচে। অন্য দেশে গুণী এবং রসিকের মধ্যেই রূপ-রসের যে বোধ দেখ্‌তে পাওয়া যায়, এ-দেশে সমস্ত জাতের মধ্যে তাই ছড়িয়ে পড়েচে। য়ুরোপে সর্ব্বজনীন বিদ্যাশিক্ষা আছে, সর্ব্বজনীন সৈনিকতার চর্চ্চাও সেখানে অনেক জায়গায় প্রচলিত,—কিন্তু এমনতর সর্ব্বজনীন রসবোধের সাধনা পৃথিবীর আর কোথাও নেই। এখানে দেশের সমস্ত লোক সুন্দরের কাছে আত্ম-সমর্পণ ক'রেচে।

তাতে কি এরা বিলাসী হয়েচে? অকর্ম্মণ্য হয়েচে? জীবনের কঠিন সমস্যা ভেদ ক'র্‌তে এরা কি উদাসীন কিম্বা অক্ষম হয়েচে?—ঠিক তার উল্টো। এরা এই সৌন্দর্য্য-সাধনা থেকেই মিতাচার শিখেচে: এই সৌন্দর্য্যসাধনা

থেকেই এরা বীর্য্য এবং কর্ম্মনৈপুণ্য লাভ ক'রেচে। আমাদের দেশে একদল লোক আছে, তা'রা মনে করে শুষ্কতাই বুঝি পৌরুষ। এবং কর্ত্তব্যের পথে চল্‌বার সদুপায় হ'চ্চে রসের উপবাস,—তা'রা জগতের আনন্দকে মুড়িয়ে ফেলাকেই জগতের ভালো করা মনে করে।

য়ুরোপে যখন গেছি, তখন তাদের কলকারখানা, তাদের কাজের ভিড়, তাদের ঐশ্বর্য্য এবং প্রতাপ খুব ক'রে চোখে পড়েচে এবং মনকে অভিভূত করেচে। তবু "এহ বাহ্য।" কিন্তু জাপানে আধুনিকতার ছদ্মবেশ ভেদ ক'রে যা চোখে পড়ে, সে হ'চ্চে মানুষের হৃদয়ের সৃষ্টি। সে অহঙ্কার নয়, আড়ম্বর নয়,—সে পূজা। প্রতাপ নিজেকে প্রচার করে; এই জন্যে যতদূর পারে বস্তুর আয়তনকে বাড়িয়ে তুলে' আর-সমস্তকে তা'র কাছে নত ক'র্‌তে চায়। কিন্তু পূজা আপনার চেয়ে বড়োকে প্রচার করে; এই জন্যে তার আয়োজন সুন্দর এবং খাঁটি, কেবলমাত্র মস্ত এবং অনেক নয়। জাপান আপনার ঘরে বাইরে সর্ব্বত্র সুন্দরের কাছে আপন অর্ঘ্য নিবেদন ক'রে দিচ্চে। এদেশে আসবামাত্র সকলের চেয়ে বড়ো বাণী যা কানে এসে পৌঁছয় সে হ'চ্চে "আমার ভালো লাগ্‌ল, আমি ভাল বাসলুম।" এই কথাটি দেশসুদ্ধ সকলের মনে উদয় হওয়া সহজ নয়, এবং সকলের বাণীতে প্রকাশ হওয়া আরো শক্ত। এখানে কিন্তু প্রকাশ হয়েচে। প্রত্যেক ছোটো জিনিষে, ছোটো ব্যবহারে, সেই আনন্দের পরিচয়

পাই। সেই আনন্দ, ভোগের আনন্দ নয়,—পূজার আনন্দ। সুন্দরের প্রতি এমন আন্তরিক সম্ভ্রম অন্য কোথাও দেখি নি। এমন সাবধানে যত্নে, এমন শুচিতা রক্ষা ক'রে সৌন্দর্য্যের সঙ্গে ব্যবহার ক'র্‌তে, অন্য কোনো জাতি শেখে নি। যা এদের ভালো লাগে, তার সামনে এরা শব্দ করে না। সংযমই প্রচুরতার পরিচয়, এবং স্তব্ধতাই গভীরতাকে প্রকাশ করে, এরা সেটা অন্তরের ভিতর থেকে বুঝেচে। এবং এরা বলে সেই আন্তরিক বোধশক্তি এরা বৌদ্ধধর্ম্মের সাধনা থেকে পেয়েচে। এরা স্থির হ'য়ে শক্তিকে নিরোধ ক'রতে পেরেচে ব'লেই, সেই অক্ষুণ্ণ শক্তি এদের দৃষ্টিকে বিশুদ্ধ এবং বোধকে উজ্জ্বল ক'রে তুলেচে।

পূর্ব্বেই বলেচি, প্রতাপের পরিচয়ে মন অভিভূত হয়—কিন্তু এখানে যে পূজার পরিচয় দেখি, তাতে মন অভিভবের অপমান অনুভব করে না। মন আনন্দিত হয়, ঈর্ষান্বিত হয় না। কেননা, পূজা যে আপনার চেয়ে বড়োকে প্রকাশ করে, সেই বড়োর কাছে সকলেই আনন্দমনে নত হ'তে পারে, মনে কোথাও বাজে না। দিল্লিতে যেখানে প্রাচীন হিন্দু রাজার কীর্ত্তিকলার বুকের মাঝখানে কুতুবমিনার অহঙ্কারের মুষলের মতো খাড়া হ'য়ে আছে, সেখানে সেই ঔদ্ধত্য মানুষের মনকে পীড়া দেয়, কিম্বা কাশীতে যেখানে হিন্দুর পূজাকে অপমানিত ক'র্‌বার জন্যে আরঙজীব মসজিদ স্থাপন ক'রেচে, সেখানে না দেখি শ্রীকে, না দেখি কল্যাণকে। কিন্তু যখন

তাজমহলের সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়াই, তখন এ তর্ক মনে আসে না যে, এটা হিন্দুর কীর্ত্তি, না মুসলমানের কীর্ত্তি। তখন এ'কে মানুষের কীর্ত্তি ব'লেই হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করি।

জাপানের যেটা শ্রেষ্ঠ প্রকাশ, সেটা অহঙ্কারের প্রকাশ নয়,—আত্মনিবেদনের প্রকাশ; সেই জন্যে এই প্রকাশ মানুষকে আহ্বান করে, আঘাত করে না। এই জন্যে জাপানে যেখানে এই ভাবের বিরোধ দেখি, সেখানে মনের মধ্যে বিশেষ পীড়া বোধ করি। চীনের সঙ্গে নৌযুদ্ধে জাপান জয়লাভ করেছিল—সেই জয়ের চিহ্নগুলিকে কাঁটার মতো দেশের চারদিকে পুঁতে রাখা যে বর্ব্বরতা, সেটা যে অসুন্দর, সে কথা জাপানের বোঝা উচিত ছিল। প্রয়োজনের খাতিরে অনেক ক্রূর কর্ম্ম মানুষকে ক'র্‌তে হয়, কিন্তু সেগুলোকে ভুল্‌তে পারাই মনুষ্যত্ব। মানুষের যা চিরস্মরণীয়, যার জন্যে মানুষ মন্দির করে, মঠ করে,—সে তো হিংসা নয়।

আমরা অনেক আচার, অনেক আসবাব য়ুরোপের কাছ থেকে নিয়েচি—সব সময়ে প্রয়োজনের খাতিরে নয়—কেবল-মাত্র সেগুলো য়ুরোপীয় ব'লেই। য়ুরোপের কাছে আমাদের মনের এই যে পরাভব ঘটেচে, অভ্যাসবশত সেজন্যে আমরা লজ্জা ক'রতেও ভুল্লে গেচি। য়ুরোপের যত বিদ্যা আছে, সবই আমাদের শেখবার—এ কথা মানি; কিন্তু যত ব্যবহার আছে, সবই যে আমাদের নেবার—এ কথা আমি মানি নে। তবু, যা নেবার যোগ্য জিনিষ, তা সব দেশ থেকেই নিতে

হবে—এ কথা ব'ল্‌তে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু সেই জন্যেই, জাপানে যে-সব ভারতবাসী এসেছে, তাদের সম্বন্ধে একটা কথা আমি বুঝতে পারি নে। দেখতে পাই তারা তো য়ুরোপের নানা অনাবশ্যক, নানা কুশ্রী জিনিষও নকল করেচে; কিন্তু তা'রা কি জাপানের কোনো জিনিষই চোখে দেখতে পায় না? তা'রা এখান থেকে যে সব বিদ্যা শেখে, সেও য়ুরোপের বিদ্যা—এবং যাদের কিছুমাত্র আর্থিক বা অন্যরকম সুবিধা আছে, তা'রা কোনোমতে এখান থেকে আমেরিকায় দৌড় দিতে চায়। কিন্তু যে-সব বিদ্যা এবং আচার ও আসবাব জাপানের সম্পূর্ণ নিজের, তার মধ্যে কি আমরা গ্রহণ ক'রবার জিনিষ কিছুই দেখি নে?

আমি নিজের কথা ব'ল্‌তে পারি, আমাদের জীবনযাত্রার উপযোগী জিনিষ আমরা এখান থেকে যত নিতে পারি, এমন য়ুরোপ থেকে নয়। তা ছাড়া জীবনযাত্রার রীতি যদি আমরা অসঙ্কোচে জাপানের কাছ থেকে শিখে নিতে পার্‌তুম, তাহ'লে আমাদের ঘর দুয়ার এবং ব্যবহার শুচি হ'ত, সুন্দর হ'ত সংযত হ'ত। জাপান ভারতবর্ষ থেকে যা পেয়েচে, তাতে আজ ভারতবর্ষকে লজ্জা দিচ্চে; কিন্তু দুঃখ এই যে, সেই লজ্জা অনুভব কর্‌বার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের যত লজ্জা সমস্ত কেবল য়ুরোপের কাছে,—তাই য়ুরোপের ছেঁড়া কাপড় কুড়িয়ে কুড়িয়ে তালি-দেওয়া অদ্ভুত আবরণে আমরা লজ্জা রক্ষা ক'রতে চাই। এদিকে জাপান-প্রবাসী ভারত-

বাসীরা বলে,জাপান আমাদের এসিয়াবাসী ব'লে অবজ্ঞা করে ; অথচ আমরাও জাপানকে এম্‌নি অবজ্ঞা করি যে, তার আতিথ্য গ্রহণ করেও প্রকৃত জাপানকে চক্ষেও দেখি নে, জাপানের ভিতর দিয়ে বিকৃত য়ুরোপকেই কেবল দেখি। জাপানকে যদি দেখ্‌তে পেতুম, তাহ'লে আমাদের ঘর থেকে অনেক কুশ্রীতা, অশুচিতা অব্যবস্থা, অসংযম আজ দূরে চ'লে যেত'।

বাঙলা দেশে আজ শিল্পকলার নূতন অভ্যুদয় হয়েচে, আমি সেই শিল্পীদের জাপানে আহ্বান ক'র্‌চি। নকল কর্‌বার জন্যে নয়, শিক্ষা কর্‌বার জন্যে। শিল্প জিনিষটা যে কত বড়ো জিনিষ, সমস্ত জাতির সেটা যে কত বড়ো সম্পদ, কেবলমাত্র সৌখিনতাকে সে যে কতদূর পর্য্যন্ত ছাড়িয়ে গেছে—তার মধ্যে জ্ঞানীর জ্ঞান, ভক্তের ভক্তি, রসিকের রসবোধ যে কত গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে আপনাকে প্রকাশ কর্‌বার চেষ্টা ক'রেচে, তা এখানে এলে তবে স্পষ্ট বোঝা যায়।

টোকিয়োতে আমি যে শিল্পীবন্ধুর বাড়ীতে ছিলুম, সেই টাইক্কানের নাম পূর্ব্বেই বলেচি, ছেলেমানুষের মতো তাঁর সরলতা ; তাঁর হাসি, তাঁর চারিদিককে হাসিয়ে রেখে দিয়েচে। প্রসন্ন তাঁর মুখ, উদার তাঁর হৃদয়, মধুর তাঁর স্বভাব। যত দিন তাঁর বাড়িতে ছিলুম, আমি জান্‌তেই পারি নি তিনি কত বড়ো শিল্পী। ইতিমধ্যে য়োকোহামায় একজন ধনী এবং রসজ্ঞ ব্যক্তির আমরা আতিথ্য লাভ করেচি। তাঁর এই বাগানটি নন্দনবনের মতো এবং তিনিও সকল বিষয়ে

এখানকারই যোগ্য। তাঁর নাম "হারা"। তাঁর কাছে শুন্‌লুম, য়োকোয়ামা টাইক্কান এবং তানজান শিমোমূরা আধুনিক জাপানের দুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী। তাঁরা আধুনিক য়ুরোপের নকল করেন না, প্রাচীন জাপানেরও না। তাঁরা প্রথার বন্ধন থেকে জাপানের শিল্পকে মুক্তি দিয়েচেন। হারার বাড়িতে টাইক্কানের ছবি যখন প্রথম দেখলুম, আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলুম। তাতে না আছে বাহুল্য, না আছে সৌখিনতা। তাতে যেমন একটা জোর আছে, তেমনি সংযম। বিষয়টা এই; চীনের একজন প্রাচীন কালের কবি ভাবে ভোর হ'য়ে চলেচে—তার পিছনে একজন বালক একটি বীণাযন্ত্র বহু যত্নে বহন ক'রে নিয়ে যাচ্চে, তাতে তার নেই; তা'র পিছনে একটি বাঁকা উইলো গাছ। জাপানে তিনভাগওয়ালা যে খাড়া পর্দ্দার প্রচলন আছে, সেই রেশমের পর্দ্দার উপর আঁকা। মস্ত পর্দ্দা এবং প্রকাণ্ড ছবি। প্রত্যেক রেখা প্রাণে ভরা। এর মধ্যে ছোটোখাটো কিম্বা জবড়জঙ্গ কিছুই নেই—যেমন উদার, তেমনি গভীর, তেমনি আয়াসহীন। নৈপুণ্যের কথা একেবারে মনেই হয় না—নানা রং, নানা রেখার সমাবেশ নেই—দেখবামাত্র মনে হয় খুব বড়ো এবং খুব সত্য। তারপরে তাঁর ভূদৃশ্যচিত্র দেখ্‌লুম। একটি ছবি,—পটের উচ্চপ্রান্তে একখানি পূর্ণচাঁদ, মাঝখানে একটি নৌকা, নীচের প্রান্তে দুটো দেওদার গাছের ডাল দেখা যাচ্চে—আর কিছু না—জলের কোনো রেখা পর্য্যন্ত নেই। জ্যোৎস্নার আলোয় স্থির

জল কেবলমাত্র বিস্তীর্ণ শুভ্রতা,—এটা যে জল, সে কেবলমাত্র ঐ নৌকা আছে ব'লেই বোঝা যাচ্চে; আর এই সর্ব্বব্যাপী বিপুল জ্যোৎস্নাকে ফলিয়ে তোলবার জন্যে যত কিছু কালিমা,—সে কেবলি ঐ দুটো পাইন গাছের ডালে। ওস্তাদ এমন একটা জিনিসকে আঁক্‌তে চেয়েচেন, যার রূপ নেই, যা বৃহৎ এবং নিস্তব্ধ—জ্যোৎস্নারাত্রি,—অতলস্পর্শ তা'র নিঃশব্দতা। কিন্তু আমি যদি তাঁর সব ছবির বিস্তারিত বর্ণনা ক'র্‌তে যাই, তাহ'লে আমার কাগজও ফুরোবে, সময়েও কুলবে না। হারা সান সবশেষে নিয়ে গেলেন একটি লম্বা সঙ্কীর্ণ ঘরে, সেখানে একদিকের প্রায় সমস্ত দেয়াল জুড়ে একটি খাড়া পর্দ্দা দাঁড়িয়ে। এই পর্দ্দায় শিমোমুরার আঁকা একটি প্রকাণ্ড ছবি। শীতের পরে প্রথম বসন্ত এসেছে—প্লাম গাছের ডালে একটাও পাতা নেই, শাদা শাদা ফুল ধরেচে—ফুলের পাপ্‌ড়ি ঝ'রে ঝ'রে পড়্‌চে;—বৃহৎ পর্দ্দার এক প্রান্তে দিগন্তের কাছে রক্তবর্ণ সূর্য্য দেখা দিয়েছে—পর্দ্দার অপর প্রান্তে প্লাম গাছের রিক্ত ডালের আড়ালে দেখা যাচ্চে একটি অন্ধ হাতজোড় ক'রে সূর্য্যের বন্দনায় রত। একটি অন্ধ, এক গাছ, এক সূর্য্য, আর সোনায় ঢালা এক সুবৃহৎ আকাশ; এমন ছবি আমি কখনো দেখি নি। উপনিষদের সেই প্রার্থনাবাণী যেন রূপ ধ'রে আমার কাছে দেখা দিলে,—তমসো মা জ্যোতির্গময়। কেবল অন্ধ মানুষের নয়, অন্ধ প্রকৃতির এই প্রার্থনা—তমসো মা জ্যোতির্গময়—সেই প্লাম গাছের

একাগ্র প্রসারিত শাখা প্রশাখার ভিতর দিয়ে জ্যোতির্লোকের দিকে উঠ্‌চে। অথচ আলোয় আলোময়—তারি মাঝখানে অন্ধের প্রার্থনা।

কাল শিমোমুরার আর একটা ছবি দেখ্‌লুম। পটের আয়তন তো ছোটো, অথচ ছবির বিষয় বিচিত্র। সাধক তার ঘরের মধ্যে ব'সে ধ্যান ক'র্‌চে—তার সমস্ত রিপুগুলি তাকে চারদিকে আক্রমণ ক'রেচে। অর্দ্ধেক মানুষ অর্দ্ধেক জন্তুর মতো তাদের আকার, অত্যন্ত কুৎসিত—তাদের কেউ বা খুব সমারোহ ক'রে আস্‌চে, কেউ বা আড়ালে আবডালে উঁকিঝুঁকি মার্‌চে। কিন্তু তবু এরা সবাই বাইরেই আছে—ঘরের ভিতরে তা'র সাম্‌নে সকলের চেয়ে তার বড়ো রিপু ব'সে আছে—তা'র মূর্ত্তি ঠিক বুদ্ধের মতো। কিন্তু লক্ষ্য ক'রে দেখ্‌লেই দেখা যায়, সে সাঁচ্চা বুদ্ধ নয়,—স্থূল তার দেহ, মুখে তার বাঁকা হাসি। সে কপট আত্মম্ভরিতা, পবিত্র রূপ ধ'রে এই সাধককে বঞ্চিত ক'র্‌চে। এ হ'চ্চে আধ্যাত্মিক অহমিকা, শুচি এবং সুগম্ভীর মুক্তস্বরূপ বুদ্ধের ছদ্মবেশ ধ'রে আছে—একেই চেনা শক্ত—এই হ'চ্চে অন্তরতম রিপু, অন্য কদর্য্য রিপুরা বাইরের। এইখানে দেবতাকে উপলক্ষ্য ক'রে মানুষ আপনার প্রবৃত্তিকে পূজা ক'র্‌চে।

আমরা যাঁর আশ্রয়ে আছি, সেই হারা সান গুণী এবং গুণজ্ঞ। তিনি রসে হাস্যে ঔদার্য্যে পরিপূর্ণ। সমুদ্রের ধারে, পাহাড়ের গায়ে তাঁর এই পরম সুন্দর বাগানটি সর্ব্বসাধারণের

জন্যে নিত্যই উদ্‌ঘাটিত। মাঝে মাঝে বিশ্রামগৃহ আছে,— যে-খুসি সেখানে এসে চা খেতে পারে। একটা খুব লম্বা ঘর আছে, সেখানে যারা বনভোজন ক'র্‌তে চায় তাদের জন্যে ব্যবস্থা আছে। হারা সানের মধ্যে কৃপণতাও নেই। আড়ম্বরও নেই, অথচ তাঁর চারদিকে সমারোহ আছে। মূঢ় ধনাভিমানীর মতো তিনি মূল্যবান জিনিষকে কেবলমাত্র সংগ্রহ ক'রে রাখেন না,—তার মূল্য তিনি বোঝেন, তার মূল্য তিনি দেন, এবং তার কাছে তিনি সম্ভ্রমে আপনাকে নত ক'র্‌তে জানেন।

১৫

এসিয়ার মধ্যে জাপানী এই কথাটি একদিন হঠাৎ অনুভব ক'র্‌লে, যে, য়ুরোপ যে-শক্তিতে পৃথিবীতে সর্ব্বজয়ী হ'য়ে উঠেচে একমাত্র সেই শক্তির দ্বারাই তাকে ঠেকানো যায়। নইলে তার চাকার নীচে প'ড়্‌তেই হবে এবং একবার প'ড়্‌লে কোনোকালে আর ওঠার উপায় থাক্‌বে না।

এই কথাটি যেমনি তার মাথায় ঢুক্‌ল, অম্‌নি সে আর এক মুহূর্ত্ত দেরি ক'র্‌লে না। কয়েক বৎসরের মধ্যেই য়ুরোপের শক্তিকে আত্মসাৎ ক'রে নিলে। য়ুরোপের কামান বন্দুক, কুচ-কাওয়াজ, কল কারখানা, আপিস আদালত, আইন কানুন যেন কোন্ আলাদিনের প্রদীপের যাদুতে পশ্চিমলোক

থেকে পূর্ব্বলোকে একেবারে আস্ত উপ্‌ড়ে এনে বসিয়ে দিলে। নতুন শিক্ষাকে ক্রমে ক্রমে সইয়ে নেওয়া, বাড়িয়ে তোলা নয়; তাকে ছেলের মতো শৈশব থেকে যৌবনে মানুষ ক'রে তোলা নয়;—তাকে জামাইয়ের মতো একেবারে পূর্ণ যৌবনে ঘরের মধ্যে বরণ ক'রে নেওয়া। বৃদ্ধ বনস্পতিকে এক জায়গা থেকে তুলে আর এক জায়গায় রোপণ করবার বিদ্যা জাপানের মালীরা জানে—য়ুরোপের শিক্ষাকেও তা'রা তেমনি ক'রেই তার সমস্ত জটিল শিকড় এবং বিপুল ডালপালা সমেত নিজের দেশের মাটিতে এক রাত্রির মধ্যেই খাড়া ক'রে দিলে। শুধু যে তার পাতা ঝরে' প'ড়্‌ল না তা নয়,—পরদিন থেকেই তার ফল ধ'র্‌তে লাগ্‌ল। প্রথম কিছু দিন ওরা য়ুরোপ থেকে শিক্ষকের দল ভাড়া ক'রে এনেছিল। অতি অল্পকালের মধ্যেই তাদের প্রায় সমস্ত সরিয়ে দিয়ে, হালে এবং দাঁড়ে নিজেরাই ব'সে গেছে—কেবল পালটা এমন আড় ক'রে ধরেচে যাতে পশ্চিমের হাওয়াটা তার উপরে পূরো এসে লাগে।

ইতিহাসে এত বড়ো আশ্চর্য্য ঘটনা আর কখনো হয় নি। কারণ, ইতিহাস তো যাত্রার পালা গান করা নয় যে, ষোলো বছরের ছোকরাকে পাকা গোঁপদাড়ি পরিয়ে দিলেই সেই মুহূর্ত্তে তাকে নারদমুনি ক'রে তোলা যেতে পারে। শুধু য়ুরোপের অস্ত্র ধার ক'র্‌লেই যদি য়ুরোপ হওয়া যেত', তাহ'লে আফগানিস্থানেরও ভাবনা ছিল না। কিন্তু য়ুরোপের

আসবাবগুলো ঠিকমত ব্যবহার করবার মতো মনোবৃত্তি জাপান এক নিমেষেই কেমন ক'রে গ'ড়ে তুল্লে, সেইটেই বোঝা শক্ত।

সুতরাং এ কথা মান্‌তেই হবে, এ জিনিষ তাকে গোড়া থেকে গড়্‌তে হয়নি,—ওটা তার একরকম গড়াই ছিল। সেই জন্যেই যেম্‌নি তার চৈতন্য হ'ল, অমনি তার প্রস্তুত হ'তে বিলম্ব হ'ল না। তার যা-কিছু বাধা ছিল, সেটা বাইরের—অর্থাৎ একটা নতুন জিনিসকে বুঝে প'ড়ে আয়ত্ত ক'রে নিতে যেটুকু বাধা, সেইটুকু মাত্র ;—তার নিজের অন্তরে কোনো বিরোধের বাধা ছিল না।

পৃথিবীতে মোটামুটি দু'রকম জাতের মন আছে—এক স্থাবর, আর এক জঙ্গম। এই মানসিক স্থাবর-জঙ্গমতার মধ্যে একটা ঐকান্তিক ভেদ আছে, এমন কথা ব'ল্‌তে চাই নে। স্থাবরকেও দায়ে প'ড়ে চল্‌তে হয়, জঙ্গমকেও দায়ে প'ড়ে দাঁড়াতে হয়। কিন্তু স্থাবরের লয় বিলম্বিত, আর জঙ্গমের লয় দ্রুত।

জাপানের মনটাই ছিল স্বভাবত জঙ্গম— লম্বা লম্বা দশকুশি তালের গাম্ভারি চাল তার নয়। এই জন্যে সে এক দৌড়ে দু' তিন শো বছর হু হু ক'রে পেরিয়ে গেল। আমাদের মত যারা দুর্ভাগ্যের বোঝা নিয়ে হাজার বছর পথের ধারে বটতলায় শুয়ে গড়িয়ে কাটিয়ে দিচ্চে, তারা অভিমান ক'রে বলে, "ওরা ভারি হাল্‌কা, আমাদের মতো গাম্ভীর্য্য থাক্‌লে ওরা এমন বিশ্রীরকম দৌড়ধাপ ক'রতে

পারত' না। সাঁচ্চা জিনিস কখনও এত শীঘ্র গ'ড়ে উঠ্‌তে পারে না।"

আমরা যাই বলি না কেন, চোখের সাম্‌নে স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্চি এসিয়ার এই প্রান্তবাসী জাত য়ুরোপীয় সভ্যতার সমস্ত জটিল ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ জোরের সঙ্গে এবং নৈপুণ্যের সঙ্গে ব্যবহার ক'র্‌তে পারচে। এর একমাত্র কারণ, এরা যে কেবল ব্যবস্থাটাকেই নিয়েচে তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে মনটাকেও পেয়েচে। নইলে পদে পদে অস্ত্রের সঙ্গে অস্ত্রীর বিষম ঠোকাঠুকি বেধে যেত, নইলে ওদের শিক্ষার সঙ্গে দীক্ষার লড়াই কিছুতেই মিট্‌ত না, এবং বর্ম্ম ওদের দেহটাকে পিষে দিত।

মনের যে জঙ্গমতার জোরে ওরা আধুনিক কালের প্রবল প্রবাহের সঙ্গে নিজের গতিকে এত সহজে মিলিয়ে দিতে পেরেচে, সেটা জাপানী পেয়েচে কোথা থেকে?

জাপানীদের মধ্যে একটা প্রবাদ আছে যে, ওরা মিশ্র জাতি। ওরা একেবারে খাস মঙ্গোলীয় নয়। এমন কি, ওদের বিশ্বাস ওদের সঙ্গে আর্য্যরক্তেরও মিশ্রন ঘটেচে। জাপানীদের মধ্যে মঙ্গোলীয় এবং ভারতীয় দুই ছাঁদেরই মুখ দেখতে পাই, এবং ওদের মধ্যে বর্ণেরও বৈচিত্র্য যথেষ্ট আছে। আমার চিত্রকর বন্ধু টাইক্কানকে বাঙালী কাপড় পড়িয়ে দিলে, তাঁকে কেউ জাপানী ব'লে সন্দেহ ক'র্‌বে না। এমন আরো অনেককে দেখেচি।

যে-জাতির মধ্যে বর্ণসঙ্করতা খুব বেশি ঘটেচে তার মনটা এক ছাঁচে ঢালাই হ'য়ে যায় না। প্রকৃতি-বৈচিত্র্যের সংঘাতে তার মনটা চলনশীল হ'য়ে থাকে। এই চলনশীলতায় মানুষকে অগ্রসর করে, একথা বলাই বাহুল্য।

রক্তের অবিমিশ্রতা কোথাও যদি দেখ্‌তে চাই, তাহ'লে বর্ব্বর জাতির মধ্যে যেতে হয়। তা'রা পরকে ভয় করেচে, তা'রা অল্পপরিসর আশ্রয়ের মধ্যে লুকিয়ে লুকিয়ে নিজের জাতকে স্বতন্ত্র রেখেচে। তাই আদিম অষ্ট্রেলীয় জাতির আদিমতা আর ঘুচল না—আফ্রিকার মধ্যদেশে কালের গতি বন্ধ বল্লেই হয়।

কিন্তু গ্রীস পৃথিবীর এমন একটা জায়গায় ছিল, যেখানে একদিকে এসিয়া, একদিকে ইজিপ্ট, একদিকে য়ুরোপের মহাদেশ তা'র সঙ্গে সংলগ্ন হ'য়ে তাকে আলোড়িত করেচে। গ্রীকেরা অবিমিশ্র জাতি ছিল না—রোমকেরাও না। ভারতবর্ষেও অনার্য্যে আর্য্যে যে মিশ্রণ ঘটেছিল, সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই।

জাপানীকেও দেখ্‌লে মনে হয়, তারা এক ধাতুতে গড়া নয়। পৃথিবীর অধিকাংশ জাতিই মিথ্যা করে'ও আপনার রক্তের অবিমিশ্রতা নিয়ে গর্ব্ব করে—জাপানীর মনে এই অভিমান কিছুমাত্র নেই। জাপানীদের সঙ্গে ভারতীয় জাতির মিশ্রণ হয়েচে, এ কথার আলোচনা তাদের কাগজে দেখেচি এবং তা নিয়ে কোনো পাঠক কিছুমাত্র বিচলিত হয়

নি। শুধু তাই নয়, চিত্রকলা প্রভৃতি সম্বন্ধে ভারতবর্ষের কাছে তারা যে ঋণী, সে কথা আমরা একেবারেই ভুলে গেচি —কিন্তু জাপানীরা এই ঋণ স্বীকার ক'র্‌তে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না।

বস্তুত ঋণ তারাই গোপন ক'র্‌তে চেষ্টা করে, ঋণ যাদের হাতে ঋণই রয়ে গেছে, ধন হয়ে ওঠে নি। ভারতের কাছ থেকে জাপান যদি কিছু নিয়ে থাকে, সেটা সম্পুর্ণ তার আপন সম্পত্তি হয়েচে। যে-জাতির মনের মধ্যে চলন-ধর্ম্ম প্রবল, সেই জাতিই পরের সম্পদকে নিজের সম্পদ ক'রে নিতে পারে। যার মন স্থাবর, বাইরের জিনিস তার পক্ষে বিষম ভার হ'য়ে ওঠে; কারণ, তার নিজের অচল অস্তিত্বই তার পক্ষে প্রকাণ্ড একটা বোঝা।

কেবলমাত্র জাতি-সঙ্করতা নয়, স্থান-সঙ্কীর্ণতা জাপানের পক্ষে একটা মস্ত সুবিধা হয়েচে। ছোট জায়গাটি সমস্ত জাতির মিলনের পক্ষে পুটপাকের কাজ করেচে। বিচিত্র্য উপকরণ ভালোরকম করে গ'লে মিলে বেশ নিবিড় হ'য়ে উঠেচে। চীন বা ভারতবর্ষের মতো বিস্তীর্ণ জায়গায়, বৈচিত্র্য কেবল বিভক্ত হ'য়ে উঠ্‌তে চেষ্টা করে, সংহত হ'তে চায় না।

প্রাচীনকালে গ্রীস, রোম, এবং আধুনিক কালে ইংলণ্ড সঙ্কীর্ণ স্থানের মধ্যে সম্মিলিত হ'য়ে বিস্তীর্ণ স্থানকে অধিকার ক'র্‌তে পেরেচে। আজকের দিনে এসিয়ার মধ্যে জাপানের সেই সুবিধা। একদিকে তার মানসপ্রকৃতির মধ্যে চির-

কালই চলন-ধর্ম্ম আছে, যে জন্য কোরিয়া প্রভৃতি প্রতিবেশীর কাছ থেকে জাপান তার সভ্যতার সমস্ত উপকরণ অনায়াসে আত্মসাৎ ক'র্‌তে পেরেচে ; আর একদিকে অল্প পরিসর জায়গায় সমস্ত জাতি অতি সহজেই এক ভাবে ভাবতে, এক প্রাণে অনুপ্রাণিত হ'তে পেরেচে। তাই যে-মুহূর্ত্তে জাপানের মস্তিষ্কের মধ্যে এই চিন্তা স্থান পেলে যে, আত্মরক্ষার জন্যে য়ুরোপের কাছ থেকে তাকে দীক্ষা গ্রহণ ক'র্‌তে হবে, সেই মুহূর্ত্তে জাপানের সমস্ত কলেবরের মধ্যে অনুকূল চেষ্টা জাগ্রত হ'য়ে উঠ্‌ল।

য়ুরোপের সভ্যতা একান্তভাবে জঙ্গম মনের সভ্যতা, তা স্থাবর মনের সভ্যতা নয়। এই সভ্যতা ক্রমাগতই নূতন চিন্তা, নূতন চেষ্টা, নূতন পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে বিপ্লব-তরঙ্গের চূড়ায় চূড়ায় পক্ষ বিস্তার ক'রে উড়ে চলেচে। এসিয়ার মধ্যে একমাত্র জাপানের মনে সেই স্বাভাবিক চলন-ধর্ম্ম থাকাতেই, জাপান সহজেই য়ুরোপের ক্ষিপ্রতালে চল্‌তে পেরেচে, এবং তাতে-ক'রে তাকে প্রলয়ের আঘাত সইতে হয় নি। কারণ, উপকরণ সে যা-কিছু পাচ্চে, তার দ্বারা সে সৃষ্টি করেচে ; সুতরাং নিজের বর্দ্ধিষ্ণু জীবনের সঙ্গে এ সমস্তকে সে মিলিয়ে নিতে পারচে। এই সমস্ত নতুন জিনিস যে তার মধ্যে কোথাও কিছু বাধা পাচ্চে না, তা নয়,—কিন্তু সচলতার বেগেই সেই বাধা ক্ষয় হ'য়ে চলেচে। প্রথম প্রথম যা অসঙ্গত অদ্ভুত হ'য়ে দেখা দিচ্চে, ক্রমে ক্রমে তার পরিবর্ত্তন

ঘটে' সুসঙ্গতি জেগে উঠ্‌চে। একদিন যে-অনাবশ্যককে সে গ্রহণ করেচে, আর একদিন সেটাকে ত্যাগ করেচে—একদিন যে আপন জিনিসকে পরের হাটে সে খুইয়েচে, আর একদিন সেটাকে আবার ফিরে নিচ্চে। এই তার সংশোধনের প্রক্রিয়া এখনো নিত্য তার মধ্যে চল্‌চে। যে-বিকৃতি মৃত্যুর, তাকেই ভয় ক'র্‌তে হয়—যে-বিকৃতি প্রাণের লীলা-বৈচিত্র্যে হঠাৎ এক-এক সময়ে দেখা দেয়, প্রাণ আপনি তাকে সাম্‌লে নিয়ে নিজের সমে এসে দাঁড়াতে পারে।

আমি যখন জাপানে ছিলুম, তখন একটা কথা বারবার আমার মনে এসেচে। আমি অনুভব করছিলুম, ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙালীর সঙ্গে জাপানীর এক জায়গায় যেন মিল আছে। আমাদের এই বৃহৎ দেশের মধ্যে বাঙালীই সব প্রথমে নূতনকে গ্রহণ ক'রেচে, এবং এখনো নূতনকে গ্রহণ ও উদ্ভাবন করবার মতো তার চিত্তের নমনীয়তা আছে।

তার একটা কারণ, বাঙালীর মধ্যে রক্তের অনেক মিশল ঘটেচে; এমন মিশ্রণ ভারতের আর কোথাও হয়েচে কিনা সন্দেহ। তারপরে বাঙালী ভারতের যে প্রান্তে বাস করে, সেখানে বহুকাল ভারতের অন্য প্রদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে আছে। বাংলা ছিল পাণ্ডব-বর্জ্জিত দেশ। বাংলা একদিন দীর্ঘকাল বৌদ্ধপ্রভাবে, অথবা যে কারণেই হোক্, আচারভ্রষ্ট হ'য়ে নিতান্ত এক-ঘরে হ'য়ে ছিল—তাতে ক'রে তার একটা সঙ্কীর্ণ স্বাতন্ত্র্য ঘটেছিল—এই কারণেই বাঙালীর চিত্ত অপেক্ষা-

কৃত বন্ধনমুক্ত, এবং নূতন শিক্ষা গ্রহণ করা বাঙালীর পক্ষে যত সহজ হ'য়েছিল, এমন ভারতবর্ষের অন্য কোনো দেশের পক্ষে হয় নি। য়ুরোপীয় সভ্যতার পূর্ণ দীক্ষা জাপানের মতো আমাদের পক্ষে অবাধ নয়; পরের কৃপণ হস্ত থেকে আমরা যেটুকু পাই, তার বেশি আমাদের পক্ষে দুর্লভ। কিন্তু য়ুরোপীয় শিক্ষা আমাদের দেশে যদি সম্পূর্ণ সুগম হ'ত, তাহ'লে কোনো সন্দেহ নেই, বাঙালী সকল দিক থেকেই তা সম্পূর্ণ আয়ত্ত ক'র্‌ত। আজ নানাদিক থেকে বিদ্যাশিক্ষা আমাদের পক্ষে ক্রমশই দুর্মূল্য হ'য়ে উঠ্‌চে—তবু বিশ্ববিদ্যা-লয়ের সঙ্কীর্ণ প্রদেশদ্বারে বাঙালীর ছেলে প্রতিদিন মাথা খোঁড়াখুঁড়ি ক'রে ম'র্‌চে। বস্তুত ভারতের অন্য সকল প্রদেশের চেয়ে বাংলাদেশে যে-একটা অসন্তোষের লক্ষণ অত্যন্ত প্রবল দেখা যায়, তার একমাত্র কারণ আমাদের প্রতিহত গতি। যা-কিছু ইংরেজি, তার দিকে বাঙালীর উদ্বোধিত চিত্ত একান্ত প্রবলবেগে ছুটেছিল; ইংরেজের অত্যন্ত কাছে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছিলুম—এ সম্বন্ধে সকল রকম সংস্কারের বাধা লঙ্ঘন করবার জন্য বাঙালীই সর্ব্বপ্রথমে উদ্যত হ'য়ে উঠেছিল। কিন্তু এইখানে ইংরেজের কাছেই যখন বাধা পেল, তখন বাঙালীর মনে যে প্রচণ্ড অভিমান জেগে উঠ্‌ল—সেটা হ'চ্চে তার অনুরাগেরই বিকার।

এই অভিমানই আজ নবযুগের শিক্ষাকে গ্রহণ করবার পক্ষে বাঙালীর মনে সকলের চেয়ে বড়ো অন্তরায় হ'য়ে

উঠেচে। আজ আমরা যে সকল কূটতর্ক ও মিথ্যা যুক্তি দ্বারা পশ্চিমের প্রভাবকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করবার চেষ্টা ক'রছি, সেটা আমাদের স্বাভাবিক নয়। এই জন্যই সেটা এমন সুতীব্র—সেটা ব্যাধির প্রকোপের মতো পীড়ার দ্বারা এমন ক'রে আমাদের সচেতন ক'রে তুলেচে।

বাঙালীর মনের এই প্রবল বিরোধের মধ্যেও তার চলন-ধর্ম্মই প্রকাশ পায়। কিন্তু বিরোধ কখনো কিছু সৃষ্টি ক'রতে পারে না। বিরোধে দৃষ্টি কলুষিত ও শক্তি বিকৃত হ'য়ে যায়। যত বড়ো বেদনাই আমাদের মনে থাক্, এ কথা আমাদের ভুল্‌লে চল্‌বে না যে, পূর্ব্ব ও পশ্চিমের মিলনের সিংহদ্বার উদ্‌ঘাটনের ভার বাঙালীর উপরেই পড়েচে। এই জন্যেই বাংলার নবযুগের প্রথম পথপ্রবর্ত্তক রামমোহন রায়। পশ্চিমকে সম্পূর্ণ গ্রহণ ক'র্‌তে তিনি ভীরুতা করেন নি, কেননা পূর্ব্বের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা অটল ছিল। তিনি যে-পশ্চিমকে দেখ্‌তে পেয়েছিলেন, সে তো শস্ত্রধারী পশ্চিম নয়, বাণিজ্যজীবী পশ্চিম নয়—সে হ'চ্চে জ্ঞানে প্রাণে উদ্ভাসিত পশ্চিম।

জাপান য়ুরোপের কাছ থেকে কর্ম্মের দীক্ষা আর অস্ত্রের দীক্ষা গ্রহণ করেচে। তার কাছ থেকে বিজ্ঞানের শিক্ষাও সে লাভ ক'রতে বসেচে। কিন্তু আমি যতটা দেখেচি, তাতে আমার মনে হয় য়ুরোপের সঙ্গে জাপানের একটা অন্তরতর জায়গায় অনৈক্য আছে। যে গূঢ় ভিত্তির উপরে য়ুরোপের

মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত, সেটা আধ্যাত্মিক। সেটা কেবলমাত্র কর্ম্ম-নৈপুণ্য নয়, সেটা তার নৈতিক আদর্শ। এইখানে জাপানের সঙ্গে য়ুরোপের মূলগত প্রভেদ। মনুষ্যত্বের যে-সাধনা অমৃত লোককে মানে, এবং সেই অভিমুখে চ'লতে থাকে, যে সাধনা কেবলমাত্র সামাজিক ব্যবস্থার অঙ্গ নয়, যে-সাধনা সাংসারিক প্রয়োজন বা স্বজাতিগত স্বার্থকেও অতিক্রম ক'রে আপনার লক্ষ্য স্থাপন ক'রেচে,—সেই সাধনার ক্ষেত্রে ভারতের সঙ্গে য়ুরোপের মিল যত সহজ, জাপানের সঙ্গে তার মিল তত সহজ নয়। জাপানী সভ্যতার সৌধ এক মহলা—সেই হ'চ্চে তার সমস্ত শক্তি এবং দক্ষতার নিকেতন। সেখানকার ভাণ্ডারে সব চেয়ে বড়ো জিনিষ যা সঞ্চিত হয়, সে হ'চ্চে কৃতকর্ম্মতা,—সেখানকার মন্দিরে সব চেয়ে বড়ো দেবতা স্বাদেশিক স্বার্থ। জাপান তাই সমস্ত য়ুরোপের মধ্যে সহজেই আধুনিক জর্ম্মণির শক্তি-উপাসক নবীন দার্শনিকদের কাছ থেকে মন্ত্র গ্রহণ ক'র্‌তে পেরেচে; নীট্‌ঝের গ্রন্থ তাদের কাছে সব চেয়ে সমাদৃত। তাই আজ পর্য্যন্ত জাপান ভালো ক'রে স্থির ক'র্‌তেই পার্‌লে না—কোনো ধর্ম্মে তার প্রয়োজন আছে কিনা, এবং ধর্ম্মটা কী। কিছু দিন এমনও তার সঙ্কল্প ছিল যে, সে খৃষ্টানধর্ম্ম গ্রহণ ক'র্‌বে। তখন তার বিশ্বাস ছিল যে, য়ুরোপ যে-ধর্ম্মকে আশ্রয় ক'রেচে, সেই ধর্ম্ম হয়তো তাকে শক্তি দিয়েচে—অতএব খৃষ্টানীকে কামান-বন্দুকের সঙ্গে সঙ্গেই সংগ্রহ করা দরকার হবে। কিন্তু

আধুনিক য়ুরোপে শক্তি-উপাসনার সঙ্গে সঙ্গে কিছুকাল থেকে এই কথাটা ছড়িয়ে পড়েচে যে, খৃষ্টানধর্ম্ম স্বভাব-দুর্ব্বলের ধর্ম্ম, তা বীরের ধর্ম্ম নয়। য়ুরোপ ব'ল্তে সুরু ক'রেছিল—যে-মানুষ ক্ষীণ, তারই স্বার্থ নম্রতা ক্ষমা ও ত্যাগধর্ম্ম প্রচার করা। সংসারে যারা পরাজিত, সে-ধর্ম্মে তাদেরই সুবিধা; সংসারে যারা জয়শীল, সে-ধর্ম্মে তাদের বাধা। এই কথাটা জাপানের মনে সহজেই লেগেচে। এই-জন্যে জাপানের রাজশক্তি আজ মানুষের ধর্ম্মবুদ্ধিকে অবজ্ঞা ক'র্চে। এই অবজ্ঞা আর কোনো দেশে চ'ল্তে পারত না; কিন্তু জাপানে চ'ল্তে পারচে, তার কারণ জাপানে এই বোধের বিকাশ ছিল না, এবং সেই বোধের অভাব নিয়েই জাপান আজ গর্ব্ব বোধ ক'র্চে—সে জান্‌ছে পরকালের দাবী থেকে সে মুক্ত, এইজন্যই ইহকালে সে জয়ী হবে।

জাপানের কর্ত্তৃপক্ষেরা যে-ধর্ম্মকে বিশেষরূপে প্রশ্রয় দিয়ে থাকেন, সে হ'চ্চে শিন্তো ধর্ম্ম। তার কারণ এই ধর্ম্ম কেবল-মাত্র সংস্কারমূলক; আধ্যাত্মিকতামূলক নয়। এই ধর্ম্ম রাজাকে এবং পূর্ব্ব-পুরুষদের দেবতা ব'লে মানে। সুতরাং স্বদেশাসক্তিকে সুতীব্র ক'রে তোলবার উপায়রূপে এই সংস্কারকে ব্যবহার করা যেতে পারে।

কিন্তু য়ুরোপীয় সভ্যতা মঙ্গোলীয় সভ্যতার মতো এক-মহাল নয়। তার একটি অন্তরমহল আছে। সে অনেক দিন থেকেই Kingdom of Heavenকে স্বীকার ক'রে

আস্‌চে। সেখানে নম্র যে, সে জয়ী হয়; পর যে, সে আপনার চেয়ে বেশি হ'য়ে ওঠে। কৃতকর্ম্মতা নয়, পরমার্থই সেখানে চরম সম্পদ। অনন্তের ক্ষেত্রে সংসার সেখানে আপনার সত্য মূল্য লাভ করে।

য়ুরোপীয় সভ্যতার এই অন্তরমহলের দ্বারা কখনো কখনো বন্ধ হ'য়ে যায়, কখনো কখনো সেখানকার দীপ জ্বলে না। তা হোক্, কিন্তু এ মহলের পাকা ভিৎ,—বাইরের কামান গোলা এর দেয়াল ভাঙতে পার্‌বে না—শেষ পর্য্যন্তই এ টিঁকে থাক্‌বে, এবং এইখানেই সভ্যতার সমস্ত সমস্যার সমাধান হবে।

আমাদের সঙ্গে য়ুরোপের আর কোথাও মিল যদি না থাকে, এই বড়ো জায়গায় মিল আছে। আমরা অন্তরতর মানুষকে মানি—তাকে বাইরের মানুষের চেয়ে বেশি মানি। যে জন্ম মানুষের দ্বিতীয় জন্ম, তার জন্যে আমরা বেদনা অনুভব করি। এই জায়গায়, মানুষের এই অন্তরমহলে, য়ুরোপের সঙ্গে আমাদের যাতায়াতের একটা পদচিহ্ন দেখ্‌তে পাই। এই অন্তরমহলে মানুষের যে-মিলন, সেই মিলনই সত্য মিলন। এই মিলনের দ্বার উদ্‌ঘাটন কর্‌বার কাজে বাঙালীর আহ্বান আছে, তার অনেক চিহ্ন অনেকদিন থেকেই দেখা যাচ্চে।

সমাপ্ত

রাজা প্রজা

গদ্যগ্রন্থাবলী, ১০ম ভাগ

রাজা প্রজা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা মাত্র

সূচী

রাজা প্রজা।

ইংরাজ ও ভারতবাসী।

There is nothing like love and admiration for bringing people to a likeness with what they love and admire; but the Englishman seems never to dream of employing these influences upon a race he wants to fuse with himself. He employs simply material interests for his work of fusion; and, beyond these nothing except scorn and rebuke. Accordingly there is no vital union between him and the races he has annexed; and while France can freely boast of her magnificent unity, a unity of spirit no less than of name between all the people who compose her, in our country the Englishman proper is in union of spirit with no one except other Englishmen proper like himself.

Matthew Arnold.

আমাদের প্রাচীন পুরাণে ইতিহাসে পাঠ করা যায় যে, চরিত্রে বা আচরণে একটা ছিদ্র না পাইলে অলক্ষ্মী প্রবেশ করিতে পথ পায় না। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে প্রত্যেক জাতিরই প্রায় একটা কোনো ছিদ্র থাকে।

আরও দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, যেখানে মানুষের দুর্ব্বলতা সেইখানে তাহার স্নেহও বেশী। ইংরাজও আপনার চরিত্রের মধ্যে ঔদ্ধত্যকে যেন কিছু বিশেষ গৌরবের সহিত পালন করে। তাহার দ্বৈপায়ন সঙ্কীর্ণতার মধ্যে সে যে অটল এবং ভ্রমণ অথবা রাজত্ব উপলক্ষে সে যাহাদের সংস্রবে আসে তাহাদের সহিত মেলামেশা করিবার যে কিছুমাত্র প্রয়াস পায় না, সাধারণ "জন্"পুঙ্গব এই গুণটিকে মনে মনে কিছু যেন শ্লাঘার বিষয় বলিয়া জ্ঞান করে। তাহার ভাবখানা এই যে, ঢেঁকি যেমন স্বর্গেও ঢেঁকি তেমনি ইংরাজ সর্ব্বত্রই খাড়া ইংরাজ, কিছুতেই তাহার আর অন্যথা হইবার জো নাই।

এই যে মনোহারিত্বের অভাব, এই যে অনুচর আশ্রিতবর্গের অন্তরঙ্গ হইয়া তাহাদের মন বুঝিবার প্রতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা, এই যে সমস্ত পৃথিবীকে নিজের সংস্কার অনুসারেই বিচার করা, ইংরাজের চরিত্রের এই ছিদ্রটি অলক্ষ্মীর একটা প্রবেশপথ।

কোথায় কোন্ শত্রু আসিবার সম্ভাবনা আছে ইংরাজ সে ছিদ্র যত্নপূর্ব্বক রোধ করে, যেখানে যত পথ ঘাট আছে সর্ব্বত্রই পাহারা বসাইয়া রাখে এবং আশঙ্কার অঙ্কুরটি পর্য্যন্ত পদতলে দলন করিয়া ফেলে, কেবল নিজের স্বভাবের মধ্যে যে একটি নৈতিক বিঘ্ন আছে সেইটাকে প্রতিদিন প্রশ্রয় দিয়া দুর্দ্দম করিয়া তুলিতেছে—কখন কখন অল্পস্বল্প আক্ষেপ করিয়াও থাকে—কিন্তু মমতাবশতঃ কিছুতেই তাহার গায়ে হাত তুলিতে পারে না।

ঠিক যেন একজন লোক বুট পায়ে দিয়া আপনার শস্যক্ষেত্রময় হৈ হৈ করিয়া বেড়াইতেছে পাছে পাখীতে শস্যের একটি কণামাত্র খাইয়া যায়। পাখী পলাইতেছে বটে কিন্তু কঠিন বুটের তলায় অনেকটা ছারখার হইয়া যাইতেছে তাহার কোন খেয়াল নাই।

আমাদের কোন শত্রুর উপদ্রব নাই, বিপদের আশঙ্কা নাই, কেবল

বুকের উপরে অকস্মাৎ সেই বুটটা আসিয়া পড়ে। তাহাতে আমরা বেদনা পাই এবং সেই বুটওয়ালার যে কোন লোকসান হয় না তাহা নহে। কিন্তু ইংরাজ সর্ব্বত্রই ইংরাজ, কোথাও সে আপনার বুটজোড়াটা খুলিয়া আসিতে রাজি নহে।

আয়র্লণ্ডের সহিত ইংরাজের যে সমস্ত খিটিমিটি বাধিয়াছে সে সকল কথা আমাদের পাড়িবার আবশ্যক নাই; অধীন ভারতবর্ষেও দেখা যাইতেছে ইংরাজের সহিত ইংরাজিশিক্ষিতদের ক্রমশই একটা অ-বনি-বনাও হইয়া আসিতেছে। তিলমাত্র অবসর পাইলে কেহ কাহাকেও ছাড়িতে চায় না। ইঁটটির পরিবর্ত্তে পাট্‌কেলটি চলিতেছেই।

আমরা যে, সকল জায়গায় সুবিচারপূর্ব্বক পাট্‌কেল নিক্ষেপ করি তাহা নহে, অধিকাংশ স্থলে অন্ধকারেই ঢেলা মারি। আমাদের কাগজে পত্রে অনেক সময় আমরা অন্যায় খিটিমিটি করিয়া থাকি এবং অমূলক কোন্দল উত্থাপন করি, সে কথা অস্বীকার করা যায় না।

কিন্তু সেগুলিকে স্বতন্ত্রভাবে বিচার করিবার আবশ্যক নাই। তাহার কোনোটা সত্য কোনোটা মিথ্যা, কোনোটা ন্যায় কোনোটা অন্যায় হইতে পারে; আসল বিচার্য্য বিষয় এই যে, আজকাল এইরূপ পাটকেল ছুঁড়িবার প্রবৃত্তিটা এত প্রবল হইয়া উঠিতেছে কেন? শাসনকর্ত্তা খবরের কাগজের কোন একটা প্রবন্ধ বিশেষকে মিথ্যা সাব্যস্ত করিয়া সম্পাদককে এবং হতভাগ্য মুদ্রাকরকে পর্য্যন্ত জেলে দিতে পারে কিন্তু প্রতিদিনই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পথে এই যে সমস্ত ছোট ছোট কাঁটাগাছগুলি গজাইয়া উঠিতেছে তাহার বিশেষ কি প্রতিকার করা হইল?

এই কাঁটাগাছগুলির মূল যখন মনের মধ্যে তখন ইহাকে উৎপাটন করিতে হইলে সেই মনের মধ্যেই প্রবেশ করিতে হইবে। কিন্তু পাকা রাস্তা ও কাঁচা রাস্তা যোগে ইংরাজরাজের আর সর্ব্বত্রই গতিবিধি আছে কেবল দুর্ভাগ্যক্রমে সেই মনের মধ্যেই নাই। হয় ত সে জায়গাটাতে

প্রবেশ করিতে হইলে ঈষৎ একটুখানি মাথা হেলাইয়া ঢুকিতে হয়, কিন্তু ইংরাজের মেরুদণ্ড কোনখানেই বাঁকিতে চায় না।

অগত্যা ইংরাজ আপনাকে এইরূপ বুঝাইতে চেষ্টা করে যে, এই যে খবরের কাগজে কটুকথা বলিতেছে, সভা হইতেছে, রাজ্যতন্ত্রের অপ্রিয় সমালোচনা চলিতেছে ইহার সহিত "পীপ্‌লের" কোন যোগ নাই;—এ কেবল কতকগুলি শিক্ষিত পুতুলনাচওয়ালার বুজরুগিমাত্র। বলে যে, ভিতরে সমস্তই আছে ভাল; বাহিরে যে একটু-আধটু বিকৃতির চিহ্ন দেখা যাইতেছে সে চতুর লোকে রঙ করিয়া দিয়াছে। তবে ত আর ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিবার আবশ্যক নাই; কেবল যে চতুর লোক-টাকে সন্দেহ করা যায় তাহাকে শাসন করিয়া দিলেই চুকিয়া যায়।

ঐটেই ইংরাজের দোষ। সে কিছুতেই ঘরে আসিতে চায় না। কিন্তু দূর হইতে, বাহির হইতে, কোনক্রমে স্পর্শসংস্রব বাঁচাইয়া মানুষের সহিত কারবার করা যায় না;— যে পরিমাণে দূরে থাকা যায় সেই পরিমাণেই নিষ্ফলতা প্রাপ্ত হইতে হয়। মানুষ ত জড়যন্ত্র নহে, যে, তাহাকে বাহির হইতে চিনিয়া লওয়া যাইবে; এমন কি পতিত ভারতবর্ষেরও একটা হৃদয় আছে এবং সে হৃদয়টা সে তাহার জামার আস্তিনে ঝুলাইয়া রাখে নাই।

জড়পদার্থকেও বিজ্ঞানের সাহায্যে নিগূঢ়রূপে চিনিয়া লইতে হয় তবেই জড়প্রকৃতির উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব বিস্তার করিতে পারা যায়। মনুষ্যলোকে যাহারা স্থায়ী প্রভাব রক্ষা করিতে চাহে তাহাদের অন্যান্য অনেক গুণের মধ্যে অন্তরঙ্গরূপে মানুষ চিনিবার বিশেষ গুণটি থাকা আবশ্যক। মানুষের অত্যন্ত কাছে যাইবার যে ক্ষমতা সে একটা দুর্লভ ক্ষমতা।

ইংরাজের বিস্তর ক্ষমতা আছে কিন্তু সেইটি নাই। সে বরঞ্চ উপকার করিতে অসম্মত নহে কিন্তু কিছুতেই কাছে আসিতে চাহে না। কোন মতে উপকারটা সারিয়া ফেলিয়া অমনি তাড়াতাড়ি সরিতে পারিলে বাঁচে।

তাহার পরে সে ক্লবে গিয়া পেগ খাইয়া বিলিয়ার্ড্ খেলিয়া অনুগৃহীতদের প্রতি অবজ্ঞাসূচক বিশেষণ প্রয়োগ পূর্ব্বক তাহাদের বিজাতীয় অস্তিত্ব শরীর মনের নিকট হইতে যথাসাধ্য দূরীকৃত করিয়া রাখে।

ইহারা দয়া করে না উপকার করে, স্নেহ করে না রক্ষা করে, শ্রদ্ধা করে না অথচ ন্যায়াচরণের চেষ্টা করে; ভূমিতে জল সেচন করে না, অথচ রাশি রাশি বীজ বপন করিতে কার্পণ্য নাই।

কিন্তু তাহার পর যখন যথেষ্ট কৃতজ্ঞতার শস্য উৎপন্ন হয় না তখন কি কেবলই মাটির দোষ দিবে? এ নিয়ম কি বিশ্বব্যাপী নহে, যে, হৃদয়ের সহিত কাজ না করিলে হৃদয়ে তাহার ফল ফলে না?

আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকেই ইংরাজকৃত উপকার যে উপকার নহে ইহাই প্রাণপণে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেছে। হৃদয়শূন্য উপকার গ্রহণ করিয়া তাহারা মনের মধ্যে কিছুতেই আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতে পারিতেছে না। কোন ক্রমে তাহারা কৃতজ্ঞতার দায় হইতে আপনাকে যেন মুক্ত করিতে চাহে। সেইজন্য আজকাল আমাদের কাগজে পত্রে কথায় বার্ত্তায় ইংরাজ সম্বন্ধে নানাপ্রকার কুতর্ক দেখা যায়।

এক কথায়, ইংরাজ নিজেকে আমাদের পক্ষে আবশ্যক করিয়া তুলিয়াছে কিন্তু প্রিয় করিয়া তোলা আবশ্যক বোধ করে নাই; পথ্য দেয়, কিন্তু তাহার মধ্যে স্বাদ সঞ্চার করিয়া দেয় না, অবশেষে যখন বমনোদ্রেক হয় তখন চোখ রাঙাইয়া হুহুঙ্কার দিয়া উঠে।

আজকালকার অধিকাংশ আন্দোলন গূঢ় মনক্ষোভ হইতে উৎপন্ন। এখন প্রত্যেক কথাটাই দুই পক্ষের হারজিতের কথা হইয়া দাঁড়ায়। হয়ত যেখানে পাঁচটা নরম কথা বলিলে উপকার হয় সেখানে আমরা তীব্রভাষায় অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছড়াইতে থাকি, এবং যেখানে একটা অনুরোধ পালন করিলে বিশেষ ক্ষতি নাই সেখানেও অপর পক্ষ বিমুখ হইয়া থাকে।

কিন্তু বৃহৎ অনুষ্ঠানমাত্রেই আপষ ব্যতীত কাজ চলে না। পঞ্চবিংশতি কোটি প্রজাকে সুশৃঙ্খলায় শাসন করা সহজ ব্যাপার নহে। এতবড় বৃহৎ রাজশক্তির সহিত যখন কারবার করিতে হয় তখন সংযম, অভিজ্ঞতা এবং বিবেচনার আবশ্যক। এইটে জানা চাই গবর্মেণ্ট ইচ্ছা করিলেই একটা কিছু করিতে পারে না; সে আপনার বৃহত্ত্বে অভিভূত, জটিলতায় আবদ্ধ। তাহাকে একটুখানি নড়িতে হইলেই অনেক দূর হইতে অনেকগুলা কল চালনা করিতে হয়।

আমাদের এখানে আবার অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান এবং ভারতবর্ষীয় এই দুই অত্যন্ত বিসদৃশ সম্প্রদায় লইয়া কারবার। উভয়ের স্বার্থ অনেক স্থলেই বিরোধী। রাজ্যতন্ত্রের যে চালক সে এই দুই বিপরীত শক্তির কোনটাকেই উপেক্ষা করিতে পারে না—যে করিতে চায় সে নিষ্ফল হয়। আমরা যখন আমাদের মনের মত কোন একটা প্রস্তাব করি তখন মনে করি, গবর্মেণ্টের পক্ষে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানের বাধাটা যেন বাধাই নহে। অথচ প্রকৃত পক্ষে শক্তি তাহারই বেশি। প্রবল শক্তিকে অবহেলা করিলে কিরূপে সঙ্কটে পড়িতে হয় ইল্‌বার্ট্‌ বিলের বিপ্লবে তাহার পরিচয় পাওয়া গেছে। সৎপথে এবং ন্যায়পথেও রেলগাড়ি চালাইতে হইলে আগে যথোচিত উপায়ে মাটি সমতল করিয়া লাইন্‌ পাতিতে হইবে। ধৈর্য্য ধরিয়া সেই সময়টুকু যদি অপেক্ষা করা যায় এবং সেই কাজটা যদি সম্পন্ন হইতে দেওয়া যায় তার পরে দ্রুতবেগে চলিবার খুব সুবিধা হয়।

ইংলণ্ডে রাজাপ্রজার মধ্যে বৈষম্য নাই; এবং সেখানে রাজ্যতন্ত্রের কল বহুকাল হইতে চলিয়া সহজ হইয়া আসিয়াছে। তবু সেখানে একটা হিতজনক পরিবর্ত্তন সাধন করিতেও কত কৌশল কত অধ্যবসায় প্রয়োগ এবং কত সম্প্রদায়কে কত ভাবে চালনা করিতে হয়! অথচ সেখানে বিপরীত স্বার্থের এমন তুমুল সংঘর্ষ নাই; সেখানে একবার

যুক্তি দ্বারা প্রস্তাব বিশেষের উপকারিতা সকলের কাছে প্রমাণ করিবামাত্র সাধারণ অথবা অধিকাংশের স্বার্থ এক হইয়া তাহা গ্রহণ করে। আর আমাদের দেশে যখন দুই শক্তি লইয়া কথা এবং আমরাই যখন সর্ব্বাংশে দুর্ব্বল তখন কেবল ভাষার বেগে গবর্মেণ্টকে বিচলিত করিবার আশা করা যায় না। নানা দূরগামী উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক।

রাজকীয় ব্যাপারে সর্ব্বত্রই ডিপ্লম্যাসি আছে এবং ভারতবর্ষে আমাদের পক্ষে তাহার সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যক। আমি ইচ্ছা করিতেছি এবং আমার ইচ্ছা অন্যায় নহে বলিয়াই পৃথিবীতে কাজ সহজ হয় না। যখন চুরি করিতে যাইতেছি না শ্বশুরবাড়ি যাইতেছি তখন পথের মধ্যে যদি একটা পুষ্করিণী পড়ে তবে তাহার উপর দিয়াই হাঁটিয়া চলিয়া যাইব এমন পণ করিয়া বসিলে, চাই কি, শ্বশুরবাড়ি না পৌঁছিতেও পারি। সেস্থলে পুকুরটা ঘুরিয়া যাওয়াই ভাল। আমাদের রাজনৈতিক শ্বশুরবাড়ি যেখানে ক্ষীরটা সরটা মাছের মুড়াটা আমাদের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে সেখানে যাইতে হইলেও নানা বাধা নানা উপায়ে অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে। যেখানে লঙ্ঘন করিলে চলে সেখানে লঙ্ঘন করিতে হইবে, যেখানে সে সুবিধা নাই সেখানে রাগারাগি করিতে না বসিয়া ঘুরিয়া যাওয়া ভাল।

ডিপ্লম্যাসি অর্থে যে কপটাচরণ বুঝিতে হইবে এমন কথা নাই। তাহার প্রকৃত মর্ম্ম এই নিজের ব্যক্তিগত হৃদয়বৃত্তি দ্বারা অকস্মাৎ বিচলিত না হইয়া কাজের নিয়ম ও সময়ের সুযোগ বুঝিয়া কাজ করা।

কিন্তু আমরা সে দিক দিয়া যাই না। আমরা কাজ পাই বা না পাই কথা একটাও বাদ দিতে পারি না। তাহাতে কেবল যে আমাদের অনভিজ্ঞতা ও অবিবেচনা প্রকাশ পায় তাহা নহে ; তাহাতে প্রকাশ পায় যে, কাজ আদায়ের ইচ্ছার অপেক্ষা দুয়ো দিবার, বাহাবা লইবার, এবং মনের ঝাল ঝাড়িবার ইচ্ছা আমাদের বেশি। তাহার একটা সুযোগ

পাইলে আমরা এত খুসি হই যে, তাহাতে আসল কাজের কত ক্ষতি হইল তাহা আমরা ভুলিয়া যাই। এবং কটু ভর্ৎসনার পর সঙ্গত প্রার্থনা পূরণ করিতেও গবর্মেণ্টের মনে দ্বিধা উপস্থিত হয়, পাছে প্রজার স্পর্দ্ধা বাড়িয়া উঠে।

ইহার প্রধান কারণ, মনের ভিতরে এমন একটা অসদ্ভাব জন্মিয়া গিয়াছে এবং প্রতিদিন তীব্রতর হইয়া উঠিতেছে, যে, উভয়পক্ষেরই কর্ত্তব্যপালন ক্রমশই কিছু কিছু করিয়া দুরূহ হইতেছে। রাজাপ্রজার এই অহরহ কলহ দেখিতেও কিছুমাত্র ভাল হইতেছে না। গবর্মেণ্টও বাহ্যতঃ যেমনই হৌক্, মনে মনে যে এ সম্বন্ধে উদাসীন তাহা বিশ্বাস হয় না। কিন্তু উপায় কি? বৃটিশ চরিত্র, হাজার হৌক, মনুষ্যচরিত্র ত বটে।

ভাবিয়া দেখিলে এ সমস্যার মীমাংসা সহজ নহে।

সব প্রথম সঙ্কট বর্ণ লইয়া। শরীরের বর্ণটা যেমন ধুইয়া-মুছিয়া কিছুতেই দূর করা যায় না তেমনি বর্ণ সম্বন্ধীয় যে সংস্কার সেটা মন হইতে তাড়ানো বড় কঠিন। শ্বেতকায় আর্য্যগণ কালো রঙটাকে বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া ঘৃণাচক্ষে দেখিয়া আসিতেছেন। এই অবসরে বেদের ইংরাজি তর্জ্জমা এবং এনসাইক্লোপীডিয়া হইতে এ সম্বন্ধে অধ্যায়, সূত্র এবং পৃষ্ঠাঙ্ক সমেত উৎকট প্রমাণ আহরণ করিয়া পাঠকদের প্রতি দৌরাত্ম্য করিতে চাহি না—কথাটা সকলেই বুঝিবেন। শ্বেতকৃষ্ণে যেন দিন-রাত্রির ভেদ। শ্বেতজাতি দিনের ন্যায় সদাজাগ্রত, কর্ম্মশীল, অনুসন্ধান-তৎপর, আর কৃষ্ণজাতি রাত্রির ন্যায় নিশ্চেষ্ট, কর্ম্মহীন, স্বপ্নকুহকে আবিষ্ট। এই শ্যামা-প্রকৃতিতে হয় ত রাত্রির মত একটা গভীরতা, মাধুর্য্য, স্নিগ্ধ করুণা এবং সুনিবিড় আত্মীয়তার ভাব আছে, দুর্ভাগ্যক্রমে ব্যস্ত চঞ্চল শ্বেতাঙ্গের তাহা আবিষ্কার করিবার অবসর নাই এবং তাহার কাছে ইহার যথেষ্ট মূল্যও নাই। তাহাদিগকে এ কথা বলিয়াও কোন ফল নাই যে,

কালো গরুতেও শাদা দুধ দিয়া থাকে এবং ভিন্ন বর্ণের মধ্যে হৃদয়ের একটা গভীর ঐক্য আছে। কিন্তু কাজ নাই এ সকল ওরিয়েণ্টাল্ উপমা তুলনায়—কথাটা এই যে কালো রঙ দেখিবামাত্র শ্বেতজাতির মন কিছু বিমুখ না হইয়া থাকিতে পারে না।

তার পরে বসনভূষণ অভ্যাস আচারে প্রত্যেক বিষয়েই এমন সকল বৈসাদৃশ্য আছে যাহা হৃদয়কে কেবলি প্রতিহত করিতে থাকে।

শরীর অর্দ্ধাবৃত রাখিয়াও যে মনের অনেক সদ্‌গুণ পোষণ করা যাইতে পারে, মনের গুণগুলা যে ছায়াপ্রিয় সৌখীন জাতীয় উদ্ভিজ্জের মত নহে, তাহাকে যে জিন বনাতের দ্বারা না মুড়িলেও অন্য উপায়ে রক্ষা করা যায় সে সমস্ত তর্ক করা মিথ্যা। ইহা তর্কের কথা নহে সংস্কারের কথা।

এক, নিকট-সংস্রবে এই সংস্কারের বল কতকটা অভিভূত হইতে পারে। কিন্তু ঐ সংস্কারই আবার নিকটে আসিতে দেয় না। যখন ষ্টীমার ছিল না এবং আফ্রিকা বেষ্টন করিয়া পালের জাহাজ সুদীর্ঘ কালে ভারতবর্ষ হইতে বিলাতে গিয়া পৌঁছিত তখন ইংরাজ দেশী লোকের সঙ্গে কিছু যেন বেশি ঘনিষ্ঠতা করিত। কিন্তু আজকাল সাহেব তিনটি মাসের ছুটি পাইলেই তৎক্ষণাৎ ইংলণ্ডে পলাইয়া গিয়া ভারতবর্ষের সমস্ত ধূলা ধৌত করিয়া আসেন এবং ভারতবর্ষেও তাঁহাদের আত্মীয় সমাজ ব্যাপক হইয়া পড়িতেছে, এই জন্য যে দেশ তাঁহারা জয় করিয়াছেন সে দেশে থাকিয়াও যথাসম্ভব না থাকা এবং যে জাতিকে শাসন করিতেছেন সে জাতিকে ভাল না বাসিয়াও কাজ করা সুসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। সহস্র ক্রোশ দূর হইতে সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া আসিয়া একটি সম্পূর্ণ বিদেশী রাজ্য নিতান্ত আপিসের কাজের ন্যায় দিনের বেলায় শাসন করিয়া সন্ধ্যাবেলায় পুনশ্চ সমুদ্রে খেয়া দিয়া বাড়ি গিয়া তপ্ত ভাত খাওয়া, ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত আর কোথায় আছে।

এক ত, আমরা সহজেই বিদেশী—এবং আমাদের রূপ রস গন্ধ শব্দ ও স্পর্শ ইংরাজের স্বভাবতই অরুচিকর, তাহার উপরে আরো একটা উপসর্গ আছে। অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান্ সমাজ এদেশে যতই প্রাচীন হইতেছে ততই তাহার কতকগুলি লোকব্যবহার ও জনশ্রুতি ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইয়া যাই-তেছে। যদিও বা কোন ইংরাজ স্বাভাবিক উদারতা ও সহৃদয়তাগুণে বাহ্য বাধাসকল দূর করিয়া আমাদের অন্তরে প্রবেশ করিবার পথ পাইতেন এবং আমাদিগকে অন্তরে আহ্বান করিবার জন্য দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিতেন, তিনি এখানে আসিবামাত্র ইংরাজ সমাজের জালের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়েন। তখন তাঁহার নিজের স্বাভাবিক সংস্কার এবং স্বজাতি সমাজের পুঞ্জীভূত সংস্কার একত্র হইয়া একটা অলংঘ্য বাধার স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। পুরাতন বিদেশী নূতন বিদেশীকে আমাদের কাছে আসিতে না দিয়া তাঁহাদের দুর্গম সমাজ-দুর্গের মধ্যে কঠিন পাষাণময় স্বাতন্ত্র্যের দ্বারা বেষ্টন করিয়া রাখেন।

স্ত্রীলোক সমাজের শক্তিস্বরূপ। রমণী চেষ্টা করিলে বিরোধীপক্ষের মিলন সাধন করিয়া দিতে পারেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহারাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকমাত্রায় সংস্কারের বশ। আমরা সেই অ্যাংলো-ইণ্ডিয় রমণীগণের স্নায়ুবিকার ও শিরঃপীড়াজনক। সে জন্য তাঁহাদের কি দোষ দিব, সে আমাদের অদৃষ্ট দোষ। বিধাতা আমাদিগকে সর্ব্বাংশেই তাঁহাদের রুচিকর করিয়া গড়েন নাই।

তাহার পরে, আমাদের মধ্যে ইংরাজেরা যে ভাবে আমাদের সম্বন্ধে বলাকহা করে, চিন্তামাত্র না করিয়া আমাদের প্রতি যে সমস্ত বিশেষণ প্রয়োগ করে, এবং আমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে না জানিয়াও আমাদের যে সমস্ত কুৎসাবাদ করিয়া থাকে, প্রত্যেক সামান্য কথাটিতে আমাদের প্রতি তাহাদের যে বদ্ধমূল অপ্রেম প্রকাশ হইয়া থাকে তাহা নবাগত ইংরাজ অল্পে অল্পে সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়া শোষণ না করিয়া থাকিতে পারে না।

এ কথা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে যে বিধিবিড়ম্বনায় আমরা ইংরাজের অপেক্ষা অনেক দুর্ব্বল এবং ইংরাজকৃত অসম্মানের কোন প্রতিকার করিতে পারি না। যে নিজের সম্মান উদ্ধার করিতে পারে না এ পৃথিবীতে সে সম্মান পায় না। যখন একজন তাজা বিলাতী ইংরাজ আসিয়া দেখে যে, আমরা অপমান নিশ্চেষ্টভাবে বহন করি তখন আমাদের পরে আর তাহার শ্রদ্ধা থাকিতে পারে না।

তখন তাহাদিগকে কে বুঝাইবে, যে, অপমান সম্বন্ধে আমরা উদাসীন নহি কিন্তু আমরা দরিদ্র এবং আমরা কেহই স্বপ্রধান নহি, প্রত্যেক ব্যক্তিই এক একটি বৃহৎ পরিবারের প্রতিনিধি। তাহার উপরে কেবল তাহার একলার নহে, তাহার পিতামাতা ভ্রাতা স্ত্রী পুত্র পরিবারের জীবন-ধারণ নির্ভর করিতেছে। তাহাকে অনেক আত্মসংযম আত্মত্যাগ করিয়া চলিতে হয়। ইহা তাহার চিরদিনের শিক্ষা ও অভ্যাস। সে যে ক্ষুদ্র আত্মরক্ষণেচ্ছার নিকট আত্মসম্মান বলি দেয় তাহা নহে, বৃহৎ পরিবারের নিকট কর্ত্তব্যজ্ঞানের নিকট দিয়া থাকে। কে না জানে দরিদ্র বাঙালী কর্ম্মচারীগণ কতদিন সুগভীর নির্ব্বেদ এবং সুতীব্র ধিক্কারের সহিত আপিস হইতে চলিয়া আসে, তাহাদের অপমানিত জীবনটকি অসহ্য দুর্ভর বলিয়া বোধ হয়—সে তীব্রতা এত আত্যন্তিক, যে, সে অবস্থায় অক্ষমতম ব্যক্তিও সাংঘাতিক হইয়া উঠে কিন্তু তথাপি তাহার পরদিন যথাসময়ে ধুতির উপর চাপকানটি পরিয়া সেই আপিসের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করে এবং সেইমসীলিপ্ত ডেস্কে চামড়ায় বাঁধান বৃহৎ খাতাটি খুলিয়া সেই পিঙ্গলবর্ণ বড়সাহেবের রূঢ় লাঞ্ছনা নীরবে সহ্য করিতে থাকে। হঠাৎ আত্মবিস্মৃত হইয়া সে কি এক মুহূর্ত্তে আপনার বৃহৎ সংসারটিকে ডুবাইতে পারে? আমরা কি ইংরাজের মত স্বতন্ত্র, সংসারভারবিহীন! আমরা প্রাণ দিতে উদ্যত হইলে অনেকগুলি নিরুপায় নারী অনেকগুলি অসহায় শিশু ব্যাকুল বাহু উত্তোলন করিয়া আমাদের কল্পনাচক্ষে উদিত হয়। ইহা আমাদের বহুযুগের অভ্যাস।

কিন্তু সে কথা ইংরাজের বুঝিবার নহে। ভাষায় একটিমাত্র কথা আছে, ভীরুতা। নিজের জন্য ভীরুতা ও পরের জন্য ভীরুতার প্রভেদ নির্ণয় করিয়া কোন কথার সৃষ্টি হয় নাই। সুতরাং ভীরু শব্দটা মনে উদয় হইবামাত্র তৎসম্বলিত দৃঢ়বদ্ধমূল অবজ্ঞাও মনে উদয় হইবে। আমরা বহৎ পরিবার ও বৃহৎ অপমান একত্রে মাথায় বহন করিতেছি।

তাহার পরে ভারতবর্ষের অধিকাংশ ইংরাজি খবরের কাগজ আমাদের প্রতিকূলপক্ষ অবলম্বন করিয়া আছে। চা রুটি এবং আণ্ডার সহিত আমাদের নিন্দাবাদ ভারতবর্ষীয় ইংরাজের ছোটহাজরির অঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে। ইংরাজি সাহিত্যে ও গল্পে, ভ্রমণবৃত্তান্তে, ইতিহাসে, ভূগোলে, রাজনৈতিক প্রবন্ধে এবং বিদ্রূপাত্মক কবিতায় ভারতবর্ষীয়ের বিশেষতঃ শিক্ষিত "বাবু"দের প্রতি ইংরাজের অরুচি উত্তরোত্তর বৰ্দ্ধিত করিয়া তুলিতেছে।

ভারতবর্ষীয়েরা আপন গরীবখানায় পড়িয়া পড়িয়া তাহার প্রতিশোধ লইতে চেষ্টা করে। কিন্তু আমরা কি প্রতিশোধ লইতে পারি! আমরা ইংরাজের কতটুকু ক্ষতি করিতে সক্ষম! আমরা রাগিতে পারি, ঘরে বসিয়া গাল পাড়িতে পারি, কিন্তু ইংরাজ যদি কেবলমাত্র দুইটি অঙ্গুলি দ্বারা আমাদের কোমল কর্ণমূলে কিঞ্চিৎ কঠিন মৰ্দ্দন প্রয়োগ করে তবে সেটা আমাদিগকে সহ্য করিতে হয়! এইরূপ মৰ্দ্দন করিবার ছোট বড় কত প্রকার অবসর যে তাহাদের আছে তাহা সদর মফস্বলের লোকের অবিদিত নাই। ইংরাজ আমাদের প্রতি মনে মনে যতই বিমুখ বীতশ্রদ্ধ হইতে থাকিবে ততই আমাদের প্রকৃত স্বভাব বোঝা, আমাদের সুবিচার করা; আমাদের উপকার করা তাহাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া দাঁড়াইবে। ভারতবর্ষীয়ের অবিশ্রাম নিন্দা ও তাহার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া ইংরাজী কাগজ ভারতশাসনকার্য্য দুরূহ করিয়া তুলিতেছে। আর আমরা ইংরাজের নিন্দা করিয়া কেবল আমাদের নিরুপায় অসন্তোষ লালন করিতেছি মাত্র।

এ পর্য্যন্ত ভারত-অধিকার কার্য্যে যে অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে তাহাতে ইহা নিশ্চয় জানা গিয়াছে যে, ভারতবর্ষীয়ের নিকট হইতে ইংরাজের আশঙ্কার কোন কারণ নাই। দেড়শত বৎসর পূর্ব্বেই যখন কারণ ছিল না বলিলেই হয় তখন এখনকার ত আর কথাই নাই। রাজ্যের মধ্যে যাহারা উপদ্রব করিতে পারিত তাহাদের নখদন্ত গিয়াছে এবং অনভ্যাসে তাহারা এতই নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়াছে যে, ভারতরক্ষাকার্য্যের জন্যই সৈন্য পাওয়া ক্রমশঃ দুর্ঘট হইতেছে। তথাপি ইংরাজ "সিডিশন" দমনের জন্য সর্ব্বদা উদ্যত। তাহার কারণ, প্রবীণ রাজনীতিজ্ঞগণ কোন অবস্থাতেই সতর্কতাকে শিথিল হইতে দেন না। সাবধানের বিনাশ নাই।

তত্রাচ উহা অতিসাবধানমাত্র। কিন্তু অপর পক্ষে ইংরাজ যদি ক্রমশই ভারতদ্রোহী হইয়া উঠিতে থাকে তাহা হইলেই রাজকার্য্যের বাস্তবিক বিঘ্ন ঘটা সম্ভব। বরং উদাসীনভাবেও কর্ত্তব্যপালন করা যায় কিন্তু আন্তরিক বিদ্বেষ লইয়া কর্ত্তব্যপালন করা মনুষ্য-ক্ষমতার অতীত।

তথাপি, অমানুষিক ক্ষমতা-বলে সমস্ত কর্ত্তব্য যথাযথ পালন করিলেও সেই অন্তরস্থিত বিদ্বেষ প্রজাকে পীড়ন করিতে থাকে। কারণ, যেমন জলের ধর্ম্ম আপনার সমতল সন্ধান করা তেমনি মানবহৃদয়ের ধর্ম্ম আপনার সমঐক্য অন্বেষণ করা। এমন কি, প্রেমের সূত্রে ঈশ্বরের সহিত সে আপনার ঐক্য স্থাপন করে। যেখানে সে আপনার ঐক্যের পথ খুঁজিয়া না পায় সেখানে অন্য যত প্রকার সুবিধা থাক্ সে অতিশয় ক্লিষ্ট হইতে থাকে। মুসলমান রাজা অত্যাচারী ছিল কিন্তু তাহাদের সহিত আমাদের অনেক বিষয়ে সমকক্ষতার সাম্য ছিল। আমাদের দর্শন কাব্য আমাদের কলাবিদ্যা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিতে রাজায় প্রজায় আদানপ্রদান ছিল। সুতরাং মুসলমান আমাদিগকে পীড়ন করিতে পারিত কিন্তু অসম্মান করা তাহার সাধ্য ছিল না। মনে মনে আমাদের আত্মসম্মানের কোন লাঘব ছিল না, কারণ বাহুবলের দ্বারা শ্রেষ্ঠতা কিছুতেই অভিভূত হইতে পারে না।

কিন্তু আমরা ইংরাজের রেলগাড়ি কলকারখানা রাজ্যশৃঙ্খলা দেখি আর হাঁ করিয়া ভাবি ইহারা ময়দানবেরই বংশ—ইহারা এক জাতই স্বতন্ত্র, ইহাদের অসাধ্য কিছুই নহে—এই বলিয়া নিশ্চিত মনে রেলগাড়িতে চড়ি, কলের মাল সস্তায় কিনি এবং মনে করি ইংরাজের মুল্লুকে আমাদের আর কিছু ভয় করিবার চিন্তা করিবার চেষ্টা করিবার নাই—কেবল, পূর্ব্বে ডাকাতে যাহা লইত এখন তাহা পুলিষ এবং উকীলে মিলিয়া অংশ করিয়া লয়।

এইরূপে মনের একভাগ যেরূপ নিশ্চিত নিশ্চেষ্ট হয়, অপর ভাগে এমন কি, মনের গভীরতর মূলে ভার বোধ হইতে থাকে। খাদ্যরস এবং পাকরস মিশিয়া তবে আহার পরিপাক হয়, ইংরাজের সভ্যতা আমাদের পক্ষে খাদ্যমাত্র কিন্তু তাহাতে রসের একান্ত অভাব হওয়াতে আমাদের মন তদুপযুক্ত পাকরস নিজের মধ্য হইতে যোগাইতে পারিতেছে না। লইতেছি মাত্র কিন্তু পাইতেছি না। ইংরাজের সকল কার্য্যের ফলভোগ করিতেছি কিন্তু আমার করিতে পারিতেছি না, এবং করিবার আশাও নিরস্ত হইতেছে।

রাজ্য জয় করিয়া গৌরব এবং লাভ আছে, রাজ্য সুশাসন করিয়া ধর্ম্ম এবং অর্থ আছে, আর রাজাপ্রজার হৃদয়ের মিলন স্থাপন করিয়া কি কোন মাহাত্ম্য এবং কোন সুবিধা নাই? বর্ত্তমান কালের ভারত রাজনীতির সেই কি সর্ব্বাপেক্ষা চিন্তা এবং আলোচনার বিষয় নহে?

কেমন করিয়া হইবে তাহাই প্রশ্ন। একে একে ত দেখান গিয়াছে যে, রাজাপ্রজার মধ্যে দুর্ভেদ্য দুরূহ স্বাভাবিক বাধাসকল বর্ত্তমান। কোন কোন সহৃদয় ইংরাজও সে জন্য অনেক সময় চিন্তা ও দুঃখ অনুভব করেন। তবু যাহা অসম্ভব যাহা অসাধ্য তাহা লইয়া বিলাপ করিয়া ফল কি?

কিন্তু বৃহৎ কার্য্য মহৎ, অনুষ্ঠান কবে সহজ সুসাধ্য হইয়াছে? এই ভারতজয় ভারতশাসনকার্য্যে ইংরাজের যে সকল গুণের আবশ্যক হইয়াছে সে গুলি কি সুলভ গুণ? সে সাহস, সে অদম্য অধ্যবসায়, সে ত্যাগ-স্বীকার কি স্বল্প সাধনার ধন? আর পঞ্চবিংশতি কোটি বিদেশীয় প্রজার হৃদয় জয় করিবার জন্য যে দুর্লভ সহৃদয়তা গুণের আবশ্যক তাহা কি সাধনার যোগ্য নহে?

ইংরাজ কবিগণ গ্রীস ইটালী হাঙ্গেরি পোলাণ্ডের দুঃখে অশ্রুমোচন করিয়াছেন, আমরা ততটা অশ্রুপাতের অধিকারী নহি, কিন্তু এ পর্য্যন্ত মাহাত্মা এড্‌বিন আর্ণল্‌ড্‌ ব্যতীত আর কোন ইংরাজ কবি কোন প্রসঙ্গ উপলক্ষে ভারতবর্ষের প্রতি প্রীতি ব্যক্ত করেন নাই। বরঞ্চ শুনিয়াছি নিঃসম্পর্ক ফ্রান্সের কোন কোন বড় কবি ভারতবর্ষীয় প্রসঙ্গ অবলম্বন করিয়া কাব্য রচনা করিয়াছেন। ইহাতে ইংরাজের যতটা অনাত্মীয়তা প্রকাশ পাইয়াছে এমন আর কিছুতেই নহে।

ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষীয়দের লইয়া আজকাল ইংরাজি নভেল অনেক-গুলি বাহির হইতেছে। শুনিতে পাই আধুনিক অ্যাংলোইণ্ডিয়ান লেখক সম্প্রদায়ের মধ্যে রাড্‌ইয়ার্ড্‌ কিপ্লিং প্রতিভায় অগ্রগণ্য। তাঁহার ভারত-বর্ষীয় গল্প লইয়া ইংরাজ পাঠকেরা অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছেন। উক্ত গল্পগুলি পড়িয়া তাঁহার একজন অনুরক্ত ভক্ত ইংরাজ কবির মনে কিরূপ ধারণা হইয়াছে তাহা পড়িয়াছি। সমালোচনা উপলক্ষে এড্‌মণ্ড্‌ গস্‌ বলিতে-ছেন;—"এই সকল গল্প পড়িতে পড়িতে ভারতবর্ষীয় সেনানিবাসগুলিকে জনহীন বালুকাসমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী এক একটি দ্বীপের মত বোধ হয়। চারি-দিকেই ভারতবর্ষের অপরিসীম মরুময়তা,—অখ্যাত, একঘেয়ে, প্রকাণ্ড—সেখানে কেবল কালা আদমি, পারিয়া কুকুর, পাঠান এবং সবুজবর্ণ টিয়া পাখী, চিল এবং কুম্ভীর, এবং লম্বা ঘাসের নির্জ্জনক্ষেত্র। এই মরু-সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী দ্বীপে কতকগুলি যুবাপুরুষ বিধবা মহারাণীর কার্য্য করিতে

এবং তাঁহার অধীনস্থ পূর্ব্বদেশীয় ধনসম্পদপূর্ণ বর্ব্বর সাম্রাজ্য রক্ষা করিতে সুদূর ইংলণ্ড হইতে প্রেরিত হইয়াছে।" ইংরাজের তুলিতে ভারতবর্ষের এই শুষ্ক শোভাহীন চিত্র অঙ্কিত দেখিয়া মন নৈরাশ্যে বিষাদে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। আমাদের ভারতবর্ষ ত এমন নয়! কিন্তু ইংরাজের ভারতবর্ষ কি এত তফাৎ!

পরন্তু ভারতবর্ষের সহিত স্বার্থসম্পর্কীয় সম্বন্ধ লইয়া প্রবন্ধ আজকাল প্রায়ই দেখা যায়। ইংলণ্ডের জনসংখ্যা প্রতিবৎসর বৃদ্ধি হইয়া ক্রমশ কি পরিমাণে খাদ্যাভাব হইতেছে এবং ভারতবর্ষ তাহা কি পরিমাণে পূরণ করিতেছে এবং বিলাতি মালের আমদানি করিয়া বিলাতের বহু-সংখ্যক শ্রমজীবীর হাতে কাজ দিয়া তাহাদের কিরূপে জীবনোপায় করিয়া দিতেছে তাহার তালিকা বাহির হইতেছে।

ইংলণ্ড উত্তরোত্তর ভারতবর্ষকে তাঁহাদেরই রাজগোষ্ঠের চিরপালিত গরুটির মত দেখিতেছেন। গোয়াল পরিষ্কার রাখিতে এবং খোল বিচালি যোগাইতে কোন আলস্য নাই, এই অস্থাবর সম্পত্তিটি যাহাতে রক্ষা হয় সে পক্ষে তাঁহাদের যত্ন আছে, যদি কখন দৌরাত্ম্য করে সে জন্য শিং দুটা ঘসিয়া দিতে ঔদাসীন্য নাই এবং দুই বেলা দুগ্ধ দোহন করিয়া লইবার সময় কৃশকায় বৎসগুলাকেও একেবারে বঞ্চিত করে না। কিন্তু তবু স্বার্থের সম্পর্কটাকেই উত্তরোত্তর জাজ্বল্যমান করিয়া তোলা হইতেছে। এই সকল প্রবন্ধে প্রায় একই সময় ভারতবর্ষের সহিত ইংরাজী উপনিবেশ-গুলিরও প্রসঙ্গ অবতারণা করা থাকে। কিন্তু সুরের কত প্রভেদ! তাহাদের প্রতি কত প্রেম, কত সৌভ্রাত্র! কত বারম্বার করিয়া বলা হয় যে, যদিও মাতৃভূমি হইতে তাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া গেছে তথাপি এখনো মাতার প্রতি তাহাদের অচলা ভক্তি আছে, তাহারা নাড়ির টান ভুলিতে পারে নাই—অর্থাৎ সে স্থলে স্বার্থের সঙ্গে প্রেমের কথারও উল্লেখ করা আবশ্যক হয়। আর হতভাগ্য ভারতবর্ষেরও কোথাও একটা হৃদয় আছে এবং সেই

হৃদয়ের সঙ্গে কোথাও একটু যোগ থাকা আবশ্যক সে কথার কোন আভাস মাত্র থাকে না। ভারতবর্ষ কেবল হিসাবের খাতায় শ্রেণীবদ্ধ অঙ্কপাতের দ্বারায় নির্দ্দিষ্ট। ইংলণ্ডের প্র্যাক্‌টিক্যাল লোকের কাছে ভারতবর্ষের কেবল মন দরে সের দরে, টাকার দরে শিকার দরে গৌরব। সংবাদপত্র এবং মাসিকপত্রের লেখকগণ ইংলণ্ডকে কি কেবল এই শুষ্ক পাঠই অভ্যাস করাইবেন? ভারতবর্ষের সহিত যদি কেবল তাহার স্বার্থের সম্পর্কই দৃঢ় হয় তবে যে শ্যামাঙ্গিনী গাভীটি আজ দুধ দিতেছে কালে গোপকুলের অযথা বংশবৃদ্ধি ও ক্ষুধাবৃদ্ধি হইলে তাহার ল্যাজটুকু এবং ক্ষুরটুকু পর্য্যন্ত তিরোহিত হইবার সম্ভাবনা। এই স্বার্থের চক্ষে দেখা হয় বলিয়াই ত ল্যাঙ্কাশিয়র নিরুপায় ভারতবর্ষের তাঁতের উপর মাশুল বসাইয়াছে আর নিজের মাল বিনা মাশুলে চালান করিতেছে।

আমাদের দেশটাও যে তেমনি! যেমন রৌদ্র তেমনি ধূলা! কেবলি পাখার বাতাস এবং বরফ জল না খাইলে সাহেব বাঁচে না। আবার দুর্ভাগ্যক্রমে পাখার কুলিটিও রুগ্ন প্লীহা লইয়া ঘুমাইয়া পড়ে এবং বরফ সর্ব্বত্র সুলভ নহে। ভারতবর্ষ ইংরাজের পক্ষে রোগশোক স্বজনবিচ্ছেদ এবং নির্ব্বাসনের দেশ, সুতরাং খুব মোটা মাহিনায় সেটা পোষাইয়া লইতে হয়। আবার পোড়া এক্সচেঞ্জ তাহাতেও বাদ সাধিতে চাহে। স্বার্থসিদ্ধি ছাড়া ভারতবর্ষ ইংরাজকে কি দিতে পারে!

হায় হতভাগিনী ইণ্ডিয়া, তোমাকে তোমার স্বামীর পছন্দ হইল না; তুমি তাহাকে প্রেমের বন্ধনে বাঁধিতে পারিলে না! এখন দেখ, যাহাতে তাহার সেবার ত্রুটি না হয়! তাহাকে অশ্রান্ত যত্নে বাতাস কর; খস্‌খসের পর্দ্দা টাঙাইয়া জল সেচন কর, যাহাতে দুই দণ্ড তোমার ঘরে সে সুস্থির হইয়া বসিতে পারে। খোল, তোমার সিন্ধুকটা খোল, তোমার গহনাগুলো বিক্রয় কর, উদর পূর্ণ করিয়া আহার এবং পকেট পূর্ণ করিয়া দক্ষিণা দাও। তবু সে মিষ্ট কথা বলিবে না, তবু মুখ ভার করিয়া থাকিবে,

তবু তোমার বাপের বাড়ীর নিন্দা করিবে। আজকাল তুমি লজ্জার মাথা খাইয়া মান অভিমান করিতে আরম্ভ করিয়াছ, ঝঙ্কার সহকারে দু কথা পাঁচ কথা শুনাইয়া দিতেছ; কাজ নাই বকাবকি করিয়া; যাহাতে তোমার বিদেশী স্বামী সন্তোষে থাকে আরামে থাকে একমনে তাহাই সাধন কর! তোমার হাতের লোহা অক্ষয় হউক্!

ইংরাজ রাজকবি টেনিসন্ মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার সর্ব্বশেষ গ্রন্থে সৌভাগ্যক্রমে ভারতবর্ষকে কিঞ্চিৎ স্মরণ করিয়াছেন।

কবিবর উক্ত গ্রন্থে আকবরের স্বপ্ন নামক একটি কবিতা প্রকাশ করিয়াছেন। আকবর তাঁহার প্রিয় সুহৃৎ আবুল্‌ফজ্‌লের নিকট রাত্রের স্বপ্নবর্ণন উপলক্ষে তাঁহার ধর্ম্মের আদর্শ ও জীবনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিতেছেন। তিনি ভারতবর্ষের ভিন্ন ধর্ম্মের মধ্যে যে ঐক্য এবং ভিন্ন জাতির মধ্যে যে প্রেম ও শান্তি স্থাপনার চেষ্টা করিয়াছেন, স্বপ্নে দেখিয়াছেন তাঁহার পরবর্ত্তীগণ সে চেষ্টা বিপর্য্যস্ত করিয়া দিয়াছে এবং অবশেষে সূর্য্যাস্তের দিক্ হইতে একদল বিদেশী আসিয়া তাঁহার সেই ভূমিসাৎ মন্দিরকে, একটি একটি প্রস্তর গাঁথিয়া পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়া তুলিয়াছে এবং সেই মন্দিরে সত্য এবং শান্তি, প্রেম এবং ন্যায়পরতা পুনরায় আপন সিংহাসন স্থাপন করিয়াছে।

কবির এই স্বপ্ন সফল হউক্ প্রার্থনা করি। আজ পর্য্যন্ত এই মন্দিরের প্রস্তরগুলি গ্রথিত হইয়াছে; বল, পরিশ্রম ও নৈপুণ্যের দ্বারা যাহা হইতে পারে তাহার কোন ত্রুটি হয় নাই কিন্তু এখনো এ মন্দিরে সকল দেবতার অধিদেবতা প্রেমের প্রতিষ্ঠা হয় নাই।

প্রেম পদার্থটি ভাবাত্মক, অভাবাত্মক নহে। আকবর সকল ধর্ম্মের বিরোধভঞ্জন করিয়া যে একটি প্রেমের ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা ভাবাত্মক। তিনি নিজের হৃদয় মধ্যে একটি ঐক্যের আদর্শ লাভ করিয়াছিলেন, তিনি উদার হৃদয় লইয়া শ্রদ্ধার সহিত সকল ধর্ম্মের অন্তরে

প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিনি একাগ্রতার সহিত নিষ্ঠার সহিত হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান পার্সী ধর্ম্মজ্ঞদিগের ধর্ম্মালোচনা শ্রবণ করিতেন ও তিনি হিন্দু রমণীকে অন্তঃপুরে, হিন্দু অমাত্যদিগকে মন্ত্রীসভায়, হিন্দুবীরগণকে সেনা-নায়কতায় প্রধান আসন দিয়াছিলেন। তিনি কেবল রাজনীতির দ্বারায় নহে প্রেমের দ্বারা সমস্ত ভারতবর্ষকে, রাজা ও প্রজাকে এক করিতে চাহিয়াছিলেন। সূর্য্যাস্তভূমি হইতে বিদেশী আসিয়া আমাদের ধর্ম্মে কোন হস্তক্ষেপ করে না,—কিন্তু সেই নির্লিপ্ততা প্রেম, না রাজনীতি? উভয়ের মধ্যে আকাশপাতাল প্রভেদ।

কিন্তু এক জন মহদাশয় ক্ষণজন্মা পুরুষ যে অত্যুচ্চ আদর্শ লাভ করিয়াছিলেন একটি সমগ্র জাতির নিকট তাহা প্রত্যাশা করা যায় না। সেই-জন্য কবির স্বপ্ন কবে সত্য হইবে বলা কঠিন। বলা আরো কঠিন এইজন্য, যে, দেখিতে পাইতেছি, রাজা প্রজার মধ্যে যে চলাচলের পথ ছিল উভয় পক্ষে কাঁটাগাছের ঘের দিয়া প্রতিদিন সে পথ মারিয়া লইতেছেন। নব নব বিদ্বেষ মিলনক্ষেত্রকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে।

রাজ্যের মধ্যে এই প্রেমের অভাব আমরা আজকাল এত অধিক করিয়া অনুভব করি যে, লোকের মনে ভিতরে ভিতরে একটা আশঙ্কা এবং অশান্তি আন্দোলিত হইতেছে। তাহার একটা দৃষ্টান্ত দেখা যায়, যে, আজকাল হিন্দু মুসলমানের বিরোধ উত্তরোত্তর যে নিদারুণতর হইয়া উঠিতেছে আমরা আপনাদের মধ্যে তাহা লইয়া কিরূপ বলা কহা করি? আমরা কি গোপনে বলি না যে, এই উৎপাতের প্রধান কারণ, ইংরাজেরা এই বিরোধ নিবারণের জন্য যথার্থ চেষ্টা করে না। তাহাদের রাজানীতির মধ্যে প্রেমনীতির স্থান নাই। ভারতবর্ষের দুই প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে তাহারা প্রেমের অপেক্ষা ঈর্ষা বেশি করিয়া বপন করিয়াছে। ইচ্ছা পূর্ব্বক করিয়াছে এমন নাও হইতে পারে—কিন্তু আকবর যে একটি প্রেমের আদর্শে খণ্ড ভারতবর্ষকে এক করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন ইংরাজের পলিসির

মধ্যে সেই আদর্শটি নাই বলিয়াই এই দুই জাতির স্বাভাবিক বিরোধ হ্রাস না হইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবার উপক্রম দেখা যাইতেছে। কেবল আইনের দ্বারা শাসনের দ্বারা এক করা যায় না—অন্তরে প্রবেশ করিতে হয়, বেদনা বুঝিতে হয়, যথার্থ ভালবাসিতে হয়—আপনি কাছে আসিয়া হাতে হাতে ধরিয়া মিলন করাইয়া দিতে হয়। কেবল পুলিস্ মোতাইন্ করিয়া এবং হাতকড়ি দিয়া শান্তি স্থাপন করায় দুর্দ্ধর্ষ বলের পরিচয় পাওয়া যায় কিন্তু সেটা ঠিক আক্‌বরের স্বপ্নের মধ্যে ছিল না এবং সূর্য্যাস্ত-ভূমির কবিগণ অলীক অহঙ্কার না করিয়া যদি বিনীত প্রেমের সহিত সুগভীর আক্ষেপের সহিত স্বজাতিকে লাঞ্ছনা করিয়া প্রেমের সেই উচ্চ আদর্শ শিক্ষা দেন তবে তাঁহাদের স্বজাতিরও উন্নতি হয় এবং এই আশ্রিত-বর্গেরও উপকার হয়। ইংরাজের আত্মাভিমান সভ্যতাগর্ব্ব জাত্যহঙ্কার কি যথেষ্ট নাই, কবি কি কেবল সেই অগ্নিতেই আহুতি দিবেন? এখনো কি নম্রতা শিক্ষা ও প্রেমচর্চ্চার সময় হয় নাই? সৌভাগ্যের উন্নততম শিখরে অধিরোহণ করিয়া এখনো কি ইংরাজ কবি কেবল আত্মঘোষণা করিবেন।

কিন্তু আমাদের মত অবস্থাপন্ন লোকের মুখে এ সকল কথা কেমন শোভন হয় না, সেই জন্য বলিতেও লজ্জা বোধ হয়। দায়ে পড়িয়া প্রেম ভিক্ষা করার মত দীনতা আর কিছু নাই। এবং এ সম্বন্ধে দুই এক কথা আমাদিগকে মাঝে মাঝে শুনিতেও হয়।

মনে পড়িতেছে কিছুদিন হইল ভক্তিভাজন প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের এক পত্রের উত্তরে লণ্ডনের স্পেক্টেটর পত্র বলিয়াছিলেন নব্য বাঙালাদের অনেকগুলা ভাল লক্ষণ আছে কিন্তু একটা দোষ দেখিতেছি সিম্প্যাথি-লালসাটা তাহাদের বড় বেশি হইয়াছে।

এ দোষ স্বীকার করিতে হয় এবং এতক্ষণ আমি যে ভাবে কথাগুলা বলিয়া আসিতেছি তাহাতে এ দোষ হাতে হাতে প্রমাণ হয়। ইংরাজের

কাছ হইতে আদর পাইবার ইচ্ছাটা আমাদের কিছু অস্বাভাবিক পরিমাণে বাড়িয়া উঠিয়াছে। তাহার কারণ, আমরা স্পেক্টেটরের ন্যায় স্বাভাবিক অবস্থায় নাই। আমরা যখন "তৃষার্ত্ত হইয়া চাহি এক ঘটি জল" আমাদের রাজা তখন "তাড়াতাড়ি এনে দেয় আধখানা বেল!" আধখানা বেল সময় বিশেষে অত্যন্ত উপাদেয় হইতে পারে কিন্তু তাহাতে ক্ষুধাতৃষ্ণা দুই এক সঙ্গে দূর হয় না। ইংরাজের সুনিয়মিত সুবিচারিত গবর্মেণ্ট্ অত্যন্ত উত্তম এবং উপাদেয় কিন্তু তাহাতে প্রজার হৃদয়ের তৃষ্ণা মোচন না হইতেও পারে, এমন কি, গুরুপাক প্রচুর ভোজনের ন্যায় তদ্দ্বারা তৃষ্ণা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিতেও আটক নাই। স্পেক্টেটর দেশ দেশান্তরের সকল প্রকার ভোজ্য এবং সকল প্রকার পানীয় অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে আহরণ করিয়া পরিপূর্ণ ডিনারের মাঝখানে বসিয়া কিছুতেই ভাবিয়া পান না তাঁহাদের বাতায়নের বহিঃস্থিত পথপ্রান্তবর্ত্তী ঐ বিদেশী বাঙালীটির এমন বুভুক্ষু কাঙালের মত ভাবখানা কেন?

কিন্তু স্পেক্টেটর শুনিয়া হয় ত সুখী হইবেন অতি দুষ্প্রাপ্য তাঁহাদের সেই সিম্প্যাথির আঙুর ক্রমে আমাদের নিকটও টক হইয়া আসিয়াছে। আমরা অনেকক্ষণ উর্দ্ধে লোলুপ দৃষ্টিপাত করিয়া অবশেষে ধীরে ধীরে ঘরে ফিরিবার উপক্রম করিতেছি। আমাদের এই চির-উপবাসী ক্ষুধিত স্বভাবের মধ্যেও যেটুকু মনুষ্যত্ব অবশিষ্ট ছিল তাহা ক্রমে বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছে!

আমরা বলিতে আরম্ভ করিয়াছি—তোমরা এতই কি শ্রেষ্ঠ! তোমরা না হয় কল চালাইতে এবং কামান পাতিতে শিখিয়াছ কিন্তু মানবের প্রকৃত সভ্যতা আধ্যাত্মিক সভ্যতা, সেই সভ্যতায় আমরা তোমাদের অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠতর। অধ্যাত্মবিদ্যার ক খ হইতে আমরা তোমাদিগকে শিখাইতে পারি। তোমরা যে আমাদিগকে স্বল্পসভ্য বলিয়া অবজ্ঞা কর সে তোমাদের অন্ধ মূঢ়তাবশতঃ, হিন্দুজাতির শ্রেষ্ঠতা

ধারণা করিবার শক্তিও তোমাদের নাই। আমরা পুনরায় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যানে বসিব। আজ হইতে তোমাদের য়ুরোপের সুখাসক্ত চপল সভ্যতার বাল্যলীলা হইতে সমস্ত দৃষ্টি ফিরাইয়া আনিয়া তাহাকে কেবলমাত্র নাসাগ্রভাগে নিবিষ্ট করিয়া রাখিলাম। তোমরা কাছারি কর, আপিস কর, দোকান কর, নাচ, খেল, মার ধর, হুটোপাটি কর এবং সিমলার শৈলশিখরে বিলাসের স্বর্গপুরী নির্ম্মাণ করিয়া সভ্যতামদে প্রমত্ত হইয়া থাক।

দরিদ্র বঞ্চিত মানব আপনাকে এইরূপে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করে। যে শ্রেষ্ঠতার সহিত প্রেম নাই সে শ্রেষ্ঠতা সে কিছুতেই বহন করিতে সম্মত হয় না। কারণ, তাহার অন্তরে একটি সহজ জ্ঞান আছে তদ্দ্বারা সে জানে, যে, এইরূপ শুষ্ক শ্রেষ্ঠতা বাধ্য হইয়া বহন করিতে হইলে ক্রমশঃ ভারবাহী মূঢ় পশুর সমতুল্য হইয়া যাইতে হইবে।

কিন্তু কে বলিতে পারে এই মানসিক বিদ্রোহই বিধাতার অভিপ্রেত নহে! তিনি ক্ষুদ্র পৃথিবীকে যেরূপ প্রচণ্ড সূর্য্যের প্রবল আকর্ষণ হইতে রক্ষা করিতেছেন, তাহার অন্তরে একটি প্রতিকূল শক্তি নিহিত করিয়া দিয়াছেন, সেই শক্তির বলে সে সূর্য্যের আলোক উত্তাপ ভোগ করিয়াও আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতেছে এবং সূর্য্যের ন্যায় প্রতাপশালী হইবার চেষ্টা না করিয়া আপনার অন্তর্নিহিত স্নেহশক্তি দ্বারা শ্যামলা শস্যশালিনী কোমলা মাতৃরূপিণী হইয়া উঠিয়াছে, বিধাতা বোধ করি সেইরূপ আমাদিগকেও ইংরাজের বৃহৎ আকর্ষণের কবল হইতে রক্ষা করিবার উদ্যোগ করিয়াছেন। বোধ করি তাঁহার অভিপ্রায় এই যে, আমরা ইংরাজি সভ্যতার জ্ঞানালোকে নিজের স্বাতন্ত্র্যকেই সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিব।

তাহার লক্ষণও দেখা যায়। ইংরাজের সহিত সংঘর্ষ আমাদের অন্তরে যে একটি উত্তাপ সঞ্চার করিয়া দিয়াছে তদ্দ্বারা আমাদের মুমূর্ষু

জীবনী শক্তি পুনরায় সচেতন হইয়া উঠিতেছে। আমাদের অন্তরের মধ্যে আমাদের যে সমস্ত বিশেষ ক্ষমতা অন্ধ ও জড়বৎ হইয়া অবস্থান করিতেছিল তাহারা নূতন আলোকে পুনরায় আপনাকে চিনিতে পারিতেছে। স্বাধীন যুক্তি তর্ক বিচারে আমাদের মানসভূমি আমাদের নিকট নবাবিষ্কৃত হইতেছে। দীর্ঘ প্রলয়-রাত্রির অবসানে অরুনোদয়ে যেন আমরা আমাদেরই দেশ আবিষ্কার করিতে বাহির হইয়াছি। স্মৃতিশ্রুতি কাব্য পুরাণ ইতিহাস দর্শনের প্রাচীন গহন অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছি—পুরাতন গুপ্তধনকে নূতন করিয়া লাভ করিবার ইচ্ছা। আমাদের মনে যে একটা ধিক্কারের প্রতিঘাত উপস্থিত হইয়াছে তাহাতেই আমাদিগকে আমাদের নিজের দিকে পুনরায় সবলে নিক্ষেপ করিয়াছে। প্রথম আক্ষেপে আমরা কিছু অন্ধভাবে আমাদের মাটি ধরিয়া পড়িয়াছি—আশা করা যায়, একদিন স্থিরভাবে অক্ষুব্ধচিত্তে ভালমন্দ বিচারের সময় আসিবে এবং এই প্রতিঘাত হইতে যথার্থ গভীর শিক্ষা এবং স্থায়ী উন্নতি লাভ করিতে পারিব।

একপ্রকারের কালী আছে যাহা কাগজের গায়ে কালক্রমে অদৃশ্য হইয়া যায় অবশেষে অগ্নির কাছে কাগজ ধরিলে পুনর্ব্বার রেখায় রেখায় ফুটিয়া উঠে। পৃথিবীর অধিকাংশ সভ্যতা সেই কালীতে লেখা; কালক্রমে লুপ্ত হইয়া যায় আবার শুভ দৈবক্রমে নব সভ্যতার সংস্রবে নবজীবনের উত্তাপে তাহা পুনরায় ফুটিয়া উঠা অসম্ভব বোধ হয় না। আমারা ত সেইরূপ আশা করিয়া আছি। এবং সেই বিপুল আশায় উৎসাহিত হইয়া আমাদের সমুদয় প্রাচীন পুঁথিপত্রগুলি সেই উত্তাপের কাছে আনিয়া ধরিতেছি,—যদি পূর্ব্ব অক্ষর ফুটিয়া উঠে তবেই পৃথিবীতে আমাদের গৌরব রক্ষিত হইতে পারে—নচেৎ বৃদ্ধ ভারতের জরাজীর্ণ দেহ সভ্যতার জ্বলন্ত চিতায় সমর্পণ করিয়া লোকান্তর ও রূপান্তর প্রাপ্তি হওয়াই সদ্গতি।

আমাদের মধ্যে সাধারণের সম্মানভাজন এক সম্প্রদায়ের লোক আছেন তাঁহারা বর্ত্তমান সমস্যার সহজ একটা মীমাংসা করিতে চান। তাঁহাদের ভাবখানা এই:—

ইংরাজের সহিত আমাদের অনেকগুলি বাহ্য অমিল আছে। সেই বাহ্য অমিলই সর্ব্বপ্রথম চক্ষে আঘাত করে এবং তাহা হইতেই বিজাতীয় বিদ্বেষের সূত্রপাত হইয়া থাকে। অতএব বাহ্য অনৈক্যটা যথাসম্ভব দূর করা আবশ্যক। যে সমস্ত আচার ব্যবহার এবং দৃশ্য চিরাভ্যাসক্রমে ইংরাজের সহজে শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে সেইগুলি দেশে প্রবর্ত্তন করা দেশের পক্ষে হিতজনক। বসনভূষণ ভাবভঙ্গী, এমন কি, ভাষাটা পর্য্যন্ত ইংরাজি হইয়া গেলে দুই জাতির মধ্যে মিলনসাধনের একটি প্রধান অন্তরায় চলিয়া যায় এবং আমাদের আত্মসম্মান রক্ষার একটি সহজ উপায় অবলম্বন করা হয়।

আমার বিবেচনায় একথা সম্পূর্ণ শ্রদ্ধেয় নহে। বাহ্য অনৈক্য লোপ করিয়া দেওয়ার একটি মহৎ বিপদ এই যে, অনভিজ্ঞ দর্শকের মনে একটি মিথ্যা আশার সঞ্চার করিয়া দেওয়া হয় এবং সেই আশাটি রক্ষা করিবার জন্য অলক্ষিতভাবে মিথ্যার শরণাপন্ন হইতে হয়। ইংরাজদিগকে জানাইয়া দেওয়া হয় আমরা তোমাদেরই মত, এবং যেখানে অন্যতর কিছু বাহির হইয়া পড়ে সেখানে তাড়াতাড়ি যেনতেন প্রকারে চাপাচুপি দিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করে। আডাম্ এবং ঈভ জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইবার পূর্ব্বে যে সহজ বেশে ভ্রমণ করিতেন তাহা অতি শোভন ও পবিত্র কিন্তু জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইবার পরে যে পর্য্যন্ত না পৃথিবীতে দর্জ্জির দোকান বসিয়াছিল সে পর্য্যন্ত তাহাদের বেশভূষা অশ্লীলতানিবারিণী সভায় নিন্দার্হ হইয়াছিল সন্দেহ নাই। আমাদের ও নব-আবরণে লজ্জা নিবারণ না করিয়া লজ্জা বৃদ্ধি করিবারই সম্ভব। কারণ, সমস্ত দেশটাকে ঢাকিবার মত দর্জ্জির এষ্টাব্লিশ্মেণ্ট এখনো খোলা হয় নাই। ঢাকিতে গিয়া ঢাকা পড়িবে

না এবং তাহার মত বিড়ম্বনা আর কিছুই নাই। যাঁহারা লোভে পড়িয়া সভ্যতাবৃক্ষের এই ফলটি খাইয়া বসিয়াছেন তাঁহাদিগকে বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়া থাকিতে হয়। পাছে ইংরাজ দেখিতে পায় আমরা হাতে করিয়া খাই, পাছে ইংরাজ জানিতে পায় আমরা আসনে চৌকা হইয়া বসি, এজন্য কেবলি তাঁহাদিগকে পর্দ্দা টানিয়া বেড়াইতে হয়। এটিকেট্ শাস্ত্রে একটু ক্রটি হওয়া, ইংরাজি ভাষায় স্বল্প স্খলন হওয়া তাঁহারা পাতকরূপে গণ্য করেন এবং স্বসম্প্রদায়ের পরস্পরের মধ্যে সাহেবি আদর্শের ন্যূনতা দেখিলে লজ্জা ও অবজ্ঞা অনুভব করিয়া থাকেন। ভাবিয়া দেখিলে অনাবরণ অপেক্ষা এই অসম্পূর্ণ আবরণে, এই আবরণের নিষ্ফল চেষ্টাতেই প্রকৃত অশ্লীলতা—ইহাতেই যথার্থ আত্মাবমাননা।

কতকটা পরিমাণে ইংরাজি ছদ্মবেশ ধারণ করিলে বৈসাদৃশ্যটা আরো বেশি জাজ্জ্বল্যমান হইয়া উঠে। তাহার ফলটা বেশ সুশোভন হয় না। সুতরাং রুচিতে দ্বিগুণ আঘাত দেয়। ইংরাজের মনটা অভ্যাসকুহকে নিকটে আকৃষ্ট হওয়াতেই আপনাকে অন্যায় প্রতারিত জ্ঞান করিয়া দ্বিগুণ বেগে প্রতিহত হয়।

নব্য জাপান য়ুরোপীয় সভ্যতায় রীতিমত দীক্ষিত হইয়াছে। তাহার শিক্ষা কেবল বাহ্যশিক্ষা নহে। কলকারখানা শাসনপ্রণালী বিদ্যাবিস্তার সমস্ত সে নিজের হাতে চালাইতেছে। তাহার পটুতা দেখিয়া য়ুরোপ বিস্মিত হয় এবং কোথাও কোন ক্রটি খুঁজিয়া পায় না কিন্তু তথাপি য়ুরোপ আপনার বিদ্যালয়ের এই সর্দ্দার পোড়োটিকে বিলাতী বেশভূষা আচার ব্যবহারের অনুকরণ করিতে দেখিলেই বিমুখ না হইয়া থাকিতে পারে না। জাপান নিজের এই অদ্ভুত কুরুচি, এই হাস্যজনক অসঙ্গতি সম্বন্ধে নিজে একেবারেই অন্ধ। কিন্তু য়ুরোপ এই ছদ্মবেশী আসিয়াবাসীকে দেখিয়া বিপুল শ্রদ্ধাসত্ত্বেও না হাসিয়া থাকিতে পারে না।

আর আমরা কি য়ুরোপের সহিত অন্য সমস্ত বিষয়েই এতটা দূর

একাত্ম হইয়া গিয়াছি যে, বাহ্য অনৈক্য বিলোপ করিয়া দিলে অসঙ্গতি নামক গুরুতর রুচিদোষ ঘটিবে না ?

এই ত গেল একটা কথা। দ্বিতীয় কথা এই যে, এই উপায়ে লাভ চুলায় যাক্, মূলধনেরই ক্ষতি হয়। ইংরাজের সহিত অনৈক্য ত আছেই আবার স্বদেশীয়ের সহিত অনৈক্যের সূচনা হয়। আমি যদি আজ ইংরাজের মত হইয়া ইংরাজের নিকট মান কাড়িতে যাই তবে আমার যে ভ্রাতারা ইংরাজের মত সাজে নাই তাহাদিগকে আত্মীয় বলিয়া পরিচয় দিতে স্বভাবতই কিছু সঙ্কোচ বোধ হয়ই। তাহাদের জন্য লজ্জা অনুভব না করিয়া থাকিবার যো নাই। আমি যে নিজগুণে ঐ সকল মানুষের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র জাতিভুক্ত হইয়াছি এইরূপ পরিচয় দিতে প্রবৃত্তি হয়। ইহার অর্থই এই—জাতীয় সম্মান বিক্রয় করিয়া আত্মসম্মান ক্রয় করা। ইংরাজের কাছে একরকম করিয়া বলা, যে, সাহেব, ঐ বর্ব্বরদের প্রতি যেমন ব্যবহারই কর আমি যখন কতকটা তোমাদের মত চেহারা করিয়া আসিয়াছি তখন মনে বড় আশা আছে, যে, আমাকে তুমি দূর করিয়া দিবে না।

মনে করা যাক্ যে, এইরূপ কাঙালবৃত্তি করিয়া কিছু প্রসাদ পাওয়া যায় কিন্তু ইহাতেই কি আপনার কিম্বা স্বজাতির সম্মান রক্ষা করা হয় ?

কর্ণ যখন অশ্বথামাকে বলেন, যে, তুমি ব্রাহ্মণ, তোমার সহিত কি যুদ্ধ করিব, তখন অশ্বথামা বলিয়াছিলেন আমি ব্রাহ্মণ সেই জন্যই তুমি আমার সহিত যুদ্ধ করিতে পারিবে না ! আচ্ছা, তবে আমার এই পৈতা ছিঁড়িয়া ফেলিলাম।

সাহেব যদি শেক্‌হ্যাণ্ড্ পূর্ব্বক বলে এবং এস্কোয়ার যোজনাপূর্ব্বক লেখে, যে, আচ্ছা, তুমি যখন তোমার জাতীয়ত্ব যথাসম্ভব ঢাকিয়া আসিয়াছ তখন এবারকার মত তোমাকে আমাদের ক্লাবের সভ্য করা গেল, আমাদের হোটেলে স্থান দেওয়া গেল, এমন কি, তুমি দেখা করিলে এক আধবার

তোমার "কল্ রিটার্ন্" করা যাইতেও পারে—তবে কি তৎক্ষণাৎ আপনাকে পরম সম্মানিত জ্ঞান করিয়া পুলকিত হইয়া উঠিব, না বলিব—ইহারই জন্য আমার সম্মান! তবে এ ছদ্মবেশ আমি ছিঁড়িয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলাম! যতক্ষণে না আমার স্বজাতিকে আমি যথার্থ সম্মানযোগ্য করিতে পারিব ততক্ষণ আমি রঙ মাখিয়া এক্সেপ্শন্ সাজিয়া তোমাদের দ্বারে পদার্পণ করিব না।

আমি ত বলি সেই আমাদের একমাত্র ব্রত। সম্মান বঞ্চনা করিয়া লইব না সম্মান আকর্ষণ করিব। নিজের মধ্যে সম্মান অনুভব করিব। সে দিন যখন আসিবে তখন পৃথিবীর যে সভায় ইচ্ছা প্রবেশ করিব—ছদ্মবেশ, ছদ্মনাম, ছদ্মব্যবহার এবং যাচিয়া মান কাঁদিয়া সোহাগের কোন প্রয়োজন থাকিবে না।

উপায়টা সহজ নহে। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি সহজ উপায়ে কোন্ দুঃসাধ্য কাজ হইয়াছে। বড় কঠিন কাজ সেই জন্য অন্য সমস্ত ফেলিয়া তাহারই প্রতি বিশেষ মনোযোগ করিতে হইবে।

কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার আরম্ভে এই পণ করিয়া বসিতে হইবে, যে, যতদিন না সুযোগ্য হইব ততদিন অজ্ঞাতবাস অবলম্বন করিয়া থাকিব।

নির্ম্মাণ হইবার অবস্থায় গোপনের আবশ্যক। বীজ মৃত্তিকার নিম্নে নিহিত থাকে, ভ্রূণ গর্ভের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে রক্ষিত হয়। শিক্ষাবস্থায় বালককে সংসারে অধিক পরিমাণে মিশিতে দিলে সে প্রবীণ সমাজের মধ্যে গণ্য হইবার দুরাশায় প্রবীণদিগের অযথা অনুকরণ করিয়া অকালপক্ব হইয়া যায়। সে মনে করে সে একজন গণ্যমান্য লোক হইয়া গিয়াছে। তাহার আর রীতিমত শিক্ষার প্রয়োজন নাই—বিনয় তাহার পক্ষে বাহুল্য।

পাণ্ডবেরা পূর্ব্বগৌরব গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে পূর্ব্বে অজ্ঞাতবাসে

থাকিয়া বল সঞ্চয় করিয়াছিলেন। সংসারে উদ্যোগপর্ব্বের পূর্ব্বে অজ্ঞাতবাসের পর্ব্ব।

আমাদেরও এখন আত্মনির্ম্মাণ জাতিনির্ম্মাণের অবস্থা, এখন আমাদের অজ্ঞাতবাসের সময়।

কিন্তু এমনি আমাদের দুর্ভাগ্য আমরা বড়ই বেশি প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছি। আমরা নিতান্ত অপরিপক্ক অবস্থাতেই অধীরভাবে ডিম্ব ভাঙিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছি, এখন প্রতিকূল সংসারের মধ্যে এই দুর্ব্বল অপরিণত শরীরের পুষ্টিসাধন বড় কঠিন হইয়া পড়িয়াছে।

আমরা আজ পৃথিবীর রণভূমিতে কি অস্ত্র লইয়া আসিয়া দাঁড়াইলাম? কেবল বক্তৃতা এবং আবেদন? কি চর্ম্ম পরিয়া আত্মরক্ষা করিতে চাহিতেছি? কেবল ছদ্মবেশ? এমন করিয়া কতদিনই বা কাজ চলে এবং কতটুকুই বা ফল হয়?

একবার নিজেদের মধ্যে অকপটচিত্তে সরলভাবে স্বীকার করিতে দোষ কি, যে, এখনও আমাদের চরিত্রবল জন্মে নাই? আমরা দলাদলি ঈর্ষা ক্ষুদ্রতায় জীর্ণ। আমরা একত্র হইতে পারি না, পরস্পরকে বিশ্বাস করি না, আপনাদের মধ্যে কাহারও নেতৃত্ব স্বীকার করিতে চাহি না। আমাদের বৃহৎ অনুষ্ঠানগুলি বৃহৎ বুদ্বুদের মত ফুটিয়া যায়; আরম্ভে ব্যাপারটা খুব তেজের সহিত উদ্ভিন্ন হইয়া উঠে দুইদিন পরেই সেটা প্রথমে বিচ্ছিন্ন, পরে বিকৃত, পরে নির্জ্জীব হইয়া যায়। যতক্ষণ না যথার্থ ত্যাগস্বীকারের সময় আসে ততক্ষণ আমরা ক্রীড়াসক্ত বালকের মত একটা উদ্যোগ লইয়া উন্মত্ত হইয়া থাকি, তার পরে কিঞ্চিৎ ত্যাগের সময় উপস্থিত হইলেই আমরা নানান্ ছুতায় স্ব স্ব গৃহে সরিয়া পড়ি। আত্মাভিমান কোন কারণে তিলমাত্র ক্ষুণ্ণ হইলে উদ্দেশ্যের মহত্ত্বসম্বন্ধে আমাদের আর কোন জ্ঞান থাকে না। যেমন করিয়া হৌক্ কাজ আরম্ভ হইতে না হইতেই তপ্ত তপ্ত নামটা চাই। বিজ্ঞাপন, রিপোর্ট,

ধুমধাম এবং খ্যাতিটা যথেষ্ট পরিমাণে হইলেই আমাদের এমনি পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তি বোধ হয় যে, তাহার পরেই প্রকৃতিটা নিদ্রালস হইয়া আসে ; ধৈর্য্যসাধ্য শ্রমসাধ্য নিষ্ঠাসাধ্য কাজে হাত দিতে আর তেমন গা লাগে না।

এই দুর্ব্বল অপরিণত শতজীর্ণ চরিত্রটা লইয়া আমরা কি সাহসে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি তাহাই বিস্ময় এবং ভাবনার বিষয়।

এরূপ অবস্থায় অসম্পূর্ণতা সংশোধন না করিয়া অসম্পূর্ণতা গোপন করিতেই ইচ্ছা যায়। একটা কোন আত্মদোষের সমালোচনা করিতে গেলেই সকলে মিলিয়া মুখ চাপিয়া ধরে, বলে, আরে চুপ চুপ, ইংরাজেরা শুনিতে পাইবে—তাহারা কি মনে করিবে ?

আবার আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে ইংরাজও অনেকগুলি বিষয়ে কিছু স্থূল দৃষ্টি। ভারতবর্ষীয়ের মধ্যে যে বিশেষ গুণগুলি আছে এবং যেগুলি বিশেষ সমাদরের যোগ্য তাহা তাহারা তলাইয়া গ্রহণ করিতে পারে না ; অবজ্ঞা-ভরেই হোক্ বা যে কারণেই হোক্ তাহারা বিদেশী আবরণ ভেদ করিতে পারে না বা চাহে না। তাহার একটা দৃষ্টান্ত দেখ—বিদেশে থাকিয়া জর্ম্মান্ যেমন একাগ্রতার সহিত আমাদের সংস্কৃত শাস্ত্রের অনুশীলন করিয়াছে স্বক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া ইংরাজ তেমন করে নাই। ইংরাজ ভারতবর্ষে জীবনযাপন করে এবং দেশটাকে সম্পূর্ণই দখল করিয়াছে কিন্তু দেশী ভাষাটা দখল করিতে পারে নাই।

অতএব ইংরাজ ভারতবর্ষীয়কে ঠিক্ ভারতবর্ষীয়ভাবে বুঝিতে এবং শ্রদ্ধা করিতে অক্ষম। এইজন্য আমরা অগত্যা ইংরাজকে ইংরাজী ভাবেই মুগ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছি। মনে যাহা জানি মুখে তাহা বলি না, কাজে যাহা করি কাগজে তাহা বাড়াইয়া লিখি। জানি, যে, ইংরাজ পীপ্‌ল্ নামক একটা পদার্থকে জুজুর মত দেখে, আমরাও সেইজন্য কোনমতে পাঁচজনকে জড় করিয়া পীপ্‌ল্ সাজিয়া গলা গম্ভীর করিয়া ইংরাজকে ভয় দেখাই। পরস্পরকে বলি, কি করিব ভাই, এমন না

করিলে উহারা যদি কোন কথায় কর্ণপাত না করে তবে কি করা যায়! উহারা কেবল নিজের দস্তুরটাই বোঝে।

এইরূপে ইংরাজের স্বভাবগুণেই আমাদিগকে ইংরাজের মত ভাণ করিয়া আড়ম্বর করিয়া তাহাদের নিকট সম্মান এবং কাজ আদায় করিতে হয়। কিন্তু তবু আমি বলি, সর্ব্বাপেক্ষা ভাল কথা এই যে, আমরা সাজিতে পারিব না। না সাজিলে কর্ত্তারা যদি আমাদিগকে একটুখানি অধিকার বা আধ্‌টুকরা অনুগ্রহ না দেন ত নাই দিলেন!

কর্ত্তৃপক্ষের প্রতি অভিমান করিয়া যে এ কথা বলা হইতেছে তাহা নহে। মনে বড় ভয় আছে। আমরা মৃৎপাত্র, ঐ কাংস্যপাত্রের সহিত বিবাদ চুলায় যাউক্ আত্মীয়তাপূর্ব্বক শেক্‌হাণ্ড্ করিতে গেলেও আশঙ্কার সম্ভাবনা জন্মে।

কারণ, এত অনৈক্যের সংঘাতে আত্মরক্ষা করা বড় কঠিন। আমরা দুর্ব্বল বলিয়াই ভয় হয় যে, সাহেবের কাছে যদি একবার ঘেঁসি, সাহেব যদি অনুগ্রহ করিয়া আমার প্রতি কিছু সুপ্রসন্ন হাস্য বর্ষণ করে তাহার প্রলোভন আমার কাছে বড় বেশি—এত বেশি, যে, সে অনুগ্রহের তুলনায় আমাদের যথার্থ হিত আমরা ভুলিয়া যাইতে পারি। সাহেব যদি হাসিয়া বলিয়া বসে, বাঃ বাবু, তুমি ত ইংরাজি মন্দ বল না; তাহার পর হইতে বাংলার চর্চ্চা করা আমার পক্ষে বড়ই কঠিন হইয়া উঠে। যে বাহিরাংশে ইংরাজের অনুগ্রহ-দৃষ্টি পড়ে সেই অংশেরই চাকচিক্য সাধনে প্রবৃত্তি হয়, যে দিকটা য়ুরোপের চক্ষুগোচর হইবার সম্ভাবনা নাই সে দিকটা অন্ধকারে, অনাদরে আবর্জ্জনায় আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। সে দিকের কোনরূপ সংশোধনে হাত দিতে আলস্য বোধ হয়।

মানুষকে দোষ দিতে পারি না; অকিঞ্চন অপমানিতের পক্ষে এ প্রলোভন বড় স্বাভাবিক। সৌভাগ্যবানের প্রসন্নতায় তাহাকে বিচলিত না করিয়া থাকিতে পারে না।

আজ আমি বলিতেছি, ভারতবর্ষের দীনতম মলিনতম কৃষককেও আমি ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করিব আর ঐ যে রাঙা সাহেব টম্‌টম্ হাঁকাইয়া আমার সর্ব্বাঙ্গে কাদা ছিটাইয়া চলিয়া যাইতেছে উহার সহিত আমার কাণাকড়ির সম্পর্ক নাই।

ঠিক এমন সময়টিতে যদি উক্ত রাঙা সাহেব হঠাৎ টম্‌টম্ থামাইয়া আমারই দরিদ্র কুটীরে পদার্পণ করিয়া বলে—"বাবু তোমার কাছে দেশালাই আছে?" তখন ইচ্ছা করে দেশের পঞ্চবিংশতি কোটি লোক সারি সারি কাতার দিয়া দাঁড়াইয়া দেখিয়া যায় যে, সাহেব আজ আমারই বাড়িতে দেশালাই চাহিতে আসিয়াছে। এবং দৈবাত ঠিক সেই সময়টিতে যদি আমার দীনতম মলিনতম কৃষক ভাইটি মা ঠাকরুণকে প্রণাম করিবার জন্য আমার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হয় তখন সেই কুৎসিৎ দৃশ্যটিকে ধরণীতলে বিলুপ্ত করিয়া দিতে ইচ্ছা করে; পাছে সেই বর্ব্বরের সহিত আমার কোন যোগ কোন সংস্রব কোন সুদূর ঐক্য বড় সাহেবের কল্পনা-পথে উদিত হয়!

অতএব, যখন মনে মনে বলি সাহেবের কাছে আর ঘেঁসিব না তখন অহঙ্কারের সহিত বলি না, বড় বিনয়ের সহিত বড় আশঙ্কার সহিত বলি। জানি যে, সেই সৌভাগ্যগর্ব্বেই আমার সর্ব্বাপেক্ষা সর্ব্বনাশ হইবে—আমি আর নিভৃতে বসিয়া আপনার কর্ত্তব্যপালন করিতে পারিব না, মনটা সর্ব্বদাই উড়ু উড়ু করিতে থাকিবে এবং আপনাদের দরিদ্র স্বজনের খ্যাতিহীন গৃহটাকে বড়ই বেশি শূন্য বলিয়া বোধ হইবে। যাহাদের জন্য জীবন উৎসর্গ করা আমার কর্ত্তব্য তাহাদের সহিত নিকট-আত্মীয়ের মত ব্যবহার করিতে আমার লজ্জা বোধ হইবে।

ইংরাজ তাহাদের আমোদ-প্রমোদ আহার-বিহার আসঙ্গ-প্রসঙ্গ বন্ধুত্ব প্রণয় হইতে আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে বহিষ্কৃত করিয়া দ্বার রুদ্ধ রাখিতে চাহে তবু আমরা নত হইয়া প্রণত হইয়া ছল করিয়া কল করিয়া একটুখানি

প্রবেশাধিকার পাইলে, রাজসমাজের একটু ঘ্রাণমাত্র পাইলে, এত কৃতার্থ হই যে, আপনার দেশের লোকের আত্মীয়তা সে গৌরবের নিকট তুচ্ছ বোধ হয়, এমন স্থলে, এমন দুর্ব্বল মানসিক অবস্থায় সেই সর্ব্বনাশী অনুগ্রহমদ্যকে অপেয়মস্পর্শং বলিয়া সর্ব্বথা পরিহার করাই কর্ত্তব্য।

আরও একটা কারণ আছে। ইংরাজের অনুগ্রহকে কেবল গৌরব মনে করিয়া কেবল নিস্বার্থভাবে ভোগ করাও আমাদের পক্ষে কঠিন। কারণ আমরা দরিদ্র, এবং জঠরানল কেবল সম্মানবর্ষণে শান্ত হয় না। আমরা অনুগ্রহটিকে সুবিধায় ভাঙাইয়া লইতে চাহি। কেবল অনুগ্রহ নহে সেই সঙ্গে কিছু অন্নেরও প্রত্যাশা রাখি। কেবল শেক্‌হ্যাণ্ড্ নহে চাকরিটা বেতনবৃদ্ধিটাও আবশ্যক। প্রথম দুই দিন যদি সাহেবের কাছে বন্ধুর মত আনাগোনা করি ত তৃতীয় দিনে ভিক্ষুকের মত হাত পাতিতে লজ্জা বোধ করি না। সুতরাং সম্বন্ধটা বড়ই হীন হইয়া পড়ে। এদিকে অভিমান করি, যে, ইংরাজ আমাদিগকে সমকক্ষ ভাবের সম্মান দেয় না ওদিকে তাহাদের দ্বারস্থ হইয়া ভিক্ষা করিতেও ছাড়ি না।

ইংরাজ আমাদের দেশী সাক্ষাৎকারীকে উমেদার, অনুগ্রহপ্রার্থী অথবা টাইটেল্‌-প্রত্যাশী না মনে করিয়া থাকিতে পারে না। কারণ, ইংরাজের সঙ্গে ত আমাদের দেখাশুনার কোন সম্বন্ধই নাই। তাহাদের ঘরের দ্বার রুদ্ধ, আমাদের কপাটে তালা। তবে আজ হঠাৎ ঐ যে লোকটা পাগড়ি চাপকান পরিয়া শঙ্কিত গমনে আসিতেছে, অপ্রস্তুত অভদ্রের মত অনভ্যস্ত অশোভন ভাবে সেলাম করিতেছে, কোথায় বসিবে ভাবিয়া পাইতেছে না এবং থত মত খাইয়া কথা কহিতেছে উহার সহসা এত বিরহবেদনা কোথা হইতে উৎপন্ন হইল যে, দ্বারীকে কিঞ্চিৎ পারিতোষিক দিয়াও সাহেবের মুখচন্দ্রমা দেখিতে আসিয়াছে ?

যাহার অবস্থা হীন সে যেন বিনা আমন্ত্রণে বিনা আদরে সৌভাগ্যশালীর সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতে না যায়—তাহাতে কোন পক্ষেরই মঙ্গল হয় না।

ইংরাজ এদেশে আসিয়া ক্রমশই নূতন মূর্ত্তি ধারণ করিতে থাকে তাহার অনেকটা কি আমাদেরই হীনতাবশতঃ নহে? সেই জন্যও বলি, অবস্থা যখন এতই মন্দ তখন আমাদের সংস্রব সংঘর্ষ হইতে ইংরাজকে রক্ষা করিলে উহাদেরও চরিত্রের এমন দ্রুত বিকৃতি হইবে না। সে উভয় পক্ষেরই লাভ।

অতএব সকল দিক পর্য্যালোচনা করিয়া রাজাপ্রজার বিদ্বেষভাব শমিত রাখিবার প্রকৃষ্ট উপায় এই দেখা যাইতেছে ইংরাজ হইতে দূরে থাকিয়া আমাদের নিকট-কর্ত্তব্য সকল পালনে একান্তমনে নিযুক্ত হওয়া। কেবলমাত্র ভিক্ষা করিয়া কখনই আমাদের মনের যথার্থ সন্তোষ হইবে না। আজ আমরা মনে করিতেছি ইংরাজের নিকট হইতে কতকগুলি অধিকার পাইলেই আমাদের সকল দুঃখ দূর হইবে। ভিক্ষাস্বরূপে সমস্ত অধিকারগুলি যখন পাইব তখনো দেখিব অন্তর হইতে লাঞ্ছনা কিছুতেই দূর হইতেছে না—বরং যতদিন না পাইয়াছি ততদিন যে সান্ত্বনাটুকু ছিল সে সান্ত্বনাও আর থাকিবে না। আমাদের অন্তরের শূন্যতা না পূরাইতে পারিলে কিছুতেই আমাদের শান্তি নাই। আমাদের স্বভাবকে সমস্ত ক্ষুদ্রতার বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে পারিলে তবেই আমাদের যথার্থ দৈন্য দূর হইবে এবং তখন আমরা তেজের সহিত সম্মানের সহিত রাজসাক্ষাতে যাতায়াত করিতে পারিব।

আমি এমন বাতুল নহি যে, আশা করিব সমস্ত ভারতবর্ষ পদচিন্তা, প্রভাবচিন্তা, ইংরাজের প্রসাদচিন্তা ত্যাগ করিয়া, বাহ্য আস্ফালন বাহ্য যশখ্যাতি পরিহার করিয়া, ইংরাজ আকর্ষণের প্রবল মোহ হইতে আপনাকে রক্ষা করিয়া, নিবিষ্টমনে অবিচলিতচিত্তে চরিত্রবল সঞ্চয় করিবে, জ্ঞান বিজ্ঞান অর্জ্জন করিবে, স্বাধীন বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইবে, পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া লোকব্যবহার শিক্ষা করিবে, পরিবার ও সমাজের মধ্যে সত্যাচরণ সত্যানুষ্ঠান প্রচার করিবে, মানুষ যেমন আপন মস্তক সহজে বহন করে

তেমনি অনায়াসে স্বভাবতই আপনার সম্মান ঊর্দ্ধে বহন করিয়া রাখিবে, লালায়িত লোলজিহ্বায় পরের কাছে মান যাচ্ঞা করিতে যাইবে না। এবং ধর্ম্মোরক্ষতি রক্ষিতঃ এই কথাটির সুগভীর তাৎপর্য্য সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিবে। এ কথা সুবিদিত যে, সুবিধার ঢাল্ যে দিকে, মানুষ অলক্ষিতে ধীরে ধীরে সেই দিকে গড়াইয়া যায়; যদি হ্যাট্‌কোট পরিয়া ইংরাজি ভাষা অবলম্বন করিয়া, ইংরাজের দ্বারস্থ হইয়া, ইংরাজিতে নিজেকে বড় বড় অক্ষরে তর্জ্জমা করিয়া কোন সুবিধা থাকে তবে অল্পে অল্পে লোকে হ্যাট্‌কোট ধরিবে, সন্তানদিগকে বহুচেষ্টায় বাংলা ভুলিতে দিবে এবং নিজের পিতা ভ্রাতার অপেক্ষা সাহেবের দ্বারবান্ মহলে বেশী আত্মীয়তা স্থাপন করিবে। এ প্রবাহ রোধ করা দুঃসাধ্য। তবু মনের আক্ষেপ স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিয়া বলা আবশ্যক। যদি অরণ্যে রোদনও হয় তবু বলিতে হইবে, যে, ইংরাজি ফলাইয়া কোন ফল নাই, স্বভাষায় শিক্ষার মূলভিত্তি স্থাপন করিয়াই দেশের স্থায়ী উন্নতি; ইংরাজের কাছে আদর কুড়াইয়া কোন ফল নাই, আপনাদের মনুষ্যত্বকে সচেতন করিয়া তোলাতেই যথার্থ গৌরব; অন্যের নিকট হইতে ফাঁকি দিয়া আদায় করিয়া কিছু পাওয়া যায় না, প্রাণপণ নিষ্ঠার সহিত ত্যাগস্বীকারেই প্রকৃত কার্য্য-সিদ্ধি।

শিখদিগের শেষগুরু গুরুগোবিন্দ যেমন বহুকাল জনহীন দুর্গম স্থানে বাস করিয়া নানা জাতির নানাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া সুদীর্ঘ অবসর লইয়া আত্মোন্নতি সাধন পূর্ব্বক তাহার পর নির্জ্জন হইতে বাহির হইয়া আসিয়া আপনার গুরুপদ গ্রহণ করিয়াছিলেন তেমনি আমাদের যিনি গুরু হইবেন তাঁহাকেও খ্যাতিহীন নিভৃত আশ্রমে অজ্ঞাতবাস যাপন করিতে হইবে, পরম ধৈর্য্যের সহিত গভীর চিন্তায় নানা দেশের জ্ঞান বিজ্ঞানে আপনাকে গড়িয়া তুলিতে হইবে, সমস্ত দেশ অনিবার্য্য বেগে অন্ধভাবে যে আকর্ষণে ধাবিত হইয়া চলিয়াছে সেই আকর্ষণ হইতে বহুযত্নে আপনাকে দূরে রক্ষা করিয়া

পরিষ্কার সুস্পষ্টরূপে হিতাহিত জ্ঞানকে অর্জ্জন ও মার্জ্জন করিতে হইবে—তাহার পরে তিনি বাহির হইয়া আসিয়া যখন আমাদের চিরপরিচিত ভাষায় আমাদিগকে আহ্বান করিবেন আদেশ করিবেন, তখন আর কিছু না হৌক সহসা চৈতন্য হইবে এতদিন আমাদের একটা ভ্রম হইয়াছিল, আমরা একটা স্বপ্নের বশবর্ত্তী হইয়া চোখ বুজিয়া সঙ্কটের পথে চলিতেছিলাম, সেইটাই পতনের উপত্যকা।

আমাদের সেই গুরুদেব আজিকার দিনের এই উদ্‌ভ্রান্ত কোলাহলের মধ্যে নাই; তিনি মান চাহিতেছেন না, পদ চাহিতেছেন না, ইংরাজি কাগজের রিপোর্ট চাহিতেছেন না, তিনি সমস্ত মত্ততা হইতে মূঢ় জনস্রোতের আবর্ত্ত হইতে আপনাকে সযত্নে রক্ষা করিতেছেন; কোন একটি বিশেষ আইন সংশোধন বা বিশেষ সভায় স্থান পাইয়া আমাদের দেশের কোন যথার্থ দুর্গতি দূর হইবে আশা করিতেছেন না। তিনি নিভৃতে শিক্ষা করিতেছেন এবং একান্তে চিন্তা করিতেছেন; আপনার জীবনকে মহোচ্চ আদর্শে অটল উন্নত করিয়া তুলিয়া চারিদিকের জনমণ্ডলীকে অলক্ষ্যে আকর্ষণ করিতেছেন। তিনি চতুর্দ্দিককে যেন উদার বিশ্বগ্রাহী হৃদয় দিয়া নীরবে শোষণ করিয়া লইতেছেন; এবং বঙ্গলক্ষ্মী তাঁহার প্রতি স্নেহদৃষ্টিপাত করিয়া দেবতার নিকট একান্তমনে প্রার্থনা করিতেছেন যেন এখনকার দিনের মিথ্যা তর্ক ও বাঁধি কথার তাঁহাকে কখনও লক্ষ্যভ্রষ্ট না করে এবং দেশের লোকের বিশ্বাসহীন নিষ্ঠাহীনতায়, উদ্দেশ্য সাধন অসাধ্য বলিয়া তাঁহাকে নিরুৎসাহ করিয়া না দেয়। অসাধ্য বটে, কিন্তু এদেশের যিনি উন্নতি করিবেন অসাধ্য সাধনই তাঁহার ব্রত।

১৩০০

———

রাজনীতির দ্বিধা

সাধারণতঃ ন্যায়পরতা দয়া প্রভৃতি অনেক বড় বড় গুণ আপন সমকক্ষ লোকদের মধ্যে যতটা স্ফূর্ত্তি পায় অসমকক্ষ লোকদের মধ্যে ততটা স্ফূর্ত্তি পায় না। এমন অনেক দেখা যায় যাঁহারা আপনার সমশ্রেণীর লোকের মধ্যে গৃহপালিত মৃগশিশুর মত মৃদুস্বভাব তাঁহারই নিম্নশ্রেণীয়দের নিকট ডাঙার বাঘ, জলের কুম্ভীর এবং আকাশের শ্যেনপক্ষী বিশেষ।

য়ুরোপীয় জাতি য়ুরোপে যত সভ্য, যত সদয়, যত ন্যায়পর, বাহিরে ততটা নহে এ পর্য্যন্ত ইহার অনেক প্রমাণ পাওয়া গেছে। যাহারা খৃষ্টানদের নিকট খৃষ্টান অর্থাৎ গালে চড় খাইলে সময়বিশেষে অন্য গালটিও ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হয় তাহারাই স্থানান্তরে গায়ে পড়িয়া অখৃষ্টানের এক গালে চড় মারিয়া তাহাকে অন্য গাল ফিরাইতে বলে এবং অখৃষ্টান যদি দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ উক্ত অনুরোধ পালনে ইতস্ততঃ করে তবে তৎক্ষণাৎ তাহাকে কান ধরিয়া ঘরের বাহির করিয়া দিয়া তাহার ঘরের মধ্যে নিজের চৌকি টেবিল ও ক্যাম্পখাট আনিয়া হাজির করে, তাহার শস্যক্ষেত্র হইতে শস্য কাটিয়া লয়, তাহার স্বর্ণখণি হইতে স্বর্ণ উত্তোলন করে, তাহার গাভীগুলা হইতে দুগ্ধ দোহন করে এবং তাহার বাছুরগুলা কাটিয়া বাবুর্চ্চিখানায় বোঝাই করিতে থাকে।

সভ্য খৃষ্টান আমেরিকায় কিরূপ প্রলয়ব্যাপার এবং অষ্ট্রেলিয়ায় কিরূপ নিদারুণ লোকসংহার উপস্থিত করিয়াছিল সেই অপেক্ষাকৃত পুরাতন কথা পাড়িবার আবশ্যক দেখি না। দক্ষিণ আফ্রিকায় ম্যাটাবিলি যুদ্ধের বৃত্তান্ত ভাল করিয়া পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেই, অখৃষ্টানের গালে খৃষ্টানী চড় কাহাকে বলে কতকটা বুঝিতে পারা যায়।

সমস্ত সংবাদ পুরাপূরি পাওয়া যায় না, এবং যাহা পাওয়া যায় তাহার

যে সমস্তই সত্য তাহাতেও সন্দেহ আছে, কারণ, যুদ্ধসংবাদের টেলিগ্রাম রচনার ভার উক্ত খৃষ্টানের হাতে। ট্রুথ্ নামক বিখ্যাত ইংরাজি সাপ্তাহিক পত্রে এই যুদ্ধ সম্বন্ধে যে কয়েকটি পত্র ও প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে তাহা পাঠকদিগকে পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

পাঠ করিয়া যে কেহ বিশেষ আশ্বস্ত হইবেন বা আনন্দ লাভ করিবেন এরূপ আশা দিতে পারি না, তবে এইটুকু বুঝিতে পারিবেন সভ্য জাতি যাহাকে আপনার অপেক্ষা অল্প সভ্য জ্ঞান করে তাহার নিকট আপন সভ্যতাকে এবং সেই সঙ্গে সেই অসভ্যটাকে বলিদান দিতে কুণ্ঠিত বোধ করে না। উনিশ শত বৎসরের চিরসঞ্চিত সভ্যনীতি, য়ুরোপীয় আলোকিত নাট্যমঞ্চের বাহিরে অন্ধকার নেপথ্যদেশে ক্ষণপরিহিত ছদ্মবেশের মত খসিয়া পড়ে এবং সেখানে যে আদিম উলঙ্গ মানুষ বাহির হইয়া পড়ে উলঙ্গ ম্যাটাবিলি তাহার অপেক্ষা নিকৃষ্টতর নহে।

কিছু সসঙ্কোচে বলিলাম নিকৃষ্টতর নহে, নির্ভয়ে সত্য বলিতে গেলে অনেকাংশে শ্রেষ্ঠতর। বর্ব্বর লবেঙ্গুলা ইংরাজদের প্রতি ব্যবহারে যে উদারতা এবং উন্নত বীরহৃদয়ের পরিচয় দিয়াছে ইংরাজদের ক্রুর ব্যবহার তাহার নিকট লজ্জায় ম্লান হইয়া রহিয়াছে ইংরাজের পত্রেই তাহা প্রকাশ পাইয়াছে।

কোন ইংরাজ যে সে কথা স্বীকার করে ইহাই অনেকে ইংরাজের গৌরব বলিয়া মনে করিবেন এবং আমিও তাহা করি। কিন্তু আজকাল ইংরাজের মধ্যে অনেকে সেটাকে গৌরব বলিয়া জ্ঞান করে না।

তাহারা মনে করে ধর্ম্মনীতি আজ কাল বড় বেশি সূক্ষ্ম হইয়া আসিতেছে। পদে পদে এত খুঁৎখুৎ করিলে কাজ চলে না। ইংরাজের যখন গৌরবের মধ্যাহ্নকাল ছিল তখন নীতির সূক্ষ্ম গণ্ডিগুলা এক লম্ফে সে উলঙ্ঘন করিতে পারিত। যখন আবশ্যক তখন অন্যায় করিতে হইবে। নর্ম্মাণ দস্যু যখন সমুদ্রে সমুদ্রে দস্যুবৃত্তি করিয়া বেড়াইত তখন তাহারা

সুস্থ সবল ছিল, এখন তাহার যে ইংরাজ বংশধর ভিন্ন জাতির প্রতি জবরদস্তি করিতে কুণ্ঠিত হয় সে দুর্ব্বল রুগ্নপ্রকৃতি। কিসের মাটাবিলি, কেই বা লবেঙ্গুলা, আমি ইংরাজ আমি তোমার সোনার খণি, তোমার গরুর পাল লুঠিতে ইচ্ছা করি ইহার জন্যে এত ছুতা এত ছল কেন, মিথ্যা সংবাদই বা কেন বানাই, আর দুটো একটা দুরন্তপনা ধরা পড়িলেই বা এত উচ্চৈঃস্বরে কাগজে পরিতাপ করিতে বসি কেন!

কিন্তু বালককালে যাহা শোভা পায় বয়সকালে তাহা শোভা পায় না। একটা দুরন্ত লুব্ধ বালক নিজের অপেক্ষা ছোট এবং দুর্ব্বলতর বালকের হাতে মোওয়া দেখিলে কাড়িয়া ছিঁড়িয়া লুটপাট করিয়া লইয়া এক মুহূর্ত্তে মুখের মধ্যে পূরিয়া বসে, হৃতমোদক অসহায় শিশুর ক্রন্দন দেখিয়াও কিছুমাত্র অনুতপ্ত হয় না। এমন কি, হয়ত ঠাস্ করিয়া তাহার গালে একটা চড় বসাইয়া সবলে তাহার ক্রন্দন থামাইয়া দিতে চেষ্টা করে এবং অন্যান্য বালকেরাও মনে মনে তাহার বাহুবল ও দৃঢ় সংকল্পের প্রশংসা করিতে থাকে।

বয়সকালেও সেই বলবানের যদি অসংযত লোভ থাকে তবে সে আর চড় মারিয়া মোওয়া লয় না, ছল করিয়া লয় এবং যদি ধরা পড়ে ত কিছু অপ্রতিভ হয়। তখন সে আর পরিচিত প্রতিবেশীদের ঘরে হাত বাড়াইতে সাহস করে না; দূরে কোন দরিদ্রপল্লীর অসভ্য মাতার উলঙ্গ শীর্ণ সন্তানের হস্তে যখন তাহার এক সন্ধ্যার একমাত্র উপজীব্য খাদ্যখণ্ডটুকু দেখে চারিদিকে চাহিয়া গোপনে ছোঁ মারিয়া লয় এবং যখন তাহার ক্রন্দনে গগনতল বিদীর্ণ হইতে থাকে তখন সমাগত স্বজাতীয় পান্থদের প্রতি চোখ টিপিয়া বলে, এই অসভ্য কালো ছোক্‌রাটাকে আচ্ছা শাসন করিয়া দিয়াছি! কিন্তু স্বীকার করে না যে ক্ষুধা পাইয়াছিল তাই কাড়িয়া খাইয়াছি।

পুরাকালের দস্যুবৃত্তির সহিত এই অধুনাতন কালের চৌর্য্যবৃত্তির

অনেক প্রভেদ আছে। এখনকার অপহরণব্যাপারের মধ্যে পূর্ব্বকালের সেই নির্লজ্জ অসঙ্কোচ বলদর্প থাকিতেই পারে না। এখন নিজের কাজের সম্বন্ধে নিজের চেতনা জন্মিয়াছে সুতরাং এখন প্রত্যেক কাজের জন্য বিচারের দায়িক হইতে হয়। তাহাতে কাজও পূর্ব্বের মত তেমন সহজে সম্পন্ন হয় না এবং গালিও খাইতে হয়। পুরাতন দস্যু যদি দুর্ভাগ্যক্রমে ঊনবিংশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করে তবে তাহার আবির্ভাব নিতান্ত অসাময়িক হইয়া পড়ে।

সমাজে এরূপ অসাময়িক আবির্ভাব সর্ব্বদা ঘটিয়া থাকে। দস্যু বিস্তর জন্মে কিন্তু সহসা তাহাদিগকে চেনা যায় না—অকালে অস্থানে পড়িয়া তাহারা অনেক সময় আপনাদিগকেও চেনে না। এদিকে তাহারা গাড়ি চড়িয়া বেড়ায়, সংবাদপত্র পড়ে, হুইষ্ট্ খেলে, স্ত্রী সমাজে মধুরালাপ করে, কেহ সন্দেহ মাত্র করে না যে, এই শাদা কামিজ কালো কোর্ত্তার মধ্যে রবিন্ হুডের নব অবতার ফিরিয়া বেড়াইতেছে।

য়ুরোপের বাহিরে গিয়া ইহারা সহসা পূর্ণশক্তিতে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। ধর্ম্মনীতির আবরণমুক্ত সেই উৎকট রুদ্রমূর্ত্তির কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু য়ুরোপের সমাজমধ্যেই যে সমস্ত ভস্মাচ্ছাদিত অঙ্গার আছে তাহাদেরও উত্তাপ বড় অল্প নহে।

ইহারাই আজকাল বলিতেছে, বলনীতির সহিত প্রেমনীতিকে যোগ করিলে নীতির নীতিত্ব বাড়িতে পারে কিন্তু বলের বলত্ব কমিয়া যায়। প্রেম দয়া এসব কথা শুনিতে বেশ—কিন্তু যেখানে আমরা রক্তপাত করিয়া আপন প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি সেখানে যে নীতিদুর্ব্বল নব শতাব্দীর সুকুমার হৃদয় শিশু সেন্টিমেণ্টের অশ্রুপাত করিতে আসে তাহাকে আমরা অন্তরের সহিত ঘৃণা করি। এখানে সঙ্গীত সাহিত্য শিল্পকলা এবং শিষ্টাচার, সেখানে উলঙ্গ তরবারী এবং অসঙ্কোচ একাধিপত্য।

এই জন্য আমাদের কর্ত্তৃজাতীয়দের মধ্য হইতে আজকাল দুই সুরের

গলা শুনা যায়। একদল প্রবলতার পক্ষপাতী, আর একদল প্রেম এবং শান্তি এবং সুবিচার জগতে বিস্তার করিতে চাহে।

জাতির হৃদয় এইরূপে বিভক্ত হইয়া গেলে বলের খর্ব্বতা হয়—আপনি আপনাকে বাধা দিতে থাকে। আজকাল ভারতবর্ষীয় ইংরাজ সম্প্রদায় ইহাই লইয়া সুতীব্র আক্ষেপ করে। তাহারা বলে, আমরা কিছু জোরের সহিত যে কাজটা করিতে চাই ইংলণ্ডীয় ভ্রাতারা তাহাতে বাধা দিয়া বসে। সকল কথাতেই নৈতিক কৈফিয়ৎ দিতে হয়। যখন দস্যু ড্রেক্ সমুদ্রদিগ্বিজয় করিয়া বেড়াইত, যখন ক্লাইভ ভারতভূমিতে বৃটিশ ধ্বজা খাড়া করিয়া দাঁড়াইল তখন নীতির কৈফিয়ৎ দিতে হইলে ঘরের বাহিরে ইংরাজের ছেলের এক ছটাক জমি মিলিত না।

কিন্তু এমন করিয়া যতই বিলাপ কর কিছুতেই আর সেই অখণ্ড দোর্দ্দণ্ড বলের বয়সে ফিরিয়া যাইতে পারিবে না। এখন কোন জুলুমের কাজ করিতে বসিলেই সমস্ত দেশ ব্যাপিয়া একটা দ্বিধা উপস্থিত হইবে। এখন যদি কোন নিপীড়িত ব্যক্তি ন্যায়বিচার প্রার্থনা করে তবে স্বার্থহানির সম্ভাবনা থাকিলেও, নিদেন, গুটিকতক লোকও তাহার সদ্বিচার করিতে উদ্যত হইবে। এখন একজন ব্যক্তিও যদি ন্যায়ের দোহাই দিয়া উঠিয়া দাঁড়ায় তবে প্রবল স্বার্থপরতা হয় লজ্জায় কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে, নয়, ন্যায়েরই ছদ্মবেশ ধারণ করিতে চেষ্টা করে। অন্যায় অনীতি যখন বলের সহিত আপনাকে অসঙ্কোচে প্রকাশ করিত তখন বল ব্যতীত তাহার আর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না, কিন্তু যখনি সে আপনাকে আপনি গোপন করিতে চেষ্টা করে এবং বলের সহিত আপন কুটুম্বিতা অস্বীকার করিয়া ন্যায়কে আপন পক্ষে টানিয়া বলী হইতে চায় তখনি সে আপনি আপনার শত্রুতা সাধন করে। এইজন্য বিদেশে ইংরাজ আজকাল কিঞ্চিৎ দুর্ব্বল এবং সেজন্য সে সর্ব্বদা অধৈর্য্য প্রকাশ করে।

আমরাও সেই জন্য ইংরাজের দোষ পাইলে তাহাকে দোষী করিতে

সাহসী হই। সে জন্য ইংরাজ প্রভুরা কিছু রাগ করে। তাহারা বলে, নবাব যখন যথেচ্ছাচারী ছিল, বর্গী যখন লুটপাট করিত, ঠগী যখন গলায় ফাঁসি লাগাইত তখন তোমাদের কন্‌গ্রেসের সভাপতি এবং সংবাদপত্রের সম্পাদক ছিল কোথায়! কোথাও ছিল না এবং থাকিলেও কোন ফল হইত না। তখন গোপন বিদ্রোহী ছিল, মারহাট্টা এবং রাজপুত ছিল, তখন বলের বিরুদ্ধে বল ছাড়া গতি ছিল না। তখন চোরার নিকট ধর্ম্মের কাহিনী উত্থাপন করিবার কথা কাহারো মনেও উদয় হইত না।

আজ যে কন্‌গ্রেস এবং সংবাদপত্রের অভ্যুদয় হইয়াছে তাহার কারণই এই যে, ইংরাজের মধ্যে অখণ্ড বলের প্রাদুর্ভাব নাই। এখন চোরকে ধর্ম্মের কাহিনী বলিলে যদিবা সে না মানে তবু তার একটা ধর্ম্মসঙ্গত জবাব দিতে চেষ্টা করে এবং ভাল জবাবটি দিতে না পারিলে তেমন বলের সহিত কাজ করিতে পারে না। অতএব যে সকল ইংরাজ ভারতবর্ষীয় সভাসমিতি ও সংবাদপত্রের বাহুল্য বিস্তারে আক্ষেপ প্রকাশ করে, তাহারা যথার্থ পক্ষে স্বদেশীয়দের জাতীয় প্রকৃতিতে ধর্ম্মবুদ্ধির অস্তিত্ব লইয়া দুঃখ করে। তাহারা যে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারা যে নিজের ত্রুটির জন্য নিজে লজ্জিত হইতে শিখিয়াছে ইহাই তাহাদের নিকট শোচনীয় বলিয়া বোধ হয়।

এক হিসাবে ইহার মধ্যে কতকটা শোচনীয়তা আছে। এদিকে ক্ষুধার জ্বালাও নিবারণ হয় নি ওদিকে পরের অন্নও কাড়িতে পারিব না এ এক বিষম সঙ্কট! জাতির পক্ষে নিজের জীবন রক্ষা এবং ধর্ম্ম রক্ষা উভয়ই পরমাবশ্যক। পরের প্রতি অন্যায়াচরণ করিলে যে পরের ক্ষতি হয় তাহা নহে নিজেদের ধর্ম্মের আদর্শ ক্রমশঃ ভিত্তিহীন হইয়া পড়ে। দাসদের প্রতি যাহারা অত্যাচার করে তাহারা নিজের চরিত্র ধ্বংস করে। ধর্ম্মকে সর্ব্বপ্রযত্নে বলবান্ না রাখিলে আপনাদের মধ্যে জাতীয় বন্ধন ক্রমশঃ শিথিল হইয়া পড়িতে থাকে। অপর পক্ষে, পেট ভরিয়া খাইতেও

হইবে। ক্রমে বংশবৃদ্ধি ও স্থানাভাব হইতেছে এবং সভ্যতার উন্নতি সহকারে জীবনের আবশ্যক উপকরণ অতিরিক্ত বাড়িয়া চলিয়াছে।

অতএব পঁচিশ কোটি ভারতবাসীর অদৃষ্টে যাহাই থাক্ মোটা-বেতনের ইংরাজ কর্ম্মচারীকে এক্স্‌চেঞ্জের ক্ষতিপূরণস্বরূপ রাশি রাশি টাকা ধরিয়া দিতে হইবে। সেই জন্য রাজকোষে যদি টাকার অনটন পড়ে তবে পণ্যদ্রব্যে মাশুল বসান আবশ্যক হইবে। কিন্তু তাহাতে যদি ল্যাঙ্কাশিয়ারের কিঞ্চিৎ অসুবিধা হয় তবে তুলার উপর মাশুল বসান যাইতে পারে। তৎপরিবর্ত্তে বরঞ্চ পব্‌লিক ওয়ার্কস্ কিছু খাট করিয়া এবং দুর্ভিক্ষফণ্ড বাজেয়াপ্ত করিয়া কাজ চালাইয়া লইতে হইবে।

একদিকে ইংরাজ কর্ম্মচারীদিগেরও কষ্ট চক্ষে দেখা যায় না, অপর দিকে ল্যাঙ্কাশিয়রের ক্ষতিও প্রাণে সহ্য হয় না। এদিকে আবার পঞ্চবিংশতিকোটি হতভাগ্যের জন্য যে কিছুমাত্র দুঃখ হয় না তাহাও নহে। ধর্ম্মনীতি এমন সঙ্কটেও ফেলে!

অমনি খবরের কাগজে ঢাক বাজিয়া যায়, আহতনীড় পক্ষীসমাজের ন্যায় সভাস্থলে কর্ণবধির কলকলধ্বনি উত্থিত হয়, ইংরাজ ভারি চটিয়া উঠে।

যখন কাজটা ন্যায়সঙ্গত হইতেছে না বলিয়া মন বলিতেছে অথচ না করিয়াও এড়াইবার জো নাই সেই সময়ে ধর্ম্মের দোহাই পাড়িতে থাকিলে বিষম রাগ হয়। তখন রিক্তহস্তে কোন যুক্তি-অস্ত্র না থাকাতে একেবারে ঘুষি মারিতে ইচ্ছা করে। কেবল মানুষটা নহে ধর্ম্মশাস্ত্রটার উপরেও দিক্ ধরিয়া যায়।

ভারত মন্ত্রীসভার সভাপতি এবং অনেক মাতব্বর সভ্য ভাবেগতিকে বলিয়াছেন যে, কেবল ভারতবর্ষের নহে সমস্ত ইংরাজ রাজ্যের মুখ চাহিয়া যখন আইন করিতে হইবে তখন কেবল স্থানীয় ন্যায় অন্যায় বিচার করিলে চলিবে না এবং করিলে তাহা টিঁকিবেও না। ল্যাঙ্কাশিয়র স্বপ্ন নহে।

ভারতবর্ষের দুঃখ যেমন সত্য ল্যাঙ্কাশিয়রের লাভও তেম্‌নি সত্য, বরঞ্চ শেষোক্তটার বল কিছু বেশি! আমি যেন ভারত মন্ত্রী-সভায় ল্যাঙ্কাশিয়রকে ছাড়িয়া দিয়াই একটা আইন পাশ করিয়া দিলাম, কিন্তু ল্যাঙ্কাশিয়র আমাকে ছাড়িবে কেন? কম্‌লি নেহি ছোড়্‌তা—বিশেষতঃ কম্‌লির গায়ে খুব জোর আছে।

চতুর্দ্দিকের অবস্থাকে উপেক্ষা করিয়া তাড়াতাড়ি একটা আইন পাশ করিয়া শেষকালে আবার দায়ে পড়িয়া তাহা হইতে পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেও মান থাকে না, এদিকে আবার কৈফিয়ৎও তেমন সুবিধামত নাই। নবাবের মত বলিতে পারি না যে, আমার যে অভাব হইবে আমার যেমন ইচ্ছা তাহা পূরণ করিব, ওদিকে ন্যায়বুদ্ধিতে যাহা বলে তাহা সম্পন্ন করিবারও অলংঘ্য বিঘ্ন—অথচ এই সঙ্কটের অবস্থাটাও সাধারণের কাছে প্রকাশ করিতে লজ্জা বোধ হয়, ইহা বাস্তবিকই শোচনীয় বটে!

এইরূপ সময়টায় আমরা দেশী সভা এবং দেশী কাগজপত্রে যখন গোলমাল করিতে আরম্ভ করিয়া দিই তখন সাহেবেরা মাঝে মাঝে আমাদিগকে শাসায় এবং গবর্ণমেণ্ট যদিবা আমাদের গায়ে হাত তুলিতে সঙ্কোচ বোধ করে, ছোট ছোট কর্ত্তারা কোন সুযোগে একবার আমাদিগকে হাতে পাইলে ছাড়িতে চায় না এবং ভারতবর্ষীয় ইংরাজের বড় বড় খবরের কাগজগুলো শৃঙ্খলবদ্ধ কুক্কুরের মত দাঁত বাহির করিয়া আমাদের প্রতি অবিশ্রাম তারস্বর প্রয়োগ করিতে থাকে। ভাল, যেন আমরাই চুপ করিলাম কিন্তু তোমাদের আপনাদিগকে থামাও দেখি? তোমাদের মধ্যে যাঁহারা স্বার্থকে উপেক্ষা করিয়া ধর্ম্মের পতাকা ধরিয়া দণ্ডায়মান হন, তাঁহাদিগকে নির্ব্বাসিত কর, তোমাদের জাতীয় প্রকৃতিতে যে ন্যায়পরতার আদর্শ আছে তাহাকে পরিহাস করিয়া ম্লান করিয়া দাও।

কিন্তু সে কিছুতেই হইবে না। তোমাদের রাজনীতির মধ্যে ধর্ম্মবুদ্ধি একটা সত্য পদার্থ। কখনো বা তাহার জয় হয় কখনো বা তাহার

পরাজয় হয় কিন্তু তাহাকে বাদ দিয়া চলিতে পারে না। আয়র্লণ্ড্ যখন ব্রিটানিয়ার নিকট কোন অধিকার প্রার্থনা করে তখন সে যেমন একদিকে খুনের ছুরিতে শান দিতে থাকে তেমনি অন্যদিকে ইংলণ্ডের ধর্ম্মবুদ্ধিকে আপন দলে লইতে চেষ্টা করে। ভারতবর্ষ যখন বিদেশী স্বামীর দ্বারে আপন দুঃখ নিবেদন করিতে সাহসী হয় তখন সেও ইংরাজের ধর্ম্মবুদ্ধিকে আপন সহায় করিবার জন্য ব্যগ্র হয়। মাঝে হইতে ইংরাজের রাজকার্য্যে লাঠা বিস্তর বাড়িয়া যায়।

কিন্তু যত দিন ইংরাজপ্রকৃতির কোথাও এই সচেতন ধর্ম্মবুদ্ধির প্রভাব থাকিবে, যত দিন তাহার নিজের মধ্যেই তাহার নিজের সুকৃতি দুষ্কৃতির একটি বিচারক বর্ত্তমান থাকিবে ততদিন আমাদের সভাসমিতি বাড়িয়া চলিবে, আমাদের সংবাদপত্র ব্যাপ্ত হইতে থাকিবে। ইহাতে আমাদের বলবান ইংরাজগণ নিষ্ফল গাত্রদাহে যতই অধীর হইয়া উঠিবে আমাদের উৎসাহ এবং উদ্যমের আবশ্যকতা ততই আরও বাড়াইয়া তুলিবে মাত্র।

১৩০০

অপমানের প্রতিকার

একদা কোন উচ্চপদস্থ বাঙালী গবর্মেণ্ট কর্ম্মচারীর বাড়িতে কোন কলেজের ইংরাজ অধ্যক্ষ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তখন জুরি-দমন বিল লইয়া দেশে একটা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল।

আহারান্তে নিমন্ত্রিত মহিলাগণ পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে উঠিয়া গেলে প্রসঙ্গক্রমে জুরি-প্রথার কথা উঠিল। ইংরাজ প্রোফেসর কহিলেন, যে দেশের লোক অর্দ্ধসভ্য, অর্দ্ধশিক্ষিত, যাহাদের ধর্ম্মনীতির আদর্শ উন্নত নহে, জুরির অধিকার তাহাদের হস্তে কুফল প্রসব করে।

শুনিয়া এই কথা মনে করিলাম, ইংরাজ, এত অধিক সভ্য হইয়াছে যে, আমাদের সহিত সভ্যতা রক্ষা সে বাহুল্য জ্ঞান করে। আমাদের নৈতিক আদর্শ কত মাত্রা উঠিয়াছে অথবা নামিয়াছে জানি না, কিন্তু ইহা জানি, যাঁহার আতিথ্য ভোগ করিতেছি তাঁহার স্বজাতিকে পরুষ বাক্যে অবমাননা করা আমাদের শিষ্টনীতির আদর্শের অনেক বাহিরে।

অধ্যাপক মহাশয় আর একটি কথা বলিয়াছিলেন, যে কথা কেবল মাত্র অমিষ্ট ও অশিষ্ট নহে পরন্তু ইংরাজের মুখে অত্যন্ত অসঙ্গত শুনিতে হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন, জীবনের পবিত্রতা, অর্থাৎ জীবনের প্রতি হস্তক্ষেপ করার পরম দূষণীয়তা সম্বন্ধে ভারতবাসীর ধারণা ইংরাজের তুলনায় অত্যন্ত স্বল্প পরিমিত। সেই জন্য হত্যাকারীর প্রতি ভারতবর্ষীয় জুরির মনে যথোচিত বিদ্বেষের উদ্রেক হয় না।

যাহারা মাংসাশী জাতি এবং যাহারা বিরাট হত্যাকাণ্ডের দ্বারা পৃথিবীর দুই নবাবিষ্কৃত মহাদেশের মধ্যে আপনাদের বাসযোগ্য স্থান পরিষ্কার করিয়া লইয়াছে, এবং সম্প্রতি তরবারীর দ্বারা তৃতীয় মহাদেশের প্রচ্ছন্ন বক্ষোদেশ অল্পে অল্পে বিদীর্ণ করিয়া তাহার শস্য অংশটুকু সুখে ভক্ষণ করিবার উপক্রম করিতেছে তাহারা যদি নিমন্ত্রণ-সভায় আরামে ও স্পর্দ্ধাভরে নৈতিক আদর্শের উচ্চ দণ্ডে চড়িয়া বসিয়া জীবনের পবিত্রতা ও প্রাণহিংসার অকর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে অহিংসক ভারতবর্ষকে উপদেশ দিতে থাকে তবে অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ এই শাস্ত্রবাক্য স্মরণ করিয়াই সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিতে হয়।

এই ঘটনা আজ বছর দুয়েকের কথা হইবে। সকলেই জানেন তাহার পরে এই দুই বৎসরের মধ্যে ইংরাজ কর্তৃক অনেকগুলি ভারত-বাসীর অপমৃত্যু ঘটিয়াছে এবং ইংরাজের আদালতে সেই সকল হত্যাকাণ্ডে এক জন ইংরাজেরও দোষ সপ্রমাণ হয় নাই। সংবাদপত্রে উপর্য্যুপরি এই সকল সংবাদ পাঠ করা যায় এবং ভারতবর্ষীয়ের প্রতি সেই মুণ্ডিত-

গুম্ফশ্মশ্রু খড়্গনাসা ইংরাজ অধ্যাপকের তীব্র ঘৃণাবাক্য এবং জীবন হনন সম্বন্ধে তাঁহাদের নৈতিক আদর্শের শ্রেষ্ঠত্বাভিমান মনে পড়ে। মনে পড়িয়া তিলমাত্র সান্ত্বনা লাভ হয় না।

ভারতবর্ষীয়ের প্রাণ এবং ইংরাজের প্রাণ ফাঁসিকাষ্ঠের অটল তুলাদণ্ডে এক ওজনে তুলিত হইয়া থাকে ইহা বোধ হয় ইংরাজ মনে মনে রাজ-নৈতিক কুদৃষ্টান্ত স্বরূপে গণ্য করে।

ইংরাজ এমন কথা মনে করিতে পারে, আমরা গুটিকতক প্রবাসী পঁচিশ কোটি বিদেশীকে শাসন করিতেছি। কিসের জোরে? কেবলমাত্র অস্ত্রের জোরে নহে, নামের জোরেও বটে। সেইজন্য সর্ব্বদাই বিদেশীর মনে ধারণা জন্মাইয়া রাখা আবশ্যক আমরা তোমাদের অপেক্ষা পঁচিশ কোটি গুণে শ্রেষ্ঠ। আমরা সমান ক্ষেত্রে আছি এরূপ ধারণার লেশমাত্র জন্মিতে দিলে আমাদের বলক্ষয় হয়। পরস্পরের মধ্যে একটা সুদূর ব্যবধান, অধীন জাতির মনে একটা অনির্দ্দিষ্ট সম্ভ্রম এবং অকারণ ভয় শত সহস্র সৈন্যের কাজ করে। ভারতবর্ষীয় যে, কোন দিন বিচারে নিজের প্রাণের পরিবর্ত্তে ইংরাজকে প্রাণত্যাগ করিতে দেখে নাই, ইহাতে তাহার মনে সেই সম্ভ্রম দৃঢ় হয়—মনে ধারণা হয় আমার প্রাণে ইংরাজের প্রাণে অনেক তফাৎ, অসহ্য অপমান অথবা নিতান্ত আত্মরক্ষার স্থলেও ইংরাজের গায়ে হাত তুলিতে তাহার দ্বিধা হয়।

এই পলিসির কথা স্পষ্টতঃ অথবা অস্পষ্টতঃ ইংরাজের মনে আছে কিনা জোর করিয়া বলা কঠিন—কিন্তু একথা অনেকটা নিশ্চয় অনুমান করা যাইতে পারে যে, স্বজাতীয় প্রাণের পবিত্রতা তাহারা মনে মনে অত্যন্ত অধিক করিয়া উপলব্ধি করেন। একজন ইংরাজ ভারতবর্ষীয়কে হত্যা করিলে নিঃসন্দেহ তাঁহারা দুঃখিত হন—সেটাকে একটা "গ্রেট্ মিস্টেক্," এমন কি, একটা "গ্রেট্‌শেম" মনে করাও তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব—কিন্তু তাই বলিয়া তাহার শাস্তিস্বরূপে য়ুরোপীয়ের প্রাণ হরণ করা

তাঁহারা সমুচিত মনে করিতে পারেন না। তদপেক্ষা লঘু শাস্তি যদি আইনে নির্দ্দিষ্ট থাকিত তবে ভারতবর্ষীয় হত্যাপরাধে ইংরাজের শাস্তি পাইবার সম্ভাবনা অনেক অধিক হইত। যে জাতিকে নিজেদের অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্টতর বলিয়া বিবেচনা করা যায়, সে জাতিসম্বন্ধে আইনের ধারায় অপক্ষপাতের বিধান থাকিলেও বিচারকের অন্তঃকরণে অপক্ষপাত রক্ষিত হওয়া কঠিন হইয়া উঠে। সে স্থলে প্রমাণের সামান্য ত্রুটি, সাক্ষ্যের সামান্য স্খলন এবং আইনের ভাষাগত তিলমাত্র ছিদ্রও স্বভাবতই এত বৃহৎ হইয়া উঠে যে, ইংরাজ অপরাধী অনায়াসে তাহার মধ্যে দিয়া গলিয়া বাহির হইয়া যাইতে পারে।

আমাদের দেশের লোকের পর্য্যবেক্ষণশক্তি এবং ঘটনাস্মৃতি তেমন পরিষ্কার এবং প্রবল নহে; আমাদের স্বভাবের মধ্যে মানসিক শৈথিল্য এবং কল্পনার উচ্ছৃঙ্খলতা আছে এ দোষ স্বীকার করিতেই হয়। একটা ঘটনার মধ্যে উপস্থিত থাকিয়াও তাহার সমস্ত আনুপূর্ব্বিক পরম্পরা আমাদের মনে মুদ্রিত হইয়া যায় না—এইজন্য আমাদের বর্ণনার মধ্যে অসঙ্গতি ও দ্বিধা থাকে—এবং ভয় অথবা তর্কের মুখে পরিচিত সত্য ঘটনারও সূত্র হারাইয়া ফেলি। এইজন্য আমাদের দেশীয় সাক্ষ্যের সত্যমিথ্যা সূক্ষ্মরূপে নির্দ্ধারণ করা বিদেশীয় বিচারকের পক্ষে সর্ব্বদাই কঠিন। তাহার উপরে অভিযুক্ত যখন স্বদেশী তখন কঠিনতা শতসহস্রগুণে বাড়িয়া উঠে। আরও বিশেষতঃ যখন স্বভাবতই ইংরাজের নিকটে স্বল্পাবৃত স্বল্পাহারী স্বল্পমান স্বল্পবল ভারতবাসীর "প্রাণের পবিত্রতা" স্বদেশীয়ের তুলনায় ক্ষুদ্রতম ভগ্নাংশ পরিমিত, তখন ভারতবর্ষের পক্ষে যথোপযুক্ত প্রমাণ সংগ্রহ করা একপ্রকার অসম্ভব হইয়া পড়ে। অতএব একে আমাদের সাক্ষ্য দুর্ব্বল, তাহাতে প্লীহা প্রভৃতি আমাদের শারীরযন্ত্রগুলিরও বিস্তর ত্রুটি আবিষ্কৃত হইয়া থাকে, সুতরাং আমরা সহজে মারাও পড়ি এবং তাহার বিচার পাওয়াও আমাদের দ্বারা দুঃসাধ্য হয়।

লজ্জা এবং দুঃখ সহকারে এ সমস্ত দুর্ব্বলতা আমাদিগকে স্বীকার করিতে হয় কিন্তু সেই সঙ্গে এ সত্যটুকুও প্রকাশ করিয়া বলা উচিত যে, উপর্যুপরি এই সকল ঘটনায় দেশের লোকের চিত্ত নিরতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতেছে। সাধারণ লোকে আইনের এবং প্রমাণের সূক্ষ্মবিচার করিতে পারে না। ভারতবর্ষীয়কে হত্যা করিয়া কোন ইংরাজেরই প্রাণদণ্ড হয় না এই তথ্যটি বারম্বার এবং অল্পকালের মধ্যে ঘন ঘন লক্ষ্য করিয়া তাহাদের মনে ইংরাজের অপক্ষপাত ন্যায়পরতা সম্বন্ধে সুতীব্র সন্দেহের উদয় হয়।

সাধারণ লোকের মূঢ়তার কেন দোষ দিই, গবর্মেণ্ট্ অনুরূপ স্থলে কি করেন? যদি তাঁহারা দেখেন কোন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ অধিকাংশ সংখ্যক আসামীকে খালাস দিতেছেন, তখন তাঁহারা এমন বিবেচনা করেন না যে, সম্ভবতঃ উক্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ অন্য ম্যাজিষ্ট্রেট্ অপেক্ষা অধিকতর ন্যায়পর, এবং তিনি সাক্ষ্যের সত্যমিথ্যা সম্পূর্ণ নিঃসংশয় সূক্ষ্মরূপে নির্ণয় না করিয়া আসামীকে দণ্ড দিতে কুণ্ঠিত, অতএব এই সচেতন ধর্ম্মবুদ্ধি এবং সতর্ক ন্যায়পরতার জন্য সত্বর তাঁহার পদবৃদ্ধি করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য, অথবা যদি দেখিতে পান, যে, কোন পুলিশ কর্ম্মচারীর এলাকায় অপরাধের সংখ্যার তুলনায় অল্পসংখ্যক অপরাধী ধরা পড়িতেছে অথবা চালান আসামী বহুল সংখ্যায় খালাস পাইতেছে তখন তাঁহারা এমন তর্ক করেন না যে, সম্ভবতঃ এই পুলিস কর্ম্মচারী অন্য পুলিস্ কর্ম্মচারী অপেক্ষা সৎপ্রকৃতির—ইনি সাধু লোককে চোর বলিয়া চালান দেন না এবং মিথ্যাসাক্ষ্য স্বহস্তে সৃজন করিয়া অভিযোগের ছিদ্র সকল সংশোধন করিয়া লন না অতএব পুরস্কার স্বরূপে অচিরাৎ ইহার গ্রেড্ বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। আমরা যে দুই আনুমানিক দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিলাম উভয়তই সম্ভবপরতা ন্যায় ও ধর্ম্মের দিকেই অধিক। কিন্তু কাহারও অবিদিত নাই গবর্মেণ্টের হস্তে উক্তবিধ হতভাগ্য সাধুদিগের সম্মান এবং উন্নতি লাভ হয় না।

জনসাধারণও গবর্মেণ্টের অপেক্ষা অধিক সূক্ষ্মবুদ্ধি নহে, সেও খুব মোটামুটি রকমের বিচার করে। সে বলে আমি অত আইনকানুন সাক্ষীসাবুদ বুঝি না, কিন্তু ভারতবর্ষীয়কে হত্যা করিয়া একটা ইংরাজও উপযুক্ত দণ্ডার্হ হয় না এ কেমন কথা!

বারম্বার আঘাতে প্রজাসাধারণের হৃদয়ে যদি একটা সাংঘাতিক ক্ষত উৎপন্ন হইতে থাকে তবে তাহা গোপনে আচ্ছন্ন করিয়া রাখা রাজভক্তি নহে। তাই 'ব্যাবু'-অভিহিত অস্মৎপক্ষীয়েরা এ সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলাই কর্ত্তব্য জ্ঞান করে। আমরা ভারতবর্ষ পরিচালক বাষ্প-যন্ত্রের "বয়লার"স্থিত তাপমান মাত্র, আমাদের নিজের কোন শক্তি নাই, ছোট বড় বিচিত্র লৌহচক্রচালনার কোন ক্ষমতাই রাখি না, কেবল বৈজ্ঞানিক নিগূঢ় নিয়মানুসারে সময়ে সময়ে আমাদের চঞ্চল পারদবিন্দু হঠাৎ উপরের দিকে চড়িয়া যায়, কিন্তু এঞ্জিনিয়ার সাহেবের তাহাতে রাগ করা কর্ত্তব্য নহে। তিনি একটি ঘুসি মারিলেই এই ক্ষুদ্র ক্ষণভঙ্গুর পদার্থটি ভাঙ্গিয়া তাহার সমস্ত পারদটুকু নাস্তিনভূত হইয়া যাইতে পারে—কিন্তু বয়লার-গত উত্তাপের পরিমাণ নির্ণয় করা যন্ত্রচালনকার্য্যের একটা প্রধান অঙ্গ। ইংরাজ অনেক সময় বিপরীত উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বলে—প্রজাসাধারণের নাম করিয়া আত্মপরিচয় দিতেছ তোমরা কে? তোমরা ত আমাদেরই স্কুলের গুটিকয়েক বাক্যবিশারদ ইংরাজিনবিশ!

প্রভু, আমরা কেহই নহি! কিন্তু তোমাদের বিদ্রূপ বিরক্তি এবং ক্রোধদহনের দ্বারা অনুমান করিতেছি তোমরা আমাদিগকে নিতান্তই সামান্য বলিয়া জ্ঞান কর না। এবং সামান্য জ্ঞান করা কর্ত্তব্যও নহে। সংখ্যায় সামান্য হইলেও এই বিচ্ছিন্নসমাজ ভারতবর্ষে কেবল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই শিক্ষা এবং হৃদয়ের ঐক্য আছে—এবং এই শিক্ষিত সম্প্রদায়ই ভারতবর্ষীয় হৃদয়বেদনা স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ এবং নানা উপায়ে সঞ্চারিত করিয়া দিতে পারে। এই শিক্ষিত সাধারণের অন্তরে কখন্

কিরূপ আঘাত অভিঘাত লাগিতেছে তাহা মনোযোগ সহকারে আলোচনা করা গবর্মেণ্টের রাজনীতির একটা প্রধান অঙ্গ হওয়া উচিত। লক্ষণে যতদূর প্রকাশ প্রায় গবর্মেণ্টেরও তাহাতে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য নাই।

আমরা আলোচিত ব্যাপারে দুই কারণে আঘাত পাই প্রথমতঃ, একটা অত্যাচারের কথা শুনিলেই তাহার উপযুক্ত দণ্ডবিধানের প্রত্যাশা করিয়া হৃদয় ব্যগ্র হইয়া থাকে। যে জন্যই হৌক্ দোষী অব্যাহতি পাইলে অন্তর ক্ষুব্ধ হয়। দ্বিতীয়তঃ, এই সকল ঘটনায় আমরা আমাদের জাতীয় অসম্মান তীব্ররূপে অনুভব করিয়া একান্ত মর্ম্মাহত হই।

দোষী অব্যাহতি পাওয়া দোষের বটে কিন্তু আদালতের বিচারের নিকট অদৃষ্টবাদী ভারতবর্ষ অসম্ভব কিছু প্রত্যাশা করে না। আইন এতই জটিল, সাক্ষ্য এতই পিচ্ছল, এবং দেশীয় চরিত্রজ্ঞান মমত্বহীন অবজ্ঞাকারী বিদেশীয়ের পক্ষে এতই দুর্লভ, যে, অনিশ্চিতফল মকদ্দমা অনেকটা জুয়াখেলার মত বোধ হয়। এইজন্যই জুয়াখেলার যেমন একটা মোহকারী উত্তেজনা আছে আমাদের দেশের অনেক লোকের কাছে মকদ্দমার সেইরূপ একটা মাদকতা দেখা যায়। অতএব মকদ্দমার ফলের অনিশ্চয়তা সম্বন্ধে যখন সাধারণের একটা ধারণা আছে এবং যখন সে অনিশ্চয়তা জন্য আমাদের স্বভাবদোষও অনেকটা দায়ী তখন মধ্যে মধ্যে নির্দ্দোষীর পীড়ন ও দোষীর নিষ্কৃতি শোচনীয় অথচ অবশ্যম্ভাবী বলিয়া দেখিতে হয়।

কিন্তু বারম্বার য়ুরোপীয় অপরাধীর অব্যাহতি এবং তৎসম্বন্ধে কর্তৃপক্ষীয়ের ঔদাসীন্যে ভারতবর্ষীয়ের প্রতি ইংরাজের আন্তরিক অবজ্ঞার পরিচয় দেয়। সেই অপমানের ধিক্কারশেলের ন্যায় স্থায়ীভাবে হৃদয়ে বিঁধিয়া থাকে।

যদি ঠিক বিপরীত ঘটনা ঘটিত, যদি স্বল্পকালের মধ্যে অনেকগুলি য়ুরোপীয় দেশীয় কর্তৃক হত হইত এবং প্রত্যেক অভিযুক্তই বিচারে মুক্তি পাইত, তবে এরূপ দুর্ঘটনার সমস্ত সম্ভাবনা লোপ করিবার সহস্রবিধ

উপায় উদ্ভাবিত হইত। কিন্তু প্রাচ্য ভারতবাসী যখন নিরর্থক গুলি খাইয়া লাথি খাইয়া মরে তখন পাশ্চাত্য কর্ত্তৃপুরুষদের কোনপ্রকার দুর্ভাবনার লক্ষণ দেখা যায় না। কি করিলে এ সমস্ত উপদ্রব নিবারণ হইতে পারে সে সম্বন্ধে কোনরূপ প্রশ্ন উত্থাপন হইতেও শুনা যায় না।

কিন্তু আমাদিগের প্রতি কর্ত্তৃজাতীয়ের এই যে অবজ্ঞা, সে জন্য প্রধানতঃ আমরাই ধিক্কারের যোগ্য। কারণ, একথা কিছুতেই আমাদের বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় যে, আইনের সাহায্যে সম্মান পাওয়া যায় না— সম্মান নিজের হস্তে। আমরা সানুনাশিক স্বরে যে ভাবে ক্রমাগত নালিশ করিতে আরম্ভ করিয়াছি তাহাতে আমাদের আত্মমর্য্যাদার নিরতিশয় লাঘব হইতেছে।

উদাহরণ স্থলে আমরা খুলনার ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক মুহুরি মারার ঘটনা উল্লেখ করিতে পারি। কিন্তু প্রথমেই বলিয়া রাখা আবশ্যক ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট বেল্ সাহেব অত্যন্ত দয়ালু উন্নতচেতা সহৃদয় ব্যক্তি, এবং ভারতবর্ষীয়ের প্রতি তাঁহার ঔদাসীন্য অথবা অবজ্ঞা নাই। আমাদের বিশ্বাস, তিনি, যে, মুহুরিকে মারিয়াছিলেন তাহাতে কেবল দুর্দ্দম ইংরাজ প্রকৃতির হঠকারিতা প্রকাশ পাইয়াছে, বাঙালীঘৃণা প্রকাশ পায় নাই। জঠরানল যখন প্রজ্জ্বলিত তখন ক্রোধানল সামান্য কারণেই উদ্দীপ্ত হইয়া থাকে, তা বাঙালীরও হয় ইংরাজেরও হয়; অতএব এ ঘটনার প্রসঙ্গে বিজাতি বিদ্বেষের কথা উত্থাপন করা উচিত হয় না।

কিন্তু ফরিয়াদীর পক্ষের বাঙালী ব্যারিষ্টার মহাশয় এই মকদ্দমার প্রসঙ্গে বারম্বার বলিয়াছেন মুহুরিমারা কাজটা ইংরাজের অযোগ্য হইয়াছে, কারণ, বেল সাহেবের জানা ছিল অথবা জানা উচিত ছিল যে, মুহুরি তাঁহাকে ফিরিয়া মারিতে পারে না।

এ কথা যদি সত্য হয় তবে যথার্থ লজ্জার বিষয় মুহুরির এবং মুহুরির স্বজাতিবর্গের। কারণ, হঠাৎ রাগিয়া প্রহার করিয়া বসা পুরুষের দুর্ব্বলতা,

কিন্তু মার খাইয়া বিনা প্রতিকারে ক্রন্দন করা কাপুরুষের দুর্ব্বলতা। এ কথা বলিতে পারি মুহুরি যদি ফিরিয়া মারিত তবে বেল্ সাহেব যথার্থ ইংরাজের ন্যায় তাহাকে মনে মনে শ্রদ্ধা করিতেন।

যথেষ্ট অপমানিত হইলেও একজন মুহুরি কোন ইংরাজকে ফিরিয়া মারিতে পারে না এই কথাটি ধ্রুব সত্যরূপে অম্লানমুখে স্বীকার করা এবং ইহারই উপরে ইংরাজকে বেশি করিয়া দোষার্হ করা আমাদের বিবেচনায় নিতান্ত অনাবশ্যক এবং লজ্জাজনক আচরণ।

মার খাওয়ার দরুণ আইনমতে মুহুরির যে কোন প্রতিকার প্রাপ্য, তাহা হইতে সে তিলমাত্র বঞ্চিত না হয় তৎপ্রতি আমাদের দৃষ্টিরাখা উচিত হইতে পারে কিন্তু তাহার আঘাত এবং অপমান-বেদনার উপর সমস্ত দেশের লোক মিলিয়া অজস্র পরিমাণে আহা উহু করার, এবং কেবলমাত্র বিদেশীকে গালিমন্দ দিবার কোন কারণ দেখি না। বেল্ সাহেবের ব্যবহার প্রশংসনীয় নহে, কিন্তু মুহুরি ও তাহার নিকটবর্ত্তী সমস্ত লোকের আচরণ হেয়, এবং খুলনার বাঙালী ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের আচরণে হীনতা ও অন্যায় মিশ্রিত হইয়া সর্ব্বাপেক্ষা বীভৎস হইয়া উঠিয়াছে।

অল্পকাল হইল ইহার অনুরূপ ঘটনা পাবনায় ঘটিয়াছিল। সেখানে মুনিসিপালিটির খেয়াঘাটের কোন ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারী পুলিস সাহেবের পাখাটানা বেহারার নিকট উচিত মাশুল আদায় করাতে পুলিস্ সাহেব তাহাকে নিজের ঘরে লইয়া লাঞ্ছনার একশেষ করিয়াছিলেন; বাঙালী ম্যাজিষ্ট্রেট সেই অপরাধী ইংরাজের কোনরূপ দণ্ডবিধান না করিয়া কেবলমাত্র সতর্ক করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। অথচ যখন পাখাটানা বেহারা উক্ত ব্রাহ্মণের নামে উপদ্রবের নালিশ আনে তখন তিনি ব্রাহ্মণকে জরিমানা না করিয়া ছাড়েন নাই।

যে কারণবশতঃ বাঙালী ম্যাজিষ্ট্রেট্ প্রবল ইংরাজ অপরাধীকে সতর্ক এবং অক্ষম বাঙালী অভিযুক্তকে জরিমানা করিয়া থাকেন, সেই কারণটি

আমাদের জাতির মর্ম্মে মর্ম্মে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছে। আমাদের স্বজাতিকে যে সম্মান আমরা নিজে দিতে জানি না, আমরা আশা করি এবং আবদার করি সেই সম্মান ইংরাজ আমাদিগকে যাচিয়া সাধিয়া দিবে।

এক বাঙ্গালী যখন নীরবে মার খায় এবং অন্য বাঙালী যখন তাহা কৌতূহলভরে দেখে, এবং স্বহস্তে অপমানের প্রতিকার সাধন বাঙালীর নিকট প্রত্যাশাই করা যায় না, একথা সকল বাঙালী বিনা লজ্জায় ইঙ্গিতেও স্বীকার করে তখন ইহা বুঝিতে হইবে যে, ইংরাজের দ্বারা হত ও আহত হইবার মূল প্রধান কারণ আমাদের নিজের স্বভাবের মধ্যে—গবর্মেণ্ট কোন আইনের দ্বারা বিচারের দ্বারা তাহা দূর করিতে পারিবেন না।

আমরা অনেক সময় ইংরাজ কর্ত্তৃক অপমানবৃত্তান্ত শুনিলে আক্ষেপ করিয়া বলিয়া থাকি, কোন ইংরাজের প্রতি ইংরাজ এমন ব্যবহার করিত না। করিত না বটে, কিন্তু ইংরাজের উপর রাগ করিতে বসার অপেক্ষা নিজের প্রতি রাগ করিতে বসিলে অধিক ফল পাওয়া যায়। যে যে কারণ-বশতঃ একজন ইংরাজ সহজে আর একজন ইংরাজের গায়ে হাত তুলিতে সাহস করে না সেই কারণগুলি থাকিলে আমরাও অনুরূপ আচরণ প্রাপ্ত হইতে পারিতাম, সানুনাসিক স্বরে এত অধিক কান্নাকাটি করিতে হইত না।

বাঙালীর প্রতি বাঙালী কিরূপ ব্যবহার করে সেইটে গোড়ায় দেখা উচিত। কারণ তাহারই উপর আমাদের সমস্ত শিক্ষা নির্ভর করে। আমরা কি আমাদের ভৃত্যাদিগকে প্রহার করি না, আমাদের অধীনস্থ ব্যক্তিদের প্রতি ঔদ্ধত্য এবং নিম্নশ্রেণীস্থদিগের প্রতি সর্ব্বদা অসম্মান প্রকাশ করি না? আমাদের সমাজ স্তরে স্তরে উচ্চে নীচে বিভক্ত, যে ব্যক্তি কিছুমাত্র উচ্চে আছে সে নিম্নতর ব্যক্তির নিকট হইতে অপরিমিত অধীনতা প্রত্যাশা করে। নিম্নবর্ত্তী কেহ তিলমাত্র স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করিলে উপরের লোকের গায়ে তাহা অসহ্য বোধ হয়। ভদ্রলোকের নিকট "চাষা বেটা" প্রায়

মনুষ্যের মধ্যেই নহে ;—ক্ষমতাপন্নের নিকট অক্ষম লোক যদি সম্পূর্ণ অবনত হইয়া না থাকে তবে তাহাকে ভাঙ্গিয়া দিবার চেষ্টা করা হয়। যেমন দেখা যায় চৌকিদারের উপর কন্‌ষ্টেবল্, কন্‌ষ্টেবলের উপর দারোগা, কেবল যে গবর্মেণ্টের কাজ আদায় করে তাহা নহে, কেবল যে উচ্চতর পদের উচিত সম্মানটুকু গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্ট হয় তাহা নহে, তদতিরিক্ত দাসত্ব দাবী করিয়া থাকে—চৌকিদারের নিকট কন্‌ষ্টেবল্ যথেচ্ছাচারী রাজা, এবং কন্‌ষ্টেবলের নিকট দারোগাও তদ্রূপ, তেমনি আমাদের সমাজে সর্ব্বত্র অধস্তনের নিকট উচ্চতনের দাবীর একেবারে সীমা নাই। স্তরে স্তরে প্রভুত্বের ভার পড়িয়া দাসত্ব এবং ভয় আমাদের মজ্জার মধ্যে সঞ্চারিত হইতে থাকে। আমাদের আজন্মকালের প্রতিনিয়ত অভ্যাস ও দৃষ্টান্তে আমাদিগকে অন্ধ বাধ্যতার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত করিয়া রাখে, তাহাতে আমরা অধীনস্থ লোকের প্রতি অত্যাচারী, সমকক্ষ লোকের প্রতি ঈর্ষান্বিত এবং উপরিস্থ লোকের নিকট ক্রীতদাস হইতে শিক্ষা করি। সেই আমাদের প্রতি মুহূর্ত্তের শিক্ষার মধ্যে আমাদের সমস্ত ব্যক্তিগত এবং জাতীয় অসম্মানের মূল নিহিত রহিয়াছে। গুরুকে ভক্তি করিয়া ও প্রভুকে সেবা করিয়া ও মান্য লোককে যথোচিত সম্মান দিয়াও মনুষ্যমাত্রের যে একটি মনুষ্যোচিত আত্মমর্য্যাদা থাকা আবশ্যক তাহা রক্ষা করা যায়। আমাদের গুরু, আমাদের প্রভু, আমাদের রাজা আমাদের মান্য ব্যক্তিগণ যদি সেই আত্মমর্য্যাদাটুকুও অপহরণ করিয়া লন তবে একেবারে মনুষ্যত্বের প্রতি হস্তক্ষেপ করা হয়। সেই সকল কারণে আমরা যথার্থ ই মনুষ্যত্বহীন হইয়া পড়িয়াছি এবং সেই কারণেই ইংরাজ ইংরাজের প্রতি যেমন ব্যবহার করে আমাদের প্রতি সেরূপ ব্যবহার করে না।

গৃহের এবং সমাজের শিক্ষায় যখন আমরা সেই মনুষ্যত্ব উপার্জ্জন করিতে পারিব তখন ইংরাজ আমাদিগকে শ্রদ্ধা করিতে বাধ্য হইবে এবং অপমান করিতে সাহস করিবে না। ইংরাজ গবর্মেণ্টের নিকট আমরা

অনেক প্রত্যাশা করিতে পারি কিন্তু স্বাভাবিক নিয়ম বিপর্য্যস্ত করা তাঁহাদেরও সাধ্যায়ত্ত নহে। হীনত্বের প্রতি আঘাত ও অবমাননা সংসারের স্বাভাবিক নিয়ম।

১৩০১

সুবিচারের অধিকার

সংবাদপত্রপাঠকগণ অবগত আছেন অল্পকাল হইল সেতারা জিলায় বাই নামক নগরে তেরো জন সম্ভ্রান্ত হিন্দু জেলে গিয়াছেন। তাঁহারা অপরাধ করিয়া থাকিবেন, এবং আইনমতেও হয়ত তাঁহারা দণ্ডনীয়—কিন্তু ঘটনাটি সমস্ত হিন্দুর হৃদয়ে আঘাত করিয়াছে এবং আঘাতের ন্যায্য কারণও আছে।

উক্ত নগরে হিন্দু সংখ্যা মুসলমান অপেক্ষা অনেক অধিক এবং পরস্পরের মধ্যে কোন কালে কোন বিরোধের লক্ষণ দেখা যায় নাই। একটি মুসলমান সাক্ষীও প্রকাশ করিয়াছে যে, সে স্থানে হিন্দুর সহিত মুসলমানের কোন বিবাদ নাই—বিবাদ হিন্দুর সহিত গবর্মেণ্টের।

অকস্মাৎ ম্যাজিষ্ট্রেট্ অশান্তি আশঙ্কা করিয়া কোন এক পূজা উপলক্ষ্যে হিন্দুদিগকে বাদ্য বন্ধ করিতে আদেশ করেন। হিন্দুগণ ফাঁপরে পড়িয়া রাজাজ্ঞা ও দেবসম্মান উভয় রক্ষা করিতে গিয়া কোনটাই রক্ষা করিতে পারিলেন না। তাঁহারা চির নিয়মানুমোদিত বাদ্যাড়ম্বর বন্ধ করিয়া একটি মাত্র সামান্য বাদ্যযোগে কোনমতে উৎসব পালন করিলেন। ইহাতে দেবতা সন্তুষ্ট হইলেন কিনা জানিনা, মুসলমানগণ অসন্তুষ্ট হইলেন না, কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট্ রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। নগরের তেরো জন ভদ্র হিন্দুকে জেলে চালান করিয়া দিলেন।

হাকিম খুব জবরদস্ত, আইন খুব কঠিন, শাসন খুব কড়াক্কড়, কিন্তু এমন করিয়া স্থায়ী শান্তি স্থাপিত হয় কি না সন্দেহ। এমন করিয়া যেখানে বিরোধ নাই সেখানে বিরোধ বাধিয়া উঠে, যেখানে বিদ্বেষের বীজমাত্র আছে সেখানে তাহা অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হইয়া উঠিতে থাকে। প্রবল প্রতাপে শান্তি স্থাপন করিতে গিয়া সমাসমারোহে অশান্তিকে জাগ্রত করিয়া তোলা হয়।

সকলেই জানেন অনেক অসভ্যদের মধ্যে আর কোন প্রকার চিকিৎসা নাই কেবল ভূতঝাড়ানো আছে। তাহারা গর্জ্জন করিয়া নৃত্য করিয়া রোগীকে মারিয়া ধরিয়া প্রলয়কাণ্ড বাধাইয়া দেয়। ইংরাজ হিন্দুমুসলমান-বিরোধব্যাধির যদি সেইরূপ আদিম প্রণালী মতে চিকিৎসা সুরু করেন তাহাতে রোগীর মৃত্যু হইতে পারে কিন্তু ব্যাধির উপশম না হইবার সম্ভাবনা। এবং ওঝা ভূত ঝাড়িতে গিয়া যে ভূত নামাইয়া আনেন তাহাকে শান্ত করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে।

অনেক হিন্দুর বিশ্বাস, বিরোধ মিটাইয়া দেওয়া গবর্মেণ্টের আন্তরিক অভিপ্রায় নহে। পাছে কনগ্রেস্ প্রভৃতির চেষ্টায় হিন্দু মুসলমানগণ ক্রমশঃ ঐক্যপথে অগ্রসর হয় এই জন্য তাঁহারা উভয় সম্প্রদায়ের ধর্ম্মবিদ্বেষ জাগাইয়া রাখিতে চান, এবং মুসলমানের দ্বারা হিন্দুর দর্পচূর্ণ করিয়া মুসলমানকে সন্তুষ্ট ও হিন্দুকে অভিভূত করিতে ইচ্ছা করেন।

অথচ লর্ডল্যান্সডাউন্ হইতে আরম্ভ করিয়া লর্ডহ্যারিস্ পর্য্যন্ত সকলেই বলিতেছেন এমন কথা যে মুখে আনে সে পাষণ্ড মিথ্যাবাদী। ইংরাজ গবর্মেণ্ট হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের প্রতি যে অধিক পক্ষপাত প্রকাশ করিতেছেন এ অপবাদকেও তাঁহারা সম্পূর্ণ অমূলক বলিয়া তিরস্কার করিয়াছেন।

আমরাও তাঁহাদের কথা অবিশ্বাস করি না। কনগ্রেসের প্রতি গবর্মেণ্টের সুগভীর প্রীতি না থাকিতে পারে এবং মুসলমানগণ হিন্দুদের

সহিত যোগ দিয়া কন্‌গ্রেসকে বলশালী না করুক এমন ইচ্ছাও তাঁহাদের থাকা সম্পূর্ণ সম্ভব, তথাপি রাজ্যের দুই প্রধান সম্প্রদায়ের অনৈক্যকে বিরোধে পরিণত করিয়া তোলা কোন পরিণামদর্শী বিবেচক গবর্মেণ্টের অভিপ্রেত হইতে পারে না। অনৈক্য থাকে সে ভাল, কিন্তু তাহা গবর্মেণ্টের সুশাসনে শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকিবে। গবর্মেণ্টের বারুদখানায় বারুদ যেমন শীতল হইয়া আছে অথচ তাহার দাহিকাশক্তি নিবিয়া যায় নাই—হিন্দুমুসলমানের আভ্যন্তরিক অসদ্ভাব গবর্মেণ্টের রাজনৈতিক শস্ত্রশালায় সেইরূপ সুশীতলভাবে রক্ষিত হইবে এমন অভিপ্রায় গবর্মেণ্টের মনে থাকা অসম্ভব নহে।

এই কারণে, গবর্মেণ্ট হিন্দুমুসলমানের গলাগলি দৃশ্য দেখিবার জন্যও ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেছেন না, অথচ লাঠালাঠি দৃশ্যটাও তাঁহাদের সুশাসনের হানিজনক বলিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিতেছেন।

সর্ব্বদাই দেখিতে পাই দুই পক্ষে যখন বিরোধ ঘটে এবং শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা উপস্থিত হয় তখন ম্যাজিষ্ট্রেট্ সূক্ষ্মবিচারের দিকে না গিয়া উভয় পক্ষকেই সমানভাবে দমন করিয়া রাখিতে চেষ্টা করেন। কারণ, সাধারণ নিয়ম এই যে, এক হাতে তালি বাজে না। কিন্তু হিন্দুমুসলমানবিরোধে সাধারণের বিশ্বাস দৃঢ়বদ্ধমূল হইয়াছে, যে, দমনটা অধিকাংশ হিন্দুর উপর দিয়াই চলিতেছে এবং প্রশ্রয়টা অধিকাংশ মুসলমানেরাই লাভ করিতেছেন। এরূপ বিশ্বাস জন্মিয়া যাওয়াতে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ঈর্ষানল আরো অধিক করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে। এবং যেখানে কোনকালে বিরোধ ঘটে নাই সেখানেও কর্তৃপক্ষ আগেভাগে অমূলক আশঙ্কার অবতারণা করিয়া একপক্ষের চিরাগত অধিকার কাড়িয়া লওয়াতে অন্যপক্ষের সাহস ও স্পর্দ্ধা বাড়িতেছে এবং চিরবিরোধের বীজ বপন করা হইতেছে।

হিন্দুদের প্রতি, গবর্মেণ্টের বিশেষ একটা বিরাগ না থাকাই সম্ভব

কিন্তু একমাত্র গবর্মেণ্টের পলিসির দ্বারাই গবর্মেণ্ট চলে না—প্রাকৃতিক নিয়ম একটা আছে। স্বর্গরাজ্যে পবনদেবের কোন প্রকার অসাধু অভিপ্রায় থাকিতে পারে না তথাচ উত্তাপের নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহার মর্ত্ত্যরাজ্যের অনুচর উনপঞ্চাশ বায়ু অনেক সময় অকস্মাৎ ঝড় বাধাইয়া বসে। আমরা গবর্মেণ্টের স্বর্গ-লোকের খবর ঠিক করিয়া বলিতে পারি না, সে সকল খবর লর্ড্ ল্যান্স্‌ডাউন এবং লর্ড্ হ্যারিস্ জানেন কিন্তু আমরা আমাদের চতুর্দ্দিকের হাওয়ার মধ্যে একটা গোলোযোগ অনুভব করিতেছি। স্বর্গধাম হইতে মাভৈঃ মাভৈঃ শব্দ আসিতেছে কিন্তু আমাদের নিকটবর্ত্তী দেবচরগণের মধ্যে ভারি একটা উষ্মার লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। মুসলমানেরাও জানিতেছেন তাঁহাদের জন্য বিষ্ণুদূত অপেক্ষা করিয়া আছে, আমরাও হাড়ের মধ্যে কম্পসহকারে অনুভব করিতেছি আমাদের জন্য যমদূত দ্বারের নিকটে গদাহস্তে বসিয়া আছে এবং উপরন্তু সেই যমদূতগুলার খোরাকী আমাদের নিজের গাঁঠ হইতে দিতে হইবে।

হাওয়ার গতিক আমরা যেরূপ অনুভব করিতেছি তাহা যে নিতান্ত অমূলক এ কথা বিশ্বাস হয় না। অল্পকাল হইল ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্ পত্রে গবর্মেণ্টের উচ্চ উপাধিধারী কোন শ্রদ্ধেয় ইংরাজ সিভিলিয়ান প্রকাশ করিয়াছেন যে, আজকাল সাধারণ ভারতবর্ষীয় ইংরাজের মনে একটা হিন্দুবিদ্বেষের ভাব ব্যাপ্ত হইয়াছে এবং মুসলমান জাতির প্রতিও একটি আকস্মিক বাৎসল্যরসের উদ্রেক দেখা যাইতেছে। মুসলমান ভ্রাতাদের প্রতি ইংরাজের স্তনে যদি ক্ষীর সঞ্চার হইয়া থাকে তবে তাহা আনন্দের বিষয় কিন্তু আমাদের প্রতি যদি কেবলই পিত্তসঞ্চার হইতে থাকে তবে সে আনন্দ অকপটভাবে রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠে।

কেবল রাগদ্বেষের দ্বারা পক্ষপাত এবং অবিচার ঘটিতে পারে তাহা নহে ভয়েতে করিয়াও ন্যায়পরতার নিক্তির কাঁটা অনেকটা পরিমাণে কম্পিত বিচলিত হইয়া উঠে। আমাদের এমন সন্দেহ হয়, যে, ইংরাজ

মুসলমানকে মনে মনে কিছু ভয় করিয়া থাকেন। এই জন্য রাজদণ্ডটা মুসলমানের গা ঘেঁসিয়া ঠিক হিন্দুর মাথার উপরে কিছু জোরের সহিত পড়িতেছে।

ইহাকে নাম দেওয়া যাইতে পারে "ঝিকে মারিয়া বৌকে শেখানো" রাজনীতি। ঝিকে কিছু অন্যায় করিয়া মারিলেও সে সহ্য করে, কিন্তু বৌ পরের ঘরের মেয়ে, উচিত শাসন উপলক্ষ্যে গায়ে হাত তুলিতে গেলেও বরদাস্ত না করিতেও পারে। অথচ বিচার কার্য্যটা একেবারে বন্ধ করাও যায় না। যেখানে বাধা স্বল্পতম সেখানে শক্তিপ্রয়োগ করিলে শীঘ্র ফল পাওয়া যায় এ কথা বিজ্ঞানসম্মত। অতএব হিন্দু মুসলমানের দ্বন্দ্বে, শান্তপ্রকৃতি, ঐক্যবন্ধনহীন, আইন ও বেআইনসহিষ্ণু হিন্দুকে দমন করিয়া দিলে মীমাংসাটা সহজে হয়। আমরা বলিনা যে, গবর্মেণ্টের এইরূপ পলিসি, কিন্তু কার্য্যবিধি স্বভাবতঃ, এমন কি অজ্ঞানত, এই পথ অবলম্বন করিতে পারে। যেমন, নদীস্রোত কঠিন মৃত্তিকাকে পাশ কাটাইয়া স্বতই কোমল মৃত্তিকাকে খনন করিয়া চলিয়া যায়।

অতএব, হাজার গবর্মেণ্টের দোহাই পাড়িতে থাকিলেও গবর্মেণ্ট্ যে ইহার প্রতিকার করিতে পারেন এ কথা আমরা বিশ্বাস করি না। আমরা কন্‌গ্রেসে যোগ দিয়াছি, বিলাতে আন্দোলন করিতেছি, অমৃতবাজারে প্রবন্ধ লিখিতেছি, ভারতবর্ষের উচ্চ হইতে নিম্নতন ইংরাজ কর্ম্মচারীদের কার্য্য স্বাধীনভাবে সমালোচন করিতেছি, অনেক সময় তাঁহাদিগকে অপদস্থ করিতে কৃতকার্য্য হইতেছি এবং ইংলণ্ডবাসী অপক্ষপাতী ইংরাজের সহায়তা লইয়া ভারতীয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অনেক রাজবিধি সংশোধন করিতেও সক্ষম হইয়াছি—এই সকল ব্যবহারে ইংরাজ এতদূর পর্য্যন্ত জ্বালাতন হইয়া উঠিয়াছে, যে, ভারত-রাজতন্ত্রের বড় বড় ভূধর-শিখর হইতেও রাজনীতি-সম্মত মৌন ভেদ করিয়া মাঝে মাঝে আগ্নেয় স্রাব উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। অপরপক্ষে, মুসলমানগণ রাজভক্তিভরে

অবনতপ্রায় হইয়া কন্‌গ্রেসের উদ্দেশ্যপথে বাধাস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। এই সকল কারণে ইংরাজের মনে একটা বিকার উপস্থিত হইয়াছে—গবর্মেণ্টের ইহাতে কোন হাত নাই!

কেবল ইহাই নহে। কন্‌গ্রেস্‌ অপেক্ষা গোরক্ষণী সভাটাতে ইংরাজের মনে অধিক আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিল। তাঁহারা জানেন ইতিহাসের প্রারম্ভকাল হইতে যে হিন্দুজাতি আত্মরক্ষার জন্য কখনও একত্র হইতে পারে নাই, চাই কি গোরক্ষার জন্য সে জাতি একত্র হইতে পারে। অতএব, সেইসূত্রে যখন হিন্দু মুসলমানের বিরোধ আরম্ভ হইল তখন স্বভাবতই মুসলমানের প্রতিই ইংরাজের দরদ বাড়িয়া গিয়াছিল। তখন উপস্থিতক্ষেত্রে কোন্‌ পক্ষ অধিক অপরাধী, অথবা উভয় পক্ষ ন্যূনাধিক অপরাধী কি না তাহা অবিচলিতচিত্তে অপক্ষপাত সহকারে বিচার করিবার ক্ষমতা অতি অল্প ইংরাজের ছিল। তখন তাঁহারা ভীত চিত্তে একটা রাজনৈতিক সঙ্কট কিরূপে নিবারণ হইতে পারে সেইদিকেই অধিক মনোযোগ দিয়াছিলেন। তৃতীয় খণ্ড সাধনায় "ইংরাজের আতঙ্ক" নামক প্রবন্ধে আমরা সাঁওতাল দমনের উদাহরণ দিয়া দেখাইয়াছি, ভয় পাইলে সুবিচার করিবার ধৈর্য্য থাকে না এবং যাহারা জ্ঞানতঃ অথবা অজ্ঞানতঃ ভীতির কারণ, তাহাদের প্রতি একটা নিষ্ঠুর হিংস্র ভাবের উদয় হয়। এই কারণে—গবর্মেণ্ট নামক যন্ত্রটি যেমনি-নিরপেক্ষ থাক গবর্মেণ্টের ছোটবড় যন্ত্রীগুলি যে আদ্যোপান্ত বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিলেন তাহা তাঁহারা বারম্বার অস্বীকার করিলেও লক্ষণে স্পষ্টই প্রকাশ পাইয়াছিল এখনো প্রকাশ পাইতেছে। এবং সাধারণ ভারতবর্ষীয় ইংরাজের মনে বিবিধ স্বাভাবিক কারণে একবার এইরূপ বিকার উপস্থিত হইলে তাহার যে ফল সে ফলিতে থাকিবেই;—ক্যান্যুট যেমন সমুদ্রতরঙ্গকে নিয়মিত করিতে পারেন নাই গবর্মেণ্টও সেইরূপ স্বাভাবিক নিয়মকে বাধা দিতে পারিবেন না।

প্রশ্ন উঠিতে পারে, তবে কেনই বা বৃথা আন্দোলন করা এবং আমারই বা এ প্রবন্ধ লিখিতে বসিবার প্রয়োজন কি ছিল ?

গবর্মেণ্টের নিকট সকরুণ অথবা সাভিমান স্বরে আবেদন বা অভিযোগ করিবার জন্য প্রবন্ধ লিখার কোন আবশ্যক নাই সে কথা আমি সহস্রবার স্বীকার করি। আমাদের এই প্রবন্ধ কেবল আমাদের স্বজাতীয়ের জন্য। আমরা নিজেরা ব্যতীত আমাদের নিজেদের প্রতি অন্যায় ও অবিচারের প্রতিকার কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে।

ক্যান্যুট সমুদ্রতরঙ্গকে যেখানে থামিতে বলিয়াছিলেন, সমুদ্রতরঙ্গ সেখানে থামে নাই—সে জড়শক্তির নিয়মানুবর্ত্তী হইয়া যথোপযুক্ত স্থানে গিয়া আঘাত করিয়াছিল। ক্যান্যুট মুখের কথায় বা মন্ত্রোচ্চারণে তাহাকে ফিরাইতে পারিতেন না বটে কিন্তু বাঁধ বাঁধিয়া তাহাকে প্রতিহত করিতে পারিতেন।

স্বাভাবিক নিয়মানুগত আঘাতপরম্পরাকে যদি অর্দ্ধপথে বাধা দিতে হয় তবে আমাদিগকে ও বাঁধ বাঁধিতে হইবে। সকলকে এক হইতে হইবে। সকলকে সমহৃদয় হইয়া সমবেদনা অনুভব করিতে হইবে।

দল বাঁধিয়া যে বিপ্লব করিতে হইবে তাহা নহে—আমাদের সে শক্তিও নাই। কিন্তু দল বাঁধিলে যে একটা বৃহত্ত্ব এবং বল লাভ করা যায় তাহাকে লোকে শ্রদ্ধা না করিয়া থাকিতে পারে না। শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে না পারিলে সুবিচার আকর্ষণ করা বড় কঠিন।

কিন্তু বালির বাঁধ বাঁধিবে কি করিয়া ? যাহারা বারম্বার নিহত পরাহত হইয়াছে অথচ কোন কালে সংহত হইতে শিখে নাই, যাহাদের সমাজের মধ্যে অনৈক্যের সহস্র বিষবীজ নিহিত রহিয়াছে তাহাদিগকে কিসে বাঁধিতে পারিবে ? ইংরাজ যে আমাদের মর্ম্মবেদনা অনুভব করিতে পারে না এবং ইংরাজ ঔষধের দ্বারা চিকিৎসার চেষ্টা না করিয়া কঠিন আঘাতের দ্বারা আমাদের হৃদয়ব্যথা চতুর্গুণ বর্দ্ধিত করিবার উদ্যোগ করিতেছে

এই বিশ্বাসে উত্তর হইতে দক্ষিণে এবং পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে সমস্ত হিন্দু-জাতির হৃদয় অলক্ষিতভাবে প্রতিদিন পরস্পর নিকটে আকৃষ্ট হইয়া আসিতেছে। কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নহে। আমাদের স্বজাতি এখনও আমাদের স্বজাতীয়ের পক্ষে ধ্রুবআশ্রয় ভূমি হইয়া উঠিতে পারেন নাই। এই জন্য বাহিরের ঝটিকা অপেক্ষা আমাদের গৃহভিত্তির বালুকাময় প্রতিষ্ঠা স্থানকে অধিক আশঙ্কা করি। খরবেগ নদীর মধ্যস্রোত অপেক্ষা তাহার শিথিলবন্ধন ভগ্নপ্রবণ তটভূমিকে পরিহার করিয়া চলিতে হয়।

আমরা জানি, বহুকাল পরাধীনতায় পিষ্ট হইয়া আমাদের জাতীয় মনুষ্যত্ব ও সাহস চূর্ণ হইয়া গেছে, আমরা জানি যে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে যদি দণ্ডায়মান হইতে হয় তবে সর্ব্বাপেক্ষা ভয় আমাদের স্বজাতিকে—যাহার হিতের জন্য প্রাণপণ করা যাইবে সেই আমাদের প্রধান বিপদের কারণ, আমরা যাহার সহায়তা করিতে যাইব তাহার নিকট হইতে সহায়তা পাইব না, কাপুরুষগণ সত্য অস্বীকার করিবে, নিপীড়িতগণ আপন পীড়া গোপন করিয়া যাইবে, আইন আপন বজ্রমুষ্টি প্রসারিত করিবে এবং জেলখানা আপন লৌহ বদন ব্যাদন করিয়া আমাদিগকে গ্রাস করিতে আসিবে কিন্তু তথাপি অকৃত্রিম মহত্ত্ব এবং স্বাভাবিক ন্যায়প্রিয়তাবশতঃ আমাদের মধ্যে দুই চারিজন লোকও যখন শেষ পর্য্যন্ত অটল থাকিতে পারিবে তখন আমাদের জাতীয় বন্ধনের সূত্রপাত হইতে থাকিবে এবং তখন আমরা ন্যায়বিচার পাইবার অধিকার প্রাপ্ত হইব।

জানি না হিন্দু ও মুসলমানের বিরোধ অথবা ভারতবর্ষীয় ও ইংরাজের সংঘর্ষস্থলে আমরা যাহা অনুমান ও অনুভব করিয়া থাকি তাহা সত্য কি না, আমরা যে অবিচারের আশঙ্কা করিয়া থাকি, তাহা সমূলক কি না, কিন্তু ইহা নিশ্চয় জানি, যে, কেবলমাত্র বিচারকের অনুগ্রহ ও কর্ত্তব্যবুদ্ধির উপর বিচারভার রাখিয়া দিলে সুবিচারের অধিকারী হওয়া যায় না। রাজতন্ত্র যতই উন্নত হউক্ প্রজার অবস্থা নিতান্ত অবনত হইলে সে

কখনই আপনাকে উচ্চে ধারণ করিয়া রাখিতে পারে না, কারণ মানুষের দ্বারাই রাজ্য চলিয়া থাকে, যন্ত্রের দ্বারাও নহে, দেবতার দ্বারাও নহে। তাহাদের নিকট যখন আমরা আপনাদিগকে মনুষ্য বলিয়া প্রমাণ দিব তখন তাহারা সকল সময়েই আমাদের সহিত মনুষ্যোচিত ব্যবহার করিবে। যখন ভারতবর্ষে অন্ততঃ কতকগুলি লোকও উঠিবেন যাঁহারা আমাদের মধ্যে অটল সত্যপ্রিয়তা ও নির্ভীক ন্যায়পরতার উন্নত আদর্শ স্থাপন করিবেন, যখন ইংরাজ অন্তরের সহিত অনুভব করিবে যে ভারতবর্ষ ন্যায়বিচার নিশ্চেষ্টভাবে গ্রহণ করে না, সচেষ্টভাবে প্রার্থনা করে, অন্যায় নিবারণের জন্য প্রাণপণ করিতে প্রস্তুত হয় তখন তাহারা কখনও ভ্রমেও আমাদিগকে অবহেলা করিবে না এবং আমাদের প্রতি ন্যায়বিচারে শৈথিল্য করিতে তাহাদের স্বভাবতই প্রবৃত্তি হইবে না।

১৩০১

কণ্ঠরোধ *

অদ্য আমি যে ভাষায় প্রবন্ধ পাঠ করিতে উদ্যত হইয়াছি তাহা যদিও বাঙালীর ভাষা, দুর্বলের ভাষা, বিজিত জাতির ভাষা তথাপি সে ভাষাকে আমাদের কর্তৃপক্ষেরা ভয় করিয়া থাকেন। তাহার একটি কারণ, এ ভাষা তাঁহারা জানেন না। এবং যেখানেই অজ্ঞানের অন্ধকার সেইখানেই অন্ধ আশঙ্কার প্রেতভূমি।

কারণ যাহাই হউক না কেন যে ভাষা আমাদের শাসনকর্তারা জানেন না, এবং যে ভাষাকে তাঁহারা মনে মনে ভয় করেন সে ভাষায় তাঁহাদিগকে সম্ভাষণ করিতে আমি ততোধিক ভয় করি। কেন না আমরা কোন্ ভাব হইতে কি কথা বলিতেছি, আমাদের কথাগুলি দুঃসহ বেদনা হইতে

* সিডিশান্ বিল্ পাস্ উপলক্ষ্যে টৌন্হলে পঠিত।

উচ্ছ্বসিত, না দুর্ব্বিসহ স্পর্দ্ধা হইতে উদ্‌গীরিত তাহার বিচারের ভার তাঁহাদেরই হস্তে, এবং তাহার বিচারের ফল নিতান্ত সামান্য নহে।

আমি বিদ্রোহী নহি, বীর নহি, বোধ করি নির্ব্বোধও নহি। উদ্যত রাজদণ্ডপাতের দ্বারা দলিত হইয়া অকস্মাত অপঘাত মৃত্যুর ইচ্ছাও আমার নাই; কিন্তু আমাদের রাজকীয় দণ্ডধারী পুরুষটি ভাষার ঠিক কোন সীমানায় ঘাটি বাঁধিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে তাহা আমি স্পষ্টরূপে জানি না,—এবং আমি ঠিক কোন্‌খানে পদার্পণ করিলে শাসনকর্ত্তার লগুড় আসিয়া আমাকে ভূমিশায়ী করিবে তাহা কর্ত্তার নিকটও অস্পষ্ট, সুতরাং স্বভাবতই তাঁহার শাসনদণ্ড আনুমানিক আশঙ্কাবেগে অন্ধভাবে পরিচালিত হইয়া দণ্ডবিধির ন্যায়সীমা উলঙ্ঘন পূর্ব্বক আকস্মিক উল্কাপাতের ন্যায় অযথাস্থানে দুর্ব্বলজীবের অন্তরিন্দ্রিয়কে অসময়ে সচকিত করিয়া তুলিতে পারে। এমনস্থলে সর্ব্বতোভাবে মূক হইয়া থাকাই সুবুদ্ধির কাজ, এবং আমাদের এই দুর্ভাগা দেশে অনেকেই কর্ত্তব্যক্ষেত্র হইতে যথেষ্ট দূরে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া সেই নিরাপদ সদ্বুদ্ধি অবলম্বন করিবেন তাহারও দুই একটা লক্ষণ এখন হইতে দেখা যাইতেছে,—আমাদের দেশের বিক্রমশালী বাগ্মী যাঁহারা বিলাতী সিংহনাদে শ্বেতদ্বৈপায়নগণের চিত্তেও সহসা বিভ্রম উৎপাদন করিতে পারেন তাঁহাদের অনেকে বিবর আশ্রয় করিয়া বাক্‌রোধ অভ্যাস করিতে বসিবেন দেশের এমন একটা দুঃসময় আসন্ন;—সে সময়ে দুর্ভাগ্য দেশের নির্ব্বাক্‌ বেদনা নিবেদন করিতে রাজদ্বারে অগ্রসর হইবে এমন দুঃসাহসিক দেশবন্ধু দুর্লভ হইয়া পড়িবে। যদি চ শাস্ত্রে আছে "রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ" তথাপি শ্মশান যখন রাজদ্বারের এত অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী হইয়াছে তখন ভীত বন্ধুদিগকে কথঞ্চিৎ মার্জ্জনা করিতে হইবে।

অবশ্য, রাজা বিমুখ হইলে আমরা ভয় পাইব না আমাদের এমন স্বভাবই নহে কিন্তু রাজা যে কেন আমাদের প্রতি এতটা ভয় প্রকাশ

করিতে আরম্ভ করিয়াছেন সেই প্রশ্নই আমাদিগকে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছে।

যদিচ ইংরাজ আমাদের একেশ্বর রাজা, এবং তাঁহাদের শক্তিও অপরিমেয়, তথাপি এদেশে তাঁহারা ভয়ে ভয়ে বাস করেন ক্ষণে ক্ষণে তাহার পরিচয় পাইয়া আমরা বিস্ময় বোধ করি। অতি দূরে রুশিয়ার পদধ্বনি অনুমানমাত্র করিলে তাঁহারা যে কিরূপ চকিত হইয়া উঠেন তাহা আমরা বেদনার সহিত অনুভব করিয়াছি। কারণ প্রত্যেকবার তাঁহাদের সেই হৃৎকম্পের চমকে আমাদের ভারতলক্ষ্মীর শূন্যপ্রায় ভাণ্ডারে ভূমিকম্প উপস্থিত হয়, আমাদের দৈন্যপীড়িত কঙ্কালসার দেশের ক্ষুধার অন্নপিণ্ডগুলি মুহূর্তের মধ্যে কামানের কঠিন লৌহপিণ্ডে পরিণত হইয়া যায়;—সেটা আমাদের পক্ষে লঘুপাক খাদ্য নহে।

বাহিরের প্রবল শত্রুসম্বন্ধে এইরূপ সচকিত সতর্কতার সমূলক কারণ থাকিতেও পারে, তাহার নিগূঢ় সংবাদ এবং জটিল তত্ত্ব আমাদের জানা নাই।

কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে উপর্যুপরি কতকগুলি অভাবনীয় ঘটনায় আমরা হঠাৎ আবিষ্কার করিয়াছি, যে বিনা চেষ্টায় বিনা কারণে আমরা ভয় উৎপাদন করিতেছি। আমরা ভয়ঙ্কর! আশ্চর্য্য! ইহা আমরা পূর্ব্বে কেহ সন্দেহই করি নাই।

ইতিমধ্যে একদিন দেখিলাম গবর্মেণ্ট অত্যন্ত সচকিত ভাবে তাঁহার পুরাতন দণ্ডশালা হইতে কতকগুলি অব্যবহৃত কঠিন নিয়মের প্রবল লৌহশৃঙ্খল টানিয়া বাহির করিয়া তাহার মরিচা সাফ করিতে বসিয়াছেন। প্রত্যহ প্রচলিত আইনের মোটা কাছিতেও আমাদিগকে আর বাঁধিয়া রাখিতে পারে না—আমরা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর!

একদিন শুনিলাম অপরাধী-বিশেষকে সন্ধান পূর্ব্বক গ্রেফ্‌তার করিতে অক্ষম হইয়া রোষরক্ত গবর্মেণ্ট সাক্ষীসাবুদ বিচার বিবেচনার বিলম্বমাত্র

না করিয়া একেবারে সমস্ত পুনা সহরের বক্ষের উপর রাজদণ্ডের জগদ্দল পাথর চাপাইয়া দিলেন। আমরা ভাবিলাম পুনা বড় ভয়ঙ্কর সহর! ভিতরে ভিতরে না জানি কি ভয়ানক কাণ্ডই করিয়াছে!

আজ পর্য্যন্ত সে ভয়ানক কাণ্ডের কোন অন্ধিসন্ধি পাওয়া গেল না।

কাণ্ডটা সত্য অথবা স্বপ্ন ইহাই ভাবিয়া অবাক হইয়া বসিয়া আছি এমন সময় তারের খবর আসিল, রাজপ্রাসাদের গুপ্তচূড়া হইতে কোন এক অজ্ঞাত অপরিচিত বীভৎস আইন বিদ্যুতের মত পড়িয়া নাটুভাতৃ-যুগলকে ছোঁ মারিয়া কোথায় অন্তর্দ্ধান করিয়াছে। দেখিতে দেখিতে আকস্মিক গুরুবর্ষার মত সমস্ত বম্বাই প্রদেশের মাথার উপরে কালো মেঘ নিবিড় হইয়া উঠিল এবং জবর্দস্ত শাসনের ঘন ঘন বজ্রপাত ও শিলাবৃষ্টির আয়োজন আড়ম্বরে আমরা ভাবিলাম, ভিতরে কি ঘটিয়াছে জানি না, কিন্তু বেশ দেখিতেছি, ব্যাপারটি সহজ নহে! মহারাট্টীরা বড় ভয়ঙ্কর জাত!

একদিকে পুরাতন আইন শৃঙ্খলের মরিচা সাফ হইল আবার অন্যদিকে রাজকারখানায় নূতন লৌহশৃঙ্খল নির্ম্মাণের ভীষণ হাতুড়িধ্বনিতে সমস্ত ভারতবর্ষ কম্পান্বিত হইয়া উঠিয়াছে! একটা ভয়ানক ধুম পড়িয়া গেছে! আমরা এতই ভয়ঙ্কর!

আমরা এতকাল বিপুলা পৃথিবীকে অচলা বলিয়া বিশ্বাস করিতাম এবং এই প্রবলা বসুন্ধরার প্রতি আমরা যতই নির্ভর ও যতই উপদ্রব করিয়াছি তিনি তাহা অকুণ্ঠিত প্রকাণ্ড শক্তিতে অনায়াসে বহন করিয়াছেন। একদিন নববর্ষার দুর্য্যোগে মেঘাবৃত অপরাহ্নে অকস্মাৎ আমাদের সেই চিরনির্ভরভূমি জানিনা কোন্ নিগূঢ় আশঙ্কায় কম্পান্বিত হইতে লাগিলেন। আমরা দেখিলাম তাঁহার সেই মুহূর্ত্তকালের চাঞ্চল্যে আমাদের বহুকালের প্রিয় পুরাতন বাসস্থানগুলি ধূলিসাৎ হইল।

গবর্মেণ্টের অচলা নীতিও যদি অকস্মাৎ সামান্য অথবা অনির্দ্দেশ্য

আতঙ্কে বিচলিত ও বিদীর্ণ হইয়া আমাদিগকে গ্রাস করিতে উদ্যত হয় তাহা হইলে তাহার শক্তি ও নীতির দৃঢ়তা সম্বন্ধে আমাদের চিরবিশ্বাস হঠাৎ প্রচণ্ড আঘাত প্রাপ্ত হয়। সেই আঘাতে প্রজার মনে ভয়সঞ্চার হওয়া সম্ভবপর কিন্তু সেই সঙ্গে নিজের প্রতিও তাহার অকস্মাৎ অত্যধিক মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। হঠাৎ এ প্রশ্নটা আপনিই মনে উদয় হয় আমি না জানি কি!

সুতরাং ইহার মধ্যে আমাদের একটুখানি সান্ত্বনা আছে। কারণ, সম্পূর্ণ নিস্তেজ নিঃসত্ত্ব জাতির প্রতি বলপ্রয়োগ করা যেমন অনাবশ্যক, তেমনি তাহাকে শঙ্কা করাও অসম্ভব। আমাদিগকে দমন করিবার জন্য অতিরিক্ত আয়োজন দেখিলে ন্যায় অন্যায় বিচার অবিচারের তর্ক দূরে রাখিয়া একথা আমাদের স্বভাবতই মনে হয় যে, হয়ত আমাদের মধ্যে একটা শক্তির সম্ভাবনা আছে যাহা কেবল মূঢ়তাবশত আমরা সকল সময়ে উপলব্ধি করিতে পারি না। গবর্মেণ্ট যখন চারি তরফ হইতেই কামান পাতিতেছেন তখন ইহা নিশ্চয় যে আমরা মশা নহি—অন্তত মরা মশা নহি!

আমাদের স্বজাতির অন্তরে একটা প্রাণ, একটা শক্তির সঞ্চার সম্ভাবনা আমাদের পক্ষে পরমানন্দের বিষয় একথা অস্বীকার করা এমন সুস্পষ্ট কপটতা, যে, তাহা পলিসি স্বরূপে অনাবশ্যক এবং প্রবঞ্চনা স্বরূপে নিষ্ফল। অতএব গবর্মেণ্টের তরফ হইতে আমাদের কোনো খানে সেই শক্তির স্বীকার দেখিতে পাইলে নিরাশ চিত্তে কিঞ্চিৎ গর্ব্বের সঞ্চার না হইয়া থাকিতে পারে না! কিন্তু, হায়, এ গর্ব্ব আমাদের পক্ষে সাংঘাতিক,—শুক্তির মুক্তার ন্যায় ইহা আমাদের পক্ষে ব্যাধি,—উপযুক্ত ধীবররাজ আমাদের জঠরের মধ্যে কঠোর ছুরিকা চালাইয়া এই গর্ব্বটুকু নিঃশেষে বাহির করিয়া লইয়া নিজেদের রাজ-মুকুটের উপরে স্থাপন করিবেন। ইংরাজ নিজের আদর্শে পরিমাপ

করিয়া আমাদিগকে যে অযথা সম্মান দিতেছেন সে সম্মান হয়ত আমাদের পক্ষে একই কালে পরিহাস এবং মৃত্যু! আমাদের যে বল সন্দেহ করিয়া গবর্মেণ্ট আমাদের প্রতি বলপ্রয়োগ করিতেছেন সে বল যদি আমাদের না থাকে তবে গবর্মেণ্টের গুরুদণ্ডে আমরা নষ্ট হইয়া যাইব, সে বল যদি যথার্থ থাকে তবে দণ্ডের তাড়নায় তাহা উত্তরোত্তর দৃঢ় এবং গোপনে প্রবল হইবে।

আমরা ত আমাদিগকে জানি, কিন্তু ইংরেজ আমাদিগকে জানেন না। না জানিবার ১০১ কারণ আছে—তাহা বিস্তারিত পর্য্যালোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। মূল কথাটা এই তাঁহারা আমাদিগকে জানেন না। আমরা পূর্ব্বদেশী, তাঁহারা পশ্চিমদেশী। আমাদের মধ্যে যে কি হইতে কি হয়, কোথায় আঘাত লাগিলে কোন্ খানে ধোঁয়াইয়া উঠে তাহা তাঁহারা ঠিক করিয়া বুঝিতে পারেন না। সেই জন্যই তাঁহাদের ভয়। আমাদের মধ্যে ভয়ঙ্করত্বের আর কোনও লক্ষণ নাই কেবল একটি আছে, আমরা অজ্ঞাত। আমরা স্তন্যপায়ী উদ্ভিজ্জাশী জীব, আমরা শান্ত সহিষ্ণু উদাসীন কিন্তু তবু আমাদিগকে বিশ্বাস করিতে নাই, কারণ আমরা প্রাচ্য আমরা দুর্জ্ঞেয়।

সত্য যদি তাহাই হইবে, তবে হে রাজন্, আমাদিগকে আরও কেন অজ্ঞেয় করিয়া তুলিতেছ? যদি রজ্জুতে সর্পভ্রম ঘটিয়া থাকে তবে তাড়াতাড়ি ঘরের প্রদীপ নিবাইয়া দিয়া ভয়কে আরও পরিব্যাপ্ত করিয়া তুলিতেছ কেন? যে একমাত্র উপায়ে আমরা আত্মপ্রকাশ করিতে পারি, তোমাদের নিকট আপনাকে পরিচিত করিতে পারি তাহা রোধ করিয়া ফল কি?

সিপাহি বিদ্রোহের পূর্ব্বে হাতে হাতে যে রুটি বিলি হইয়াছিল তাহাতে একটি অক্ষরও লেখা ছিল না। সেই নির্ব্বাক নিরক্ষর সংবাদপত্রই কি যথার্থ ভয়ঙ্কর নহে? সর্পের গতি গোপন এবং দংশন নিঃশব্দ, সেই

জন্যই কি তাহা নিদারুণ নহে? সংবাদ পত্র যতই অধিক এবং যতই অবাধ হইবে স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে দেশ ততই আত্মগোপন করিতে পারিবে না। যদি কখনও কোন ঘনান্ধকার অমাবস্যা রাত্রে আমাদের অবলা ভারতভূমি দুরাশার দুঃসাহসে উন্মাদিনী হইয়া বিপ্লবাভিসারে যাত্রা করে, তবে সিংহদ্বারের কুক্কুর না ডাকিতেও পারে, রাজার প্রহরী না জাগিতেও পারে, পুররক্ষক কোতোয়াল তাহাকে না চিনিতেও পারে, কিন্তু তাহার নিজেরই সর্ব্বাঙ্গের কঙ্কণ কিঙ্কিণী নূপুর কেয়ূর, তাহার বিচিত্র ভাষার বিচিত্র সংবাদপত্রগুলি কিছু না কিছু বাজিয়া উঠিবেই, নিষেধ মানিবে না। প্রহরী যদি নিজ হস্তে সেই মুখর ভূষণগুলির ধ্বনি রোধ করিয়া দেন তবে তাঁহার নিদ্রার সুযোগ হইতে পারে কিন্তু পাহারার কি সুবিধা হইবে জানি না!

কিন্তু পাহারা দিবার ভার যে জাগ্রত লোকটির হাতে, পাহারা দিবার প্রণালীও তিনিই স্থির করিবেন; সে সম্বন্ধে বিজ্ঞভাবে পরামর্শ দেওয়া আমার পক্ষে নিরতিশয় ধৃষ্টতা এবং সম্ভবত তাহা নিরাপদও নহে। অতএব মাতৃভাষায় আমার এই দুর্ব্বল উদ্যমের মধ্যে দুশ্চেষ্টা নাই। তবে আমার এই ক্ষীণ, ক্ষুদ্র, ব্যর্থ অথচ বিপদসঙ্কুল বাচালতা কেন? সে কেবল, প্রবলের ভয় দুর্ব্বলের পক্ষে কি ভয়ঙ্কর তাহাই স্মরণ করিয়া!

ইহার একটি ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কিছুদিন হইল একদল ইতর শ্রেণীয় অবিবেচক মুসলমান কলিকাতার রাজপথে লোষ্ট্রখণ্ড হস্তে উপদ্রবের চেষ্টা করিয়াছিল। তাহার মধ্যে বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, উপদ্রবের লক্ষ্যটা বিশেষরূপে ইংরাজেরই প্রতি। তাহাদের শাস্তিও যথেষ্ট হইয়াছিল। প্রবাদ আছে, ইঁটটি মারিলেই পাট্‌খেলটি খাইতে হয়, কিন্তু মূঢ়গণ ইঁটটি মারিয়া পাট্‌খেলের অপেক্ষা অনেক শক্ত শক্ত জিনিষ খাইয়াছিল। অপরাধ করিল দণ্ড পাইল কিন্তু ব্যাপারটা কি আজ পর্য্যন্ত স্পষ্ট বুঝা গেল না। এই নিম্নশ্রেণীর মুসলমানগণ

সংবাদপত্র পড়েও না, সংবাদপত্রে লেখেও না ;—একটা ছোট বড় কাণ্ড হইয়া গেল অথচ এই মূক নির্ব্বাক প্রজা সম্প্রদায়ের মনের কথা কিছু বোঝা গেল না। ব্যাপারটি রহস্যাবৃত রহিল বলিয়াই সাধারণের নিকট তাহার একটা অযথা এবং কৃত্রিম গৌরব জন্মিল। কৌতূহলী কল্পনা হ্যারিসন রোডের প্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া তুরস্কের অর্দ্ধচন্দ্রশিখরী রাজপ্রাসাদ পর্য্যন্ত সম্ভব ও অসম্ভব অনুমানকে শাখাপল্লবান্বিত করিয়া চলিল। ব্যাপারটি রহস্যাবৃত রহিল বলিয়াই আতঙ্কচকিত ইংরাজি কাগজ কেহ বলিল ইহা কন্‌গ্রেসের সহিত যোগবদ্ধ রাষ্ট্রবিপ্লবের সূচনা, কেহ বলিল মুসলমানদের বস্তিগুলা একেবারে উড়াইয়া পুড়াইয়া দেওয়া যাক্, কেহ বলিল এমন নিদারুণ বিপৎপাতের সময় তুহিনাবৃত শৈলশিখরের উপর বড়লাট সাহেবের এতটা সুশীতল হইয়া বসিয়া থাকা উচিত হয় না।

রহস্যই অনিশ্চিত ভয়ের প্রধান আশ্রয় স্থান—এবং প্রবল ব্যক্তির অনিশ্চিত ভয় দুর্ব্বল ব্যক্তির নিশ্চিত মৃত্যু! রুদ্ধবাক্ সংবাদপত্রের মাঝখানে রহস্যান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া থাকা আমাদের পক্ষে বড়ই ভয়ঙ্কর অবস্থা। তাহাতে করিয়া আমাদের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ রাজপুরুষদের চক্ষে সংশয়ান্ধকারে অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ দেখাইবে। দুরপনেয় অবিশ্বাসে রাজদণ্ড উত্তরোত্তর খরধার হইয়া উঠিবে এবং প্রজার হৃদয় বিষাদে ভারাক্রান্ত ও নির্ব্বাক্ নৈরাশ্যে বিষতিক্ত হইতে থাকিবে। আমরা ইংরাজের একান্ত অধীন প্রজা, কিন্তু প্রকৃতির নিয়ম তাঁহার দাসত্ব করে না। আঘাত করিলে আমরা বেদনা পাইব ; ইংরাজ হাজার চক্ষু রক্তবর্ণ করিলেও এ নিয়মটাকে দেশান্তরিত করিতে পারিবেন না। তাঁহারা রাগ করিয়া আঘাতের মাত্রা বাড়াইতে পারেন, কিন্তু বেদনার মাত্রাও সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া উঠিবে। কারণ, সে বিধির নিয়ম ; পিনালকোডে তাহার কোন নিষেধ নাই। অন্তর্দাহ বাক্যে প্রকাশ না

হইলে অন্তরে সঞ্চিত হইতে থাকে। সেইরূপ অস্বাস্থ্যকর অস্বাভাবিক অবস্থায় রাজা প্রজার সম্বন্ধ যে কিরূপ বিকৃত হইবে তাহা কল্পনা করিয়া আমরা ভীত হইতেছি।

কিন্তু এই অনির্দ্দিষ্ট সংশয়ের অবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান অমঙ্গল নহে। আমাদের পক্ষে ইহা অপেক্ষা গুরুতর অশুভ আছে। মানব চরিত্রের উপরে পরাধীনতার অবনতিকর ফল আছেই তাহা আমরা ইংরাজের নিকট হইতেই শিখিয়াছি। অসত্যাচরণ কপটতা অধীন জাতির আত্মরক্ষার অস্ত্রস্বরূপ হইয়া তাহার আত্মসম্মানকে তাহার মনুষ্যত্বকে নিশ্চিতরূপে নষ্ট করিয়া ফেলে। স্বাধীনতাপূজক ইংরাজ আপন প্রজাদিগের অধীনদশা হইতে সেই হীনতার কলঙ্ক যথাসম্ভব অপনয়ন করিয়া আমাদিগকে মনুষ্যত্বের শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। আমরা বিজিত তাঁহারা বিজেতা, আমরা দুর্ব্বল তাঁহারা সবল ইহা তাঁহারা পদে পদে স্মরণ করাইয়া রাখেন নাই। এতদূর পর্য্যন্তও ভুলিতে দিয়াছিলেন যে, আমরা মনে করিয়াছিলাম ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতা আমাদের মনুষ্যত্বের স্বাভাবিক অধিকার।

আজ সহসা জাগ্রত হইয়া দেখিতেছি দুর্ব্বলের কোন অধিকারই নাই। আমরা যাহা মনুষ্য-মাত্রেরই প্রাপ্য মনে করিয়াছিলাম তাহা দুর্ব্বলের প্রতি প্রবলের স্বেচ্ছাধীন অনুগ্রহ মাত্র। আমি আজ যে এই সভাস্থলে দাঁড়াইয়া একটিমাত্র শব্দোচ্চারণ করিতেছি তাহাতে আমার মনুষ্যোচিত গর্ব্বানুভব করিবার কোন কারণ নাই,—দোষ করিবার ও বিচার হইবার পূর্ব্বেই যে আমি কারাগারের মধ্যে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত দেখিতেছি না তাহাতেও আমার কোনও গৌরব নাই।

ইহা এক হিসাবে সত্য। কিন্তু এই সত্য সর্ব্বদা অনুভব করা রাজা প্রজা কাহারও পক্ষে হিতকর নহে। মনুষ্য, অবস্থার পার্থক্যের মাঝখানে হৃদয়ের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া অসমানতার মধ্যেও নিজের মনুষ্যত্ব রক্ষার চেষ্টা করে।

শাসিত ও শাসনকর্ত্তার মধ্যবর্ত্তী শাসনশৃঙ্খলটাকে সর্ব্বদা ঝঙ্কার না দিয়া সেটাকে আত্মীয় সম্বন্ধ বন্ধনরূপে ঢাকিয়া রাখিলে অধীন জাতির ভার লাঘব হয়।

মুদ্রা যন্ত্রের স্বাধীনতা এই প্রকারের একটা আচ্ছাদন পট। ইহাতে আমাদের অবস্থার হীনতা গোপন করিয়া রাখিয়াছিল। আমরা জেতৃ-জাতির সহস্র ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত হইয়াও এই স্বাধীনতাসূত্রে অন্তরঙ্গ-ভাবে তাঁহাদের নিকটবর্ত্তী ছিলাম। আমরা দুর্ব্বলজাতির হীন ভয় ও কপটতা ভুলিয়া মুক্ত হৃদয়ে উন্নত মস্তকে সত্য কথা স্পষ্ট কথা বলিতে শিখিতেছিলাম।

যদি চ উচ্চতর রাজকার্য্যে আমাদের স্বাধীনতা ছিল না, তথাপি নির্ভীকভাবে পরামর্শ দিয়া স্পষ্ট বাক্যে সমালোচনা করিয়া আপনাদিগকে এই বিপুল ভারতরাজ্যশাসনকার্য্যের অঙ্গ বলিয়া জ্ঞান করিতাম। তাহার অন্য ফলাফল বিবেচনা করিবার সময় নাই, কিন্তু তাহাতে আমাদের আত্মসম্মান বাড়িয়া উঠিয়াছিল। আমরা জানিতাম আমাদের স্বদেশ শাসনের বিপুল ব্যাপারে আমরা অকর্ম্মণ্য নিশ্চেষ্ট নহি—ইহার মধ্যে আমাদেরও কর্ত্তব্য আমাদেরও দায়িত্ব আছে। এই শাসন কার্য্যের উপর যখন প্রধানতঃ আমাদের সুখ দুঃখ আমাদের শুভ অশুভ নির্ভর করিতেছে, তখন তাহার সহিত আমাদের কোনও মন্তব্য কোনও বক্তব্য বন্ধনের যোগ না থাকিলে আমাদের দীনতা আমাদের হীনতার আর অবধি থাকে না। বিশেষতঃ আমরা ইংরাজি বিদ্যালয়ে শিক্ষা পাইয়াছি, ইংরাজি সাহিত্য হইতে ইংরাজ কর্ম্মবীরগণের দৃষ্টান্ত আমাদের অন্তঃকরণের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সর্ব্বপ্রকার ব্যাপারেই নিজের শুভসাধনে আমাদের নিজের স্বাধীন অধিকার থাকার যে পরম গৌরব তাহা আমরা অনুভব করিয়াছি। আজ যদি অকস্মাৎ আমরা সেই ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত হই,—রাজকার্য্যচালনার সহিত

আমাদের সমালোচনার ক্ষুদ্র সম্বন্ধটুকুও এক আঘাতে বিচ্ছিন্ন হয়, এবং হয় আমরা নিশ্চেষ্ট উদাসীনতার মধ্যে নিমগ্ন হইয়া থাকি, নয় কপটতা ও মিথ্যা বাক্যের দ্বারা প্রবলতার রাঙ্গা পদতলে আপন মনুষ্যত্বকে সম্পূর্ণ বলিদান করি, তবে পরাধীনতার সমস্ত হীনতার সঙ্গে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত আকাঙ্ক্ষার বাক্যহীন ব্যর্থবেদনা মিশ্রিত হইয়া আমাদের দুর্দ্দশা পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইবে; যে সম্বন্ধের মধ্যে আদান-প্রদানের একটি সঙ্কীর্ণ পথ খোলা ছিল ভয় আসিয়া সে পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইবে;—রাজার প্রতি প্রজার সে ভয় গৌরবের নহে এবং প্রজার প্রতি রাজার সে ভয় ততোধিক শোচনীয়।

এই মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতাবরণ উত্তোলন করিয়া লইলে আমাদের পরাধীনতার সমস্ত কঠিন কঙ্কাল এক মুহূর্ত্তে বাহির হইয়া পড়িবে। আজকালকার কোন কোন জবরদস্ত ইংরাজ লেখক বলেন যাহা সত্য তাহা অনাবৃত হইয়া থাকাই ভাল। কিন্তু, আমরা জিজ্ঞাসা করি ইংরাজশাসনে এই কঠিন শুষ্ক পরাধীনতার কঙ্কালই কি একমাত্র সত্য, ইহার উপরে জীবনের লাবণ্যের যে আবরণ, স্বাধীন গতিভঙ্গীর যে বিচিত্রলীলা মনোহর শ্রী অর্পণ করিয়াছিল তাহাই কি মিথ্যা, তাহাই কি মায়া? দুইশত বৎসর পরিচয়ের পরে আমাদের মানব সম্বন্ধের এই কি অবশেষ?

১৩০৫

অত্যুক্তি

(দিল্লি দরবারের উদ্যোগকালে লিখিত)

পৃথিবীর পূর্ব্বকোণের লোক—অর্থাৎ আমরা—অত্যুক্তি অত্যন্ত ব্যবহার করিয়া থাকি, আমাদের পশ্চিমের গুরুমশায়দের কাছ হইতে

ইহা লইয়া আমরা প্রায় বকুনি খাই। যাঁহারা সাত সমুদ্র পার হইয়া আমাদের ভালর জন্য উপদেশ দিতে আসেন তাঁহাদের কথা আমাদের নতশিরে শোনা উচিত। কারণ তাঁহারা যে হতভাগ্য আমাদের মত কেবল কথাই বলিতে জানেন তাহা নহে—কথা যে কি করিয়া শোনাইতে হয় তাহাও তাঁহাদের অবিদিত নাই। আমাদের দুটো কানের উপরেই তাঁহাদের দখল সম্পূর্ণ।

কিন্তু উপদেশ ও ভৎর্সনা ত বার বার শুনিয়াছি; আমরা যে কত অধম তাহা আমাদের স্কুলপাঠ্য জিয়োগ্রাফির পত্রে মর্ম্মরিত ও কন্‌ভোকেশন হলে প্রতিধ্বনিত হইতেছে; আমাদের ক্ষীণ কৈফিয়ৎ ইহাকে চাপাইয়া উঠিতে পারিবে না; তবু না বলিয়া বাঁচি কই? নত শিরকে আর কত নত করিব?

আসল কথা, সকল জাতির মধ্যেই অত্যুক্তি ও অতিশয্য আছে। নিজেরটাকেই অত্যন্ত স্বাভাবিক ও পরেরটাকেই অত্যন্ত অসঙ্গত বোধ হয়। যে প্রসঙ্গে আমাদের কথা আপনি বাড়িয়া চলে, সে প্রসঙ্গে ইংরেজ চুপ—যে প্রসঙ্গে ইংরেজ অত্যন্ত বেশি বকিয়া থাকে, সে প্রসঙ্গে আমাদের মুখে কথা বাহির হয় না। আমরা মনে করি—ইংরেজ বড় বাড়াবাড়ি করে, ইংরেজ মনে করে, প্রাচ্যলোকের পরিমাণবোধ নাই।

আমাদের দেশে গৃহস্থ অতিথিকে সম্বোধন করিয়া বলে—"সমস্ত আপনারি—আপনারি ঘর, আপনারি বাড়ী।" ইহা অত্যুক্তি। ইংরেজ তাহার নিজের রান্নাঘরে প্রবেশ করিতে হইলে রাঁধুনিকে জিজ্ঞাসা করে—"ঘরে ঢুকিতে পারি কি?" এ একরকমের অত্যুক্তি।

স্ত্রী নুনের বাটি সরাইয়া দিলে ইংরেজ স্বামী বলে—"আমার ধন্যবাদ জানিবে!" ইহা অত্যুক্তি। নিমন্ত্রণকারীর ঘরে চর্ব্যচোষ্য খাইয়া এবং বাঁধিয়া এদেশীয় নিমন্ত্রিত বলে—"বড় পরিতোষ লাভ করিলাম"—অর্থাৎ

আমার পরিতোষেই তোমার পারিতোষিক ; তদুত্তরে নিমন্ত্রণকারী বলে— "আমি কৃতার্থ হইলাম"—ইহাকে অত্যুক্তি বলিতে পার।

আমাদের দেশে স্ত্রী স্বামীকে পত্রে "শ্রীচরণেষু" পাঠ লিখিয়া থাকে, ইংরেজের কাছে ইহা অত্যুক্তি। ইংরেজ যাহাকে-তাহাকে পত্রে প্রিয়-সম্বোধন করে—অভ্যস্ত না হইয়া গেলে ইহা আমাদের কাছে অত্যুক্তি বলিয়া ঠেকিত।

নিশ্চয়ই আরো এমন সহস্র দৃষ্টান্ত আছে। কিন্তু এগুলি বাঁধা অত্যুক্তি —ইহারা পৈতৃক। দৈনিক ব্যবহারে আমরা নব নব অত্যুক্তি রচনা করিয়া থাকি—ইহাই প্রাচ্যজাতির প্রতি ভর্ৎসনার কারণ।

তালি একহাতে বাজে না তেমনি কথা দুজনে মিলিয়া হয়। শ্রোতা ও বক্তা যেখানে পরস্পরের ভাষা বোঝে, সেখানে অত্যুক্তি উভয়ের যোগে আপনি সংশোধিত হইয়া আসে। সাহেব যখন চিঠির শেষে আমাকে লেখেন Yours truly—সত্যই তোমারি, তখন তাঁহার এই অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার সত্যপাঠটুকুকে তর্জ্জমা করিয়া আমি এই বুঝি, তিনি সত্যই আমারি নহেন। বিশেষত বড়সাহেব যখন নিজেকে আমার বাধ্যতম ভৃত্য বলিয়া বর্ণনা করেন, তখন অনায়াসে সে কথাটার ষোল-আনা বাদ দিয়া তাহার উপরে আরো ষোল-আনা কাটিয়া লইতে পারি। এগুলি বাঁধাদস্তুরের অত্যুক্তি, কিন্তু প্রচলিত ভাষাপ্রয়োগের অত্যুক্তি ইংরেজীতে ঝুড়িঝুড়ি আছে। Immensely, immeasurably, extremely, awfully, infinitely, absolutely, ever so much, for the life of me, for the world, unbounded, endless প্রভৃতি শব্দপ্রয়োগগুলি যদি সর্ব্বত্র যথার্থভাবে লওয়া যায়, তবে প্রাচ্য অত্যুক্তিগুলি ইহজন্মে আর মাথা তুলিতে পারে না।

বাহ্যবিষয়ে আমাদের কতকটা ঢিলামি আছে, এ কথা স্বীকার

করিতেই হইবে। বাহিরের জিনিষকে আমরা ঠিক্‌ঠাক্‌মত দেখি না, ঠিক্‌ঠাক্‌মত গ্রহণ করি না। যখন তখন বাহিরের নয়কে আমরা ছয় এবং ছয়কে আমরা নয় করিয়া থাকি। ইচ্ছা করিয়া না করিলেও এস্থলে অজ্ঞানকৃত পাপের ডবল্‌ দোষ—একে পাপ, তাহাতে অজ্ঞান। ইন্দ্রিয়কে এমন অলস এবং বুদ্ধিকে এমন অসাবধান করিয়া রাখিলে, পৃথিবীতে আমাদের দুটি প্রধান নির্ভরকে একেবারে মাটি করা হয়। বৃত্তান্তকে নিতান্ত ফাঁকি দিয়া সিদ্ধান্তকে যাহারা কল্পনার সাহায্যে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করে, তাহারা নিজেকেই ফাঁকি দেয়। যে-যে বিষয়ে আমাদের ফাঁকি আছে, সেই-সেই বিষয়েই আমরা ঠকিয়া বসিয়া আছি। একচক্ষু হরিণ যে দিকে তাহার কাণা চোখ ফিরাইয়া আরামে ঘাস খাইতেছিল, সেই দিক্‌ হইতেই ব্যাধের তীর তাহার বুকে বাজিয়াছে। আমাদের কাণা চোখটা ছিল ইহলোকের দিকে—সেই তরফ হইতে আমাদের শিক্ষা যথেষ্ট হইয়াছে। সেই দিকের ঘা খাইয়া আমরা মরিলাম! কিন্তু স্বভাব না যায় ম'লে!

নিজের দোষ কবুল করিলাম, এবার পরের প্রতি দোষারোপ করিবার অবসর পাওয়া যাইবে। অনেকে এরূপ চেষ্টাকে নিন্দা করেন, আমরাও করি। কিন্তু যে লোক বিচার করে, অন্যে তাহাকে বিচার করিবার অধিকারী। সে অধিকারটা ছাড়িতে পারিব না। তাহাতে পরের কোন উপকার হইবে বলিয়া আশা করি না—কিন্তু অপমানের দিনে যেখানে যতটুকু আত্মপ্রসাদ পাওয়া যায়, তাহা ছাড়িয়া দিতে পারিব না।

আমরা দেখিয়াছি, আমাদের অত্যুক্তি অলসবুদ্ধির বাহ্যপ্রকাশ। তা ছাড়া সুদীর্ঘকাল পরাধীনতাবশত চিত্তবিকারেরও হাত দেখিতে পাই। যেমন আমাদিগকে যখন-তখন, সময়ে অসময়ে, উপলক্ষ্য থাক্‌ বা না থাক্‌, চীৎকার করিয়া বলিতে হয়—আমরা রাজভক্ত। অথচ

ভক্তি করিব কাহাকে, তাহার ঠিকানা নাই। আইনের বইকে, না, কমিশনর-সাহেবের চাপরাশকে, না পুলিসের দারোগাকে? গবর্মেণ্ট আছে, কিন্তু মানুষ কই? হৃদয়ের সম্বন্ধ পাতাইব কাহার সঙ্গে? আপিস্‌কে বক্ষে আলিঙ্গন করিয়া ধরিতে পারি না। মাঝে মাঝে অপ্রত্যক্ষ রাজার মৃত্যু বা অভিষেক উপলক্ষ্যে যখন বিবিধ চাঁদার আকারে রাজভক্তি দোহন করিয়া লইবার আয়োজন হয়, তখন, ভীতচিত্তে, শুষ্কভক্তি ঢাকিবার জন্য অতিদান ও অত্যুক্তির দ্বারা রাজপাত্র কানায় কানায় পূর্ণ করিয়া দিতে হয়। যাহা স্বাভাবিক নহে, তাহাকে প্রমাণ করিতে হইলে লোকে অধিক চীৎকার করিতে থাকে— এ কথা ভুলিয়া যায় যে, মৃদুস্বরে যে বেসুর ধরা পড়ে না, চীৎকারে তাহা চারগুণ হইয়া উঠে।

কিন্তু এই শ্রেণীর অত্যুক্তির জন্য আমরা একা দায়ী নই। ইহাতে পরাধীন জাতির ভীরুতা ও হীনতা প্রকাশ পায় বটে, কিন্তু এই অবস্থাটায় আমাদের কর্তৃপুরুষদের মহত্ত্ব ও সত্যানুরাগের প্রমাণ দেয় না। জলাশয়ের জল সমতল নহে, এ কথা যখন কেহ অম্লানমুখে বলে, তখন বুঝিতে হইবে, সে কথাটা অবিশ্বাস্য হইলেও তাহার মনিব তাহাই শুনিতে চাহে। আজকালকার সাম্রাজ্যমদমত্ততার দিনে ইংরেজ নানাপ্রকারে শুনিতে চায় আমরা রাজভক্ত,—আমরা তাহার চরণতলে স্বেচ্ছায় বিক্রীত। এ কথা জগতের কাছে তাহারা ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত করিতে চাহে।

এদিকে আমাদের প্রতি সিকি-পয়সার বিশ্বাস মনের মধ্যে নাই; এত-বড় দেশটা সমস্ত নিঃশেষে নিরস্ত্র; একটা হিংস্র পশু দ্বারের কাছে আসিলে দ্বারে অর্গল লাগানো ছাড়া আর কোন উপায় আমাদের হাতে নাই—অথচ জগতের কাছে সাম্রাজ্যের বলপ্রমাণ উপলক্ষ্যে আমাদের অটল ভক্তি রটাইবার বেলা আমরা আছি! মুসলমান সম্রাটের সময়

দেশনায়কতা সেনানায়কতার অধিকার আমরা হারাই নাই;—মুসলমান সম্রাট্ যখন সভাস্থলে সামন্তরাজগণকে পার্শ্বে লইয়া বসিতেন, তখন তাহা শূন্যগর্ভ প্রহসনমাত্র ছিল না। যথার্থই রাজারা সম্রাটের সহায় ছিলেন, রক্ষী ছিলেন, সম্মানভাজন ছিলেন। আজ রাজাদের সম্মান মৌখিক, অথচ তাহাদিগকে পশ্চাতে টানিয়া লইয়া দেশে-বিদেশে রাজভক্তির অভিনয় ও আড়ম্বর তখনকার চেয়ে চারগুণ। যখন ইংলণ্ডের সাম্রাজ্যলক্ষ্মী সাজ পরিতে বসেন, তখন কলোনিগুলির সামান্য শাসন-কর্ত্তারা মাথার মুকুটে ঝল্‌মল্ করেন; আর ভারতবর্ষের প্রাচীনবংশীয় রাজগণ তাঁহার চরণনূপুরে কিঙ্কিণীর মত আবদ্ধ হইয়া কেবল ঝঙ্কার দিবার কাজ করিতে থাকেন—এবারকার বিলাতি দরবারে তাহা বিশ্বজগতের কাছে জারি হইয়াছে! ইংরেজের সাম্রাজ্যজগন্নাথজীর মন্দিরে, যেখানে কানাডা, নিউজিলাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা স্বাধীন দীপ্ত ও পরিপুষ্ট দেহ লইয়া দিব্য হাঁকডাক সহকারে পাণ্ডাগিরি করিয়া বেড়াইতেছে, সেখানে কৃশজীর্ণ ভারতবর্ষের কোথাও প্রবেশাধিকার নাই—ঠাকুরের ভোগও তাহার কপালে অল্পই জোটে—কিন্তু যে দিন বিশ্বজগতের রাজপথে ঠাকুরের অভ্রভেদী রথ বাহির হয়, সেই একটা দিন রথের দড়া ধরিয়া টানিবার জন্য ভারতবর্ষের ডাক পড়ে। সেদিন কত বাহবা, কত করতালি, কত সৌহার্দ্য—সেদিন কার্জ্জনের নিষেধশৃঙ্খলমুক্ত ভারতবর্ষীয় রাজাদের মণিমাণিক্য লণ্ডনের রাজপথে ঝল্‌মল্ করিতে থাকে এবং লণ্ডনের হাঁসপাতালগুলির 'পরে রাজভক্ত রাজাদের মুষলধারে বদান্যতাবৃষ্টির বার্ত্তা ভারতবর্ষ নতশিরে নীরবে শ্রবণ করে! এই ব্যাপারের সমস্তটা পাশ্চাত্য অত্যুক্তি। ইহা মেকি অত্যুক্তি—খাঁটি নহে!

প্রাচ্যদিগের অত্যুক্তি ও আতিশয্য অনেক সময়েই তাহাদের স্বভাবের ঔদার্য্য হইতেই ঘটিয়া থাকে। পাশ্চাত্য অত্যুক্তি সাজানো

জিনিষ, তাহা জাল বলিলেই হয়। দিল্‌দরাজ মোগলসম্রাট্‌দের আমলে দিল্লিতে দরবার জমিত। আজ সে দিল্ নাই, সে দিল্লি নাই, তবু একটা নকল দরবার করিতে হইবে। সংবৎসর ধরিয়া রাজারা পোলিটিকাল্ এজেন্টের রাহুগ্রাসে কবলিত;—সাম্রাজ্যচালনায় তাহাদের স্থান নাই, কাজ নাই, তাহাদের স্বাধীনতা নাই—হঠাৎ একদিন ইংরেজসম্রাটের নায়েব, পরিত্যক্তমহিমা দিল্লিতে সেলাম কুড়াইবার জন্য ইংরাজদিগকে তলব দিলেন, নিজের ভূলুণ্ঠিত পোষাকের প্রান্ত শিখ্ ও রাজপুত রাজকুমারদের দ্বারা বহন করাইয়া লইলেন,—আকস্মিক উপদ্রবের মত একদিন একটা সমারোহের আগ্নেয় উচ্ছ্বাস উদ্‌গীরিত হইয়া উঠিল,—তাহার পর সমস্ত শূন্য, সমস্ত নিষ্প্রভ।

এখনকার ভারতসাম্রাজ্য আপিসে এবং আইনে চলে—তাহার রংচং নাই, গীতবাদ্য নাই, তাহাতে প্রত্যক্ষ মানুষ নাই। ইংরেজের খেলাধূলা, নাচগান, আমোদপ্রমোদ, সমস্ত নিজেদের মধ্যে বদ্ধ—সে আনন্দ-উৎসবের উদ্বৃত্ত খুদকুঁড়াও ভারতবর্ষের জনসাধারণের জন্য প্রমোদশালার বাহিরে আসিয়া পড়ে না। আমাদের সঙ্গে ইংরেজের সম্বন্ধ আপিসের বাঁধা কাজ এবং হিসাবের খাতা-সহির সম্বন্ধ। প্রাচ্য সম্রাটের ও নবাবের সঙ্গে আমাদের অন্নবস্ত্র, শিল্পশোভা, আনন্দ-উৎসবের নানা সম্বন্ধ ছিল। তাঁহাদের প্রাসাদে প্রমোদের দীপ জ্বলিলে তাহার আলোক চারিদিকে প্রজার ঘরে ছড়াইয়া পড়িত—তাহাদের তোরণদ্বারে যে নহবৎ বসিত, তাহার আনন্দধ্বনি দীনের কুটীরের মধ্যেও প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিত।

ইংরেজ সিভিলিয়ানগণ পরস্পরের আমন্ত্রণে-নিমন্ত্রণে-সামাজিকতায় যোগদান করিতে বাধ্য, যে ব্যক্তি স্বভাবদোষে এই সকল বিনোদন-ব্যাপারে অপটু, তাহার উন্নতির অনেক ব্যাঘাত ঘটে। এই সমস্তই নিজেদের জন্য। যেখানে পাঁচটা ইংরেজ আছে, সেখানে আমোদ-

আহ্লাদের অভাব নাই—কিন্তু সে আমোদে চারিদিক্‌ আমোদিত হইয়া উঠে না। আমরা কেবল দেখিতে পাই—কুলিগুলা বাহিরে বসিয়া সন্ত্রস্তচিত্তে পাখার দড়ি টানিতেছে, সহিস্‌ ডগ্‌কার্টের ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া চামর দিয়া মশামাছি তাড়াইতেছে, এবং দগ্ধ ভারতবর্ষের তপ্ত সংস্রব হইতে সুদূরে যাইবার জন্য রাজপুরুষগণ সিম্‌লার শৈল-শিখরে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া চলিয়াছেন। ভারতবর্ষে ইংরাজরাজ্যের বিপুল শাসনকার্য্য একেবারে আনন্দহীন, সৌন্দর্য্যহীন—তাহার সমস্ত পথই আপিস্‌-আদালতের দিকে—জনসমাজের হৃদয়ের দিকে নহে। হঠাৎ ইহার মধ্যে একটা খাপ্‌ছাড়া দরবার কেন? সমস্ত শাসনপ্রণালীর সঙ্গে তাহার কোন্‌খানে যোগ? গাছে লতায় ফুল ধরে, আফিসের কড়ি-বরগায় ত মাধবী-মঞ্জরী ফোটে না! এ যেন মরুভূমির মধ্যে মরীচিকার মত। এ ছায়া তাপনিবারণের জন্য নহে, এ জল তৃষ্ণা দূর করিবে না।

পূর্ব্বকার দরবারে সম্রাটেরা যে নিজের প্রতাপ জাহির করিতেন, তাহা নহে; সে সকল দরবার কাহারো কাছে তারস্বরে কিছু প্রমাণ করিবার জন্য ছিল না,—তাহা স্বাভাবিক;—সে সকল উৎসব বাদসাহ-নবাবদের ঔদার্য্যের উদ্বেলিত-প্রবাহস্বরূপ ছিল;—সেই প্রবাহ বদান্যতা বহন করিত, তাহাতে প্রার্থীর প্রার্থনা পূর্ণ করিত, দীনের অভাব দূর হইত, তাহাতে আশা এবং আনন্দ দূরদূরান্তরে বিকীর্ণ হইয়া যাইত। আগামী দরবার উপলক্ষ্যে কোন্‌ পীড়িত আশ্বস্ত হইয়াছে, কোন্‌ দরিদ্র সুখস্বপ্ন দেখিতেছে? সেদিন যদি কোনো দুরাশাগ্রস্ত দুর্ভাগা দরখাস্ত হাতে সম্রাট্‌প্রতিনিধির কাছে অগ্রসর হইতে চায়, তবে কি পুলিশের প্রহার পৃষ্ঠে লইয়া তাহাকে কাঁদিয়া ফিরিতে হইবে না?

তাই বলিতেছিলাম আগামী দিল্লীর দরবার পাশ্চাত্য অত্যুক্তি, তাহা মেকি অত্যুক্তি। এদিকে হিসাবকিতাব এবং দোকানদারিটুকু

আছে—ওদিকে প্রাচ্যসম্রাটের নকলটুকু না করিলে নয়। আমরা দেশব্যাপী অনশনের দিনে এই নিতান্ত ভূয়া দরবারের আড়ম্বর দেখিয়া ভীত হইয়াছিলাম বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষ আশ্বাস দিয়া বলিয়াছেন—খরচ খুব বেশি হইবে না, যাহাও হইবে, তাহার অর্দ্ধেক আদায় করিয়া লইতে পারিব। কিন্তু সে দিন উৎসব করা চলে না, যেদিন খরচপত্র সাম্‌লাইয়া চলিতে হয়। তহবিলের টানাটানি লইয়া উৎসব করিতে হইলে, নিজের খরচ বাঁচাইবার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া অন্যের খরচের প্রতি উদাসীন হইতে হয়। তাই আগামী দরবারে সম্রাটের নায়েব অল্প খরচে কাজ চালাইবেন বটে, কিন্তু আড়ম্বরটাকে স্ফীত করিয়া তুলিবার জন্য রাজাদিগকে খরচ করাইবেন। প্রত্যেক রাজাকে অন্ততঃ ক'টা হাতী, ক'টা ঘোড়া, ক'জন লোক আনিতে হইবে, শুনিতেছি তাহার অনুশাসন জারি হইয়াছে। সেই সকল রাজাদেরই হাতিঘোড়া-লোকলস্করে যথাসম্ভব অল্পখরচে চতুর সম্রাট্‌প্রতিনিধি যথাসম্ভব বৃহৎব্যাপার ফাঁদিয়া তুলিবেন। ইহাতে চাতুর্য্য ও প্রতাপের পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু বদান্যতা ও ঔদার্য্য—প্রাচ্য সম্প্রদায়ের মতে যাহা রাজকীয় উৎসবের প্রাণ বলিলেই হয় তাহা ইহার মধ্যে থাকে না। এক চক্ষু টাকার থলিটির দিকে এবং অন্য চক্ষু সাবেক বাদ্‌শাহের অনুকরণকার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়া এ সকল কাজ চলে না। এ সব কাজ যে স্বভাবত পারে, সেই পারে এবং তাহাকেই শোভা পায়।

ইতিমধ্যে আমাদের দেশের একটি ক্ষুদ্র রাজা সম্রাটের অভিষেক উপলক্ষে তাঁহার প্রজাদিগকে বহুসহস্র টাকা খাজ্‌না মাপ দিয়াছেন। আমাদের মনে হইল, ভারতবর্ষের রাজকীয় উৎসব কি ভাবে চালাইতে হয়, ভারতবর্ষীয় এই রাজাটি তাহা ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষদিগকে শিক্ষা দিলেন। কিন্তু যাহারা নকল করে, তাহারা আসল শিক্ষাটুকু গ্রহণ করে না, তাহারা বাহ্য আড়ম্বরটাকেই ধরিতে পারে। তপ্তবালুকা সূর্য্যের মত তাপ দেয়, কিন্তু আলোক দেয় না। সেইজন্য তপ্তবালুকার তাপকে আমাদের দেশে

অসহ্য আতিশয্যের উদাহরণ বলিয়া উল্লেখ করে। আগামী দিল্লিদরবারও সেইরূপ প্রতাপ বিকিরণ করিবে, কিন্তু আশা ও আনন্দ দিবে না। শুদ্ধমাত্র দম্ভ-প্রকাশ সম্রাটকেও শোভা পায় না—ঔদার্য্যের দ্বারা—দয়াদাক্ষিণ্যের দ্বারা দুঃসহ দম্ভকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখাই যথার্থ রাজোচিত। আগামী দরবারে ভারতবর্ষ তাহার সমস্ত রাজরাজন্য লইয়া বর্ত্তমান বাদ্‌সাহের নায়েবের কাছে নতিস্বীকার করিতে যাইবে, কিন্তু বাদ্‌সাহ তাহাকে কি সম্মান, কি সম্পদ্, কোন্ অধিকার দান করিবেন? কিছুই নহে। ইহাতে যে কেবল ভারতবর্ষের অবনতিস্বীকার তাহা নহে, এইরূপ শূন্যগর্ভ আকস্মিক দরবারের বিপুল কার্পণ্যে ইংরেজের রাজমহিমা প্রাচ্যজাতির নিকট খর্ব্ব না হইয়া থাকিতে পারে না।

যে সকল কাজ ইংরেজী দস্তুরমতে সম্পন্ন হয়, তাহা আমাদের প্রথার সঙ্গে না মিলিলেও সে সম্বন্ধে আমরা চুপ করিয়া থাকিতে বাধ্য। যেমন, আমাদের দেশে বরাবর রাজার আগমনে বা রাজকীয় শুভকর্ম্মাদিতে যে সকল উৎসব আমোদ হইত, তাহার ব্যয় রাজাই বহন করিতেন, প্রজারা জন্মতিথি প্রভৃতি নানাপ্রকার উপলক্ষ্যে রাজার অনুগ্রহ লাভ করিত। এখন ঠিক তাহার উল্টা হইয়াছে। রাজা জন্মিলে-মরিলে নড়িলে-চড়িলে প্রজার কাছে রাজার তরফ হইতে চাঁদার খাতা বাহির হয়, রাজা-রায়-বাহাদুর প্রভৃতি খেতাবের রাজকীয় নিলামের দোকান জমিয়া উঠে। আকবর-সাজাহান্ প্রভৃতি বাদ্‌শারা নিজেদের কীর্ত্তি নিজেরা রাখিয়া গেছেন,—এখনকার দিনে রাজকর্ম্মচারীরা নানা ছলে নানা কৌশলে প্রজাদের কাছ হইতে বড় বড় কীর্ত্তিস্তম্ভ আদায় করিয়া লন। এই যে সম্রাটের প্রতিনিধি সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজাদিগকে সেলাম দিবার জন্য ডাকিয়াছেন, ইনি নিজের দানের দ্বারায় কোথায় দীঘি খনন করাইয়াছেন, কোথায় পান্থশালা নির্ম্মাণ করিয়াছেন, কোথায় দেশের বিদ্যাশিক্ষা ও শিল্পচর্চ্চাকে আশ্রয় দান করিয়াছেন? সেকালে বাদ্‌শারা, নবাবরা,

রাজকর্ম্মচারিগণও এই সকল মঙ্গলকার্য্যের দ্বারা প্রজাদের হৃদয়ের সঙ্গে যোগ রাখিতেন। এখন রাজকর্ম্মচারীর অভাব নাই—তাঁহাদের বেতনও যথেষ্ট মোটা বলিয়া জগদ্বিখ্যাত—কিন্তু দানে ও সৎকর্ম্মে এদেশে তাঁহাদের অস্তিত্বের কোন চিহ্ন তাঁহারা রাখিয়া যান না। বিলাতী দোকান হইতে তাঁহারা জিনিষপত্র কেনেন, বিলাতী সঙ্গীদের সঙ্গে আমোদ-আহ্লাদ করেন, এবং বিলাতের কোণে বসিয়া অন্তিমকাল পর্য্যন্ত তাঁদের পেন্সন সম্ভোগ করিয়া থাকেন।

ভারতবর্ষে লেডি ডফারিণের নামে যে সকল হাঁসপাতাল খোলা হইল, তাহার টাকা ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় ভারতবর্ষের প্রজারাই যোগাইয়াছে। এ প্রথা খুব ভাল হইতে পারে, কিন্তু ইহা ভারতবর্ষের প্রথা নহে—সুতরাং এই প্রকারের পূর্ত্তকার্য্যে আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে না। না করুক্, তথাপি বিলাতের রাজা বিলাতের প্রথামতই চলিবেন, ইহাতে বলিবার কথা কিছু নাই। কিন্তু কখনো দিশি কখনো বিলিতি হইলে কোনোটাই মানানসই হয় না। বিশেষত আড়ম্বরের বেলায় দিশি দস্তুর এবং খরচপত্রের বেলায় বিলিতি দস্তুর হইলে আমাদের কাছে ভারি অসঙ্গত ঠেকে। আমাদের বিদেশী কর্ত্তারা ঠিক করিয়া বসিয়া আছেন, যে প্রাচ্যহৃদয় আড়ম্বরেই ভোলে, এই জন্যই ত্রিশকোটি অপদার্থকে অভিভূত করিতে দিল্লির দরবার নামক একটা সুবিপুল অত্যুক্তি বহু চিন্তায়-চেষ্টায় ও হিসাবের বহুতর কশাকশিদ্বারা খাড়া করিয়া তুলিতেছেন—জানেন না যে, প্রাচ্যহৃদয় দানে, দয়াদাক্ষিণ্যে, অবারিত মঙ্গল-অনুষ্ঠানেই ভোলে। আমাদের যে উৎসব-সমারোহ, তাহা আহূত-অনাহূত-রবাহূতের আনন্দ-সমাগম; তাহাতে 'এহি এহি দেহি দেহি পীয়তাং ভুজ্যতাং' রবের কোথাও বিরাম ও বাধা নাই। তাহা প্রাচ্য আতিশয্যের লক্ষণ হইতে পারে, কিন্তু তাহা খাঁটি, তাহা স্বাভাবিক;—আর পুলিসের দ্বারা সীমানাবদ্ধ, সঙীনের দ্বারা কণ্টকিত, সংশয়ের দ্বারা সন্ত্রস্ত, সতর্ক কৃপণতার দ্বারা সঙ্কীর্ণ, দয়াহীন দানহীন যে

দরবার—যাহা কেবলমাত্র দম্ভপ্রচার, তাহা পাশ্চাত্য অত্যুক্তি—তাহাতে আমাদের হৃদয় পীড়িত ও লাঞ্ছিত হয়—আমাদের কল্পনা আকৃষ্ট না হইয়া প্রতিহত হইতে থাকে। তাহা ঔদার্য্য হইতে উৎসারিত নহে, তাহা প্রাচুর্য্য হইতে উদ্বেলিত হয় নাই।

এই গেল নকল-করা অত্যুক্তি। কিন্তু নকল, বাহ্য আড়ম্বরে মূলকে ছাড়াইবার চেষ্টা করে, এ কথা সকলেই জানে। সুতরাং সাহেব যদি সাহেবী ছাড়িয়া নবাবী ধরে তবে তাহাতে যে আতিশয্য প্রকাশ হইয়া পড়ে, তাহা কতকটা কৃত্রিম, অতএব তাহার দ্বারা জাতিগত অত্যুক্তির প্রকৃতি ঠিক ধরা যায় না। ঠিক খাঁটি বিলাতি অত্যুক্তির একটা দৃষ্টান্ত মনে পড়িতেছে। গবর্মেণ্ট সেই দৃষ্টান্তটি আমাদের চোখের সাম্নে পাথরের স্তম্ভ দিয়া স্থায়ীভাবে খাড়া করিয়া তুলিয়াছেন, তাই সেটা হঠাৎ মনে পড়িল। তাহা অন্ধকূপহত্যার অত্যুক্তি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রাচ্য অত্যুক্তি মানসিক ঢিলামী। আমরা কিছু প্রাচুর্য্যপ্রিয়, আঁটাআঁটি আমাদের সহে না। দেখ না আমাদের কাপড়গুলা ঢিলাঢিলা, আবশ্যকের চেয়ে অনেক বেশি—ইংরেজের বেষভূষ কাঁটাছাঁটা, ঠিক মাপসই—এমন কি, আমাদের মতে তাহা আঁটিতে আঁটিতে ও কাটিতে কাটিতে শালীনতার সীমা ছাড়াইয়া গেছে। আমরা, হয় প্রচুররূপে নগ্ন, নয় প্রচুররূপে আবৃত। আমাদের কথাবার্ত্তাও সেই ধরণের,—হয় একেবারে মৌনের কাছাকাছি, নয় উদারভাবে সুবিস্তৃত। আমাদের ব্যবহারও তাই, হয় অতিশয় সংযত, নয় হৃদয়াবেগে উচ্ছ্বসিত।

কিন্তু ইংরেজের অত্যুক্তির সেই স্বাভাবিক প্রাচুর্য্য নাই,—তাহা অত্যুক্তি হইলেও খর্ব্বকায়। তাহা আপনার অমূলকতাকে নিপুণভাবে মাটিচাপা দিয়া ঠিক সমূলকতার মত সাজাইয়া তুলিতে পারে। প্রাচ্য অত্যুক্তির অতিটুকুই শোভা তাহাই তাহার অলঙ্কার, সুতরাং তাহা অসঙ্কোচে বাহিরে আপনাকে ঘোষণা করে। ইংরেজি অত্যুক্তির অতিটুকুই

গভীর ভাবে ভিতরে থাকিয়া যায়—বাহিরে তাহা বাস্তবের সংযত সাজ পরিয়া খাঁটি সত্যের সহিত এক পংক্তিতে বসিয়া পড়ে।

আমরা হইলে বলিতাম, অন্ধকূপের মধ্যে হাজার লোক মরিয়াছে। সংবাদটাকে একেবারে একঠেলায় অত্যুক্তির মাঝ-দরিয়ার মধ্যে রওনা করিয়া দিতাম। হল্‌ওয়েল্ সাহেব একেবারে জনসংখ্যা সম্পূর্ণ নির্দ্দিষ্ট করিয়া তাহার তালিকা দিয়া অন্ধকূপের আয়তন একেবারে ফুট-হিসাবে গণনা করিয়া দিয়াছেন! সে সত্যের মধ্যে কোথাও কোন ছিদ্র নাই। ওদিকে যে গণিত শাস্ত্র তাঁহার প্রতিবাদী হইয়া বসিয়া আছে, সেটা খেয়াল করেন নাই। হল্‌ওয়েলের মিথ্যা যে কত স্থানে কতরূপে ধরা পড়িয়াছে, তাহা অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের সিরাজদ্দৌল্লা গ্রন্থে ভালরূপেই আলোচিত হইয়াছে। আমাদের উপদেষ্টা কার্জ্জন্ সাহেবের নিকট স্পর্দ্ধা পাইয়া হল্‌ওয়েলের সেই অত্যুক্তি রাজপথের মাঝখানে মাটি ফুঁড়িয়া স্বর্গের দিকে পাষাণ-অঙ্গুষ্ঠ উত্থাপিত করিয়াছে।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্য হইতে দুই বিভিন্ন শ্রেণীর অত্যুক্তির উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। প্রাচ্য অত্যুক্তির উদাহরণ আরব্য উপন্যাস এবং পাশ্চাত্য অত্যুক্তির উদাহরণ রাডিয়ার্ড কিপ্লিংয়ের "কিম্" এবং তাঁহার ভারতবর্ষীয় চিত্রাবলী। আরব্য উপন্যাসেও ভারতবর্ষের কথা আছে, চীনদেশের কথা আছে, কিন্তু সকলেই জানে তাহা গল্পমাত্র—তাহার মধ্য হইতে কাল্পনিক সত্য ছাড়া আর কোন সত্য কেহ প্রত্যাশাই করিতে পারে না, তাহা এতই সুস্পষ্ট। কিন্তু কিপ্লিং তাঁহার কল্পনাকে আচ্ছন্ন রাখিয়া এমনি একটি সত্যের আড়ম্বর করিয়াছেন যে, যেমন হলপ্-পড়া সাক্ষীর কাছ হইতে লোকে প্রকৃত বৃত্তান্ত প্রত্যাশা করে, তেমনি কিপ্লিঙের গল্প হইতে ব্রিটিশপাঠক ভারতবর্ষের প্রকৃত বৃত্তান্ত প্রত্যাশা না করিয়া থাকিতে পারে না।

ব্রিটিশ পাঠককে এমনি ছল করিয়া ভুলাইতে হয়। কারণ ব্রিটিশ পাঠক

বাস্তবের প্রিয়। শিক্ষালাভ করিবার বেলাও তাহার বাস্তব চাই, আবার খেলেনাকেও বাস্তব করিয়া তুলিতে না পারিলে তাহার খেলার সুখ হয় না। আমরা দেখিয়াছি, ব্রিটিশ ভোজে খরগোষ রাঁধিয়া জন্তুটাকে যথাসম্ভব অবিকল রাখিয়াছে। সেটা যে সুখাদ্য, ইহাই যথেষ্ট আমোদ নহে কিন্তু সেটা যে একটা বাস্তব জন্তু ব্রিটিশভোগী তাহা প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে চায়। ব্রিটিশ খানা যে কেবল খানা তাহা নহে, তাহা প্রাণিবৃত্তান্তের গ্রন্থ বিশেষ বলিলেই হয়। যদি কোন ব্যঞ্জনে পাখীগুলা ভাজা ময়দার আবরণে ঢাকা পড়ে, তবে তাহাদের পাগুলা কাটিয়া আবরণের উপরে বসাইয়া রাখা হয়। বাস্তব এত আবশ্যক। কল্পনার নিজ এলাকার মধ্যেও ব্রিটিশ পাঠক বাস্তবের সন্ধান করে—তাই কল্পনাকেও দায়ে পড়িয়া প্রাণপণে বাস্তবের ভাণ করিতে হয়। যে ব্যক্তি অসম্ভব স্থান হইতেও সাপ দেখিতেই চায়, সাপুড়ে তাহাকে ঠকাইতে বাধ্য হয়। সে নিজের ঝুলির ভিতর হইতেই সাপ বাহির করে, কিন্তু ভাণ করে যেন দর্শকের চাদরের মধ্য হইতে বাহির হইল। কিপ্লিং নিজের কল্পনার ঝুলি হইতেই সাপ বাহির করিলেন, কিন্তু নৈপুণ্যগুণে ব্রিটিশ পাঠক ঠিক বুঝিল যে এসিয়ার উত্তরীয়ের ভিতর হইতেই সরীসৃপগুলা দলে দলে বাহির হইয়া আসিল।

বাহিরের বাস্তব সত্যের প্রতি আমাদের এরূপ একান্ত লোলুপতা নাই। আমরা কল্পনাকে কল্পনা জানিয়াও তাহার মধ্য হইতে রস পাই। এজন্য গল্প শুনিতে বসিয়া আমরা নিজেকে নিজে ভুলাইতে পারি—লেখককে কোনরূপ ছলনা অবলম্বন করিতে হয় না। কাল্পনিক সত্যকে বাস্তব সত্যের ছদ্মগোঁপদাড়ি পরিতে হয় না। আমরা বরঞ্চ বিপরীত দিকে যাই। আমরা বাস্তব সত্যে কল্পনার রং ফলাইয়া তাহাকে অপ্রাকৃত করিয়া ফেলিতে পারি, তাহাতে আমাদের দুঃখবোধ হয় না। আমরা বাস্তব সত্যকেও কল্পনার সহিত মিশাইয়া দিই—আর য়ুরোপ কল্পনাকেও বাস্তব সত্যের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করাইয়া তবে ছাড়ে। আমাদের এই স্বভাবদোষে আমাদের

বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে—আর ইংরেজের স্বভাবে ইংরেজের কি কোনো লোক্‌সান্ করে নাই? গোপন-মিথ্যা কি সেখানে ঘরে-বাহিরে বিহার করিতেছে না? সেখানে খবরের কাগজে খবর-বানানো চলে, তাহা দেখা গিয়াছে এবং সেখানে ব্যবসাদার-মহলে শেয়ার-কেনা-বেচার বাজারে যে কিরূপ সর্ব্বনেশে মিথ্যা বানানো হইয়া থাকে, তাহা কাহারো অগোচর নাই। বিলাতে বিজ্ঞাপনের অত্যুক্তি ও মিথ্যোক্তি নানা বর্ণে নানা চিত্রে নানা অক্ষরে দেশ-বিদেশে নিজেকে কিরূপ ঘোষণা করে, তাহা আমরা জানি—এবং আমরাও ভদ্রাভদ্রে মিলিয়া নির্লজ্জভাবে এই অভ্যাস গ্রহণ করিয়াছি! বিলাতে পলিটিক্সে বানানো বাজেট তৈরি করা, প্রশ্নের বানানো উত্তর দেওয়া প্রভৃতি অভিযোগ তুলিয়া এক পক্ষের প্রতি অপর পক্ষে যে সকল দোষারোপ করিয়া থাকেন, তাহা যদি মিথ্যা হয় তবে লজ্জার বিষয়, যদি না হয়, তবে শঙ্কার বিষয় সন্দেহ নাই। সেখানকার পার্লামেন্টে পার্লামেন্ট-সঙ্গত ভাষায় এবং কখনো বা তাহা লঙ্ঘন করিয়াও বড় বড় লোককে মিথ্যুক, প্রবঞ্চক, সত্যগোপনকারী, বলা হইয়া থাকে; হয়, এরূপ নিন্দাবাদকে অত্যুক্তিপরায়ণতা বলিতে হয়, নয়, ইংলণ্ডের পলিটিক্স্ মিথ্যার দ্বারা জীর্ণ, এ কথা স্বীকার করিতে হয়।

যাহা হউক, এ সমস্ত আলোচনা করিলে এই কথা মনে উদয় হয় যে, বরঞ্চ অত্যুক্তিকে সুস্পষ্ট অত্যুক্তিরূপে পোষণ করাও ভাল, কিন্তু অত্যুক্তিকে সুকৌশলে ছাঁটিয়া-ছুঁটিয়া তাহাকে বাস্তবের দলে চালাইবার চেষ্টা করা ভাল নহে—তাহাতে বিপদ্ অনেক বেশি।

ইম্পীরিয়লিজ্‌ম্‌

বিলাতে ইম্পীরিয়ালিজ্‌মের একটা নেশা ধরিয়াছে। অধীনদেশ ও উপনিবেশ প্রভৃতি জড়াইয়া ইংরেজসাম্রাজ্যকে একটা বৃহৎ উপসর্গ করিয়া তুলিবার ধ্যানে সে দেশে অনেকে নিযুক্ত আছেন। বিশ্বামিত্র একটা নূতন জগৎসৃষ্টি করিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন, বাইবল্‌-কথিত কোনো রাজা স্বর্গের প্রতি স্পর্দ্ধা করিয়া এক স্তম্ভ তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, স্বয়ং দশাননের সম্বন্ধেও এরূপ একটা জনশ্রুতি প্রচলিত আছে।

দেখা যাইতেছে এইরূপ বড় বড় মৎলব পৃথিবীতে অনেক সময়ে অনেক লোকে মনে মনে আঁটিয়াছে। এসকল মৎলব টেকেনা—কিন্তু নষ্ট হইবার পূর্ব্বে পৃথিবীতে কিছু অমঙ্গল না সাধিয়া যায় না।

তাঁহাদের দেশের এই খেয়ালের ঢেউ লর্ড কার্জ্জনের মনের মধ্যেও যে তোলপাড় করিতেছে সে দিনকার এক অলক্ষণে বক্তৃতায় তিনি তাহার আভাস দিয়াছেন। দেখিয়াছি আমাদের দেশের কোনো কোনো খবরের কাগজ কখনো কখনো এই বিষয়টাতে একটু উৎসাহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, বেশ কথা, ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ "এম্পায়ারে" একাত্ম হইবার অধিকার দাওনা।

কথার ছল ধরিয়া ত কোনো অধিকার পাওয়া যায় না—এমন কি, লেখাপড়া পাকা কাগজে হইলেও দুর্ব্বল লোকের পক্ষে নিজের স্বত্ব উদ্ধার করা শক্ত। এই কারণে যখন দেখিতে পাই যাহারা আমাদের উপরওয়ালা তাঁহারা ইম্পীরিয়ালবায়ুগ্রস্ত, তখন মনের মধ্যে স্বস্তিবোধ করি না।

পাঠকেরা বলিতে পারেন, তোমার অত ভয় করিবার প্রয়োজন কি, যাহার হাতে ক্ষমতা আছে সে ব্যক্তি ইম্পীরিয়ালিজমের বুলি আওড়াক্

বা নাই আওড়াক্ তোমার মন্দ করিতে ইচ্ছা করিলে সে ত অনায়াসে করিতে পারে।

অনায়াসে করিতে পারে না। কেন না হাজার হইলেও দয়াধর্ম্ম একেবারে ছাড়া কঠিন। লজ্জাও একটা আছে। কিন্তু একটা বড়গোছের বুলি যদি কাহাকেও পাইয়া বসে, তবে তাহার পক্ষে নিষ্ঠুরতা ও অন্যায় সহজ হইয়া উঠে।

অনেক লোকে জন্তুকে শুধু শুধু কষ্ট দিতে পীড়া বোধ করে। কিন্তু কষ্ট দেওয়ার একটা নাম যদি দেওয়া যায় "শিকার," তবে সে ব্যক্তি আনন্দের সহিত হত আহত নিরীহ পাখীর তালিকা বৃদ্ধি করিয়া গৌরব বোধ করে। নিশ্চয়ই, বিনা উপলক্ষ্যে যে ব্যক্তি পাখীর ডানা ভাঙিয়া দেয়, সে ব্যক্তি শিকারীর চেয়ে নিষ্ঠুর, কিন্তু পাখীর তাহাতে বিশেষ সান্ত্বনা নাই। বরঞ্চ অসহায় পক্ষিকুলের পক্ষে স্বভাব-নিষ্ঠুরের চেয়ে শিকারীর দল অনেক বেশি নিদারুণ।

যাঁহারা ইম্পীরিয়লিজমের খেয়ালে আছেন, তাঁহারা দুর্ব্বলের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও অধিকার সম্বন্ধে অকাতরে নির্ম্মম হইতে পারেন এবিষয়ে সন্দেহ নাই. পৃথিবীর নানাদিকেই তাহার দৃষ্টান্ত দেখা যাইতেছে।

রাশিয়া, ফিন্‌ল্যাণ্ড পোল্যাণ্ডকে নিজের বিপুল কলেবরের সহিত একেবারে বেমালুম মিশাইয়া লইবার জন্য যে কি পর্য্যন্ত চাপ দিতেছে, তাহা সকলেই জানেন। এতদূর পর্য্যন্ত কখনই সম্ভব হইত না যদি না রাশিয়া মনে করিত, তাহার অধীন দেশের স্বাভাবিক বৈষম্যগুলি জবরদস্তির সহিত দূর করিয়া দেওয়াই ইম্পীরিয়ালিজম্ নামক একটা সর্ব্বাঙ্গীন বৃহৎ স্বার্থের পক্ষে প্রয়োজনীয়। এই স্বার্থকে রাশিয়া পোলাণ্ড ভিন্‌ল্যাণ্ডেরও স্বার্থ বলিয়া গণ্য করে।

লর্ড কর্জ্জনও সেই ভাবেই বলিতেছেন, জাতীয়তার কথা ভুলিয়া এম্পায়ারের স্বার্থকে তোমাদের নিজের স্বার্থ করিয়া তোল।

কোনো শক্তিমানের কানে একথা বলিলে তাহার ভয় পাইবার কারণ নাই; কেন না, শুধু কথায় সে ভুলিবে না। বস্তুতই তাহার স্বার্থ কড়ায় গণ্ডায় সপ্রমাণ হওয়া চাই। অর্থাৎ সে স্থলে তাহাকে দলে টানিতে গেলে নিজের স্বার্থও যথেষ্ট পরিমাণে বিসর্জ্জন না দিলে তাহার মন পাওয়া যাইবে না। অতএব, সেখানে অনেক মধু ঢালিতে হয়, অনেক তেল খরচ না করিয়া চলে না।

ইংলণ্ডের উপনিবেশগুলি তাহার দৃষ্টান্ত। ইংরেজ ক্রমাগতই তাহাদের কানে মন্ত্র আওড়াইতেছে "যদেতৎহৃদয়ং মমতদস্তু হৃদয়ং তব," কিন্তু তাহারা শুধু মন্ত্রে ভুলিবার নয়— পণের টাকা গণিয়া দেখিতেছে।

হতভাগ্য আমাদের বেলায় মন্ত্রেরও কোনো প্রয়োজন নাই, পণের কড়ি ত দূরে থাক্।

আমাদের বেলায় বিচার্য্য এই যে, বিদেশীয়ের সহিত ভেদবুদ্ধি জাতীয়তার পক্ষে আবশ্যক কিন্তু ইম্পীরিয়ালিজমের পক্ষে প্রতিকূল; অতএব সেই ভেদবুদ্ধির যে সকল কারণ আছে, সেগুলাকে উৎপাটন করা কর্ত্তব্য।

কিন্তু সেটা করিতে গেলে দেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশের মধ্যে যে একটা ঐক্য জমিয়া উঠিতেছে, সেটাকে কোনোমতে জমিতে না দেওয়াই শ্রেয়। সে যদি খণ্ড খণ্ড চূর্ণ চূর্ণ অবস্থাতেই থাকে, তবে তাহাকে আত্মসাৎ করা সহজ।

ভারতবর্ষের মত এত বড় দেশকে এক করিয়া তোলার মধ্যে একটা গৌরব আছে। ইহাকে চেষ্টা করিয়া বিচ্ছিন্ন রাখা ইংরেজের মত অভিমানী জাতির পক্ষে লজ্জার কথা।

কিন্তু ইম্পীরিয়ালিজ্‌ম্ মন্ত্রে এই লজ্জা দূর হয়। ব্রিটিশ এম্পায়ারের মধ্যে এক হইয়া যাওয়াই ভারতবর্ষের পক্ষে যখন পরমার্থলাভ, তখন সেই মহদুদ্দেশ্যে ইহাকে জাঁতায় পিসিয়া বিশ্লিষ্ট করাই "হিয়ুম্যানিটি!"

ভারতবর্ষের কোন স্থানে তাহার স্বাধীন শক্তিকে সঞ্চিত হইতে না

দেওয়া ইংরেজসভ্যনীতি অনুসারে নিশ্চয়ই লজ্জাকর ; কিন্তু যদি মন্ত্র বলা যায় "ইম্পীরিয়লিজম্"—তবে যাহা মনুষ্যত্বের পক্ষে একান্ত লজ্জা তাহা রাষ্ট্রনীতিকতার পক্ষে চূড়ান্ত গৌরব হইয়া উঠিতে পারে।

নিজেদের নিশ্চিন্ত একাধিপত্যের জন্য একটি বৃহৎ দেশের অসংখ্য লোককে নিরস্ত্র করিয়া তাহাদিগকে চিরকালের জন্য পৃথিবীর জনসমাজে সম্পূর্ণ নিঃস্বত্ব নিরুপায় করিয়া তোলা যে কত বড় অধর্ম্ম, কি প্রকাণ্ড নিষ্ঠুরতা, তাহা ব্যাখ্যা করিবার প্রয়োজন নাই ; কিন্তু এই অধর্ম্মের গ্লানি হইতে আপনার মনকে বাঁচাইতে হইলে একটা বড় বুলির ছায়া লইতে হয়।

সেসিল্ রোড্‌স্ একজন ইম্পীরিয়াল্‌বায়ুগ্রস্ত লোক ছিলেন ; সেইজন্য দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে বোয়ারদের স্বাতন্ত্র্যলোপ করিবার জন্য তাঁহাদের দলের লোকের কিরূপ আগ্রহ ছিল, তাহা সকলেই জানেন।

ব্যক্তিগত ব্যবহারে যে সকল কাজকে চৌর্য্য, মিথ্যাচার বলে, যাহাকে জাল, খুন, ডাকাতি নাম দেয়, একটা ইজ্‌ম্-প্রত্যয়যুক্ত শব্দে তাহাকে শোধন করিয়া কতদূর গৌরবের বিষয় করিয়া তোলে, বিলাতি ইতিহাসের মান্যব্যক্তিদের চরিত্র হইতে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়।

এই জন্য আমাদের কর্ত্তাদের মুখ হইতে ইম্পীরিয়ালিজ্‌মের আভাস পাইলে আমরা সুস্থির হইতে পারি না। এতবড় রথের চাকার তলে যদি আমাদের মর্ম্মস্থান পিষ্ট হয়, তবে ধর্ম্মের দোহাই দিলে কাহারো কর্ণগোচর হইবে না। কারণ, পাছে কাজ ভণ্ডুল করিয়া দেয়, এই ভয়ে মানুষ তাহার বৃহৎ ব্যাপারগুলিতে ধর্ম্মকে আমল দিতে চাহে না।

প্রাচীন গ্রীসে প্রবল এথীনিয়ান্‌গণ যখন দুর্ব্বল মেলিয়ানদের দ্বীপটী অন্যায় নিষ্ঠুরতার সহিত গ্রহণ করিবার উপক্রম করিয়াছিল, তখন উভয় পক্ষে কিরূপ বাদানুবাদ হইয়াছিল, গ্রীক্ ইতিহাসবেত্তা থুকিদিদীস্ তাহার একটা নমুনা দিয়াছিলেন। নিম্নে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম

—ইহা হইতে পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন, ইম্পীরিয়ালিজ্‌মতত্ত্ব য়ুরোপে কত প্রাচীন—এবং যে পলিটিক্‌সের ভিত্তির উপরে য়ুরোপীয় সভ্যতা গঠিত, তাহার মধ্যে কিরূপ নিদারুণ ক্রূরতা প্রচ্ছন্ন আছে।

Athenians. But you and we should say what we really think, and aim only at what is possible, for we both alike know that into the discussion of human affairs the question. of justice only enters where the pressure of necessity is equal, and that the powerful exact what they can, and the weak grant what they must.
And we will now endeavour to show that we have come in the interests of our empire, and that in what we are about to say we are only seeking the preservation of your city. For we want to make you ours with the least trouble to ourselves and it is for the interest of us both that you should not be destroyed.

Mel. It may be your interest to be our masters, but how can it be ours to be your slaves ?

Ath. To you the gain will be that by submission you will avert the worst ; and we shall be all the richer for your preservation.

১৩১২

রাজভক্তি

রাজপুত্র আসিলেন। রাজ্যের যত পাত্রের পুত্র তাঁহাকে গণ্ডি দিয়া ঘিরিয়া বসিল—তাহার মধ্যে একটু ফাঁক পায় এমন সাধ্য কাহারো রহিল না। এই ফাঁক যতদূর সম্ভব সঙ্কীর্ণ করিবার জন্য কোটালের পুত্র পাহারা দিতে লাগিল—সে জন্য সে শিরোপা পাইল। তাহার পর? তাহার পর বিস্তর বাজি পুড়াইয়া রাজপুত্র জাহাজে চড়িয়া চলিয়া গেলেন—এবং আমার কথাটি ফুরালো, নটে শাকটি মুড়ালো।

ব্যাপারখানা কি? একটি কাহিনীমাত্র। রাজ্য ও রাজপুত্রের এই বহুদুর্লভ মিলন যত সুদূর, যত স্বল্প, যত নিরর্থক হওয়া সম্ভব তাহা হইল। সমস্ত দেশ পর্য্যটন করিয়া দেশকে যত কম জানা—দেশের সঙ্গে যত কম যোগস্থাপন হইতে পারে, তাহা বহু ব্যয়ে—বহু নৈপুণ্য ও সমারোহসহকারে সমাধা হইল।

অবশ্যই রাজপুরুষেরা ইহার মধ্যে কিছু একটা পলিসি, কিছু একটা প্রয়োজন বুঝিয়া ছিলেন—নহিলে এত বাজে খরচ করিবেন কেন? রূপ কথার রাজপুত্র কোনো সুপ্ত রাজকন্যাকে জাগাইবার জন্য সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হইয়াছিলেন; আমাদের রাজপুত্রও বোধ করি সুপ্ত রাজভক্তিকে জাগাইবার জন্যই যাত্রা করিয়া থাকিবেন, কিন্তু সোনার কাঠি কি মিলিয়াছিল?

নানা ঘটনা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, আমাদের রাজপুরুষেরা সোনার কাঠির চেয়ে লোহার কাঠির উপরেই বেশী আস্থা রাখিয়া থাকেন! তাঁহাদের প্রতাপের আড়ম্বরটাকেই তাঁহারা বজ্রগর্ভ বিদ্যুতের মত ক্ষণে ক্ষণে আমাদের চোখের উপর দিয়া ঝলকিয়া লইয়া যান। তাহাতে আমাদের চোখ ধাঁধিয়া যায়, হৃৎকম্পও হইতে পারে কিন্তু রাজা প্রজার মধ্যে অন্তরের বন্ধন দৃঢ় হয় না—পার্থক্য আরও বাড়িয়া যায়।

ভারতবর্ষের অদৃষ্টে এইরূপ অবস্থা অবশ্যম্ভাবী। কারণ, এখানকার রাজাসনে যাঁহারা বসেন, তাঁহাদের মেয়াদ বেশীদিনকার নহে, অথচ এখানে রাজক্ষমতা যেরূপ অত্যুৎকট, স্বয়ং ভারতসম্রাটেরও সেরূপ নাই। বস্তুত ইংলণ্ডে রাজত্ব করিবার সুযোগ কাহারও নাই; কারণ, সেখানে প্রজাগণ স্বাধীন। ভারতবর্ষ যে অধীন রাজ্য, তাহা ইংরাজ এখানে পদার্পণ করিবামাত্র বুঝিতে পারে। সুতরাং এদেশে কর্ত্তৃত্বের দম্ভ ক্ষমতার মত্ততা সহসা সম্বরণ করা ক্ষুদ্রপ্রকৃতির পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে।

বনিয়াদি রাজাকে রাজকীয় নেশায় টলাইতে পারে না। হঠাৎ-রাজার পক্ষে এই নেশা একেবারে বিষ। ভারতবর্ষে যাঁহারা কর্ত্তৃত্ব করিতে আসেন, তাঁহারা অধিকাংশই এই মদিরায় অভ্যস্ত নহেন। তাঁহাদের স্বদেশ হইতে এদেশের পরিবর্ত্তন বেশি। যাঁহারা কোনো কালেই বিশেষ কেহ নহেন, এখানে তাঁহারা এক মুহূর্ত্তেই হর্ত্তাকর্ত্তা। এমন অবস্থায় নেশার ঝোঁকে এই নূতনলব্ধ প্রতাপটাকেই তাঁহারা সকলের চেয়ে প্রিয় এবং শ্রেয় জ্ঞান করেন।

প্রেমের পথ নম্রতার পথ। সামান্য লোকেরও হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইলে নিজের মাথাটাকে তাহার দ্বারের মাপে নত করিতে হয়। নিজের প্রতাপ ও প্রেষ্টিজ সম্বন্ধে যে ব্যক্তি হঠাৎনবাবের মত সর্ব্বদাই আপাদমস্তক সচেতন, সে ব্যক্তির পক্ষে এই নম্রতা দুঃসাধ্য। ইংরাজের রাজত্ব যদি ক্রমাগতই আনাগোনার রাজত্ব না হইত, যদি এদেশে তাহারা স্থায়ী হইয়া কর্ত্তৃত্বের উগ্রতাটা কতকটা পরিমাণে সহ্য করিতে পারিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহারা আমাদের সঙ্গে হৃদয়ের যোগস্থাপনের চেষ্টা করিতে বাধ্য হইত। কিন্তু বর্ত্তমান ব্যবস্থায় ইংলণ্ডের অখ্যাত প্রান্ত হইতে কয়েক দিনের জন্য এদেশে আসিয়া ইহারা কোনোমতেই ভুলিতে পারে না যে, আমরা কর্ত্তা—এবং সেই ক্ষুদ্র

দম্ভটাকেই সর্ব্বদা প্রকাশমান রাখিবার জন্য তাহারা আমাদিগকে সকল বিষয়েই অহরহ দূরে ঠেকাইয়া রাখে এবং কেবলমাত্র প্রবলতার দ্বারা আমাদিগকে অভিভূত করিয়া রাখিতে চেষ্টা করে। আমাদের ইচ্ছা অনিচ্ছা যে তাহাদের রাজনীতিকে স্পর্শ করিতে পারে, একথা তাহারা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হয়। এমন কি, তাহাদের কোনো বিধানে আমরা যে বেদনা অনুভব ও বেদনা প্রকাশ করিব, তাহাও তাহারা স্পর্দ্ধা বলিয়া জ্ঞান করে।

কিন্তু স্বামী যতই কঠোর হউক্ না কেন সে স্ত্রীর কাছে যে কেবল বাধ্যতা চাহে তাহা নহে, স্ত্রীর হৃদয়ের প্রতিও তাহার ভিতরে ভিতরে আকাঙ্ক্ষা থাকে। অথচ হৃদয় অধিকার করিবার ঠিক পথটি সে গ্রহণ করিতে পারে না, তাহার দুর্দম্য ঔদ্ধত্য বাধা দেয়। যদি তাহার সন্দেহ জন্মে যে স্ত্রী তাহার আধিপত্য সহ্য করে কিন্তু তাহাকে ভাল বাসে না, তবে সে তাহার কঠোরতার মাত্রা বাড়াইতে থাকে। প্রীতি জন্মাইবার ইহা যে প্রকৃষ্ট উপায় নহে, সে কথা বলাই বাহুল্য।

সেইরূপ ভারতবর্ষের ইংরেজ-রাজারা আমাদের কাছ হইতে রাজভক্তির দাবীটুকুও ছাড়িতে পারে না। কিন্তু ভক্তির সম্বন্ধ হৃদয়ের সম্বন্ধ—সে সম্বন্ধে দান প্রতিদান আছে—তাহা কলের সম্বন্ধ নহে। সে সম্বন্ধ স্থাপন করিতে গেলেই কাছে আসিতে হয়, তাহা শুদ্ধমাত্র জবরদস্তির কর্ম্ম নহে। কিন্তু কাছেও ঘেঁসিব না, হৃদয়ও দিব না—অথচ রাজভক্তিও চাই। শেষকালে সেই ভক্তিসম্বন্ধে যখন সন্দেহ জন্মে, তখন গুর্খা লাগাইয়া, বেত চালাইয়া, জেলে দিয়া ভক্তি আদায় করিতে ইচ্ছা হয়।

ইংরেজ, শাসনের কল চালাইতে চালাইতে হঠাৎ এক একবার রাজভক্তির জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠেন, কার্জ্জনের আমলে তাহার একটা নমুনা পাওয়া গিয়াছিল।

স্বাভাবিক আভিজাত্যের অভাবে লর্ড্ কার্জ্জন্ কর্ত্তৃত্বের নেশায় উন্মত্ত

হইয়াছিলেন, তাহা স্পষ্ট অনুভব করা গিয়াছিল। এ গদি ছাড়িতে তাঁহার কিছুতেই মন সরিতেছিল না। এই রাজকীয় আড়ম্বর হইতে অবসৃত হইয়া তাঁহার অন্তরাত্মা "খোঁয়ারী" গ্রস্ত মাতালের মত আজ যে অবস্থায় আছে, তাহা যদি আমরা যথার্থভাবে অনুভব করিতাম, তবে বাঙালিও বোধ হয় আজ তাঁহাকে দয়া করিতে পারিত। এরূপ আধিপত্যলোলুপতা বোধকরি ভারতবর্ষের আর কোনো শাসনকর্ত্তা এমন করিয়া প্রকাশ করেন নাই। এই লাট সাহেবটি ভারতবর্ষের পূর্ব্বতন বাদসাহের ন্যায় দরবার করিবেন স্থির করিলেন—এবং স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক দিল্লিতে সেই দরবারের স্থান করিলেন।

কিন্তু প্রাচ্যরাজমাত্রেই বুঝিতেন দরবার স্পর্দ্ধা প্রকাশের জন্য নহে; দরবার রাজার সহিত প্রজাদের আনন্দ-সম্মিলনের উৎসব। সেদিন কেবল রাজোচিত ঐশ্বর্য্যের দ্বারা প্রজাদিগকে স্তম্ভিত করা নয়, সেদিন রাজোচিত ঔদার্য্যের দ্বারা তাহাদিগকে নিকটে আহ্বান করিবার দিন। সেদিন ক্ষমা করিবার, দান করিবার, রাজ-শাসনকে সুন্দর করিয়া সাজাইবার শুভ অবসর।

কিন্তু পশ্চিমের হঠাৎনবাব দিল্লির প্রাচ্য ইতিহাসকে সম্মুখে রাখিয়া এবং বদান্যতাকে সওদাগরীকার্পণ্যদ্বারা খর্ব্ব করিয়া কেবল প্রতাপকেই উগ্রতর করিয়া প্রকাশ করিলেন। ইহাতেবস্তুত ইংরাজের রাজশ্রী আমাদের কাছে গৌরব লাভ করে নাই। ইহাতে দরবারের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়া গেছে। এই দরবারের দুঃসহ দর্পে প্রাচ্যহৃদয় পীড়িত হইয়াছে, লেশমাত্র আকৃষ্ট হয় নাই। সেই প্রচুর অপব্যয় যদি কিছুমাত্র ফল রাখিয়া থাকে, তবে তাহা অপমানের স্মৃতিতে। লোহার কাঠির দ্বারা সোনার কাঠির কাজ সারিবার চেষ্টা যে নিষ্ফল তাহা নহে—তাহাতে উল্টা ফল হইয়া থাকে।

এবারে রাজপুত্রকে ভারতবর্ষে আনা হইল। রাজনীতির তরফ হইতে

পরামর্শ উত্তম হইয়াছে। কারণ, সাধারণত রাজবংশীয়ের প্রতি ভারতবর্ষীয় হৃদয়ের অভিমুখিতা বহুকালের প্রকৃতিগত। সেই জন্য দিল্লীর দরবারে ড্যুক্ অফ্ কনট্ থাকিতে কর্জ্জনের দরবার-তক্তগ্রহণ ভারতবর্ষীয়মাত্রকেই বাজিয়াছিল; এরূপ স্থলে ড্যুকের উপস্থিত থাকাই উচিত ছিল না। বস্তুত প্রজাগণের ধারণা হইয়াছিল যে কার্জ্জন্ নিজের দম্ভপ্রচার করিবার জন্যই ইচ্ছাপূর্ব্বক দরবারে ড্যুক্ অফ্ কনটের উপস্থিতি ঘটাইয়াছিলেন। আমরা বিলাতি কায়দা বুঝিনা, বিশেষত দরবার ব্যাপারটাই যখন বিশেষভাবে প্রাচ্য, তখন এ উপলক্ষ্যে রাজবংশের প্রকাশ্য অবমাননা অন্তত পলিসিসঙ্গত হয় নাই।

যাই হোক্ ভারতবর্ষের রাজভক্তিকে নাড়া দিবার জন্য একবার রাজপুত্রকে সমস্ত দেশের উপর দিয়া বুলাইয়া লওয়া উচিত; বোধকরি এইরূপ পরামর্শ হইয়া থাকিবে। কিন্তু ভারতবর্ষের ইংরেজ, হৃদয়ের কারবার কোনোদিন করে নাই। তাহারা এদেশকে হৃদয় দেয়ও নাই এদেশের হৃদয় চায়ও নাই, দেশের হৃদয়টা কোথায় আছে তাহার খবরও রাখে না। ইহারা রাজপুত্রের ভারতবর্ষে আগমনব্যাপারটাকে যত স্বল্পফলপ্রদ করা সম্ভব তাহা করিল। আজ রাজপুত্র ভারতবর্ষের মাটি ছাড়িয়া জাহাজে উঠিতেছেন আর আমাদের মনে হইতেছে যেন একটা স্বপ্ন ভাঙিয়া গেল, যেন একটা রূপকথা শেষ হইল। কিছুই হইল না—মনে রাখিবার কিছু রহিল না, যাহা যেমন ছিল তাহা তেমনি রহিয়া গেল।

ভারতবর্ষের রাজভক্তি প্রকৃতিগত একথা সত্য। হিন্দু ভারতবর্ষের রাজভক্তির একটু বিশেষত্ব আছে। হিন্দুরা রাজাকে দেবতুল্য ও রাজভক্তিকে ধর্ম্মস্বরূপে গণ্য করিয়া থাকেন। পাশ্চাত্যগণ একথার যথার্থ মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারেন না। তাঁহারা মনে করেন ক্ষমতার কাছে এইরূপ অবনত হওয়া আমাদের স্বাভাবিক দীন চরিত্রের পরিচয়।

সংসারের অধিকাংশ সম্বন্ধকেই হিন্দু দৈবসম্বন্ধ না মনে করিয়া

থাকিতে পারে না। হিন্দুর কাছে প্রায় কিছুই আকস্মিক সম্বন্ধ নহে। কারণ, হিন্দু জানে, আমাদের কাছে প্রকাশ যতই বিচিত্র ও বিভিন্ন হউক না মূলশক্তি একই। ভারতবর্ষে ইহা কেবলমাত্র একটা দার্শনিক তত্ত্ব নহে, ইহা ধর্ম্ম,—ইহা পুঁথিতে লিখিবার কালেজে পড়াইবার নহে—ইহা জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে উপলব্ধি ও জীবনের প্রাত্যহিক ব্যবহারে প্রতিফলিত করিবার। আমরা পিতামাতাকে দেবতা বলি, স্বামীকে দেবতা বলি, সতী স্ত্রীকে লক্ষ্মী বলি। গুরুজনকে পূজা করিয়া আমরা ধর্ম্মকে তৃপ্ত করি। ইহার কারণ, যে কোনো সম্বন্ধের মধ্য হইতে আমরা মঙ্গল-লাভ করি, সেই সম্বন্ধের মধ্যেই আমরা আদি মঙ্গলশক্তিকে স্বীকার করিতে চাই। সেই সকল উপলক্ষ্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া মঙ্গলময়কে সুদূর স্বর্গে স্থাপনপূর্ব্বক পূজা করা ভারতবর্ষের ধর্ম্ম নহে। পিতামাতাকে যখন আমরা দেবতা বলি, তখন এ মিথ্যাকে আমরা মনে স্থান দিই না যে, তাঁহারা বিশ্বভুবনের ঈশ্বর বা তাঁহাদের অলৌকিক শক্তি আছে। তাঁহাদের মনুষ্যত্ব সমস্তই আমরা নিশ্চিত জানি, কিন্তু ইহাও সেইরূপ নিশ্চিত জানি যে, ইহাঁরা পিতামাতারূপে আমাদের যে কল্যাণ সাধন করিতেছেন, সেই পিতৃমাতৃত্ব জগতের পিতামাতারই প্রকাশ। ইন্দ্র চন্দ্র অগ্নি বায়ুকে যে বেদে দেবতা বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে তাহারও এই কারণ। শক্তি-প্রকাশের মধ্যে ভারতবর্ষ শক্তিমান্ পুরুষের সত্তা অনুভব না করিয়া কোনো দিন তৃপ্ত হয় নাই। এই জন্য বিশ্বভুবনে নানা উপলক্ষ্যে নানা আকারেই ভক্তিবিনম্র ভারতবর্ষের পূজা সমাহৃত হইয়াছে। জগৎ আমাদের নিকট সর্ব্বদাই দেব-শক্তিতে সজীব।

একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা যে আমরা দীনতাবশতই প্রবলতার পূজা করিয়া থাকি। সকলেই জানে গাভীকেও ভারতবর্ষ পূজ্য করিয়াছেন। গাভী যে পশু তাহা সে জানে না—ইহা নহে। মানুষ প্রবল এবং গাভীই দুর্ব্বল। কিন্তু ভারতবর্ষীয় সমাজ গাভীর নিকট হইতে নানাপ্রকার মঙ্গললাভ করে।

সেই মঙ্গল মানুষ যে নিজের গায়ের জোরে পশুর কাছ হইতে আদায় করিয়া লইতেছে, এই ঔদ্ধত্য ভারতবর্ষের নহে। সমস্ত মঙ্গলের মূলে সে দৈব অনুগ্রহকে প্রণাম করিয়া সকলের সঙ্গে আত্মীয়সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারিলে তবে বাঁচে। কারিকর তাহার যন্ত্রকে প্রণাম করে, যোদ্ধা তাহার তরবারীকে প্রণাম করে, গুণী তাহার বীণাকে প্রণাম করে ;—ইহারা যে যন্ত্রকে যন্ত্র বলিয়া জানে না তাহা নহে ; কিন্তু ইহাও জানে যন্ত্র একটা উপলক্ষ্য মাত্র—যন্ত্রের মধ্য হইতে সে যে আনন্দ বা উপকার লাভ করিতেছে, তাহা কাঠ বা লোহার দান নহে, কারণ, আত্মাকে আত্মীয় ছাড়া কোনো সামগ্রীমাত্রে স্পর্শ করিতে পারে না। এই জন্য তাহাদের কৃতজ্ঞতা, তাহাদের পূজা যিনি বিশ্বযন্ত্রের যন্ত্রী তাঁহার নিকট এই যন্ত্রযোগেই সমর্পিত হয়।

এই ভারতবর্ষ রাজশাসন-ব্যাপারকে যদি পুরুষরূপে নহে, কেবল যন্ত্র-রূপে অনুভব করিতে থাকে, তবে তাহার পক্ষে এমন পীড়াকর আর কিছুই হইতে পারে না। জড়ের মধ্যেও আত্মার সম্পর্ক অনুভব করিয়া তবে যাহার তৃপ্তি হয়, রাষ্ট্রতন্ত্রের মত এত বড় মানব-ব্যাপারের মধ্যে সে হৃদয়ের প্রত্যক্ষ আবির্ভাবকে মূর্তিমান্ না দেখিয়া বাঁচে কিরূপে? আত্মার সঙ্গে আত্মীয়ের সম্বন্ধ যেখানে আছে সেখানেই নত হওয়া যায়—যেখানে তাহা নাই সেখানে নত হইতে অহরহ বাধ্য হইলে অপমান ও পীড়া বোধ হয় ; অতএব রাষ্ট্রব্যাপারের মধ্যস্থলে আমরা দেবতার শক্তিকে, মঙ্গলের প্রত্যক্ষস্বরূপকে, রাজরূপে দেখিতে পাইলে শাসনের বিপুল ভার সহজে বহন করিতে পারি। নহিলে হৃদয় প্রতিক্ষণেই ভাঙিয়া যাইতে থাকে। আমরা পূজা করিতে চাই—রাজতন্ত্রের মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার সহিত আমাদের প্রাণের যোগ অনুভব করিতে চাই—আমরা বলকে কেবলমাত্র বলরূপে সহ্য করিতে পারি না।

অতএব ভারতবর্ষের রাজভক্তি প্রকৃতিগত একথা সত্য। কিন্তু সেই

জন্য রাজা তাহার পক্ষে শুদ্ধমাত্র তামাসার রাজা নহে। রাজাকে সে একটা অনাবশ্যক আড়ম্বরের অঙ্গরূপে দেখিতে ভালবাসে না। সে রাজাকে যথার্থ সত্যরূপে অনুভব করিতেই ইচ্ছা করে। সে রাজাকে বহুকাল ধরিয়া পাইতেছেনা বলিয়া উত্তরোত্তর পীড়িত হইয়া উঠিতেছে। ক্ষণস্থায়ী বহুরাজার দুঃসহভারে এই বৃহৎ দেশ কিরূপে মর্ম্মে মর্ম্মে ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছে, প্রতিদিন কিরূপ নিরুপায়ভাবে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেছে, তাহা অন্তর্যামী ছাড়া কেহ দেখিবার নাই। যাহারা পথিক মাত্র—ছুটির দিকেই যাহাদের মন পড়িয়া আছে—যাহারা পেটের দায়ে নির্ব্বাসনে দিন যাপন করিতেছে—যাহারা বেতন লইয়া এই শাসন-কারখানার কল চালাইয়া যাইতেছে—যাহাদের সহিত আমাদের সামাজিক কোনো সম্বন্ধ নাই—অহরহ পরিবর্ত্তমান এমন উপেক্ষাপরায়ণ জনসম্প্রদায়ের হৃদয়-সম্পর্কশূন্য আপিসিশাসন নিরন্তর বহন করা যে কি দুর্ব্বিসহ তাহা ভারতবর্ষই জানে। রাজভক্তিতে দীক্ষিত ভারতবর্ষের অন্তঃকরণ কাতরভাবে প্রার্থনা করিতেছে যে—হে ভারতের প্রতি বিমুখ ভগবান্, আমি এই সকল ক্ষুদ্ররাজা, ক্ষণিক রাজা, অনেক রাজা আর সহিতে পারি না, আমাকে এক রাজা দাও! এমন রাজা দাও যিনি বলিতে পারিবেন—ভারতবর্ষ আমারই রাজ্য, বণিকের নয়, খনিকের নয়, চা-করের নয়, ল্যাঙ্কাশিয়রের নয়;—ভারতবর্ষ যাঁহাকে অন্তরের সহিত বলিতে পারিবে—আমারই রাজা; হ্যালিডে-রাজা নয়, ফুলর-রাজা নয়, পায়োনিয়র-সম্পাদক রাজা নয়। রাজপুত্র আসুন, ভারতের রাজতক্তে বসুন, তাহা হইলে স্বভাবতই তাঁহার নিকট ভারতবর্ষই মুখ্য এবং ইংলণ্ড গৌণ হইয়া উঠিবে। তাহাতেই ভারতের মঙ্গল এবং ইংলণ্ডের স্থায়ী লাভ। কারণ, মানুষকে কল দিয়া শাসন করিব, তাহার সহিত হৃদয়ের সম্পর্ক, সমাজের সম্পর্ক রাখিব না এ স্পর্দ্ধা ধর্ম্মরাজ কখনই চিরদিন সহ্য করিতে পারেন না—ইহা স্বাভাবিক নহে—ইহা বিশ্ববিধানকে পীড়িত করিতে থাকে। সেইজন্য সুশাসনই বল, শান্তিই বল, কিছুর দ্বারাই

এই দারুণ হৃদয়-দুর্ভিক্ষ পূরণ হইতে পারে না। এ কথা শুনিয়া আইন ক্রুদ্ধ হইতে পারে, পুলিস-সর্প ফণা তুলিতে পারে; কিন্তু যে ক্ষুধিত সত্য ত্রিশ কোটি প্রজার মর্ম্মের মধ্যে হাহাকার করিতেছে, তাহাকে বলের দ্বারা উচ্ছেদ করিতে পারে এমন শাসনের উপায় কোনো মানবের হাতে নাই, কোনো দানবের হাতে নাই।

ভারতবর্ষীয় প্রজার এই যে হৃদয় প্রত্যহ ক্লিষ্ট হইতেছে, ইহাকেই কতকটা সান্ত্বনা দিবার জন্য রাজপুত্রকে আনা হইয়াছিল—আমাদিগকে দেখানো হইয়াছিল যে, আমাদেরও রাজা আছে। কিন্তু মরীচিকার দ্বারা সত্যকার তৃষ্ণা দূর হয় না।

বস্তুত আমরা রাজশক্তিকে নহে—রাজহৃদয়কে প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে ও প্রত্যক্ষ রাজাকে আমাদের হৃদয় অর্পণ করিতে চাই। ধনপ্রাণ সুরক্ষিত হওয়াই যে প্রজার চরম চরিতার্থতা, প্রভুগণ, একথা মনেও করিয়োনা। তোমরা আমাদিগকে নিতান্ত অবজ্ঞা কর বলিয়াই তোমরা বলিয়া থাক ইহারা শান্তিতে আছে তবু ইহারা আর কি চায়! ইহা জানিয়ো, হৃদয়ের দ্বারা মানুষের হৃদয়কে বশ করিলে সে ধনপ্রাণ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ত্যাগ করিতে পারে, ভারতের ইতিহাসে তাহার প্রমাণ আছে। শান্তি নহে—মানুষ তৃপ্তি চাহে এবং দৈব আমাদের প্রতি যতই বিরূপ হউন, আমরা মানুষ! আমাদেরও ক্ষুধা দূর করিতে হইলে সত্যকার অন্নেরই প্রয়োজন হয়—আমাদের হৃদয় বশ করা ফুলর, প্যানিটিভ্ পুলিশ এবং জোর-জুলুমের কর্ম্ম নহে।

দেবই হউন আর মানবই হউন, লাটই হউন আর জ্যাকই হউন, যেখানে কেবল প্রতাপের প্রকাশ, বলের বাহুল্য, সেখানে ভীত হওয়া নত হওয়ার মত আত্মাবমাননা, অন্তর্যামী ঈশ্বরের অবমাননা, আর নাই। হে ভারতবর্ষ, সেখানে তুমি তোমার চিরদিনের উদার অভয় ব্রহ্মজ্ঞানের সাহায্যে এই সমস্ত লাঞ্ছনার ঊর্দ্ধে তোমার মস্তককে অবিচলিত রাখ—এই

সমস্ত বড় বড় নামধারী মিথ্যাকে তোমার সর্ব্বান্তঃকরণের দ্বারা অস্বীকার কর, ইহারা যেন বিভীষিকার মুখস পরিয়া তোমার অন্তরাত্মাকে লেশমাত্র সঙ্কুচিত করিতে না পারে। তোমার আত্মার দিব্যতা, উজ্জ্বলতা, পরমশক্তিমত্তার কাছে এই সমস্ত তর্জ্জন গর্জ্জন, এই সমস্ত উচ্চ পদের অভিমান, এই সমস্ত শাসন শোষণের আয়োজন আড়ম্বর, তুচ্ছ ছেলেখেলা-মাত্র—ইহারা যদিবা তোমাকে পীড়া দেয় তোমাকে যেন ক্ষুদ্র করিতে না পারে। যেখানে প্রেমের সম্বন্ধ সেইখানেই নত হওয়ায় গৌরব—যেখানে সে সম্বন্ধ নাই সেখানে যাহাই ঘটুক, অন্তঃকরণকে মুক্ত রাখিয়ো, ঋজু রাখিয়ো, দীনতা স্বীকার করিয়ো না, ভিক্ষাবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়ো, নিজের প্রতি অক্ষুণ্ণ আস্থা রাখিয়ো। কারণ, নিশ্চয়ই জগতে তোমার একান্ত প্রয়োজন আছে—সেই জন্য বহু দুঃখেও তুমি বিনাশপ্রাপ্ত হও নাই। অন্যের বাহ্য অনুকরণের চেষ্টা করিয়া তুমি যে এতকাল পরে একটা ঐতিহাসিক প্রহসন রচনা করিবার জন্য এতদিন বাঁচিয়া আছ, তাহা কখনই নহে। তুমি যাহা হইবে যাহা করিবে অন্য দেশের ইতিহাসে তাহার নমুনা নাই—তোমার যথাস্থানে তুমি বিশ্বভুবনের সকলের চেয়ে মহৎ। হে আমার স্বদেশ, মহাপর্ব্বতমালার পাদমূলে মহাসমুদ্র-পরিবেষ্টিত তোমার আসন বিস্তীর্ণ রহিয়াছে—এই আসনের সম্মুখে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান বৌদ্ধ বিধাতার আহ্বানে আকৃষ্ট হইয়া বহুদিন হইতে প্রতীক্ষা করিতেছে, তোমার এই আসন তুমি যখন পুনর্ব্বার একদিন গ্রহণ করিবে, তখন আমি নিশ্চয় জানি—তোমার মন্ত্রে কি জ্ঞানের, কি কর্ম্মের, কি ধর্ম্মের অনেক বিরোধ মীমাংসা হইয়া যাইবে এবং তোমার চরণপ্রান্তে আধুনিক নিষ্ঠুর পোলিটিক্যাল্ কালভুজঙ্গের বিশ্বদ্বেষী বিষাক্ত দর্প পরিশান্ত হইবে। তুমি চঞ্চল হইয়ো না, লুব্ধ হইয়ো না, ভীত হইয়ো না, তুমি "আত্মানং বিদ্ধি" আপনাকে জান এবং "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত, ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি"

উঠ, জাগো, যাহা শ্রেষ্ঠ তাহাই পাইয়া প্রবুদ্ধ হও, যাহা যথার্থ পথ তাহা ক্ষুরধারশাণিত দুর্গম দুরত্যয়, কবিরা এইরূপ বলিয়া থাকেন।

১৩১২

বহুরাজকতা

সাবেক কালের সঙ্গে এখনকার কালের তুলনা করিতে আমরা ছাড়ি না। সাবেক কাল যখন হাজির নাই, তখন একতরফা বিচারে যাহা হইতে পারে তাহাই ঘটিয়া থাকে অর্থাৎ বিচারকের মেজাজ অনুসারে কখনো বা সেকালের ভাগ্যে যশ জোটে, কখনো বা একালের জিৎ হয়। কিন্তু এমন বিচারের উপরে ভরসা রাখা যায় না।

আমাদের পক্ষে মোগলের আমল সুখের ছিল কি ইংরেজের আমল সুখের, গোটাকতক মোটা মোটা সাক্ষীর কথা শুনিয়াই তাহার শেষ নিষ্পত্তি হইতে পারে না। নানা সূক্ষ্ম জিনিষের উপর মানুষের সুখদুঃখ নির্ভর করে—সে সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া দেখা সম্ভবপর নয়। বিশেষত যে কালটা গেছে সে আপনার অনেক সাক্ষীসাবুদ সঙ্গে লইয়া গেছে।

কিন্তু সেকাল-একালের একটা মস্ত প্রভেদ ছোট বড় আর সমস্ত প্রভেদের উপরে মাথা তুলিয়া আছে। এই প্রভেদটা যেমন সকলের চেয়ে বড়, তেমনি নিশ্চয়ই এই প্রভেদের ফলাফলও আমাদের দেশের পক্ষে সকলের চেয়ে গুরুতর। আমাদের এই ছোট প্রবন্ধে আমরা সেই প্রভেদটির কথাই সংক্ষেপে পাড়িয়া দেখিতে চাই।

ইতিপূর্ব্বে ভারতবর্ষের সিংহাসনে একজন বাদশাহ ছিল, তাহার পরে একটি কোম্পানি বসিয়াছিল, এখন একটি জাতি বসিয়াছে। আগে ছিল

এক, এখন হইয়াছে অনেক। এ কথাটা এতই সোজা যে ইহা প্রমাণ করিবার জন্য কোনো সূক্ষ্মতর্কের প্রয়োজন হয় না।

বাদশা যখন ছিলেন, তখন তিনি জানিতেন সমস্ত ভারতবর্ষ তাঁরই, এখন ইংরেজজাত জানে ভারতবর্ষ তাহাদের সকলেরই। একটা রাজপরিবারমাত্র নহে, সমস্ত ইংরেজজাতটা এই ভারতবর্ষকে লইয়া সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে।

খুব সম্ভব বাদশাহের অত্যাচার যথেষ্ট ছিল—এখন অত্যাচার নাই কিন্তু বোঝা আছে। হাতির পিঠে মাহুত বসিয়া তাহাকে মাঝে মাঝে অঙ্কুশ দিয়া মারে, হাতির পক্ষে তাহা সুখকর নহে। কিন্তু মাহুতের বদলে যদি আর একটা গোটা হাতিকে সর্ব্বদা বহন করিতে হইত তবে বাহকটি অঙ্কুশের অভাবকেই আপনার একমাত্র সৌভাগ্য বলিয়া জ্ঞান করিত না।

একটিমাত্র দেবতার পূজার থালায় যদি ফুল সাজাইয়া দেওয়া যায়, তবে তাহা দেখিতে স্তূপাকার হইতে পারে এবং যে ব্যক্তি ফুল আহরণ করিয়াছে তাহার পরিশ্রমটাও হয় ত অত্যন্ত প্রত্যক্ষরূপে দেখা যায়। কিন্তু তেত্রিশকোটি দেবতাকে একটা করিয়া পাপ্‌ড়িও যদি দেওয়া যায়, তবে তাহা চোখে দেখিতে যতই সামান্য হউক না কেন তলে তলে ব্যাপারখানা বড় কম হয় না। তবে কি না এই একটা একটা করিয়া পাপ্‌ড়ির হিসাব এক জায়গায় সংগ্রহ করা কঠিন বলিয়া নিজের অদৃষ্টকে ছাড়া আর কাহাকেও দায়ী করার কথা মনেও উদয় হয় না।

কিন্তু এখানে কাহাকেও বিশেষরূপে দায়ী করিবার কথা হইতেছে না। মোগলের চেয়ে ইংরেজ ভাল কি মন্দ তাহার বিচার করিয়া বিশেষ কোনো লাভ নাই। তবে কি না অবস্থাটা জানা চাই, তাহা হইলে অনেক বৃথা আশা ও বিফল চেষ্টার হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়, সেও একটা লাভ।

মনে কর,—এই যে আমরা আক্ষেপ করিয়া মরিতেছি দেশের বড় বড় চাক্‌রি প্রায় ইংরেজের ভাগ্যে পড়িতেছে ইহার প্রতিকারটা কোনখানে?

আমরা মনে করিতেছি বিলাতে গিয়া যদি দ্বারে দ্বারে দুঃখ নিবেদন করিয়া ফিরি, তবে একটা সদ্গতি হইতে পারে।

কিন্তু এ কথা মনে রাখিতে হইবে যাহার বিরুদ্ধে নালিশ, আমরা তাহার কাছেই নালিশ করিতে যাইতেছি।

বাদশাহের আমলে আমরা উজীর হইয়াছি, সেনাপতি হইয়াছি, দেশ শাসন করিবার ভার পাইয়াছি, এখন যে তাহা আমাদের আশার অতীত হইয়াছে ইহার কারণ কি? অন্য গূঢ় বা প্রকাশ্য কারণ ছাড়িয়া দাও, একটা মোটা কারণ আছে সে ত স্পষ্টই দেখিতেছি। ইংলণ্ড সমস্ত ইংরেজকে অন্ন দিতে পারে না—ভারতবর্ষে তাহাদের জন্য অন্নসত্র খোলা থাকা আবশ্যক। একটি জাতির অন্নের ভার অনেকটা পরিমাণে আমাদের স্কন্ধে পড়িয়াছে; সেই অন্ন নানারকম আকারে নানারকম পাত্রে যোগাইতে হইতেছে।

যদি সপ্তমএডোওয়ার্ড যথার্থই আমাদের দিল্লির সিংহাসনে রাজা হইয়া বসিতেন, তবে তাঁহাকে গিয়া বলিতে পারিতাম যে, হুজুর, অন্নের যদি বড় বড় গ্রাস সমস্তই বিদেশী লোকের পাতে পড়ে, তবে তোমার রাজ্য টেঁকে কি করিয়া।

তখন সম্রাটও বলিতেন, "তাইত, আমার সাম্রাজ্য হইতে আমার ভোগের জন্য যাহা গ্রহণ করি তাহা শোভা পায়, কিন্তু তাই বলিয়া বারো ভূতে মিলিয়া পাত পাড়িয়া বসিলে চলিবে কেন?"

তখন আমার রাজ্য বলিয়া তাঁহার দরদ বোধ হইত এবং অন্যের লুব্ধহস্ত ঠেকাইয়া রাখিতেন। কিন্তু আজ প্রত্যেক ইংরেজই ভারতবর্ষকে আমার রাজ্য বলিয়া জানে। এ রাজ্যে তাহাদের ভোগের খর্ব্বতা ঘটিতে গেলেই তাহারা সকলে মিলিয়া এমনি কলরব তুলিবে যে, তাহাদের স্বদেশীয় কোনো আইনকর্ত্তা এসম্বন্ধে কোনো বদল করিতে পারিবেই না।

এই আমাদের প্রকাণ্ড বহুসহস্রমুখবিশিষ্ট রাজার মুখের গ্রাসে ভাগ

বসাইবার জন্য তাহারই কাছে দরবারে যাওয়া নিষ্ফল, এ কথা একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যায়।

মোটকথা,—একটা আস্ত জাত নিজের দেশে বাস করিয়া অন্য দেশকে শাসন করিতেছে ইতিপূর্ব্বে এমন ঘটনা ইতিহাসে ঘটে নাই। অত্যন্ত ভাল রাজা হইলেও এ রকম অবস্থায় রাজার বোঝা বহন করা দেশের পক্ষে বড় কঠিন। মুখ্যত অন্য দেশের এবং গৌণত আপনার স্বার্থ যে দেশকে এক সঙ্গে সাম্‌লাইতে হয়, তাহার অবস্থা বড়ই শোচনীয়। যে দেশের ভারকেন্দ্র নিজের এতটা বাহিরে পড়িয়াছে সে মাথা তুলিবে কি করিয়া? না হয় চুরি ডাকাতি বন্ধ হইল, না হয় আদালতে অত্যন্ত সূক্ষ্ম সুবিচারই ঘটিয়া থাকে, কিন্তু বোঝা নামাইব কোথায়?

অতএব কন্‌গ্রেসের যদি কোনো সঙ্গত প্রার্থনা থাকে, তবে তাহা এই যে, সম্রাট্‌ এডোয়ার্ডের পুত্রই হউন্‌, স্বয়ং লর্ড কার্জ্জন বা কিচেনারই হউন্‌, অথবা ইংলিশম্যান্‌-পায়োনিয়রের সম্পাদকই হউন্‌, ভাল মন্দ বা মাঝারি যে কোনো একজন ইংরেজ বাছিয়া পার্লামেণ্ট আমাদের রাজা করিয়া দিল্লির সিংহাসনে বসাইয়া দিন। একটা দেশ যতই রসালো হউক্‌ না, একজন রাজাকেই পালিতে পারে, দেশসুদ্ধ রাজাকে পারে না।

১৩১২

পথ ও পাথেয়

জেলে প্রতিদিন জাল ফেলে তাহার জালে মাছ ওঠে। একদিন জাল ফেলিতেই হঠাৎ একটা ঘড়া উঠিল, এবং ঘড়ার মুখ যেমন খুলিল অমনি তাহার ভিতর হইতে পুঞ্জ পুঞ্জ ধোঁয়ার আকার ধরিয়া একটা দৈত্য বাহির হইয়া পড়িল, আরব্য উপন্যাসে এম্‌নি একটা গল্প আছে।

আমাদের খবরের কাগজ প্রতিদিন খবর টানিয়া আনে; কিন্তু তাহার জালে যে সেদিন এমন একটা ঘড়া ঠেকিবে, এবং ঘড়ার মধ্য হইতে এত বড় একটা ত্রাসজনক ব্যাপার বাহির হইয়া পড়িবে তাহা আমরা কোনো দিন প্রত্যাশাও করিতে পারি নাই।

নিতান্তই ঘরের দ্বারের কাছ হইতে এমন একটা রহস্য হঠাৎ চক্ষের নিমিষে উদ্ঘাটিত হইয়া পড়িলে সমস্ত দেশের লোকের মনে যে আন্দোলন উপস্থিত হয় সেই সুদূরব্যাপী চাঞ্চল্যের সময় কথার এবং আচরণের সত্যতা রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠে। জলে যখন ঢেউ উঠিতে থাকে তখন ছায়াটা আপনি বিকৃত হইয়া যায়, সে জন্য কাহাকেও দোষ দিতে পারিনা। অত্যন্ত ভয় এবং ভাবনার সময় আমাদের চিন্তা ও বাক্যের মধ্যে সহজেই বিকলতা ঘটে অথচ ঠিক এইরূপ সময়েই অবিচলিত এবং নির্বিকার সত্যের প্রয়োজন সকলের চেয়ে বেশি। প্রতিদিন অসত্য ও অর্দ্ধসত্য আমাদের তত গুরুতর অনিষ্ট করেনা কিন্তু সঙ্কটের দিনে তাহার মত শত্রু আর কেহ নাই।

অতএব ঈশ্বর করুন, আজ যেন আমরা ভয়ে, ক্রোধে, আকস্মিক বিপদে, দুর্ব্বল চিত্তের অতিমাত্র আক্ষেপে আত্মবিস্মৃত হইয়া নিজেকে বা অন্যকে ভুলাইবার জন্য কেবল কতকগুলা ব্যর্থ বাক্যের ধূলা

উড়াইয়া আমাদের চারিদিকের আবিল আকাশকে আরো অস্বচ্ছ করিয়া না তুলি। তীব্র বাক্যের দ্বারা চাঞ্চল্যকে বাড়াইয়া তোলা হয়, ভয়ের দ্বারা সত্যকে কোন প্রকারে চাপা দিবার প্রবৃত্তি জন্মে—অতএব অদ্যকার দিনে হৃদয়াবেগ প্রকাশের উত্তেজনা সম্বরণ করিয়া যথাসম্ভব শান্তভাবে যদি বর্ত্তমান ঘটনাকে বিচার না করি, সত্যকে আবিষ্কার ও প্রচার না করি তবে আমাদের আলোচনা কেবল যে ব্যর্থ হইবে তাহা নহে, তাহাতে অনিষ্ট ঘটিবে।

আমাদের হীনাবস্থা বলিয়াই উপস্থিত বিভ্রাটের সময় কিছু অতিরিক্ত ব্যগ্রতার সহিত তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে ইচ্ছা করে, "আমি ইহার মধ্যে নাই; এ কেবল অমুক দলের কীর্ত্তি; এ কেবল অমুক লোকের অন্যায়; আমি পূর্ব্ব হইতেই বলিয়া আসিতেছি এসব ভাল হইতেছে না, আমিত জানিতাম এমনি একটা ব্যাপার ঘটিবে।"

কোনো আতঙ্কজনক দুর্ঘটনার পর এই প্রকার অশোভন উৎকণ্ঠার সহিত পরের প্রতি অভিযোগ বা নিজের সুবুদ্ধি লইয়া অভিমান আমার কাছে দুর্ব্বলতার পরিচয় সুতরাং লজ্জার বিষয় বলিয়া মনে হয়। বিশেষতঃ আমরা প্রবলের শাসনাধীনে আছি এই জন্য রাজপুরুষদের বিরাগের দিনে অন্যকে গালি দিয়া নিজেকে ভালমানুষের দলে দাঁড় করাইতে গেলে তাহার মধ্যে কেমন একটা হীনতা আসিয়া পড়েই—অতএব দুর্ব্বল পক্ষের এইরূপ ব্যাপারে অতিরিক্ত উৎসাহ প্রকাশ করিতে না যাওয়াই ভাল।

তাহার পরে, যাহারা অপরাধ করিয়াছে, ধরা পড়িয়াছে, নির্ম্মম রাজদণ্ড যাহাদের 'পরে উদ্যত হইয়া উঠিয়াছে, আর কিছু বিচার না করিয়া কেবল মাত্র বিপদ ঘটাইয়াছে বলিয়াই তাহাদের প্রতি তীব্রতা প্রকাশ করাও কাপুরুষতা। তাহাদের বিচারের ভার এমন হাতে আছে যে, অনুগ্রহ বা মমত্ব সেই হাতকে লেশমাত্র দণ্ডলাঘবতার দিকে বিচলিত

করিবে না। অতএব ইহার উপরেও আমরা যেটুকু অগ্রসর হইয়া যোগ করিতে যাইব তাহাতে ভীরু স্বভাবের নির্দ্দয়তা প্রকাশ পাইবে। ব্যাপারটাকে আমরা যেমনি দোষাবহ বলিয়া মনে করিনা কেন, সে সম্বন্ধে মত প্রকাশের আগ্রহে আমরা আত্মসম্ভ্রমের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিব কেন? সমস্ত দেশের মাথার উপরকার আকাশে যখন একটা রুদ্ররোষ রক্তবর্ণ হইয়া স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে তখন সেই বজ্রধরের সম্মুখে আমাদের দায়িত্ববিহীন চাপল্য কেবল যে অনাবশ্যক তাহা নহে তাহা কেমন একপ্রকার অসঙ্গত।

যিনি নিজেকে যতই দূরদর্শী বলিয়া মনে করুন না একথা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, ঘটনা যে এতদূর আসিয়া পৌঁছিতে পারে তাহা দেশের অধিকাংশ লোক কল্পনা করে নাই। বুদ্ধি আমাদের সকলেরই ন্যূনাধিক পরিমাণে আছে কিন্তু চোর পালাইলে সেই বুদ্ধির যতটা বিকাশ হয় পূর্ব্বে ততটা প্রত্যাশা করা যায় না।

অবশ্য, ঘটনা যখন ঘটিয়াছে তখন একথা বলা সহজ যে, ঘটনার সম্ভাবনা ছিল বলিয়াই ঘটিয়াছে। এবং অমনি এই সুযোগে আমাদের মধ্যে যাঁহারা স্বভাবত কিছু অধিক উত্তেজনাশীল তাঁহাদিগকেও ভর্ৎসনা করিয়া বলা সহজ যে তোমরা যদি এতটা দূর বাড়াবাড়ি না করিতে তবে ভাল হইত।

আমরা হিন্দু, বিশেষত বাঙালী, বাক্যে যতই উত্তেজনা প্রকাশ করি কোনো দুঃসাহসিক কাজে কদাচ প্রবৃত্ত হইতে পারিনা এই লজ্জার কথা দেশে বিদেশে রাষ্ট্র হইতে বাকি নাই! ইহা লইয়া বাবুসম্প্রদায় বিশেষ ভাবে ইংরেজের কাছে অহরহ দুঃসহ ভাষায় খোঁটা খাইয়া আসিয়াছে। সর্ব্বপ্রকার উত্তেজনাবাক্য অন্তত বাংলা দেশে যে সম্পূর্ণ নিরাপদ এ সম্বন্ধে আমাদের শত্রু মিত্র কাহারো কোনো সন্দেহ মাত্র ছিলনা! তাই এপর্য্যন্ত কথায় বার্ত্তায় ভাবে ভঙ্গিতে আমরা যতই বাড়াবাড়ি

প্রকাশ করিয়াছি তাহা দেখিয়া কখনো বা পর কখনো বা আত্মীয় বিরক্ত হইয়াছে, রাগ করিয়াছে, আমাদের অসংযমকে প্রহসন বলিয়া উপহাস করিতেও ক্ষান্ত হয় নাই। বস্তুত বাংলা কাগজে অথবা কোনো বাঙালী বক্তার মুখে যখন অপরিমিত স্পর্দ্ধাবাক্য বাহির হইত তখন এই বলিয়াই বিশেষ ভাবে স্বজাতির জন্য লজ্জা অনুভব করিয়াছি যে যাহারা দুঃসাহসিক কাজ করিবার জন্য বিখ্যাত নহে তাহাদের বাক্যের তেজ দীনতাকে আরো উজ্জ্বল করিয়া প্রকাশ করে মাত্র। বস্তুত বহুদিন হইতে বাঙালীজাতি ভীরু অপবাদের দুঃসহ ভার বহন করিয়া নতশির হইয়াছে বলিয়াই বর্ত্তমান ঘটনাসম্বন্ধে ন্যায় অন্যায় ইষ্ট অনিষ্ট বিচার অতিক্রম করিয়াও অপমানমোচনের উপলক্ষ্যে বাঙালীর মনে একটা আনন্দ না জন্মিয়া থাকিতে পারে নাই।

অতএব এ কথাটা সত্য যে, বাংলা দেশের মনের জ্বালা দেখিতে দেখিতে ক্রমশই যে প্রকার অগ্নিমূর্ত্তি ধরিয়া প্রকাশ পাইয়া উঠিয়াছে ইহাকে আমাদের দেশের বা অন্য দেশের কোনো জ্ঞানী পুরুষ অবশ্যম্ভাবী বলিয়া কোনো দিন অনুমান করেন নাই। অতএব আজ আমাদের এই অকস্মাৎ-বুদ্ধিবিকাশের দিনে, যাহাকে আমার ভাল লাগেনা তাহাকে ধরিয়া অসাবধানতার জন্য দায়ী করিতে বসা সুবিচার-সঙ্গত নহে। আমিও এই গোলমালের দিনে কোনো পক্ষের বিরুদ্ধে নালিশ উত্থাপন করিতে চাইনা। কিন্তু কেমন করিয়া কি ঘটিল এবং তাহার ফলাফলটা কি, সেটা নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়া আমাদের পথ ঠিক করিয়া লইতেই হইবে; সেই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়া যদি একজনের বা অনেকের সঙ্গে আমার মতের অনৈক্য প্রকাশ হয়, তবে দয়া করিয়া একথা নিশ্চয় মনে রাখিবেন, যে, আমার বুদ্ধির ক্ষীণতা থাকিতে পারে, আমার দৃষ্টি-শক্তির দুর্ব্বলতা থাকা সম্ভব, কিন্তু স্বদেশের হিতের প্রতি ঔদাসীন্য বা হিতৈষীদের প্রতি কিছুমাত্র বিরুদ্ধ ভাববশত যে আমি বিচারে ভুল

করিতেছি ইহা কদাচ সত্য নহে। অতএব আমার কথাগুলি যদিবা গ্রাহ্য নাও করেন আমার অভিপ্রায়ের প্রতি ধৈর্য্য ও শ্রদ্ধা রক্ষা করিবেন।

বাংলা দেশে কিছুকাল হইতে যাহা ঘটিয়া উঠিতেছে তাহার সংঘটনে আমাদের কোন্ বাঙালীর কতটা অংশ আছে তাহার সূক্ষ্ম বিচার না করিয়া একথা নিশ্চয় বলা যায় যে, কায় বা মন বা বাক্যে ইহাকে আমরা প্রত্যেকেই কোনো না কোনো প্রকারে খাদ্য জোগাইয়াছি। অতএব যে চিত্তদাহ কেবল পরিমিত স্থান লইয়া বদ্ধ থাকে নাই, প্রকৃতি-ভেদে যাহার উত্তেজনা আমরা প্রত্যেকে নানাপ্রকারে অনুভব ও প্রকাশ করিয়াছি, তাহারই একটা কেন্দ্রক্ষিপ্ত পরিণাম যদি এই প্রকার গুপ্ত বিপ্লবের অদ্ভুত আয়োজন হয় তবে ইহার দায় এবং দুঃখ বাঙালীমাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে। জ্বর যখন সমস্ত শরীরকে অধিকার করিয়াই হইয়াছিল তখন হাতের তেলো কপালের চেয়ে ঠাণ্ডা ছিল বলিয়াই মৃত্যুকালে নিজেকে সাধু ও কপালটাকেই যত নষ্টের গোড়া বলিয়া নিষ্কৃতি পাইবে না। আমরা কি করিব কি করিতে চাই সে কথা স্পষ্ট করিয়া ভাবি নাই; এই জানি আমাদের মনে আগুন জ্বলিয়াছিল; সেই আগুন স্বভাবধর্ম্মবশত ছড়াইয়া পড়িতেই ভিজা কাঠ ধোঁয়াইতে থাকিল, শুকনা কাঠ জ্বলিতে লাগিল এবং ঘরের কোণে কোন্‌খানে কেরোসিন্ ছিল সে আপনাকে ধারণ করিতে না পারিয়া টিনের শাসন বিদীর্ণ করিয়া একটা বিভীষিকা করিয়া তুলিল।

তা যাই হোক্, কার্য্যকারণের পরস্পরের যোগে পরস্পরের ব্যাপ্তি যেমন করিয়াই ঘটুক না কেন, তাই বলিয়া অগ্নি যখন অগ্নিকাণ্ড করিয়া তুলে তখন সব তর্ক ছাড়িয়া তাহাকে নিবৃত্ত করিতে হইবে এ সম্বন্ধে মতভেদ হইলে চলিবে না।

বিশেষত কারণটা দেশ হইতে দূর হয় নাই; লোকের চিত্ত উত্তেজিত

হইয়া আছে। উত্তেজনা এতই তীব্র যে, যে সকল সাংঘাতিক ব্যাপার আমাদের দেশে অসম্ভব বলিয়া মনে করা যাইত তাহাও সম্ভবপর হইয়াছে। বিরোধ বুদ্ধি এতই গভীর এবং সুদূরবিস্তৃতভাবে ব্যাপ্ত যে কর্তৃপক্ষ ইহাকে বলপূর্ব্বক কেবল স্থানে স্থানে উৎপাটিত করিতে চেষ্টা করিয়া কখনই নিঃশেষ করিতে পারিবেন না, বরঞ্চ ইহাকে আরো প্রবল ও প্রকাণ্ড করিয়া তুলিবেন।

বর্ত্তমান সঙ্কটে রাজপুরুষদের কি করা কর্ত্তব্য তাহা আলোচনা করিতে গেলে তাঁহারা শ্রদ্ধা করিয়া শুনিবেন বলিয়া ভরসা হয় না। আমরা তাঁহাদের দণ্ডশালার দ্বারে বসিয়া তাঁহাদিগকে পোলিটিকাল প্রাজ্ঞতা শিক্ষা দিবার দুরাশা রাখি না। আমাদের বলিবার কথাও অতি পুরাতন এবং শুনিলে মনে হইবে ভয়ে বলিতেছি। তবু সত্য পুরাতন হইলেও সত্য এবং তাহাকে ভুল বুঝিলেও তাহা সত্য। কথাটি এই—শক্তস্য ভূষণং ক্ষমা—কথা আরো একটু আছে, ক্ষমা শুধু শক্তের ভূষণ নহে সময় বিশেষে শক্তের ব্রহ্মাস্ত্রও ক্ষমা। কিন্তু আমরা যখন শক্তের দলে নহি তখন এই সাত্ত্বিক উপদেশটি লইয়া অধিক আলোচনা আমাদের পক্ষে শোভা পায় না।

ব্যাপারটা দুই পক্ষকে লইয়া—অথচ দুই পক্ষের মধ্যে আপসে বোঝাপড়ার সম্বন্ধ অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে; একদিকে প্রজার বেদনাকে উপেক্ষা করিয়া বল একান্ত প্রবল মূর্ত্তি ধরিতেছে, অন্য দিকে দুর্ব্বলের নিরাশ মনোরথ সফলতার কোনোপথ না পাইয়া প্রতি দিন মরিয়া হইয়া উঠিতেছে;—এ অবস্থায় সমস্যাটি ছোট নহে। কারণ, আমরা এই দুই পক্ষের ব্যাপারে কেবল এক পক্ষকে লইয়া যেটুকু চেষ্টা করিতে পারি তাহাই আমাদের একমাত্র সম্বল। ঝড়ের দিনে হালের মাঝি নিজের খেয়ালে চলিতেছে; আমরা দাঁড় দিয়া যেটুকু রক্ষা করিতে পারি অগত্যা তাহাই করিতে হইবে;—মাঝি সহায় যদি হয়

তবে ভালই, যদি নাও হয় তবু দুঃসাধ্য সাধনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে ; কারণ, যখন ডুবিতে বসিব তখন অন্যকে গালি পাড়িয়া কোন সান্ত্বনা পাইব না।

এইরূপ দুঃসময়ে সত্যকে চাপাচুপি দিতে যাওয়া প্রলয়ক্ষেত্রে বসিয়া ছেলেখেলা করা মাত্র। আমরা গবর্মেণ্টকে বলিবার চেষ্টা করিতেছি এ সমস্ত কিছুই নয় এ কেবল দুই পাঁচ জন ছেলেমানুষের চিত্তবিকারের পরিচয়। আমি ত এ প্রকার শূন্যগর্ভ সান্ত্বনাবাক্যের কোনোই সার্থকতা দেখি না। প্রথমত এরূপ ফুৎকার-বায়ুমাত্রে আমরা গবর্মেণ্টের পলিসির পালকে এক ইঞ্চিও ফিরাইতে পারিব না। দ্বিতীয়ত দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় কোথায় কি হইতেছে তাহা নিশ্চয় জানি বলিলে যে মিথ্যা বলা হয় তাহার সম্পূর্ণ প্রমাণ হইয়া গেছে। অতএব বিপদের সম্ভাবনা স্বীকার করিয়াই আমাদিগকে কাজ করিতে হইবে। দায়িত্ববোধবিহীন লঘু বাক্যের দ্বারা কোন সত্যকার সঙ্কটকে ঠেকানো যায় না—এখন কেবল সত্যের প্রয়োজন।

এখন আমাদের দেশের লোককে অকপট হিতৈষণা হইতে এই কথা স্পষ্ট করিয়া বলিতে হইবে গবর্মেণ্টের শাসননীতি যে পন্থাই অবলম্বন করুক্ এবং ভারতবর্ষীয় ইংরেজের ব্যক্তিগত ব্যবহার আমাদের চিত্তকে যেমনি মথিত করিতে থাক্ আমাদের পক্ষে আত্মবিস্মৃত হইয়া আত্মহত্যা করা তাহার প্রতিকার নহে।

যে কাল পড়িয়াছে এখন ধর্ম্মের দোহাই দেওয়া মিথ্যা। কারণ, রাষ্ট্রনীতিতে ধর্ম্মনীতির স্থান আছে এ কথা যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ বিশ্বাসে প্রকাশ করে লোকে তাহাকে হয় কাণ্ডজ্ঞানহীন নয় নীতিবায়ুগ্রস্ত বলিয়া অবজ্ঞা করে। প্রয়োজনের সময় প্রবল পক্ষ ধর্ম্মকে মান্য করা কার্য্যহন্তারক দীনতা বলিয়া মনে করে, পশ্চিম মহাদেশের ইতিহাসে তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে ; তৎসত্ত্বেও প্রয়োজনসাধনের উপলক্ষে যদি দুর্ব্বলকে ধর্ম্ম

মানিতে উপদেশ দিই তবে উত্তেজনার অবস্থায় তাহারা উত্তর দেয় এ ত ধর্ম্ম মানা নয় এ ভয়কে মানা।

অল্প দিন হইল যে বোয়ার যুদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে জয়লক্ষ্মী যে ধর্ম্মবুদ্ধির পিছন পিছন চলেন নাই সে কথা কোনো কোনো ধর্ম্মভীরু ইংরেজের মুখ হইতেই শুনা গিয়াছে। যুদ্ধের সময় শত্রুপক্ষের মনে ভয় উদ্রেক করিয়া দিবার জন্য তাহাদের গ্রামপল্লী উৎসাদিত করিয়া, ঘর দুয়ার জ্বালাইয়া, খাদ্যদ্রব্য লুটপাট করিয়া নির্ব্বিচারে বহুতর নিরপরাধ নরনারীকে নিরাশ্রয় করিয়া দেওয়া যুদ্ধব্যাপারের একটা অঙ্গ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। "মার্শাল ল" শব্দের অর্থই প্রয়োজনকালে ন্যায়বিচারের বুদ্ধিকে একটা পরম বিঘ্ন বলিয়া নির্ব্বাসিত করিয়া দিবার বিধি এবং তদুপলক্ষে প্রতিহিংসাপরায়ণ মানবপ্রকৃতির বাধামুক্ত পাশবিকতাকেই প্রয়োজনসাধনের সর্ব্বপ্রধান সহায় বলিয়া ঘোষণা করা। প্যুনিটিভ পুলিসের দ্বারা সমস্ত নিরুপায় গ্রামের লোককে বলপূর্ব্বক ভারাক্রান্ত করিবার নির্বিবেক বর্ব্বরতাও এই জাতীয়। এই সকল বিধির দ্বারা প্রচার করা হয় যে, রাষ্ট্রকার্য্যে বিশুদ্ধ ন্যায়ধর্ম্ম প্রয়োজনসাধনের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে।

য়ুরোপের এই অবিশ্বাসী রাষ্ট্রনীতি আজ পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ধর্ম্মবুদ্ধিকে বিষাক্ত করিয়া তুলিতেছে। এমন অবস্থায় যখন বিশেষ ঘটনায় বিশেষ কারণে কোন অধীন জাতি সহসা নিজেদের অধীনতার ঐকান্তিক মূর্ত্তি দেখিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে পীড়িত হইয়া উঠে, অথচ নিজেদের সর্ব্বপ্রকার নিরুপায়তার অপমানে উত্তপ্ত হইতে থাকে, তখন তাহাদের মধ্যে একদল অধীর অসহিষ্ণু ব্যক্তি যখন গোপন পন্থা অবলম্বন করিয়া কেবল ধর্ম্মবুদ্ধিকে নহে কর্ম্মবুদ্ধিকেও বিসর্জ্জন দেয় তখন দেশের আন্দোলনকারী বক্তাদিগকেই এই জন্য দায়ী করা বলদর্পে-অন্ধ গায়ের জোরের মূঢ়তা মাত্র।

অতএব দেশের যে সকল লোক গুপ্তপন্থাকেই রাষ্ট্রহিতসাধনের একমাত্র পন্থা বলিয়া স্থির করিয়াছে তাহাদিগকে গালি দিয়াও কোন ফল হইবে না এবং তাহাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিতে গেলেও তাহারা হাসিয়া উড়াইয়া দিবে। আমরা যে যুগে বর্ত্তমান, এ যুগে ধর্ম্ম যখন রাষ্ট্রীয় স্বার্থের নিকট প্রকাশ্য ভাবে কুণ্ঠিত, তখন এরূপ ধর্ম্মভ্রংশতার যে দুঃখ তাহা সমস্ত মানুষকেই নানা আকারে বহন করিতেই হইবে; রাজা ও প্রজা, প্রবল ও দুর্ব্বল, ধনী ও শ্রমী কেহ তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইবে না। রাজাও প্রয়োজনের জন্য প্রজাকে দুর্নীতির দ্বারা আঘাত করিবে এবং প্রজাও প্রয়োজনের জন্য রাজাকেও দুর্নীতির দ্বারাই আঘাত করিতে চেষ্টা করিবে এবং যে সকল তৃতীয় পক্ষের লোক এই সমস্ত ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে লিপ্ত নহে তাহাদিগকেও এই অধর্ম্মসংঘর্ষের অগ্নিদাহ সহ্য করিতে হইবে। বস্তুত সঙ্কটে পড়িয়া মানুষ যেদিন সুস্পষ্ট বুঝিতে পারে যে, অধর্ম্মকে বেতন দিতে গেলে সে যে কেবল এক পক্ষেরই বাঁধা গোলামী করে তাহা নহে। সে দুই পক্ষেরই নিমক খাইয়া যখন সকল পক্ষেই সমান ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে তখন তাহার সহায়তাকে অবিশ্বাস করিয়া তাহাকে একযোগে নির্ব্বাসিত করিয়া দিবার জন্য বিপন্ন সমাজে পরস্পরের মধ্যে রফা চলিতে থাকে। এমনি করিয়াই ধর্ম্মরাজ নিদারুণ সংঘাতের মধ্য হইতেই ধর্ম্মকে জয়ী করিয়া উদ্ধার করিয়া লইতেছেন। যতদিন তাহা সম্পূর্ণ না হয় ততদিন সন্দেহের সঙ্গে সন্দেহের, বিদ্বেষের সঙ্গে বিদ্বেষের এবং কপটনীতির সহিত কপটনীতির সংগ্রামে সমস্ত মানবসমাজ উত্তপ্ত হইতে থাকিবে।

অতএব বর্ত্তমান অবস্থায় যদি উত্তেজিত দেশের লোককে কোনো কথা বলিতে হয় তবে তাহা প্রয়োজনের দিক্ হইতেই বলিতে হইবে। তাহাদিগকে এই কথা ভাল করিয়া বুঝাইতে হইবে যে, প্রয়োজন যতই গুরুতর হইলেও প্রশস্ত পথ দিয়াই তাহা মিটাইতে হয়—যেখানে ধর্ম্মসেতু

রাস্তা ধরিয়া কাজ সংক্ষেপ করিতে গেলে এক দিন দিক্ হারাইয়া শেষে পথও পাইবনা কাজও নষ্ট হইবে। আমার মনের তাগিদ অত্যন্ত বেশি বলিয়া জগতে কোনো দিন রাস্তাও নিজেকে ছাঁটিয়া দেয় না, সময় নিজেকে খাটো করে না।

দেশের হিতানুষ্ঠান জিনিষটা যে কতই বড় এবং কত দিকেই যে তাহার অগণ্য শাখা প্রশাখা প্রসারিত সে কথা আমরা যেন কোনো সাময়িক আক্ষেপে ভুলিয়া না যাই। ভারতবর্ষের মত নানা বৈচিত্র্য ও বিরোধগ্রস্ত দেশে তাহার সমস্যা নিতান্তই দুরূহ। ঈশ্বর আমাদের উপর এমন একটা সুমহৎ কর্ম্মের ভার দিয়াছেন, আমরা মানবসমাজের এত বড় একটা প্রকাণ্ড জটিল জালের শতসহস্র গ্রন্থিচ্ছেদনের আদেশ লইয়া আসিয়াছি যে তাহার মাহাত্ম্য যেন এক মুহূর্ত্তও বিস্মৃত হইয়া আমরা কোন প্রকার চাপল্য প্রকাশ না করি। আদিকাল হইতে জগতে যতগুলি বড় বড় শক্তির প্রবাহ জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে তাহাদের সকলগুলিরই কোনো না কোনো বৃহৎ ধারা এই ভারতবর্ষে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। ঐতিহাসিক স্মৃতির অতীতকালে কোন্ নিগূঢ় প্রয়োজনের দুর্নিবার তাড়নায় যে দিন আর্য্য জাতি গিরিগুহামুক্ত স্রোতস্বিনীর মত অকস্মাৎ সচল হইয়া বিশ্বপথে বাহির হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহাদেরই এক শাখা বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ভারতবর্ষের অরণ্যচ্ছায়ায় যজ্ঞের অগ্নি প্রজ্বলিত করিলেন সেই দিন ভারতবর্ষের আর্য্যঅনার্য্যসম্মিলনক্ষেত্রে যে বিপুল ইতিহাসের উপক্রমণিকা গান আরম্ভ হইয়াছিল আজ কি তাহা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই ক্ষান্ত হইয়া গিয়াছে? বিধাতা কি তাহা শিশুর ধূলাঘর নির্ম্মাণের মতই আজ হঠাৎ অনাদরে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন? তাহার পরে এই ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের মিলনমন্ত্র করুণাজলভার-বর্ষীর মেঘমন্দ্রের মত ধ্বনিত হইয়া এসিয়ার পূর্ব্বসাগরতীরবাসী সমস্ত মাত্র। জাতিদিগকে জাগ্রত করিয়া দিল এবং ব্রহ্মদেশ হইতে আরম্ভ

করিয়া অতিদূর জাপান পর্য্যন্ত ভিন্নভাষী অনাত্মীয়দিগকে ধর্ম্মসম্বন্ধে ভারতবর্ষের সঙ্গে একাত্ম করিয়া দিয়াছে, ভারতক্ষেত্রে সেই মহৎ শক্তির অভ্যুদয় কি কেবল ভারতের ভাগ্যেই পরিণামহীন পণ্ডতাতেই পর্য্যবসিত হইয়াছে? তাহার পরে এসিয়ার পশ্চিমতমপ্রান্তে দৈববলের প্রেরণায় মানবের আর এক মহাশক্তি সুপ্তি হইতে জাগ্রত হইয়া ঐক্যমন্ত্র বহন করিয়া দারুণবেগে পৃথিবী প্লাবিত করিতে বাহির হইল, সেই শক্তিস্রোতকে বিধাতা যে কেবল ভারতবর্ষে আহ্বান করিয়াছেন তাহা নহে, এইখানেই তিনি তাহাকে চিরদিনের জন্য আশ্রয় দিয়াছেন। আমাদের ইতিহাসে এই ব্যাপার কি কোন একটা আকস্মিক উৎপাত মাত্র? ইহার মধ্যে নিত্যসত্যের কোন চির-পরিচয় নাই? তাহার পরে য়ুরোপের মহাক্ষেত্রে মানবশক্তি প্রাণের প্রাবল্যে, বিজ্ঞানের কৌতূহলে, পণ্যসংগ্রহের আকাঙ্ক্ষায় যখন বিশ্বাভিমুখী হইয়া বাহির হইল তখন তাহারও একটী বৃহৎ প্রবল ধারা এই ভারতবর্ষে আসিয়াই বিধাতার আহ্বান বহন করিয়া আমাদিগকে আঘাতের দ্বারা জাগ্রত করিয়া তুলিতেছে। এই ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের প্লাবন অপসারিত হইয়া গেলে পর যখন খণ্ড খণ্ড দেশের খণ্ড খণ্ড ধর্ম্ম সম্প্রদায় বিরোধ বিচ্ছিন্নতায় চতুর্দ্দিককে কণ্টকিত করিয়া তুলিয়াছিল তখন শঙ্করাচার্য্য সেই সমস্ত খণ্ডতা ও ক্ষুদ্রতাকে একমাত্র অখণ্ড বৃহত্ত্বের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ করিবার চেষ্টায় ভারতবর্ষের প্রতিভারই পরিচয় দিয়াছিলেন। অবশেষে দার্শনিক জ্ঞানপ্রধান সাধনা যখন ভারতবর্ষে জ্ঞানী অজ্ঞানী অধিকারী অনধিকারীকে বিচ্ছিন্ন করিতে লাগিল—তখন চৈতন্য, নানক, দাদু, কবীর ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে জাতির অনৈক্য শাস্ত্রের অনৈক্যকে ভক্তির পরম ঐক্যে এক করিবার অমৃত বর্ষণ করিয়াছিলেন। কেবলমাত্র ভারতবর্ষের প্রাদেশিক ধর্ম্মগুলির বিচ্ছেদক্ষত প্রেমের দ্বারা মিলাইয়া দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহা নহে—তাঁহারাই ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমান প্রকৃতির মাঝখানে ধর্ম্মসেতু

নির্ম্মাণ করিতেছিলেন। ভারতবর্ষ এখনি যে নিশ্চেষ্ট হইয়া আছে তাহা নহে—রামমোহন রায়, স্বামী দয়ানন্দ, কেশবচন্দ্র, রামকৃষ্ণ পরমহংস, বিবেকানন্দ, শিবনারায়ণ স্বামী ইঁহারাও অনৈক্যের মধ্যে এককে, ক্ষুদ্রতার মধ্যে ভূমাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য জীবনের সাধনাকে ভারতবর্ষের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। অতীতকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের এই এক একটি অধ্যায় ইতিহাসের বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত প্রলাপ মাত্র নহে,—ইহারা পরস্পর গ্রথিত,—ইহারা কেহই একেবারে স্বপ্নের মত অন্তর্দ্ধান করে নাই,—ইহারা সকলেই রহিয়াছে; ইহারা সন্ধিতেই হউক সংগ্রামেই হউক ঘাতপ্রতিঘাতে বিধাতার অভিপ্রায়কে অপূর্ব্ব বিচিত্ররূপে সংরচিত করিয়া তুলিতেছে। পৃথিবীর মধ্যে আর কোনো দেশেই এত বড় বৃহৎ রচনার আয়োজন হয় নাই,—এত জাতি এত ধর্ম্ম এত শক্তি কোন তীর্থ স্থলেই একত্র হয় নাই,—একান্ত বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে প্রকাণ্ড সমন্বয়ে বাঁধিয়া তুলিয়া বিরোধের মধ্যেই মিলনের আদর্শকে পৃথিবীর মধ্যে জয়ী করিবার এমন সুস্পষ্ট আদেশ জগতের আর কোথাও ধ্বনিত হয় নাই। আর সর্ব্বত্র মানুষ রাজ্য বিস্তার করুক, পণ্য বিস্তার করুক, প্রতাপ বিস্তার করুক—ভারতবর্ষের মানুষ দুঃসহ তপস্যা দ্বারা এককে, ব্রহ্মকে, জ্ঞানে, প্রেমে ও কর্ম্মে সমস্ত অনৈক্য ও সমস্ত বিরোধের মধ্যে স্বীকার করিয়া মানুষের কর্ম্মশালার কঠোর সঙ্কীর্ণতার মধ্যে মুক্তির উদার নির্ম্মল জ্যোতিকে বিকীর্ণ করিয়া দিক্—ভারত ইতিহাসের আরম্ভ হইতেই আমাদের প্রতি এই অনুশাসন প্রচারিত হইয়াছে। শ্বেত ও কৃষ্ণ, মুসলমান ও খৃষ্টান, পূর্ব্ব ও পশ্চিম কেহ আমাদের বিরুদ্ধ নহে,—ভারতের পুণ্যক্ষেত্রেই সকল বিরোধ এক হইবার জন্য শত শত শতাব্দী ধরিয়া অতি কঠোর সাধনা করিবে বলিয়াই অতি সুদূরকালে এখানকার তপোবনে একের তত্ত্ব উপনিষদ এমন আশ্চর্য্য সরল জ্ঞানের সহিত প্রচার করিয়াছিলেন যে, ইতিহাস

তাহাকে নানাদিক দিয়া ব্যাখ্যা করিতে করিতে আজও অন্ত পায় নাই।

তাই আমি অনুরোধ করিতেছিলাম অন্যান্য দেশে মনুষ্যত্বের আংশিক বিকাশের দৃষ্টান্তে ভারতবর্ষের ইতিহাসকে সঙ্কীর্ণ করিয়া দেখিবেন না—ইহার মধ্যে যে বহুতর আপাতবিরোধ লক্ষিত হইতেছে তাহা দেখিয়া হতাশ হইয়া কোনো ক্ষুদ্র চেষ্টায় নিজেকে অন্ধভাবে নিযুক্ত করিবেন না—করিলেও কোনো মতেই কৃতকার্য্য হইবেন না এ কথা নিশ্চয় জানিবেন। বিধাতার ইচ্ছার সহিত নিজের ইচ্ছাকে সম্মিলিত করাই সফলতার একমাত্র উপায়—তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে গেলেই ক্ষণিক কার্য্যসিদ্ধি আমাদিগকে ভুলাইয়া লইয়া ভয়ঙ্কর ব্যর্থতার মধ্যে ডুবাইয়া মারিবে।

যে ভারতবর্ষ মানবের সমস্ত মহৎশক্তিপুঞ্জ দ্বারা ধীরে ধীরে এইরূপে বিরাট্‌মূর্ত্তি ধারণ করিয়া উঠিতেছে—সমস্ত আঘাত অপমান সমস্ত বেদনা যাহাকে এই পরম প্রকাশের অভিমুখে অগ্রসর করিতেছে, সেই মহাভারতবর্ষের সেবা আমাদের মধ্যে সজ্ঞানে সচেতনভাবে কে করিবেন, কে একান্ত অবিচলিত ভক্তির সহিত সমস্ত ক্ষোভ অধৈর্য্য অহঙ্কারকে এই মহাসাধনায় বিলীন করিয়া দিয়া ভারত-বিধাতার পদতলে নিজের নির্ম্মল জীবনকে পূজার অর্ঘ্যের ন্যায় নিবেদন করিয়া দিবেন? ভারতের মহাজাতীয় উদ্বোধনের সেই আমাদের পুরোহিতবৃন্দ কোথায়? তাঁহারা যেখানেই থাকুন্ এ কথা আপনারা ধ্রুব সত্য বলিয়া জানিবেন তাঁহারা চঞ্চল নহেন, তাঁহারা উন্মত্ত নহেন, তাঁহারা কর্ম্মনির্দ্দেশশূন্য স্পর্দ্ধা-বাক্যের দ্বারা দেশের লোকের হৃদয়াবেগকে উত্তরোত্তর সংক্রামক বায়ুরোগে পরিণত করিতেছেন না—নিশ্চয় জানিবেন, তাঁহাদের মধ্যে বুদ্ধি, হৃদয় এবং কর্ম্মনিষ্ঠার অতি অসামান্য সমাবেশ ঘটিয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে জ্ঞানের সুগভীর শান্তি ও ধৈর্য্য এবং ইচ্ছা শক্তির অপরাজিত বেগ ও অধ্যবসায় এই উভয়ের সুমহৎ সামঞ্জস্য আছে।

কিন্তু যখন দেখা যায় কোন একটা বিশেষ-ঘটনামূলক উত্তেজনার তাড়নায়, একটা সাময়িক বিরোধের ক্ষুব্ধতায় দেশের অনেক লোক সহসা দেশের হিত করিতে হইবে বলিয়া একমুহূর্ত্তে উর্দ্ধশ্বাসে ধাবিত হয় নিশ্চয় বুঝিতে হইবে হৃদয়াবেগকেই একমাত্র সম্বল করিয়া তাহারা দুর্গম পথে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা দেশের সুদূর ও সুবিস্তীর্ণ মঙ্গলকে শান্তভাবে সত্যভাবে বিচার করিতে অবস্থা-গতিকেই অক্ষম। তাহারা তাহাদের উপস্থিত বেদনাকেই এত তীব্রভাবে অনুভব করে এবং তাহারই প্রতিকারচেষ্টাকে এত উগ্রভাবে মনে রাখে যে আত্মসম্বরণে অক্ষম হইয়া দেশের সমগ্র হিতকে আঘাত করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব হয় না।

ইতিবৃত্তের শিক্ষাকে ঠিকমত বিচার করিয়া লওয়া বড় কঠিন। সকল দেশের ইতিহাসেই কোন বৃহৎ ঘটনা যখন মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া দেখা দেয় তখন তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বেই আমরা একটা প্রবল আঘাত ও আন্দোলন দেখিতে পাই। রাষ্ট্রে বা সমাজে অসামঞ্জস্যের বোঝা অনেক-দিন হইতে নিঃশব্দে পুঞ্জীভূত হইতে হইতে একদিন একটা আঘাতে হঠাৎ তাহা বিপ্লবে ভাঙিয়া পড়ে। সেই সময় দেশের মধ্যে যদি অনুকূল উপকরণ প্রস্তুত থাকে, পূর্ব্ব হইতেই যদি তাহার ভাণ্ডারে নিগূঢ়ভাবে জ্ঞান ও শক্তির সম্বল সঞ্চিত থাকে তবেই সেই বিপ্লবের দারুণ আঘাতকে কাটাইয়া সে দেশ আপনার নূতন জীবনকে নবীন সামঞ্জস্য দান করিয়া গড়িয়া তোলে। দেশের সেই আভ্যন্তরিক প্রাণ সম্বল যাহা অন্তঃপুরের ভাণ্ডারে প্রচ্ছন্নভাবে উপচিত হয় তাহা আমরা দেখিতে পাইনা বলিয়া আমরা মনে করি বুঝি বিপ্লবের দ্বারাতেই দেশ সার্থকতা লাভ করিল; বিপ্লবই যেন মঙ্গলের মূলকারণ এবং মুখ্য উপায়।

ইতিহাসকে এইরূপে বাহ্যভাবে দেখিয়া একথা ভুলিলে চলিবেনা যে দেশের মর্ম্ম স্থানে সৃষ্টি করিবার শক্তি ক্ষীণ হইয়াছে প্রলয়ের আঘাতকে সে কখনই কাটাইয়া উঠিতে পারে না। গড়িয়া তুলিবার

বাঁধিয়া তুলিবার একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি যাহাদের মধ্যে সজীবভাবে বিদ্যমান, ভাঙনের আঘাত তাহাদের সেই জীবনধর্ম্মকেই তাহাদের সৃজনীশক্তিকেই সচেষ্ট সচেতন করিয়া তোলে। এইরূপে সৃষ্টিকেই নূতন বলে উত্তেজিত করে বলিয়াই প্রলয়ের গৌরব। নতুবা শুদ্ধমাত্র ভাঙন, নির্ব্বিচার বিপ্লব, কোনমতেই কল্যাণকর হইতে পারে না।

পালে খুব দমকা হাওয়া লাগিতেই যে জাহাজ জড়ত্ব দূর করিয়া হুহু করিয়া চলিয়া গেল নিশ্চয় বুঝিতে হইবে আর কিছু না হউক সে জাহাজের খোলের তক্তাগুলার মধ্যে ফাঁক ছিল না; যদি বা পূর্ব্বে ছিল এমন হয় তবে নিশ্চয়ই কোনো এক সময়ে জাহাজের মিস্ত্রি খোলের অন্ধকারে অলক্ষ্যে বসিয়া সে গুলা সারিয়া দিয়াছিল। কিন্তু যে জীর্ণ জাহাজকে একটু নাড়া দিলেই তাহার একটা আল্গা তক্তার উপরে আর একটা আল্গা তক্তা ঠকঠক করিয়া আঘাত করিতে থাকে ঐ দম্‌কা হাওয়া কি তাহার পালের পক্ষে সর্ব্বনেশে জিনিষ নয়? আমাদের দেশেও একটুমাত্র নাড়া খাইলেই হিন্দুতে মুসলমানে, উচ্চবর্ণে নিম্নবর্ণে সংঘাত বাধিয়া যায় না কি? ভিতরে যখন এমন সব ফাঁক তখন ঝড় কাটাইয়া ঢেউ বাঁচাইয়া স্বরাজের বন্দরে পৌঁছিবার জন্য কি কেবল উত্তেজনাকে উন্মাদনায় পরিণত করাই পরিত্রাণের প্রশস্ত উপায়?

বাহির হইতে দেশ যখন অপমান লাভ করে, যখন আমাদের অধিকারকে বিস্তীর্ণ করিবার ইচ্ছা করিলেই কর্ত্তৃপক্ষদের নিকট হইতে অযোগ্যতার অপবাদ প্রাপ্ত হইতে থাকি তখন আমাদের দেশের কোন দুর্ব্বলতা কোন ত্রুটি স্বীকার করা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠে। তখন যে আমরা কেবল পরের কাছে মুখরক্ষা করিবার জন্যই গরিমা প্রকাশ করি তাহা নহে, আহত অভিমানে নিজের অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের বুদ্ধিও অন্ধ হইয়া যায়; আমরা যে অবজ্ঞার যোগ্য নহি তাহা চক্ষের পলকেই প্রমাণ করিয়া দিবার জন্য আমরা একান্ত

ব্যগ্র হইয়া উঠি। আমরা সবই পারি, আমাদের সমস্তই প্রস্তুত, শুদ্ধ মাত্র বাহিরের বাধাতেই আমাদিগকে অক্ষম করিয়া রাখিয়াছে এই কথাই কেবল অস্বাভাবিক উচ্চকণ্ঠে বলিবার চেষ্টা হয় তাহা নহে এইরূপ বিশ্বাসে কাজে প্রবৃত্ত হইবার জন্য আমাদের লাঞ্ছিত হৃদয় উদ্দাম হইয়া উঠে। এই প্রকারে অত্যন্ত চিত্তক্ষোভের সময়েই ইতিহাসকে আমরা ভুল করিয়া পড়ি। মনে স্থির করি, যে সকল অধীন দেশ স্বাধীন হইয়াছে তাহারা বিপ্লব করিয়াছে বলিয়াই স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে; এই স্বাধীনতাকে হাতে পাওয়া এবং হাতে রাখার জন্য আর কোন গুণ থাকা আবশ্যক কি না তাহা আমরা স্পষ্ট করিয়া ভাবিতেই চাহিনা, অথবা তাড়াতাড়ি করিয়া মনে করি সে সমস্ত গুণ আমাদের আছে কিম্বা উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইলে সেগুলি আপনিই কোনোরকম করিয়া জোগাইয়া যাইবে।

এইরূপে মানুষের চিত্ত যখন অপমানে আহত হইয়া নিজের গৌরব সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতেছে, সমস্ত কঠিন বাধাকে উন্মত্তের মত একেবারে অস্বীকার করিয়া অসাধ্য চেষ্টায় আত্মহত্যা করিবার উদ্যোগ করিতেছে তখন তাহার মত মর্ম্মান্তিক; করুণাবহ ব্যাপার জগতে আর কি আছে! এই প্রকার দুশ্চেষ্টা অনিবার্য্য ব্যর্থতার মধ্যে লইয়া যাইবেই, তথাপি ইহাকে আমরা পরিহাস করিতে পারিব না। ইহার মধ্যে মানবপ্রকৃতির যে পরম দুঃখকর অধ্যবসায় আছে তাহা পৃথিবীর সর্ব্বত্রই সর্ব্বকালেই নানা উপলক্ষ্যে নানা অসম্ভব প্রত্যাশায় অসাধ্য সাধনে বারম্বার দগ্ধপক্ষ পতঙ্গের ন্যায় নিশ্চিত পরাভবের বহ্নিশিখায় অন্ধভাবে ঝাঁপ দিয়া পড়িতেছে।

যাইহোক, যেমন করিয়াই হোক্, শক্তির অভিমান আঘাত পাইয়া জাগিয়া উঠিলে সেটা জাতির পক্ষে যে অনিষ্টকর, তাহা বলা যায় না। তবে কিনা বিরোধের ক্রুদ্ধ আবেগের দ্বারা আমাদের এই উদ্যম হঠাৎ

আবির্ভূত হইয়াছে বলিয়াই আমাদের মধ্যে কেহ কেহ দেশের শক্তিকে বিরোধের মূর্ত্তিতেই প্রকাশ করিবার দুর্ব্বুদ্ধি অন্তরে পোষণ করিতেছেন কিন্তু যাহারা সহজ অবস্থায় কোন দিন স্বাভাবিক অনুরাগের দ্বারা দেশের হিতানুষ্ঠানে ক্রমান্বয়ে অভ্যস্ত হয় নাই, যাহারা উচ্চ সংকল্পকে বহুদিনের ধৈর্য্যে নানা উপকরণে নানা বাধা বিঘ্নের ভিতর দিয়া গড়িয়া তুলিবার কাজে নিজের প্রকৃতিকে প্রস্তুত করে নাই, অনেকদিন ধরিয়া রাষ্ট্রচালনার বৃহৎ কার্য্যক্ষেত্র হইতে দুর্ভাগ্যক্রমে বঞ্চিত হইয়া যাহারা ক্ষুদ্র স্বার্থের অনুসরণে সঙ্কীর্ণভাবে জীবনের কাজ করিয়া আসিয়াছে তাহারা হঠাৎ বিষম রাগ করিয়া এক নিমেষে দেশের একটা মস্ত হিত করিয়া ফেলিবে ইহা কোন মতেই সম্ভবপর হইতে পারে না। ডাঙার দিনে নৌকার কাছেও ঘেঁসিলাম না, তুফানের দিনে তাড়াতাড়ি হাল ধরিয়া অসামান্য মাঝি বলিয়া দেশে বিদেশে বাহবা লইব এইরূপ আশ্চর্য্য ব্যাপার স্বপ্নে ঘটাই সম্ভব। অতএব আমাদিগকেও কাজ একেবারে সেই গোড়ার দিক হইতেই সুরু করিতে হইবে। তাহাতে বিলম্ব হইতে পারে— বিপরীত উপায়ে আরো অনেক বেশি বিলম্ব হইবে।

মানুষ বিস্তীর্ণ মঙ্গলকে সৃষ্টি করে তপস্যাদ্বারা। ক্রোধে বা কামে সেই তপস্যা ভঙ্গ করে, এবং তপস্যার ফলকে এক মুহূর্ত্তে নষ্ট করিয়া দেয়। নিশ্চয়ই আমাদের দেশেও কল্যাণময় চেষ্টা নিভৃতে তপস্যা করিতেছে; দ্রুত ফললাভের লোভ তাহার নাই, সাময়িক আশাভঙ্গের ক্রোধকে সে সংযত করিয়াছে; এমন সময় আজ অকস্মাৎ ধৈর্য্যহীন উন্মত্ততা যজ্ঞক্ষেত্রে রক্তবৃষ্টি করিয়া তাহার বহুদুঃখসঞ্চিত তপস্যার ফলকে কলুষিত করিয়া নষ্ট করিবার উপক্রম করিতেছে।

ক্রোধের আবেগ তপস্যাকে বিশ্বাসই করে না; তাহাকে নিশ্চেষ্টতা বলিয়া মনে করে, তাহাকে নিজের আশু উদ্দেশ্যসিদ্ধির প্রধান অন্তরায় বলিয়া ঘৃণা করে; উৎপাতেরদ্বারা সেই তপঃসাধনাকে চঞ্চল সুতরাং

নিষ্ফল করিবারজন্য উঠিয়া পড়িয়া প্রবৃত্ত হয়। ফলকে পাকিতে দেওয়াকেই সে ঔদাসীন্য বলিয়া জ্ঞান করে, টান দিয়া ফলকে ছিঁড়িয়া লওয়াকেই সে একমাত্র পৌরুষ বলিয়া জানে; সে মনে করে যে মালী প্রতিদিন গাছের তলায় জল সেচন করিতেছে গাছের ডালে উঠিবার সাহস নাই বলিয়াই তাহার এই দীনতা। এ অবস্থায় মালীর উপর তাহা রাগ হয়, জল দেওয়াকে সে ছোট কাজ মনে করে। উত্তেজিত অবস্থায় মানুষ উত্তেজনাকেই জগতের মধ্যে সকলের চেয়ে বড় সত্য বলিয়া জানে, যেখানে তাহার অভাব দেখে সেখানে সে কোন সার্থকতাই দেখিতে পায় না।

কিন্তু স্ফুলিঙ্গের সঙ্গে শিখার যে প্রভেদ উত্তেজনার সঙ্গে শক্তির সেই প্রভেদ। চকমকি ঠুকিয়া যে স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে থাকে তাহাতে ঘরের অন্ধকার দূর হয় না। তাহার আয়োজন স্বল্প তেমনি তাহার প্রয়োজনও সামান্য। প্রদীপের আয়োজন অনেক, তাহার আধার গড়িতে হয়, শলিতা পাকাইতে হয়, তাহার তেল জোগাইতে হয়। যখন যথাযথ মূল্য দিয়া সমস্ত কেনা হইয়াছে এবং পরিশ্রম করিয়া সমস্ত প্রস্তুত হইয়াছে, তখনই প্রয়োজন হইলে স্ফুলিঙ্গ আপনাকে স্থায়ী শিখায় পরিণত করিয়া ঘরকে আলোকিত করিয়া তুলিতে পারে। যখন উপযুক্ত চেষ্টার দ্বারা সেই প্রদীপরচনার আয়োজন করিবার উদ্যম জাগিতেছে না, যখন শুদ্ধমাত্র ঘন ঘন চকমকি ঠোকার চাঞ্চল্যমাত্রেই সকলে আনন্দে অভিভূত হইয়া উঠিতেছি তখন সত্যের অনুরোধে স্বীকার করিতেই হইবে এমন করিয়া কখনই ঘরে আলো জ্বলিবে না কিন্তু ঘরে আগুন লাগা অসম্ভব নহে।

কিন্তু শক্তিকে সুলভ করিয়া তুলিবার চেষ্টায় মানুষ উত্তেজনার আশ্রয় অবলম্বন করে। একথা ভুলিয়া যায় যে এই অস্বাভাবিক সুলভতা একদিকে মূল্য কমাইয়া আর একদিক দিয়া এমন করিয়া কষিয়া মূল্য আদায় করিয়া লয়, যে গোড়াতেই তাহার দুর্মূল্যতা স্বীকার করিয়া লইলে তাহাকে অপেক্ষাকৃত শস্তায় পাওয়া যাইতে পারে।

আমাদের দেশেও যখন দেশের হিতসাধনবুদ্ধি নামক দুর্লভ মহামূল্য পদার্থ একটি আকস্মিক উত্তেজনায় আবালবৃদ্ধবনিতার মধ্যে অভাবনীয় প্রচুররূপে দেখা দিল তখন আমাদের মত দরিদ্র জাতিকে পরমানন্দে উৎফুল্ল করিয়া তুলিল। তখন এ কথা আমাদের মনে করিতেও প্রবৃত্তি হয় নাই যে, ভাল জিনিষের এত সুলভতা স্বাভাবিক নহে। এই ব্যাপক পদার্থকে কাজের শাসনের মধ্যে বাঁধিয়া সংযত সংহত করিতে না পারিলে ইহার প্রকৃত সার্থকতাই থাকে না। রাস্তাঘাটের লোক যুদ্ধ করিব বলিয়া মাতিয়া উঠিলেই তাহাদিগকে সৈন্যজ্ঞান করিয়া যদি সুলভে কাজ সারিবার আশ্বাসে উল্লাস করিতে থাকি তবে সত্যকার লড়াইয়ের বেলায় সমস্ত ধন প্রাণ দিয়াও এই হঠাৎ-শস্তার সাংঘাতিক দায় হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না।

আসল কথা, মাতাল যেমন নিজের এবং মণ্ডলীর মধ্যে নেশাকে কেবল বাড়াইয়া চলিতেই চায় তেমনি উত্তেজনার মাদকতা আমরা সম্প্রতি যখন অনুভব করিলাম তখন কেবলি সেটাকে বাড়াইয়া তুলিবার জন্য আমাদের প্রবৃত্তি অসংযত হইয়া উঠিল। অথচ এটা যে একটা নেশার তাড়না সে কথা স্বীকার না করিয়া আমরা বলিতে লাগিলাম, গোড়ায় ভাবের উত্তেজনারই দরকার বেশি; সেটা রীতিমত পাকিয়া উঠিলে আপনিই তাহা কাজের দিকে ধাবিত হয়—অতএব দিনরাত যাহারা কাজ কাজ করিয়া বিরক্ত করিতেছে তাহারা ছোট নজরের লোক—তাহারা ভাবুক নহে—আমরা কেবলি ভাবে দেশ মাতাইব। সমস্ত দেশ জুড়িয়া আমরা ভাবের ভৈরবীচক্র বসাইয়া দিলাম; মন্ত্র এই হইল—

পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা পুনঃ পততি ভূতলে
উত্থায় চ পুনঃ পীত্বা পুনর্জন্মো ন বিদ্যতে।

চেষ্টা নহে, কর্ম্ম নহে, কিছুই গড়িয়া তোলা নহে, কেবল ভাবোচ্ছ্বাসই সাধনা, মত্ততাই মুক্তি।

অনেককেই আহ্বান করিলাম, অনেককেই সমবেত করিলাম, জনতার বিস্তার দেখিয়া আনন্দিত হইলাম কিন্তু এমন করিয়া কোন কাজের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিলাম না যাহাতে উদ্বোধিত শক্তিকে সকলে সার্থক করিতে পারে। কেবল উৎসাহই দিতে লাগিলাম কাজ দিলাম না। মানুষের মনের পক্ষে এমন অস্বাস্থ্যকর ব্যাপার আর কিছুই নাই। মনে করিলাম উৎসাহে মানুষকে নির্ভীক করে এবং নির্ভীক হইলে মানুষ কর্ম্মের বাধাদিপত্তিকে লঙ্ঘন করিতে কুণ্ঠিত হয় না। কিন্তু এইরূপ লঙ্ঘন করিবার উত্তেজনাইত কর্ম্মসাধনের সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ নহে—স্থিরবুদ্ধি লইয়া বিচারের শক্তি, সংযত হইয়া গড়িয়া তুলিবার শক্তি, যে তাহার চেয়ে বড়। এই জন্যই মাতাল হইয়া মানুষ খুন করিতে পারে কিন্তু মাতাল হইয়া কেহ যুদ্ধ করিতে পারেনা। যুদ্ধের মধ্যে কিছু পরিমাণ মত্ততা নাই তাহা নহে কিন্তু অপ্রমত্ততাই প্রভু হইয়া তাহাকে চালিত করে। সেই স্থিরবুদ্ধি দূরদর্শী কর্ম্মোৎসাহী প্রভুকেই বর্ত্তমান উত্তেজনার দিনে দেশ খুঁজিয়াছে, আহ্বান করিয়াছে, ভাগ্যহীন দেশের দৈন্যবশত তঁহাবত সাড়া পাওয়া যায় না। আমরা যাঁহারা ছুটিয়া আসি কেবল মদের পাত্রে মদই ঢালি। এঞ্জিনে ষ্টিমের দমই বাড়াইতে থাকি। যখন প্রশ্ন ওঠে, পথ সমান করিয়া রেল বসাইবার আয়োজন কে করিবে তখন আমরা উত্তর করি এ সমস্ত নিতান্ত খুচরা কাজের হিসাব লইয়া মথা বকাইবার প্রয়োজন নাই—সময় কালে আপনিই সমস্ত হইয়া যাইবে—মজুরদের কাজ মজুররাই করিবে কিন্তু আমরা যখন চালক তখন আমরা কেবল এঞ্জিনে দমই চড়াইতে থাকিব।

এ পর্য্যন্ত যাঁহারা সহিষ্ণুতা রক্ষা করিতে পারিয়াছেন তাঁহারা হয় ত আমাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন, তবে কি বাংলাদেশের সর্ব্বসাধারণের মধ্যে যে উত্তেজনার উদ্রেক হইয়াছে তাহা হইতে কোনো শুভফল প্রত্যাশা করিবার নাই?

নাই এমন কথা আমি কখনই মনে করিনা। অসাড় শক্তিকে সচেষ্ট সচেতন করিয়া তুলিবার জন্য এই উত্তেজনার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সচেতন করিয়া তুলিয়া তাহার পরে কি করিতে হইবে? কাজ করাইতে হইবে, না মাতাল করিতেই হইবে? যে পরিমাণ মদে ক্ষীণপ্রাণকে কাজের উপযোগী করিয়া তোলে তাহার চেয়ে বেশি মদে পুনশ্চ তাহার কাজের উপযোগিতা নষ্ট করিয়াই দেয়; যে সকল সত্যকর্ম্মে ধৈর্য্য এবং অধ্যবসায়ের প্রয়োজন সে কাজে মাতালের শক্তি এবং অভিরুচি বিমুখ হইয়া উঠে। ক্রমে উত্তেজনাই তাহার লক্ষ্য হয় এবং সে দায়ে পড়িয়া কাজের নামে এমন সকল অকাজের সৃষ্টি করিতে থাকে যাহা তাহার মত্ততারই আনুকূল্য করিতে পারে। এই সকল উৎপাত-ব্যাপারকে বস্তুত তাহারা মাদকস্বরূপেই ব্যবহার করে অথচ তাহাকে স্বদেশহিত নাম দিয়া উত্তেজনাকে উচ্চস্বরেই বাঁধিয়া রাখে। হৃদয়াবেগ জিনিষটা উপযুক্ত কাজের দ্বারা বহির্মুখ না হইয়া যখন কেবলি অন্তরে সঞ্চিত ও বর্দ্ধিত হইতে থাকে তখন তাহা বিষের মত কাজ করে—তাহার অপ্রয়োজনীয় উদ্যম আমাদের স্নায়ুমণ্ডলকে বিকৃত করিয়া কর্ম্মসভাকে নৃত্যসভা করিয়া তোলে।

ঘুম হইতে জাগিয়া নিজের সচল শক্তিকে সত্য বলিয়া জানিবার জন্য প্রথম যে একটা উত্তেজনার আঘাত আবশ্যক তাহাতে আমাদের প্রয়োজন ছিল। মনে নিশ্চয় স্থির করিয়াছিলাম ইংরেজ জন্মান্তরের সুকৃতি এবং জন্মকালের শুভগ্রহস্বরূপ আমাদের কর্ম্মহীন জোড়করপুটে আমাদের সমস্ত মঙ্গল আপনি তুলিয়া দিবে। বিধাতানির্দ্দিষ্ট আমাদের সেই বিনাচেষ্টার সৌভাগ্যকে কখনো বা বন্দনা করিতাম কখনো বা তাহার সঙ্গে কলহ করিয়া কাল কাটাইতাম। এই করিতে করিতে মধ্যাহ্নকালে যখন সমস্ত জগৎ আপিস করিতেছে তখন আমাদের সুখনিদ্রা প্রগাঢ় হইতেছিল।

এমন সময় কোথা হইতে একটা আঘাত লাগিল, ঘুমের ঘোরও কাটিল, আগেকার মত পুনশ্চ সুখস্বপ্ন দেখিবার জন্য নয়ন মুদিবার ইচ্ছাও রহিল না, কিন্তু আশ্চর্য্য এই আমাদের সেই স্বপ্নের সঙ্গে জাগরণের একটা বিষয়ে মিল রহিয়াই গেল।

তখন আমরা নিশ্চিন্ত হইয়াছিলাম, যে, চেষ্টা না করিয়াই আমরা চেষ্টার ফল পাইতে থাকিব, এখনো ভাবিতেছি ফল পাইবার জন্য প্রচলিত পথে চেষ্টাকে খাটাইবার প্রয়োজন আমরা যেন যথেষ্ট সংক্ষিপ্ত করিয়া লইতে পারি। স্বপ্নাবস্থাতেও অসম্ভবকে আঁকড়িয়া পড়িয়া ছিলাম, জাগ্রত অবস্থাতেও সেই অসম্ভবকে ছাড়িতে পারিলাম না। শক্তির উত্তেজনা আমাদের মধ্যে অত্যন্ত বেশি হওয়াতে অত্যাবশ্যক বিলম্বকে অনাবশ্যক বোধ হইতে লাগিল। বাহিরে সেই চিরপুরাতন দৈন্য রহিয়া গিয়াছে, অথচ অন্তরে নবজাগ্রত শক্তির অভিমান মাথা তুলিয়াছে, উভয়ের সামঞ্জস্য করিব কি করিয়া? ধীরে ধীরে? ক্রমে ক্রমে? মাঝখানের প্রকাণ্ড গহ্বরটাকে পাথরের সেতু দিয়া বাঁধিয়া? কিন্তু অভিমান দেরি সহিতে পারেনা, মত্ততা বলে আমার সিঁড়ির দরকার নাই আমি উড়িব। সময় লইয়া সুসাধ্য সাধন ত সকলেই পারে; অসাধ্য সাধনে আমরা এখনি জগৎকে চমক লাগাইয়া দিব এই কল্পনা আমাদের উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার কারণ, প্রেম যখন জাগে তখন সে গোড়া হইতে সকল কাজই করিতে চায়, সে ছোট হইতে বড় কিছুকেই অবজ্ঞা করেনা, কোনো কর্ত্তব্য পাছে অসমাপ্ত থাকে এই আশঙ্কা তাহার ঘুচেনা। প্রেম নিজেকে সার্থক করিতেই চায় সে নিজেকে প্রমাণ করিবার জন্য ব্যস্ত নহে। কিন্তু অপমানের তাড়নায় কেবল আত্মাভিমান-মাত্র যখন জাগিয়া উঠে তখন সে বুক ফুলাইয়া বলে আমি হাঁটিয়া চলিবনা আমি ডিঙাইয়া চলিব। অর্থাৎ পৃথিবীর অন্য সকলের পক্ষে যাহা খাটে তার পক্ষে তাহার কোনো প্রয়োজন নাই, ধৈর্য্যের প্রয়োজন নাই,

অধ্যবসায়ের প্রয়োজন নাই, সুদূর উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য করিয়া সুদীর্ঘ উপায় অবলম্বন করা অনাবশ্যক। ফলে দেখিতেছি পরের শক্তির প্রতি গতকল্য যেমন অন্ধভাবে প্রত্যাশা করিয়া বসিয়া ছিলাম, নিজের শক্তির কাছে আজ তেমনি অন্ধ প্রত্যাশা লইয়া আস্ফালন করিতেছি। তখনো যথাবিহিত কর্ম্মকে ফাঁকি দিবার চেষ্টা ছিল এখনো সেই চেষ্টাই বর্ত্তমান। কথামালার কৃষকের নিশ্চেষ্ট ছেলেরা যতদিন বাপ বাঁচিয়া ছিল ক্ষেতের ধারেও যায় নাই, বাপ চাষ করিত তাহারা দিব্য খাইত—বাপ যখন মরিল তখন ক্ষেতে নামিতে বাধ্য হইল কিন্তু চাষ করিবার জন্য নহে—তাহারা স্থির করিল মাটি খুঁড়িয়া একেবারেই দৈবধন পাইবে। বস্তুত চাষের ফসলই যে প্রকৃত দৈবধন এ কথা শিখিতে তাহাদিগকে অনেক বৃথা সময় নষ্ট করিতে হইয়াছিল। আমরাও যদি এ কথা সহজে না শিখি যে দৈবধন কোনো অদ্ভুত উপায়ে গোপনে পাওয়া যায় না, পৃথিবীসুদ্ধ লোক সে ধন যেমন করিয়া লাভ করিতেছে ও ভোগ করিতেছে আমাদিগকেও ঠিক তেমনি করিয়াই করিতে হইবে—তবে আঘাত এবং দুঃখ কেবল বাড়িয়াই চলিতে থাকিবে এবং বিপথে যতই অগ্রসর হইব ফিরিবার পথও ততই দীর্ঘ ও দুর্গম হইয়া উঠিবে।

অধৈর্য্য বা অজ্ঞানবশতঃ স্বাভাবিক পন্থাকে অবিশ্বাস করিয়া অসামান্য কিছু একটাকে ঘটাইয়া তুলিবার ইচ্ছা অত্যন্ত বেশি প্রবল হইয়া উঠিলে মানুষের ধর্ম্মবুদ্ধি নষ্ট হয়;—তখন সকল উপকরণকেই উপকরণ, সকল উপায়কেই উপায় বলিয়া মনে হয়—তখন ছোট ছোট বালকদিগকেও এই উন্মত্ত ইচ্ছার নিকট নির্ম্মমভাবে বলি দিতে মনে কোনো দ্বিধা উপস্থিত হয় না। আমরা মহাভারতের সোমক রাজার ন্যায় অসামান্য উপায়ে সিদ্ধিলাভের প্রলোভনে আমাদের অতি সুকুমার ছোট ছেলেটিকেই যজ্ঞের অগ্নিতে সমর্পণ করিয়া বসিয়াছি—এই নির্বিচার নিষ্ঠুরতার পাপ চিত্রগুপ্তের দৃষ্টি এড়ায় নাই—তাহার প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ

হইয়াছে, বালকদের জন্য বেদনায় সমস্ত দেশের হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে—দুঃখ আরো কত সহ্য করিতে হইবে জানিনা।

দুঃখ সহ্য করা তত কঠিন নহে কিন্তু দুর্ম্মতিকে সম্বরণ করা অত্যন্ত দুরূহ। অন্যায়কে অত্যাচারকে একবার যদি কর্ম্মসাধনের সহায় বলিয়া গণ্য করি তবে অন্তঃকরণকে বিকৃতি হইতে রক্ষা করিবার সমস্ত স্বাভাবিক-শক্তি চলিয়া যায়;—ন্যায়ধর্ম্মের ধ্রুব কেন্দ্রকে একবার ছাড়িলেই বুদ্ধির নষ্টতা ঘটে, কর্ম্মের স্থিরতা থাকেনা—তখন বিশ্বব্যাপী ধর্ম্মব্যবস্থার সঙ্গে আবার আমাদের ভ্রষ্ট জীবনের সামঞ্জস্য ঘটাইবার জন্য প্রচণ্ড সংঘাত অনিবার্য্য হইয়া উঠে।

সেই প্রক্রিয়া কিছুদিন হইতে আমাদের দেশে চলিতেছে একথা নম্র হৃদয়ে দুঃখের সহিত আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে। এই আলোচনা আমাদের পক্ষে একান্ত অপ্রিয়, তাই বলিয়া নীরবে ইহাকে গোপন করিয়া অথবা অত্যুক্তিদ্বারা ইহাকে ঢাকা দিয়া অনিষ্টকে সাংঘাতিক হইয়া উঠিতে দেওয়া আমাদের কাহারো পক্ষে কর্ত্তব্য নহে।

আমরা সাধ্যমত বিলাতী পণ্যদ্রব্য ব্যবহার না করিয়া দেশীয় শিল্পের রক্ষা ও উন্নতি সাধনে প্রাণপণে চেষ্টা করিব ইহার বিরুদ্ধে আমি কিছু বলিব এমন আশঙ্কা করিবেন না। বহুদিন পূর্ব্বে আমি যখন লিখিয়াছিলাম—

> নিজহস্তে শাক অন্ন তুলে দাও পাতে, তাই যেন রুচে,—
>
> মোটাবস্ত্র বুনে দাও যদি নিজ হাতে, তাহে লজ্জা ঘুচে;—

তখন লর্ড কর্জ্জনের উপর আমাদের রাগ করিবার কোনো কারণই ঘটে নাই এবং বহুকাল পূর্ব্বে যখন স্বদেশী ভাণ্ডার স্থাপন করিয়া দেশীপণ্য প্রচলিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম তখন সময়ের প্রতিকূলতার বিরুদ্ধেই আমাদিগকে দাঁড়াইতে হইয়াছিল।

তথাপি, দেশে বিদেশী পণ্যের পরিবর্ত্তে স্বদেশী পণ্য প্রচার যত বড়

কাজই হউক্ লেশমাত্র অন্যায়ের দ্বারা তাহার সমর্থন করিতে হইবে একথা আমি কোনো মতেই স্বীকার করিতে পারি না। বিলম্ব ভাল, প্রতিকূলতা ভাল, তাহাতে ভিত্তিকে পাকা, কর্ম্মকে পরিণত করিয়া তুলে; কিন্তু এমন কোনো ইন্দ্রজাল ভাল নহে যাহা একরাত্রে কোঠা বানাইয়া দেয় এবং আশ্বাস দিয়া বলে আমাকে উচিত মূল্য নগদ তহবিল হইতে দিবার কোনো প্রয়োজন নাই। কিন্তু হায়, মনে না কি ভয় আছে যে এক-মুহূর্ত্তের মধ্যে ম্যাঞ্চেষ্টরের কল যদি বন্ধ করিয়া দিতে না পারি তবে দীর্ঘকাল ধরিয়া এই দুঃসাধ্য উদ্দেশ্য, অটল নিষ্ঠার সহিত বহন করিবার শক্তি আমাদের নাই; সেইজন্য এবং কোনোমতে হাতে হাতে পার্টিশনের প্রতিশোধ লইবার তাড়নায় আমরা পথ বিপথ বিচার করিতেই চাই নাই। এইরূপে চারিদিক হইতে সাময়িক তাগিদের বধিরকর কলকলায় বিভ্রান্ত হইয়া নিজের প্রতি বিশ্বাসবিহীন দুর্ব্বলতা স্বভাবকে অশ্রদ্ধা করিয়া, শুভ-বুদ্ধিকে অমান্য করিয়া অতি সত্বর লাভ চুকাইয়া লইতে চায় এবং পরে অতি দীর্ঘকাল ধরিয়া ক্ষতির নিকাশ করিতে থাকে; মঙ্গলকে পীড়িত করিয়া মঙ্গল পাইব, স্বাধীনতার মূলে আঘাত করিয়া স্বাধীনতালাভ করিব ইহা কখনো হইতেই পারেনা একথা মনে আনিতেও তাহার ইচ্ছা হয় না।

আমরা অনেকে সম্পূর্ণ জানিনা এবং অনেকে স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক যে, বয়কট্ ব্যাপারটা অনেকস্থলে দেশের লোকের প্রতি দেশের লোকের অত্যাচারের দ্বারা সাধিত হইয়াছে। আমি যেটাকে ভালো বুঝি দৃষ্টান্ত এবং উপদেশের দ্বারা অন্য সকলকে তাহা বুঝাইবার বিলম্ব যদি না সহে, পরের ন্যায্য অধিকারে বলপূর্ব্বক হস্তক্ষেপ করাকে অন্যায় মনে করিবার অভ্যাস যদি দেশ হইতে চলিয়া যাইতে থাকে তবে অসংযমকে কোনো সীমার মধ্যে আর ঠেকাইয়া রাখা অসম্ভব হইয়া পড়ে। কর্ত্তব্যের নামে যখন অকর্ত্তব্য প্রবল হয় তখন দেখিতে দেখিতে সমস্ত দেশ অপ্রকৃতিস্থ হইয়া উঠে। সেই জন্যই স্বাধীনতালাভের দোহাই দিয়া আমরা যথার্থ

স্বাধীনতাধর্ম্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছি ;—দেশে মতের অনৈক্য ও ইচ্ছার বিরোধকে দণ্ড উত্তোলন করিয়া বল পূর্ব্বক একাকার করিয়া দিতে হইবে এইরূপ দুর্ম্মতির প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। আমি যাহা করিব সকলকেই তাহা করিতেই হইবে, আমি যাহা বলিব সকলকেই তাহা বলিতেই হইবে এইরূপ বলপ্রয়োগে দেশের সমস্ত মত, ইচ্ছা ও আচরণ বৈচিত্র্যের অপঘাত মৃত্যুর দ্বারা পঞ্চত্ব লাভকেই আমরা জাতীয় ঐক্য বলিয়া স্থির করিয়া বসিয়াছি। মতান্তরকে আমরা সমাজে পীড়ন করিতেছি, কাগজে অতি কুৎসিত ভাবে গালি দিতেছি, এমন কি, শারীরিক আঘাতের দ্বারাও বিরুদ্ধ মতকে শাসন করিব বলিয়া ভয় দেখাইতেছি। আপনারা নিশ্চয় জানেন এবং আমি ততোধিক নিশ্চয়তররূপে জানি, এরূপ বেনামী শাসনপত্র সময় বিশেষে আমাদের দেশের অনেক লোকেই পাইয়া থাকেন এবং দেশের প্রবীন ব্যক্তিরাও অপমান হইতে রক্ষা পাইতেছেন না। জগতে অনেক মহাপুরুষ বিরুদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে মত প্রচারের জন্য নিজের প্রাণও বিসর্জ্জন করিয়াছেন, আমরা ও মত প্রচার করিতে চাই কিন্তু আর সকলের দৃষ্টান্ত পরিহার করিয়া একমাত্র কালাপাহাড়কেই গুরু বলিয়া বরণ করিয়াছি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যাহার ভিতরে গড়নের শক্তি নাই ভাঙন তাহার পক্ষে মৃত্যু। জিজ্ঞাসা করি আমাদের দেশে সেই গঠনতত্ত্বটি কোথায় প্রকাশ পাইতেছে? কোন্ সৃজন শক্তি আমাদের মধ্যে ভিতর হইতে কাজ করিয়া আমাদিগকে বাঁধিয়া এক করিয়া তুলিতেছে? ভেদের লক্ষণই ত চারিদিকে! নিজের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাই যখন প্রবল তখন কোনো মতেই আমরা নিজের কর্ত্তৃত্বকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি না। তাহা যখন পারি না তখন অন্যে আমাদের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবেই—কিছুতেই ঠেকাইতে পারিব না। অনেকে ভাবেন এদেশের পরাধীনতা মাথাধরার মত ভিতরের ব্যাধি নহে, তাহা মাথার বোঝার মত ইংরেজগবর্মেণ্টরূপে

বাহিরে আমাদের উপরে চাপিয়া আছে—ঐটেকেই যে কোনোপ্রকারে হোক্ টান মারিয়া ফেলিলেই পর মুহূর্ত্তে আমরা হাল্কা হইব। এত সহজ নহে! ইংরেজগবর্মেণ্ট্ আমাদের পরাধীনতা নয় তাহা আমাদের গভীরতর পরাধীনতার প্রমাণমাত্র।

কিন্তু গভীরতর কারণগুলির কথাকে আমল দিবার মত অবকাশ ও মনের ভাব আজকাল আমাদের নাই। ভারতবর্ষে এত জাতিবিভাগসত্ত্বেও কেমন করিয়া এক মহাজাতি হইয়া স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করিব এই প্রশ্ন যখন উঠে তখন আমাদের মধ্যে যাঁহারা বিশেষ ত্বরান্বিত তাঁহারা এই বলিয়া কথাটা সংক্ষেপে উড়াইয়া দেন যে, সুইজরল্যাণ্ডেও ত একাধিক জাতির সমাবেশ হইয়াছে কিন্তু সেখানে কি তাহাতে স্বরাজের বাধা ঘটিয়াছে?

এমনতর নজির দেখাইয়া আমরা নিজেদের ভুলাইতে পারি কিন্তু বিধাতার চোখে ধূলা দিতে পারিব না; বস্তুত জাতির বৈচিত্র্য থাকিলেও স্বরাজ চলিতে পারে কিনা সেটা আসল তর্ক নহে। বৈচিত্র্য ত নানাপ্রকারে থাকে—যে পরিবারে দশজন মানুষ আছে সেখানে ত দশটা বৈচিত্র্য। কিন্তু আসল কথা সেই বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের তত্ত্ব কাজ করিতেছে কিনা। সুইজর্লাণ্ড যদি নানাজাতিকে লইয়াই এক হইয়া থাকে তবে ইহাই বুঝিতে হইবে সেখানে নানাত্বকে অতিক্রম করিয়াও একত্ব কর্ত্তা হইয়া উঠিতে পারিয়াছে। সেখানকার সমাজে এমন একটি ঐক্যধর্ম্ম আছে। আমাদের দেশে বৈচিত্র্যই আছে কিন্তু ঐক্যধর্ম্মের অভাবে বিশ্লিষ্টতাই ভাষা, জাতি, ধর্ম্ম, সমাজে ও লোকাচারে নানাবিধ আকার ধারণ করিয়া এই বৃহৎ দেশকে ছোট বড় বহুতর ভাগে বিভাগে শতধাবিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে।

অতএব নজির পাড়িয়া ত নিশ্চিন্ত হইবার কিছু দেখিনা। চক্ষু বুজিয়া একথা বলিলে ধর্ম্ম শুনিবেনা যে আমাদের আর সমস্তই ঠিক হইয়া গিয়াছে এখন কেবল ইংরেজকে কোনো মতে বাদ দিতে পারিলেই

বাঙালীতে পাঞ্জাবীতে মারাঠীতে মাদ্রাজিতে হিন্দুতে মুসলমানে মিলিয়া একমনে একপ্রাণে একস্বার্থে স্বাধীন হইয়া উঠিবে।

বস্তুত আজ ভারতবর্ষে যেটুকু ঐক্য দেখিয়া আমরা সিদ্ধিলাভকে আসন্ন জ্ঞান করিতেছি তাহা যান্ত্রিক তাহা জৈবিক নহে। ভারতবর্ষের ভিন্ন জাতির মধ্যে সেই ঐক্য জীবনধর্ম্মবশত ঘটে নাই—পরজাতির এক শাসনই আমাদিগকে বাহিরের বন্ধনে একত্র জোড়া দিয়া রাখিয়াছে।

সজীব পদার্থ অনেক সময় যান্ত্রিকভাবে একত্র থাকিতে থাকিতে জৈবিকভাবে মিলিয়া যায়। এমনি করিয়া ভিন্ন শ্রেণীর ডালে ডালে জুড়িয়া বাঁধিয়া কলম লাগাইতে হয়। কিন্তু যতদিন না কালক্রমে সেই সজীব জোড়টি লাগিয়া যায় ততদিন ত বাহিরের শক্ত বাঁধনটা খুলিলে চলে না! অবশ্য, দড়ার বাঁধনটা না কি গাছের অঙ্গ নহে এইজন্য যেমনভাবেই থাক্, যত উপকারই করুক, সে ত গাছকে পীড়া দিবেই কিন্তু বিভিন্নতাকে যখন ঐক্য দিয়া কলেবরবদ্ধ করিতে হইবে তখনি ঐ দড়াটাকে স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। যতটুকু প্রয়োজন তাহার চেয়ে সে বেশি বাঁধিয়াছে এ কথা সত্য হইতে পারে কিন্তু তাহার একমাত্র প্রতিকার—নিজের আভ্যন্তরিক সমস্ত শক্তি দিয়া ঐ জোড়ের মুখে রসে রস মিলাইয়া, প্রাণে প্রাণে যোগকরিয়া জোড়টিকে একান্ত চেষ্টায় সম্পূর্ণ করিয়া ফেলা। এ কথা নিশ্চয় বলা যায় জোড় বাঁধিয়া গেলেই যিনি আমাদের মালী আছেন তিনি আমাদের দড়িদড়া সব কাটিয়া দিবেন। ইংরেজশাসন নামক বাহিরের বন্ধনটাকে স্বীকার করিয়া অথচ তাহার পরে জড়ভাবে নির্ভর না করিয়া সেবার দ্বারা, প্রীতির দ্বারা, সমস্ত কৃত্রিম ব্যবধান নিরস্ত করার দ্বারা বিচ্ছিন্ন ভারতবর্ষকে নাড়ির বন্ধনে এক করিয়া লইতে হইবে। একত্রসংঘটনমূলক সহস্রবিধ সৃজনের কাজে ভৌগোলিক ভূখণ্ডকে স্বদেশ রূপে স্বহস্তে গড়িতে হইবে ও বিযুক্ত জনসমূহকে স্বজাতিরূপে স্বচেষ্টায় রচনা করিয়া লইতে হইবে।

শুনিয়াছি এমন কথাও কেহ কেহ বলেন, যে, ইংরেজের প্রতি দেশের সর্ব্বসাধারণের বিদ্বেষই আমাদিগকে ঐক্যদান করিবে। প্রাচ্য পরজাতীয়ের প্রতি স্বাভাবিক নির্ম্মমতায় ইংরেজ ঔদাসীন্যে ও ঔদ্ধত্যে ভারতবর্ষের ছোট বড় সকলকেই ব্যথিত করিয়া তুলিতেছে। যত দিন যাইতেছে এই বেদনার তপ্ত শেল গভীর ও গভীরতররূপে আমাদের প্রকৃতির মধ্যে অনুবিদ্ধ হইয়া চলিয়াছে। এই নিত্যবিস্তারপ্রাপ্ত বেদনার ঐক্যেই ভারতের নানা জাতি মিলিবার উপক্রম করিতেছে। অতএব এই বিদ্বেষকেই আমাদের প্রধান আশ্রয়রূপে অবলম্বন করিতে হইবে।

একথা যদি সত্যই হয় তবে বিদ্বেষের কারণটি যখন চলিয়া যাইবে, ইংরেজ যখনি এ দেশ ত্যাগ করিবে, তখনি কৃত্রিম ঐক্যসূত্রটি ত এক মুহূর্ত্তে ছিন্ন হইয়া যাইবে। তখন দ্বিতীয় বিদ্বেষের বিষয় আমরা কোথায় খুঁজিয়া পাইব? তখন আর দূরে খুঁজিতে হইবে না, বাহিরে যাইতে হইবে না, রক্তপিপাসু বিদ্বেষবুদ্ধির দ্বারা আমরা পরস্পরকে ক্ষতবিক্ষত করিতে থাকিব।

"ততদিনে যেমন করিয়াই হোক্ একটা কিছু সুযোগ ঘটিয়া যাইবেই, আপাতত এই ভাবেই চলুক্" এমন কথা যিনি বলেন তিনি এ কথা ভুলিয়া যান যে, দেশ তাঁহার একলার সম্পত্তি নহে; ব্যক্তিগত রাগ দ্বেষ ও ইচ্ছা অনিচ্ছা লইয়া তিনি চলিয়া গেলেও এ দেশ রহিয়া যাইবে। ট্রষ্টি যেমন সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত উপায় ব্যতীত ন্যস্ত ধনকে নিজের ইচ্ছামত যেমন তেমন করিয়া খাটাইতে পারেন না তেমনি দেশ যখন বহু লোকের এবং বহুকালের, তাহার মঙ্গলকে কোনো সাময়িক ক্ষোভের বেগে অদূরদর্শী আপাতবুদ্ধির সংশয়াপন্ন ব্যবস্থার হাতে চক্ষু বুজিয়া সমর্পণ করিবার অধিকার আমাদের কাহারো নাই। স্বদেশের ভবিষ্যৎ যাহাতে দায়গ্রস্ত হইয়া উঠিতেও পারে এমনতর নিতান্ত ঢিলা বিবেচনার কাজ বর্ত্তমানের প্ররোচনায় করিয়া ফেলা কোনো লোকের পক্ষে কখনই

কর্ত্তব্য হইতে পারে না। কর্ম্মের ফল যে আমার একলার নহে। দুঃখ যে অনেকের।

তাই বারম্বার বলিয়াছি এবং বারম্বার বলিব—শত্রুতাবুদ্ধিকে অহোরাত্র কেবলি বাহিরের দিকে উদ্যত করিয়া রাখিবার জন্য উত্তেজনার অগ্নিতে নিজের সমস্ত সঞ্চিত সম্বলকে আহুতি দিবার চেষ্টা না করিয়া ঐ পরের দিক হইতে ভ্রূকুটিকুটিল মুখটাকে ফিরাও, আষাঢ়ের দিনে আকাশের মেঘ যেমন করিয়া প্রচুর ধারাবর্ষণে তাপশুষ্ক তৃষ্ণাতুর মাটির উপরে নামিয়া আসে তেমনি করিয়া দেশের সকল জাতির সকল লোকের মাঝখানে নামিয়া এস, নানাদিগভিমুখী মঙ্গল চেষ্টার বৃহৎ জালে স্বদেশকে সর্ব্বপ্রকারে বাঁধিয়া ফেল; কর্ম্মক্ষেত্রকে সর্ব্বত্র বিস্তৃত কর—এমন উদার করিয়া এত দূর বিস্তৃত কর যে, দেশের উচ্চ ও নীচ, হিন্দু মুসলমান ও খৃষ্টান সকলেই যেখানে সমবেত হইয়া হৃদয়ের সহিত হৃদয়, চেষ্টার সহিত চেষ্টা সম্মিলিত করিতে পারে। আমাদের প্রতি রাজার সন্দেহ ও প্রতিকূলতা আমাদিগকে ক্ষণে ক্ষণে প্রতিহত করিবার চেষ্টা করিবে কিন্তু কখনই আমাদিগকে নিরস্ত করিতে পারিবে না,—আমরা জয়ী হইবই,—বাধার উপরে উন্মাদের মত নিজের মাথা ঠুকিয়া নহে অটল অধ্যবসায়ে তাহাকে শনৈঃ শনৈঃ অতিক্রম করিয়া কেবল যে জয়ী হইব তাহা নহে কার্য্যসিদ্ধির সত্য সাধনাকে দেশের মধ্যে চিরদিনের মত সঞ্চিত করিয়া তুলিব—আমাদের উত্তরপুরুষদের জন্য শক্তি চালনার সমস্ত পথ একটি একটি করিয়া উদ্ঘাটিত করিয়া দিব।

আজ ঐ যে বন্দীশালায় লৌহশৃঙ্খলের কঠোর ঝঙ্কার শুনা যাইতেছে—দণ্ডধারী পুরুষদের পদশব্দে কম্পমান রাজপথ মুখরিত হইয়া উঠিতেছে ইহাকেই অত্যন্ত বড় করিয়া জানিয়ো না। যদি কান পাতিয়া শোন তবে কালের মহাসঙ্গীতের মধ্যে ইহা কোথায় বিলুপ্ত হইয়া যায়! কত যুগ হইতে কত বিপ্লবের আবর্ত্ত, কত উৎপীড়নের মন্থন, এ দেশের

সিংহদ্বারে কত বড় বড় রাজ প্রতাপের প্রবেশ ও প্রস্থানের মধ্য দিয়া ভারতবর্ষের পরিপূর্ণতা অভিব্যক্ত হইয়া উঠিতেছে, অদ্যকার ক্ষুদ্রদিন তাহার যে ক্ষুদ্র ইতিহাসটুকু ইহার সহিত মিলিত করিতেছে আর কিছুকাল পরে সমগ্রের মধ্যে তাহা কি কোথাও দৃষ্টিগোচর হইবে! ভয় করিব না, ক্ষুব্ধ হইব না, ভারতবর্ষের যে পরম মহিমা সমস্ত কঠোর দুঃখসংঘাতের মধ্যে বিশ্বকবির সৃজনানন্দকে বহন করিয়া ব্যক্ত হইয়া উঠিতেছে—ভক্ত সাধকের প্রশান্ত ধ্যাননেত্রে তাহার অখণ্ড মূর্তি উপলব্ধি করিব। চারিদিকের কোলাহল ও চিত্তবিক্ষেপের মধ্যে সাধনাকে মহৎলক্ষ্যের দিকে অবিচলিত রাখিব। নিশ্চয় জানিব এই ভারতবর্ষে যুগযুগান্তরীয় মানবচিত্তের সমস্ত আকাঙ্ক্ষাবেগ মিলিত হইয়াছে—এইখানেই জ্ঞানের সহিত জ্ঞানের মন্থন হইবে, জাতির সহিত জাতির মিলন ঘটিবে। বৈচিত্র্য এখানে অত্যন্ত জটিল, বিচ্ছেদ এখানে অত্যন্ত প্রবল, বিপরীতের সমাবেশ এখানে অত্যন্ত বিরোধসঙ্কুল—এত বহুত্ব, এত বেদনা, এত সংঘাত কোনোদেশেই এত দীর্ঘকাল বহন করিয়া বাঁচিতে পারিত না—কিন্তু একটি অতি বৃহৎ অতি মহৎ সমন্বয়ের পরম অভিপ্রায়ই এই সমস্ত একান্ত বিরুদ্ধতাকে ধারণ করিয়া আছে, পরস্পরের আঘাতে কাহাকেও উৎসাদিত হইতে দেয় নাই। এই যে সমস্ত নানা বিচিত্র উপকরণ কালকালান্তর ও দেশদেশান্তর হইতে এখানে আহরিত হইয়াছে আমাদের ক্ষুদ্র শক্তিদ্বারা তাহাকে আঘাত করিতে গেলে আমরা নিজেই আহত হইব, তাহার কিছুই করিতে পারিব না। জানি, বাহির হইতে অন্যায় এবং অপমান আমাদের এমন প্রবৃত্তিকে উত্তেজিত করিতেছে, যাহা আঘাত করিতেই জানে, যাহা ধৈর্য্য মানে না, যাহা বিনাশ স্বীকার করিয়াও নিজের চরিতার্থতাকেই সার্থকতা বলিয়া জ্ঞান করে। কিন্তু সেই আত্মাভিমানের প্রমত্ততাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য আমাদের অন্তঃকরণের মধ্যে সুগম্ভীর আত্মগৌরব সঞ্চার করিবার অন্তরতর শক্তি কি ভারতবর্ষ

আমাদিগকে দান করিবেন না? যাহারা নিকটে আসিয়া আমাদের পরিচয় গ্রহণ করিতে ঘৃণা করে, যাহারা দূর হইতে আমাদের প্রতি বিদ্বেষ উদ্গার করে সেই সকল ক্ষণকালীন বায়ুদ্বারা স্ফীত সংবাদ পত্রের মর্ম্মর-ধ্বনি—সেই বিলাতের টাইমস্ অথবা এ দেশের টাইমস্ অব ইণ্ডিয়ার বিদ্বেষ তীক্ষ্ণ বাণীই কি অঙ্কুশাঘাতের মত আমাদিগকে বিরোধের পথে অন্ধবেগে চালনা করিবে? আর ইহা অপেক্ষা সত্যতর নিত্যতর বাণী আমাদের পিতামহদের পবিত্র মুখ দিয়া কি এ দেশে উচ্চারিত হয় নাই? যে বাণী দূরকে নিকট করিতে বলে, পরকে আত্মীয় করিতে আহ্বান করে? সেই সকল শান্তি-গম্ভীর সনাতন কল্যাণবাক্যই আজ পরাস্ত হইবে? ভারতবর্ষে আমরা মিলিব এবং মিলাইব, আমরা সেই দুঃসাধ্য সাধনা করিব, যাহাতে শত্রু মিত্র ভেদ লুপ্ত হইয়া যায়; যাহা সকলের চেয়ে উচ্চ সত্য, যাহা পবিত্রতার তেজে ক্ষমার বীর্য্যে, প্রেমের অপরাজিত শক্তিতে পূর্ণ, আমরা তাহাকে কখনই অসাধ্য বলিয়া জানিব না, তাহাকে নিশ্চিত মঙ্গল জানিয়া শিরোধার্য্য করিয়া লইব। দুঃখ বেদনার একান্ত পীড়নের মধ্য দিয়াই যাত্রা করিয়া আজ উদার আনন্দে মন হইতে সমস্ত বিদ্রোহ ভাব দূর করিয়া দিব, জানিয়া এবং না জানিয়া বিশ্বের মানব এই ভারতক্ষেত্রে মনুষ্যত্বের যে পরমাশ্চর্য্য মন্দির নানা ধর্ম্ম, নানা শাস্ত্র, নানা জাতির সম্মিলনে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে সেই সাধনাতেই যোগ দান করিব, নিজের অন্তরের সমস্ত শক্তিকে একমাত্র সৃষ্টি শক্তিতে পরিণত করিয়া এই রচনা কার্য্যে তাহাকে প্রবৃত্ত করিব। তাহা যদি করিতে পারি যদি জ্ঞানে প্রেমে ও কর্ম্মে ভারতবর্ষের এই অভিপ্রায়ের মধ্যে সমস্ত প্রাণ দিয়া নিযুক্ত হইতে পারি তবেই মোহমুক্ত পবিত্র দৃষ্টিতে স্বদেশের ইতিহাসের মধ্যে সেই এক সত্য সেই নিত্য সত্যকে দেখিতে পাইব, ঋষিরা যাঁহাকে বলিয়াছেন,—

স সেতুর্বিধৃতিরেষাং লোকানাম্—

তিনিই সমস্ত লোকের বিধৃতি, তিনিই সমস্ত বিচ্ছেদের সেতু এবং তাঁহাকেই বলা হইয়াছে—

তস্য হবা এতস্য ব্রহ্মণোনাম সত্যম্—

সেই যে ব্রহ্ম, নিখিলের সমস্ত প্রভেদের মধ্যে ঐক্য রক্ষার যিনি সেতু ইঁহারই নাম সত্য।

সমস্যা

আমি "পথ ও পাথেয়" নামক প্রবন্ধে আমাদের কর্তব্য এবং তাহার সাধনপ্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম। উক্ত প্রবন্ধটিকে সকলে যে অনুকূলভাবে গ্রহণ করিবেন এমন আমি আশা করি নাই।

কোন্‌টা শ্রেয় এবং তাহা লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়টি কি তাহা লইয়াত কোনো দেশেই আজও তর্কের অবসান হয় নাই। মানুষের ইতিহাসে এই তর্ক কত রক্তপাতে পরিণত হইয়াছে এবং একদিক হইতে তাহা বিলুপ্ত হইয়া আর এক দিক্ দিয়া বার বার অঙ্কুরিত হইয়া উঠিয়াছে।

আমাদের দেশে দেশহিত সম্বন্ধে মতভেদ এতকাল কেবল মুখে মুখে এবং কাগজে কাগজে, কেবল ছাপাখানায় এবং সভাক্ষেত্রে কথার লড়াইরূপেই সঞ্চরণ করিয়াছে। তাহা কেবল ধোঁয়ার মত ছড়াইয়াছে। আগুনের মত জ্বলে নাই।

কিন্তু আজ নাকি সকলেই পরস্পরের মতামতকে দেশের হিতাহিতের সঙ্গে আসন্ন ভাবে জড়িত মনে করিতেছেন, তাহাকে কাব্যালঙ্কারের ঝঙ্কার মাত্র বলিয়া গণ্য করিতেছেন না, সেইজন্য যাঁহাদের সহিত আমার মতের অনৈক্য ঘটিয়াছে তাঁহাদের প্রতিবাদবাক্যে যদি কখনো পরুষতা প্রকাশ পায় তাহাকে আমি অসঙ্গত বলিয়া ক্ষোভ করিতে পারি না।

এ সময়ে কোনো কথা বলিয়া কেহ অন্যের উপর দিয়া নিষ্কৃতি পাইয়া যান না ইহা সময়ের একটা শুভ লক্ষণ সন্দেহ নাই।

তবু তর্কের উত্তেজনা যতই প্রবল হোক্ যাঁহাদের সঙ্গে আমাদের কোনো কোনো জায়গায় মতের অনৈক্য ঘটিতেছে দেশের হিতসাধনে তাঁহাদেরও আন্তরিক নিষ্ঠা আছে এই শ্রদ্ধা যখন নষ্ট হইবার কোনো কারণ দেখিনা, তখন আমরা পরস্পর কি কথা বলিতেছি কি ইচ্ছা করিতেছি তাহা সুস্পষ্ট করিয়া বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক। গোড়াতেই রাগ করিয়া বসিলে অথবা বিরুদ্ধ পক্ষের বুদ্ধির প্রতি সন্দেহ করিলে নিজের বুদ্ধিকে হয়ত প্রতারিত করা হইবে। বুদ্ধির তারতম্যই যে মতের অনৈক্য ঘটে একথা সকল সময়ে খাটে না। অধিকাংশ স্থলে প্রকৃতি-ভেদেই মতভেদ ঘটে অতএব মতের ভিন্নতার প্রতি সম্মান রক্ষা করিলে যে নিজের বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি অসম্মান করা হয় তাহা কদাচই সত্য নহে।

এইটুকুমাত্র ভূমিকা করিয়া "পথ ও পাথেয়" প্রবন্ধে যে আলোচনা উত্থাপিত করিয়াছিলাম তাহারই অনুবৃত্তি করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

সংসারে বাস্তবের সঙ্গে আমাদিগকে কখনো আপস করিয়া কখনো বা লড়াই করিয়া চলিতে হয়। অন্ধতা বা চাতুরীর জোরে বাস্তবকে লঙ্ঘন করিয়া আমরা অতি ছোট কাজটুকুও করিতে পারি না।

অতএব দেশহিতের সংকল্প সম্বন্ধে যখন আমরা তর্ক করি তখন সেই তর্কের একটি প্রধান কথা এই যে, সংকল্পটি যতই বড় হোক্ এবং যতই ভাল হোক্ বাস্তবের সঙ্গে তাহার সামঞ্জস্য আছে কিনা? কোন্ ব্যক্তির চেক্-বহির পাতায় কতগুলা অঙ্ক পড়িয়াছে তাহা লইয়াই তাড়াতাড়ি উৎসাহ করিবার কারণ নাই, কোন্ ব্যক্তির চেক্ ব্যাঙ্কে চলে তাহাই দেখিবার বিষয়।

সঙ্কটের সময় যখন কাহাকেও পরামর্শ দিতে হইবে তখন এমন

পরামর্শ দিলে চলে না যাহা অত্যন্ত সাধারণ। কেহ যখন রিক্তপাত্র লইয়া মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে থাকে কেমন করিয়া তাহার পেট ভরিবে তখন তাহাকে এই কথাটি বলিলে তাহার প্রতি হিতৈষিতা প্রকাশ করা হয় না যে ভাল করিয়া অন্নপান করিলেই ক্ষুধানিবৃত্তি হইয়া থাকে। এই উপদেশের জন্যই সে এতক্ষণ কপালে হাত দিয়া অপেক্ষা করিয়া বসিয়া ছিল না। সত্যকার চিন্তার বিষয় যেটা, সেটাকে লঙ্ঘন করিয়া যত বড় কথাই বলি না কেন তাহা একেবারেই বাজে কথা।

ভারতবর্ষের সম্বন্ধেও প্রধান প্রয়োজনটা কি সে কথা আলোচনা উপলক্ষ্যে আমরা যদি তাহার বর্ত্তমান বাস্তব অভাব ও বাস্তব অবস্থাকে একেবারেই চাপা দিয়া একটা খুব মস্ত নীতিকথা বলিয়া বসি তবে শূন্য তহবিলের চেকের মত সে কথার কোনো মূল্য নাই; তাহা উপস্থিত মত ঋণের দাবী শান্ত করিবার একটা কৌশলমাত্র হইতে পারে কিন্তু পরিণামে তাহা দেনদার বা পাওনাদার কাহারও পক্ষে কিছুমাত্র কল্যাণকর হইতে পারে না।

"পথ ও পাথেয়" প্রবন্ধে আমি যদি সেইরূপ ফাঁকি চালাইবার চেষ্টা করিয়া থাকি তবে বিচার আদালতে ক্ষমা প্রত্যাশা করিতে পারিব না। আমি যদি বাস্তবকে গোপন বা অস্বীকার করিয়া কেবল একটা ভাবের ভুয়া দলিল গড়িয়া থাকি তবে সেটাকে সর্ব্বসমক্ষে খণ্ড বিখণ্ড করাই কর্ত্তব্য। কারণ, ভাব যখন বাস্তবের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া দেখা দেয় তখন গাঁজা বা মদের মত তাহা মানুষকে অকর্ম্মণ্য এবং উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তোলে।

কিন্তু বিশেষ অবস্থায় কোন্‌টা যে প্রকৃত বাস্তব তাহা নির্ণয় করা সোজা নহে। সেই জন্যই অনেক সময় মানুষ মনে করে যেটাকে চোখে দেখা যায় সেটাই সকলের চেয়ে বড় বাস্তব; যেটা মানব-প্রকৃতির নীচের তলায় পড়িয়া থাকে সেটাই আসল সত্য। কোনো ইংরাজ

সাহিত্য-সমালোচক রামায়ণের অপেক্ষা ইলিয়ডের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করিবার কালে বলিয়াছেন, ইলিয়ড কাব্য অধিকতর human, অর্থাৎ মানব চরিত্রের বাস্তবকে বেশী করিয়া স্বীকার করিয়াছে ;—কারণ উক্ত কাব্যে একিলিস নিহত শত্রুর মৃতদেহকে রথে বাঁধিয়া ট্রয়ের পথের ধূলায় লুটাইয়া বেড়াইয়াছেন আর রামায়ণে রাম পরাজিত শত্রুকে ক্ষমা করিয়াছেন। ক্ষমা অপেক্ষা প্রতিহিংসা মানব-চরিত্রের পক্ষে অধিকতর বাস্তব একথার অর্থ যদি এই হয় যে তাহা পরিমাণে বেশি তবে তাহা স্বীকার করা যাইতে পারে। কিন্তু স্থূল পরিমাণই বাস্তবতা পরিমাপের একমাত্র বাটখারা একথা মানুষ কোনো দিনই স্বীকার করিতে পারে না. এইজন্যই মানুষ ঘরভরা অন্ধকারের চেয়ে ঘরের কোণের একটি ক্ষুদ্র শিখাকেই বেশি মান্য করিয়া থাকে।

যাহাই হোক্, একথা সত্য যে মানব-ইতিহাসের বহুতর উপকরণের মধ্যে কোন্‌টা প্রধান কোন্‌টা অপ্রধান, কোন্‌টা বর্ত্তমানের পক্ষে একান্ত বাস্তব এবং কোন্‌টা নহে, তাহা একবার কেবল চোখে দেখিয়াই মীমাংসা করা যায় না। অবশ্য একথা স্বীকার করিতে পারি, উত্তেজনার সময় উত্তেজনাটাকেই সকলের চেয়ে বড় সত্য বলিয়া মনে হয়। রাগের সময় এমন কোনো কথাকেই বাস্তব মূলক বলিয়া মনে হয় না যাহা রাগকে নিবৃত্তি করিবার জন্য দণ্ডায়মান হয়। এরূপ সময় মানুষ সহজেই বলিয়া উঠে, "রেখে দাও তোমার ধর্ম্ম কথা!" বলে যে, তাহার কারণ এ নয় যে, ধর্ম্ম কথাটাই বাস্তব প্রয়োজনের পক্ষে অযোগ্য এবং রুষ্ট বুদ্ধিই তদপেক্ষা উপযোগী কিন্তু তাহার কারণ এই যে, বাস্তব উপযোগিতার প্রতি আমি দৃক্‌পাত করিতে চাই না, বাস্তব প্রবৃত্তি-চরিতার্থতাকেই আমি মান্য করিতে চাই।

কিন্তু প্রবৃত্তি-চরিতার্থতাতে বাস্তবের হিসাব অল্পই করিতে হয়, উপযোগিতায় তাহার চেয়ে অনেক বেশি করা আবশ্যক। মুটিনির পর

যে ইংরেজেরা ভারতবর্ষকে নির্দ্দয়ভাবে দলন করিতে পরামর্শ দিয়াছিল তাহারা মানবচরিত্রের বাস্তবের হিসাবটাকে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ করিয়াই প্রস্তুত করিয়াছিল ; রাগের সময় এই প্রকার সঙ্কীর্ণ হিসাব করাই যে স্বাভাবিক অর্থাৎ মাথাগন্তিতে অধিকাংশ লোকই করিয়া থাকে তাহা ঠিক কিন্তু লর্ড ক্যানিং ক্ষমার দিক্ দিয়া যে বাস্তবের হিসাব করিয়াছিলেন তাহা প্রতিহিংসার হিসাব অপেক্ষা বাস্তবকে অনেক বৃহৎ পরিমাণে অনেক গভীর এবং দূরবিস্তৃতভাবেই গণনা করিয়াছিল।

কিন্তু যাহারা ক্রুদ্ধ তাহারা ক্যানিঙের ক্ষমানীতিকে সেন্টিমেণ্টালিজম্ অর্থাৎ বাস্তব-বর্জ্জিত ভাববাতিকতা বলিতে নিশ্চয়ই কুণ্ঠিত হয় নাই। চিরদিনই এইরূপ হইয়া আসিয়াছে। যে পক্ষ অক্ষৌহিনী সেনাকেই গণনাগৌরবে বড় সত্য বলিয়া মনে করে তাহারা নারায়ণকেই অবজ্ঞা-পূর্ব্বক নিজের পক্ষে না লইয়া নিশ্চিন্ত থাকে। কিন্তু জয়লাভকেই যদি বাস্তবতার শেষ প্রমাণ বলিয়া জানি তবে নারায়ণ যতই একলা হোন্ এবং যতই ক্ষুদ্রমূর্ত্তি ধরিয়া আসুন তিনিই জিতাইয়া দিবেন।

আমার এত কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে যথার্থ বাস্তব যে কোন্ পক্ষে আছে তাহা সাময়িক উত্তেজনার প্রাবল্য বা লোকগণনার প্রাচুর্য্য হইতে স্থির করা যায় না। কোনো একটা কথা শান্তরসাশ্রিত বলিয়াই যে তাহা বাস্তবিকতায় খর্ব্ব, এবং যাহা মানুষকে এত বেগে তাড়না করে যে পথ দেখিবার কোনো অবসর দেয়না তাহাই যে বাস্তবকে অধিক মান্য করিয়া থাকে একথা আমরা স্বীকার করিব না।

"পথ ও পাথেয়" প্রবন্ধে আমি দুইটি কথার আলোচনা করিয়াছি। প্রথমতঃ ভারতবর্ষের পক্ষে দেশহিতব্যাপারটা কি ? অর্থাৎ তাহা দেশী কাপড় পরা বা ইংরেজতাড়ানো বা আর কিছু ? দ্বিতীয়তঃ সেই হিতসাধন করিতে হইবে কেমন করিয়া ?

ভারতবর্ষের পক্ষে চরম হিত যে কি তাহা বুঝিবার বাধা যে কেবল

আমরা নিজেরা উপস্থিত করিতেছি তাহা নহে বস্তুত তাহার সর্ব্বপ্রধান বাধা আমাদের প্রতি ইংরেজের ব্যবহার। ইংরেজ কোনো মতেই আমাদের প্রকৃতিকে মানবপ্রকৃতি বলিয়া গণ্য করিতেই চায় না। তাহারা মনে করে তাহারা যখন রাজা তখন জবাবদিহি কেবলমাত্র আমাদেরই, তাহাদের একেবারেই নাই। বাংলাদেশর একজন ভূতপূর্ব্ব হর্ত্তাকর্ত্তা ভারতবর্ষের চাঞ্চল্য সম্বন্ধে যত কিছু উষ্মা প্রকাশ করিয়াছেন সমস্তই ভারতবাসীর প্রতি। তাঁহার মত এই যে কাগজগুলাকে উচ্ছেদ কর; সুরেন্দ্রবাড়ুযো, বিপিনপালকে দমন করিয়া দাও। দেশকে ঠাণ্ডা করিবার এই একমাত্র উপায় যাহারা অনায়াসে কল্পনাও নিঃসঙ্কোচেপ্রচার করিতে পারে তাহাদের মত ব্যক্তি যে আমাদের শাসনকর্ত্তার পদে প্রতিষ্ঠিত ছিল ইহাই কি দেশের রক্তগরম করিয়া তুলিবার পক্ষে অন্তত একটা প্রধান কারণ নহে? ইংরেজের গায়ে জোর আছে বলিয়াই মানব-প্রকৃতিকে মানিয়া চলা কি তাহার পক্ষে একেবারেই অনাবশ্যক? ভারতবর্ষের চাঞ্চল্য নিবারণের পক্ষে ভারতের পেন্সনভোগী এলিয়টের কি তাঁহার জাতভাইকে একটি কথাও বলিবার নাই? যাহাদের হাতে ক্ষমতা অজস্র তাহাদিগকেই আত্মসম্বরণ করিতে হইবেনা আর যাহারা স্বভাবতই অক্ষম শম দম নিয়ম সংযমের সমস্ত ব্যবস্থা কেবল তাহাদেরই জন্য! তিনি লিখিয়াছেন ভারতবর্ষে ইংরেজের গায়ে যাহারা হাত তোলে তাহারা যাহাতে কোনোমতেই নিষ্কৃতি না পায় সে জন্য সতর্ক হইতে হইবে। আর যে সকল ইংরেজ ভারতবর্ষীয়কে হত্যা করিয়া কেবলি দণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইয়া ব্রিটিশ বিচার সম্বন্ধে চিরস্থায়ী কলঙ্কের রেখা আগুন দিয়া ভারতবর্ষের চিত্তে দাগিয়া দাগিয়া দিতেছে তাহাদের সম্বন্ধেই সতর্ক হইবার কোনো প্রয়োজন নাই? বলদর্পে অন্ধ ধর্ম্মবুদ্ধিহীন এইরূপ স্পর্দ্ধাই কি ভারতবর্ষে ইংরেজশাসনকে এবং ইংরেজের প্রজাকে উভয়কেই ভ্রষ্ট করিতেছে না? অক্ষম যখন অস্থিমজ্জায় জ্বলিয়া

জ্বলিয়া মরে, যখন হাতে হাতে অপমানের প্রতিশোধ লওয়ার কাছে মানবধর্ম্মের আর কোনো উচ্চতর দাবী তাহার কাছে কোনো মতেই রুচিতে চাহেনা তখন কেবল ইংরেজের রক্তচক্ষু পিনালকোডই ভারতবর্ষে শান্তিবর্ষণ করিতে পারে এতশক্তি ভগবান ইংরেজের হাতে দেন নাই। ইংরেজ জেলে দিতে পারে, ফাঁসি দিতে পারে কিন্তু স্বহস্তে অগ্নিকাণ্ড করিয়া তুলিয়া তার পরে পদাঘাতের দ্বারা তাহা নিবাইয়া দিতে পারে না —যেখানে জলের দরকার সেখানে রাজা হইলেও তাহাকে জল ঢালিতে হইবে। তাহা যদি না করে, নিজের রাজদণ্ডকে যদি বিশ্ববিধানের চেয়ে বড় বলিয়া জ্ঞান করে, তবে সেই ভয়ঙ্কর অন্ধতাবশতই দেশে পাপের বোঝা স্তূপাকৃত হইয়া একদিন সেই ঘোরতর অসামঞ্জস্য একটা নিদারুণ বিপ্লবে পরিণত না হইয়া থাকিতেই পারে না। প্রতিদিন দেশের অন্তরে অন্তরে যে চিত্তবেদনা সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে তাহাকে কৃত্রিম বলিয়া আত্মপ্রসাদস্ফীত ইংরেজ উড়াইয়া দিতে পার—মর্লি তাহাকে না মানাই রাষ্ট্রনীতিক সুবুদ্ধিতা বলিয়া মনে করিতে পার এবং এলিয়ট তাহাকে পরাধীন জাতির স্পর্দ্ধামাত্র মনে করিয়া বৃদ্ধ বয়সেও দন্তের উপর দন্তঘর্ষণের অসঙ্গত চেষ্টা করিতে পার কিন্তু তাই বলিয়া অক্ষমেরও এই বেদনার হিসাব কি কেহই রাখিতেছে না মনে কর? বলিষ্ঠ যখন মনে করে যে, নিজের অন্যায় করিবার অবাধ অধিকারকে সে সংযত করিবেনা, কিন্তু ঈশ্বরের বিধানে সেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে যে অনিবার্য্য প্রতিকার চেষ্টা মানব-হৃদয়ে ক্রমশই ধোঁয়াইয়া ধোঁয়াইয়া জ্বলিয়া উঠিতে থাকে তাহাকেই একমাত্র অপরাধী করিয়া দলিত করিয়া দিয়া সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকিবে তখনই বলের দ্বারাই প্রবল আপনার বলের মূলে আঘাত করে;—কারণ তখন সে অশক্তকে আঘাত করে না—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূলে যে শক্তি আছে সেই বজ্রশক্তির বিরুদ্ধে নিজের বদ্ধমুষ্টি চালনা করে। যদি এমন কথা তোমরা বল ভারতবর্ষে আজ যে ক্ষোভ নিরস্ত্রকেও নিদারুণ করিয়া

তুলিতেছে, যাহা অক্ষমের ধৈর্য্যকেও অভিভূত করিয়া তাহাকে নিশ্চিত আত্মঘাতের অভিমুখে তাড়না করিতেছে তাহাতে তোমাদের কোনো হাতই নাই—তোমরা ন্যায়কে কোথাও পীড়িত করিতেছ না, তোমরা স্বভাবসিদ্ধ অবজ্ঞা ও ঔদ্ধত্যের দ্বারা প্রতিদিন তোমাদের উপকারকে উপকৃতের নিকট নিতান্তই অরুচিকর করিয়া তুলিতেছ না, যদি কেবল আমাদেরই দিকে তাকাইয়া এই কথাই বল যে, অকৃতার্থের অসন্তোষ ভারতের পক্ষে অকারণ অপরাধ এবং অপমানের দুঃখদাহ ভারতের পক্ষে নিরবচ্ছিন্ন অকৃতজ্ঞতা, তবে সেই মিথ্যাবাক্যকে রাজতক্তে বসিয়া বলিলেও তাহা ব্যর্থ হইবে এবং তোমাদের টাইম্‌সের পত্রলেখক, ডেলিমেলের সংবাদ-রচয়িতা এবং পায়োনিয়ার ইংলিশম্যানের সম্পাদকে মিলিয়া তাহাকে ব্রিটিশ পশুরাজের ভীমগর্জ্জনে পরিণত করিলেও সেই অসত্যের দ্বারা তোমরা কোনো শুভফল পাইবে না। তোমার গায়ে জোর আছে বটে তবু সত্যের বিরুদ্ধেও তুমি চক্ষু রক্তবর্ণ করিবে এত জোর নাই। নূতন আইনের দ্বারা নূতন লোহার শিকল গড়িয়া তুমি বিধাতার হাত বাঁধিতে পারিবে না।

অতএব মানবপ্রকৃতির সংঘাতে বিশ্বের নিয়মে যে আবর্ত্ত পাক খাইয়া উঠিতেছে তাহার ভীষণত্ব স্মরণ করিয়া আমার প্রবন্ধটুকুর দ্বারা তাহাকে নিরস্ত করিতে পারিব এমন দুরাশা আমার নাই। দুর্ব্বুদ্ধি যখন জাগ্রত হইয়া উঠে তখন একথা মনে রাখিতে হইবে সেই দুর্ব্বুদ্ধির মূলে বহুদিনের বহুতর কারণ সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছিল; একথা মনে রাখিতে হইবে, যেখানে এক পক্ষকে সর্ব্বপ্রকারে অক্ষম ও অনুপায় করা হইয়াছে সেখানে ক্রমশই অপর পক্ষের বুদ্ধিভ্রংশ ও ধর্ম্মহানি ঘটা একেবারেই অনিবার্য্য;—যাহাকে নিয়তই অশ্রদ্ধা অসম্মান করি তাহার সহিত ব্যবহার করিয়া মানুষ কদাচই আত্মসম্মানকে উজ্জ্বল রাখিতে পারে না—দুর্ব্বলের সংস্রবে সবল হিংস্র হইয়া উঠে এবং অধীনের সংস্রবে স্বাধীন অসংযত

হইতে থাকে ;—স্বভাবের এই নিয়মকে কে ঠেকাইতে পারে? অবশেষে জমিয়া উঠিতে উঠিতে ইহার কি কোথাও কোনোই পরিণাম নাই? বাধাহীন কর্ত্তৃত্বে চরিত্রের অসংযম যখন বুদ্ধির অন্ধতাকে আনয়ন করে তখন কি কেবল তাহা দরিদ্রেরই ক্ষতি এবং দুর্ব্বলেরই দুঃখের কারণ হয়?

এইরূপে বাহিরের আঘাতে বহুদিন হইতে দেশের মধ্যে একটা উত্তেজনা ক্রমশই উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিতেছে এই অত্যন্ত প্রত্যক্ষ সত্যটুকুকে কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেনা। এবং ইংরেজ সমস্ত শাসন ও সতর্কতা কেবল একটা দিকে কেবল দুর্ব্বলের দিকে চাপান দিয়া যে একটা অসমতার সৃষ্টি করিতেছে তাহাতে ভারতবাসীর সমস্ত বুদ্ধিকে, সমস্ত কল্পনাকে সমস্ত বেদনাবোধকে অহরহ অতিরিক্ত পরিমাণে এই বাহিরের দিকেই, এই একটা নৈমিত্তিক উৎপাতের দিকেই উদ্রিক্ত করিয়া রাখিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

অতএব, এমন অবস্থায় দেশের কোন্ কথাটা সকলের চেয়ে বড় কথা তাহা যদি একেবারেই ভুলিয়া যাই তবে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। কিন্তু যাহা প্রাকৃতিক তাহা দুর্নিবার হইলেও তাহা সকল সময়ে শ্রেয়স্কর হয় না। হৃদয়াবেগের তীব্রতাকেই পৃথিবীর সকল বাস্তবের চেয়ে বড় বাস্তব বলিয়া মনে করিয়া আমরা যে অনেক সময়েই ভয়ঙ্কর ভ্রমে পড়িয়া থাকি—সংসারে এবং নিজের ব্যক্তিগত জীবনে পদে পদে তাহার পরিচয় পাইয়া আসিয়াছি। জাতির ইতিহাসেও যে এ কথা আরো অনেক বেশি খাটে তাহা স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

"আচ্ছা, ভাল কথা, তুমি কোন্‌টাকে দেশের সকলের চেয়ে গুরুতর প্রয়োজন বলিয়া মনে কর" এই প্রশ্নটাই অনেকে বিশেষ বিরক্তির সহিত আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন ইহা আমি অনুভব করিতেছি। এই বিরক্তিকে স্বীকার করিয়া লইয়াও আমাকে উত্তর দিতে প্রস্তুত হইতে হইবে।

ভারতবর্ষের সম্মুখে বিধাতা যে সমস্যাটি স্থাপিত করিয়াছেন তাহা

অত্যন্ত দুরূহ হইতে পারে কিন্তু সেই সমস্যাটি যে কি তাহা খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন নহে। তাহা নিতান্তই আমাদের সম্মুখে পড়িয়া আছে; অন্য দূর দেশের ইতিহাসের নজিরের মধ্যে তাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইলে তাহার সন্ধান পাওয়া যাইবে না।

ভারতবর্ষের পর্ব্বতপ্রান্ত হইতে সমুদ্রসীমা পর্যান্ত যে জিনিষটি সকলের চেয়ে সুস্পষ্ট হইয়া চোখে পড়িতেছে সেটি কি? সেটি এই যে, এত ভিন্ন জাতি, ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন আচার জগতে আর কোনো একটিমাত্র দেশে নাই।

পশ্চিম দেশের যে সকল ইতিহাস ইস্কুলে পড়িয়াছি তাহার কোথাও আমরা এরূপ সমস্যার পরিচয় পাই নাই। য়ুরোপে যে সকল প্রভেদের মধ্যে সংঘাত বাধিয়াছিল সে প্রভেদগুলি একান্ত ছিল না;—তাহাদের মধ্যে মিলনের এমন একটি সহজ তত্ত্ব ছিল যে যখন তাহারা মিলিয়া গেল তখন তাহাদের মিলনের মুখে জোড়ের চিহ্নটুকু পর্য্যন্ত খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন হইল। প্রাচীন য়ুরোপে গ্রীক্ রোমক গথ প্রভৃতি জাতির মধ্যে বাহিরে শিক্ষাদীক্ষার পার্থক্য যতই থাক্ তাহারা প্রকৃতই একজাতি ছিল। তাহারা পরস্পরের ভাষা, বিদ্যা, রক্ত মিলাইয়া এক হইয়া উঠিবার জন্য স্বতই প্রবণ ছিল। বিরোধের উত্তাপে তাহারা গলিয়া যখনি মিলিয়া গেছে তখনি বুঝা গিয়াছে তাহারা এক ধাতুতেই গঠিত। ইংলণ্ডে একদিন স্যাক্সন্ নর্ম্মান ও কেল্টিক জাতির একত্র সংঘাত ঘটিয়াছিল কিন্তু ইহাদের মধ্যে এমন একটি স্বাভাবিক ঐক্যতত্ত্ব ছিল যে জেতাজাতি জেতারূপে স্বতন্ত্র হইয়া থাকিতে পারিল না; বিরোধ করিতে করিতেই কখন যে এক হইয়া গেল তাহা জানাও গেল না।

অতএব য়ুরোপীয় সভ্যতায় মানুষের সঙ্গে মানুষকে যে ঐক্যে সঙ্গত করিয়াছে তাহা সহজ ঐক্য। য়ুরোপ এখনও এই সহজ ঐক্যকেই মানে—নিজের সমাজের মধ্যে কোনো গুরুতর প্রভেদকে স্থান দিতেই চায়

না, হয় তাহাকে মারিয়া ফেলে নয় তাড়াইয়া দেয়। য়ুরোপের যে-কোনো জাতি হোক না কেন সকলেরই কাছে ইংরেজের উপনিবেশ প্রবেশদ্বার উদ্ঘাটিত রাখিয়াছে আর এসিয়াবাসীমাত্রই যাহাতে কাছে ঘেঁষিতে না পারে সে জন্য তাহাদের সতর্কতা সাপের মত ফোঁস্ করিয়া ফণা মেলিয়া উঠিতেছে।

য়ুরোপের সঙ্গে ভারতবর্ষের এইখানেই গোড়া হইতেই অনৈক্য দেখা যাইতেছে। ভারতবর্ষের ইতিহাস যখনি সুরু হইল সেই মুহূর্ত্তেই বর্ণের সঙ্গে বর্ণের, আর্য্যের সঙ্গে অনার্য্যের বিরোধ ঘটিল। তখন হইতে এই বিরোধের দুঃসাধ্য সমন্বয়ের চেষ্টায় ভারতবর্ষের চিত্ত ব্যাপৃত রহিয়াছে। আর্যসমাজে যিনি অবতার বলিয়া গণ্য সেই রামচন্দ্র দাক্ষিণাত্যে আর্য্য উপনিবেশকে অগ্রসর করিয়া দিবার উপলক্ষ্যে যেদিন গুহক চণ্ডালরাজের সহিত মৈত্রী স্থাপন করিয়াছিলেন, যেদিন কিষ্কিন্ধ্যার অনার্য্যগণকে উচ্ছিন্ন না করিয়া সহায়তায় দীক্ষিত করিয়াছিলেন, এবং লঙ্কার পরাস্ত রাক্ষস-রাজ্যকে নির্ম্মূল করিবার চেষ্টা না করিয়া বিভীষণের সহিত বন্ধুতার যোগে শত্রুপক্ষের শত্রুতা নিরস্ত করিয়াছিলেন, সেইদিন ভারতবর্ষের অভিপ্রায় এই মহাপুরুষকে অবলম্বন করিয়া নিজেকে ব্যক্ত করিয়াছিল। তাহার পর হইতে আজ পর্য্যন্ত এদেশে মানুষের যে সমাবেশ ঘটিয়াছে তাহার মধ্যে বৈচিত্র্যের আর অন্ত রহিল না। যে উপকরণগুলি কোনোমতেই মিলিতে চায় না, তাহাদিগকে একত্রে থাকিতে হইল। এমনভাবে কেবল বোঝা তৈরি হয় কিন্তু কিছুতেই দেহ বাঁধিয়া উঠিতে চায় না। তাই এই বোঝা ঘাড়ে করিয়াই ভারতবর্ষকে শত শত বৎসর ধরিয়া কেবলি চেষ্টা করিতে হইয়াছে, যাহারা বিচ্ছিন্ন কি উপায়ে সমাজের মধ্যে তাহারা সহযোগীরূপে থাকিতে পারে; যাহারা বিরুদ্ধ কি উপায়ে তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্যরক্ষা করা সম্ভব হয়; যাহাদের ভিতরকার প্রভেদ মানবপ্রকৃতি কোনোমতেই অস্বীকার করিতে পারে না কিরূপ ব্যবস্থা করিলে সেই প্রভেদ যথাসম্ভব

পরস্পরকে পীড়িত না করে ;—অর্থাৎ কি করিলে স্বাভাবিক ভেদকে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াও সামাজিক ঐক্যকে যথাসম্ভব মান্য করা যাইতে পারে।

নানা বিভিন্ন লোক যেখানে একত্রে আছে সেখানকার প্রতিমুহূর্তের সমস্যাই এই যে, এই পার্থক্যের পীড়া এই বিভেদের দুর্বলতাকে কেমন করিয়া দূর করা যাইতে পারে। একত্রে থাকিতেই হইবে অথচ কোনোমতেই এক হইতে পারিব না মানুষের পক্ষে এতবড় অমঙ্গল আর কিছুই হইতে পারে না। এমন অবস্থায় প্রথম চেষ্টা হয় প্রভেদকে সুনির্দিষ্ট গণ্ডীদ্বারা স্বতন্ত্র করিয়া দেওয়া ;—পরস্পর পরস্পরকে আঘাত না করে সেইটি সাম্‌লাইয়া যাওয়া ; পরস্পরের চিহ্নিত অধিকারের সীমা কেহ কোনোদিক্ হইতে লঙ্ঘন না করে সেইরূপ ব্যবস্থা করা।

কিন্তু এই নিষেধের গণ্ডিগুলি যাহা প্রথম অবস্থায় বহুবিচিত্রকে একত্রে অবস্থানে সহায়তা করে তাহাই কালক্রমে নানাকে এক হইয়া উঠিতে বাধা দিতে থাকে। তাহা আঘাতকেও বাঁচায় তেমনি মিলনকেও ঠেকায়। অশান্তিকে দূরে খেদাইয়া রাখাই যে শান্তিকে প্রতিষ্ঠা করা তাহা নহে। বস্তুত তাহাতে অশান্তিকে চিরদিনই কোনো একটা জায়গায় জিয়াইয়া রাখা হয় ; বিরোধকে কোনোমতে দূরে রাখিলেও তবু তাহাকে রাখা হয়—ছাড়া পাইলেই তাহার প্রলয় মূর্ত্তি হঠাৎ আসিয়া দেখা দেয়।

শুধু তাই নয়। ব্যবস্থাবদ্ধভাবে একত্রে অবস্থান মাত্র মিলনের নেতিবাচক অবস্থা, ইতিবাচক নহে। তাহাতে মানুষ আরাম পাইতে পারে কিন্তু শক্তি পাইতে পারে না। শৃঙ্খলার দ্বারা কাজ চলে মাত্র, ঐক্যের দ্বারা প্রাণ জাগে।

ভারতবর্ষও এতকাল তাহার বহুতর অনৈক্য ও বিরুদ্ধতাকে একটি ব্যবস্থার মধ্যে টানিয়া প্রত্যেককে এক একটি প্রকোষ্ঠে বদ্ধ করিবার চেষ্টাতেই নিযুক্ত ছিল। অন্য কোনোদেশেই এমন সত্যকার প্রভেদ একত্রে

আসিয়া দাঁড়ায় নাই, সুতরাং অন্য কোনো দেশেরই এমন দুঃসাধ্য সাধনে প্রবৃত্ত হইবার কোনো প্রয়োজনই হয় নাই।

নানা বিশৃঙ্খল বিচ্ছিন্ন সত্য যখন স্তূপাকার হইয়া জ্ঞানের পথরোধ করিবার উপক্রম করে তখন বিজ্ঞানের প্রথম কাজ হয় তাহাদিগকে গুণকর্ম্ম অনুসারে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া ফেলা। কিন্তু কি বিজ্ঞানে কি সমাজে শ্রেণীবদ্ধ করা আরম্ভের কাজ, কলেবরবদ্ধ করাই চূড়ান্ত ব্যাপার। ইঁট কাঠ চূণ সুরকি পাছে বিমিশ্রিত হইয়া পরস্পরকে নষ্ট করে এই জন্য তাহাদিগকে ভাগ ভাগ করিয়া সাজাইয়া রাখাই যে ইমারত নির্ম্মাণ করা তাহা নহে।

আমাদের দেশেও শ্রেণীবিভাগ হইয়া আছে কিন্তু রচনাকার্য্য হয় আরম্ভ হয় নাই নয় অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। একই বেদনায় অনুভূতির দ্বারা আদ্যোপান্ত আবিষ্ট, প্রাণময়, রসরক্তময় স্নায়ুপেশীমাংসের দ্বারা অস্থিরাশি যেমন করিয়া ঢাকা পড়ে তেমনি করিয়াই বিধিনিষেধের শুষ্ক কঠিন ব্যবস্থাকে একেবারে আচ্ছন্ন এবং অন্তরাল করিয়া দিয়া যখন একই সরস অনুভূতির নাড়িজালসমগ্রের মধ্যে প্রাণের চৈতন্যকে ব্যাপ্ত করিয়া দিবে তখনই জানিব মহাজাতি দেহধারণ করিয়াছে।

আমরা যে সকল দেশের ইতিহাস পড়িয়াছি তাহারা বিশেষ বিশেষ পথ দিয়া নিজের সিদ্ধির সাধনা করিয়াছে। যে বিশেষ অমঙ্গল তাহাদের পরিপূর্ণ বিকাশের অন্তরায়, তাহারই সঙ্গে তাহাদিগকে লড়িতে হইয়াছে। একদিন আমেরিকার একটি সমস্যা এই ছিল যে, ঔপনিবেশিক দল একজায়গায়, আর তাহাদের চালকশক্তি সমুদ্রপারে,—ঠিক যেন মাথার সঙ্গে ধড়ের বিচ্ছেদ—এরূপ অসামঞ্জস্য কোনো জাতির পক্ষে বহন করা অসম্ভব। ভূমিষ্ঠ শিশু যেমন মাতৃগর্ভের সঙ্গে কোনো বন্ধনে বাঁধা থাকিতে পারে না—নাড়ি ছেদন করিয়া দিতে হয়—তেমনি আমেরিকার সম্মুখে যেদিন এই নাড়ি ছেদনের প্রয়োজন উপস্থিত হইল সেদিন সে ছুরি লইয়া তাহা কাটিল। একদিন ফ্রান্সের সম্মুখে একটি সমস্যা

এই ছিল যে, সেখানে শাসয়িতার দল ও শাসিতের দল যদিচ একই জাতিভুক্ত তথাপি তাহাদের পরস্পরের জীবনযাত্রা ও স্বার্থ এতই সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল যে সেই অসামঞ্জস্যের পীড়ন মানুষের পক্ষে দুর্ব্বহ হইয়াছিল। এই কারণে এই আত্মবিচ্ছেদকে দূর করিবার জন্য ফ্রান্সকে রক্তপাত করিতে হইয়াছিল।

বাহ্যত দেখিতে গেলে, সেই আমেরিকা ও ফ্রান্সের সমস্যার সঙ্গে ভারতবর্ষের মিল আছে। ভারতবর্ষেও শাসয়িতা ও শাসিত পরস্পর অসংলগ্ন। তাহাদের পরস্পর সম-অবস্থা ও সমবেদনার কোনো যোগই নাই। এমন স্থলে শাসনপ্রণালীর মধ্যে সুব্যবস্থার অভাব না ঘটিতে পারে;—কিন্তু কেবলমাত্র ব্যবস্থার অপেক্ষা মানুষের প্রয়োজন অনেক বেশি। যে আনন্দে মানুষ বাঁচে এবং মানুষ বিকাশ লাভ করে, তাহা কেবল আইন আদালত সুপ্রতিষ্ঠিত ও ধনপ্রাণ সুরক্ষিত হওয়া নহে। ফল কথা, মানুষ আধ্যাত্মিক জীব—তাহার শরীর আছে, মন আছে, হৃদয় আছে—তাহাকে তৃপ্ত করিতে গেলে তাহার সমস্তকেই তৃপ্ত করিতে হয়—যে কোনো পদার্থে সজীব সর্ব্বাঙ্গীনতার অভাব আছে তাহাতে সে পীড়িত হইবেই;—তাহাকে কোন্ জিনিষ দেওয়া গেল সেই হিসাবটাই তাহার পক্ষে একমাত্র হিসাব নহে, তাহাকে কেমন করিয়া দেওয়া হইল সেই হিসাবটা আরও বড় হিসাব। উপকার তাহার পক্ষে বোঝা হইয়া উঠে যদি সেই উপকারের সঙ্গে সঙ্গে আত্মশক্তির উপলব্ধি না থাকে। সে অত্যন্ত কঠিন শাসনও নীরবে সহ্য করিতে পারে, এমন কি, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহাকে বরণ করিতে পারে যদি তাহার সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতার আনন্দ থাকে। তাই বলিতেছিলাম, কেবলমাত্র সুব্যবস্থা মানুষকে পূর্ণ করিয়া রাখিতে পারে না।

অথচ যেখানে শাসয়িতা ও শাসিত পরস্পর দূরবর্ত্তী হইয়া থাকে, উভয়ের মাঝখানে প্রয়োজনের অপেক্ষা উচ্চতর আত্মীয়তর কোনো সম্পর্ক

স্থাপিত হইতে বাধা পায়, সেখানে রাষ্ট্রব্যাপার যদি অত্যন্ত ভালও হয় তবে তাহা বিশুদ্ধ আপিস আদালত এবং নিতান্তই আইন কানুন ছাড়া আর কিছু হইতেই পারে না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও মানুষ কেন যে কেবলি কৃশ হইতে থাকে, তাহার অন্তর বাহির কেন যে আনন্দহীন হইয়া উঠে তাহা কর্ত্তা কিছুতেই বুঝিতে চান না, কেবলি রাগ করেন—এমন কি, ভোক্তাও ভাল করিয়া নিজেই বুঝিতে পারে না। অতএব শাসয়িতা ও শাসিত পরস্পর বিচ্ছিন্ন থাকাতে যে জীবনহীন শুষ্ক শাসনপ্রণালী ঘটা একেবারেই অনিবার্য্য ভারতের ভাগ্যে তাহা ঘটিয়াছে সে কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না।

তাহার পরে অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রান্সের সঙ্গে বর্ত্তমান ভারতের একটা মিল আছে সে কথাও মানিতে হইবে। আমাদের শাসনকর্ত্তাদের জীবনযাত্রা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি ব্যয় সাধ্য। তাঁহাদের খাওয়া পরা বিলাস বিহার, তাঁহাদের সমুদ্রের এপার ওপার দুই পারের রসদ জোগানো, তাঁহাদের এখানকার কর্ম্মাবসানে বিলাতী অবকাশের আরামের আয়োজন এ সমস্তই আমাদিগকে করিতে হইতেছে। দেখিতে দেখিতে তাঁহাদের বিলাসের মাত্রা কেবলি অত্যন্ত বাড়িয়া চলিয়াছে তাহা সকলেই অবগত আছেন। এই সমস্ত বিলাসের খরচা জোগাইবার ভার এমন ভারতবর্ষের, যাহার দুইবেলার অন্ন পূরা পরিমাণে জোটে না। এমন অবস্থায় যাহারা বিলাসী প্রবলপক্ষ, তাহাদের অন্তঃকরণ নির্ম্মম হইয়া উঠিতে বাধ্য। যদি তাহাদিগকে কেহ বলে ঐ দেখ এই হতভাগাগুলা খাইতে পায় না, তাহারা প্রমান করিতে ব্যস্ত হয় যে ইহাদের পক্ষে এইরূপ খাওয়াই স্বাভাবিক এবং ইহাই যথেষ্ট। যে সব কেরাণী ১৫।২০ টাকায় ভূতের খাটুনি খাটিয়া মরিতেছে মোটা মাহিনার বড় সাহেব ইলেক্‌ট্রীক পাখার নীচে বসিয়া একবার চিন্তা করিতেও চেষ্টা করে না যে কেমন করিয়া পরিবারের ভার লইয়া ইহাদের দিন চলিতেছে। তাহারা

মনকে শান্ত সুস্থির রাখিতে চায় নতুবা তাহাদের পরিপাকের ব্যাঘাত এবং যকৃতের বিকৃতি ঘটে। এ কথা যখন নিশ্চিত যে অল্পে তাহাদের চলে না, এবং ভারতবর্ষের উপরেই তাহাদের নির্ভর তখন তাহাদের তুলনায় তাহাদের চারিদিকের লোকে কি খায় পরে কেমন করিয়া দিন কাটায় তাহা নিঃস্বার্থভাবে তাহারা বিচার কখনই করিতে পারে না। বিশেষত এক আধজন লোক ত নয়—কেবল ত একটি রাজা নয় একজন সম্রাট নয়—একেবারে একটি সমগ্র জাতির বাবুয়ানার সম্বল এই ভারতবর্ষকে যোগাইতে হইবে। যাহারা বহুদূরে থাকিয়া রাজার হালে বাঁচিয়া থাকিতে চায় তাহাদের জন্য আত্মীয়তা-সম্পর্কশূন্য অপরজাতিকে অন্নবস্ত্র সমস্ত সঙ্কীর্ণ করিয়া আনিতে হইতেছে এই যে নিষ্ঠুর অসামঞ্জস্য ইহা যে প্রতিদিন বাড়িয়াই চলিল তাহা কেবল তাঁহারাই অস্বীকার করিতেছেন যাঁহাদের পক্ষে আরাম অত্যন্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে।

অতএব, এক পক্ষে বড় বড় বেতন, মোটা পেন্সন এবং লম্বা চাল, অন্যপক্ষে নিতান্ত ক্লেশে আধপেটা আহারে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ ;—অবস্থার এই অসঙ্গতি একেবারে গায়ে গায়ে সংলগ্ন। শুধু অন্নবস্ত্রের হীনতা নহে, আমাদের তরফে সম্মানে লাঘবতা এত অত্যন্ত অধিক, পরস্পরের মূল্যের তারতম্য এত অতিমাত্র, যে, আইনের পক্ষেও পক্ষপাত বাঁচাইয়া চলা অসাধ্য ; এমন স্থলে যতদিন যাইতেছে ভারতবর্ষের বক্ষের উপর বিদেশীর ভার ততই গুরুতর হইতেছে, উভয়পক্ষের মধ্যেকার অসাম্য নিরতিশয় অপরিমিত হইয়া উঠিতেছে ইহা আজ আর কাহারো বুঝিতে বাকি নাই। ইহাতে একদিকে বেদনা যতই দুঃসহ হইতেছে আর একদিকে অসাড়তা ও অবজ্ঞা ততই গভীরতা লাভ করিতেছে। এইরূপ অবস্থাই যদি টিকিয়া যায় তবে ইহাতে একদিন না একদিন ঝড় আনিয়া উপস্থিত করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

এইরূপ কতকটা ঐক্য থাকা সত্ত্বেও তথাপি আমাদিগকে বলিতে

হইবে বিপ্লবের পূর্ব্বে আমেরিকা ও ফ্রান্সের সম্মুখে যে একমাত্র সমস্যা বর্ত্তমান ছিল—অর্থাৎ যে সমস্যাটির মীমাংসার উপরেই তাহাদের মুক্তি সম্পূর্ণ নির্ভর করিত আমাদের সম্মুখে সেই সমস্যাটি নাই। অর্থাৎ আমরা যদি দরখাস্তের জোরে বা গায়ের জোরে ইংরেজকে ভারতবর্ষ হইতে বিদায় লইতে রাজি করিতে পারি তাহা হইলেও আমাদের সমস্যার কোনো মীমাংসাই হয় না;—তাহা হইলে হয় ইংরেজ আবার ফিরিয়া আসিবে, নয়, এমন কেহ আসিবে যাহার মুখের গ্রাস এবং পেটের পরিধি ইংরেজের চেয়ে হয় ত ছোট না হইতে পারে।

একথা বলাই বাহুল্য, যে দেশে একটি মহাজাতি বাঁধিয়া ওঠে নাই সেদেশে স্বাধীনতা হইতেই পারে না। কারণ স্বাধীনতার "স্ব" জিনিষটা কোথায়? স্বাধীনতা কাহার স্বাধীনতা? ভারতবর্ষে বাঙালী যদি স্বাধীন হয় তবে দাক্ষিণাত্যের নায়র জাতি নিজেকে স্বাধীন বলিয়া গণ্য করিবে না এবং পশ্চিমের জাঠ যদি স্বাধীনতা লাভ করে তবে পূর্ব্ব-প্রান্তের আসামী তাহার সঙ্গে একই ফল পাইল বলিয়া গৌরব করিবে না। এক বাংলাদেশেই হিন্দুর সঙ্গে মুসলমান যে নিজের ভাগ্য মিলাইবার জন্য প্রস্তুত এমন কোনো লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। তবে স্বাধীন হইবে কে? হাতের সঙ্গে পা, পায়ের সঙ্গে মাথা যখন একেবারে পৃথক্ হইয়া হিসাব মিলাইতে থাকে তখন লাভ বলিয়া জিনিষটা কাহার?

এমন তর্কও শুনা যায় যে, যতদিন আমরা পরের কড়া শাসনের অধীন হইয়া থাকিব ততদিন আমরা জাত বাঁধিয়া তুলিতেই পারিব না—পদে পদে বাধা পাইব এবং একত্র মিলিয়া যে সকল বড় বড় কাজ করিতে করিতে পরস্পরে মিল হইয়া যায় সেই সকল কাজের অবসরই পাইব না। একথা যদি সত্য হয় তবে এ সমস্যার কোনা মীমাংসাই নাই। কারণ, বিচ্ছিন্ন কোনো দিনই মিলিতের সঙ্গে বিরোধ করিয়া

জয়লাভ করিতে পারে না। বিচ্ছিন্নের মধ্যে সামর্থ্যের ছিন্নতা, উদ্দেশ্যের ছিন্নতা, অধ্যবসায়ের ছিন্নতা। বিচ্ছিন্ন জিনিষ জড়ের মত পড়িয়া থাকিলে তবু টিঁকিয়া থাকে কিন্তু কোনো উপায়ে কোনো বায়ুবেগে তাহাকে চালনা করিতে গেলেই সে ছড়াইয়া পড়ে, সে ভাঙিয়া যায়, তাহার এক অংশ অপর অংশকে আঘাত করিতে থাকে; তাহার অভ্যন্তরের সমস্ত দুর্ব্বলতা নানা মূর্ত্তিতে জাগিয়া উঠিয়া তাহাকে বিনাশ করিতে উদ্যত হয়। নিজেরা এক না হইতে পারিলে আমরা এমন কোনো এককে স্থানচ্যুত করিতে পারিব না যাহা কৃত্রিমভাবেও সেই ঐক্যের স্থান পূরণ করিয়া আছে।

শুধু পারিব না তাহা নহে কোনো নিতান্ত আকস্মিক কারণে পারিলেও যে একটি মাত্র বাহ্যবন্ধনে আমরা বিধৃত হইয়া আছি তাহাও ছিন্ন হইয়া পড়িবে। তখন আমাদের নিজের মধ্যে বিরোধ বাধিলে, আমরা কোনো এক প্রকার করিয়া, কিছুকাল মারামারি কাটাকাটির পর তাহার একটা কিছু মীমাংসা করিয়া লইব ইহাও সম্ভব হইবে না। আমাদিগকে সেই সময়টুকুও কেহ দিবে না। কারণ, আমরাই যেন আমাদের সুযোগের সুবিধাটুকু লইবার জন্য প্রস্তুত না থাকিতে পারি, কিন্তু জগতে যে সকল প্রবলজাতি সময়ে অসময়ে সর্ব্বদাই প্রস্তুত হইয়া আছে তাহারা আমাদের ঘরাও যুদ্ধকাণ্ড, অভিনয়ের দর্শকদের মত, দূরে বসিয়া দেখিবে না। ভারতবর্ষ এমন স্থান নহে, লুব্ধের চক্ষু যাহার উপর হইতে কোনোদিনই অপসারিত হইবে।

অতএব যে দেশে বহু বিচ্ছিন্ন জাতিকে লইয়া এক মহাজাতি তৈরি হইয়া উঠে নাই সে দেশে ইংরেজের কর্ত্তৃত্ব থাকিবে কি না থাকিবে সেটা আলোচনার বিষয় নহে; সেই মহাজাতিকে গড়িয়া তোলাই সেখানে এমন একটি উদ্দেশ্য অন্য সমস্ত উদ্দেশ্যই যাহার কাছে মাথা অবনত করিবে—এমন কি, ইংরেজ রাজত্ব যদি এই উদ্দেশ্যসাধনের

সহায়তা করে তবে ইংরেজরাজত্বকেও আমাদের ভারতবর্ষেরই সামগ্রী করিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। তাহা অন্তরের সহিত প্রীতির সহিত স্বীকার করিবার অনেক বাধা আছে। সেই বাধাগুলিকে দূর করিয়া ইংরেজ রাজত্ব কি করিলে আমাদের আত্মসম্মানকে পীড়িত না করে, কি করিলে তাহার সহিত আমাদের গৌরবকর আত্মীয় সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে এই অতি কঠিন প্রশ্নের মীমাংসাভারও আমাদিগকে লইতে হইবে। রাগ করিয়া যদি বলি "না আমরা চাই না" তবু আমাদিগকে চাহিতেই হইবে কারণ যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা এক হইয়া মহাজাতি বাঁধিয়া উঠিতে না পারি ততক্ষণ পর্য্যন্ত ইংরেজরাজত্বের যে প্রয়োজন তাহা কখনই সম্পূর্ণ হইবে না।

আমাদের দেশের সকলের চেয়ে বড় সমস্যা যে কি, অল্পদিন হইল বিধাতা তাহার প্রতি আমাদের সমস্ত চেতনাকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। আমরা সেদিন মনে করিয়াছিলাম, পার্টিশন ব্যাপারে আমরা যে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছি ইহাই ইংরেজকে দেখাইব, আমরা বিলাতী নিমকের সম্বন্ধ কাটিব এবং দেশের বিলাতী বস্ত্রহরণ না করিয়া জলগ্রহণ করিব না। পরের সঙ্গে যুদ্ধঘোষণা যেমনি করিয়াছি অমনি ঘরের মধ্যে এমন একটা গোল বাধিল যে, এমনতর আর কখনো দেখা যায় নাই। হিন্দুতে মুসলমানে বিরোধ হঠাৎ অত্যন্ত মর্ম্মান্তিকরূপে বীভৎস হইয়া উঠিল।

এই ব্যাপার আমাদের পক্ষে যতই একান্ত কষ্টকর হৌক কিন্তু আমাদের এই শিক্ষার প্রয়োজন ছিল। এ কথা আমাদের সম্পূর্ণ নিশ্চিতরূপেই জানা আবশ্যক ছিল, অদ্য আমাদের দেশে হিন্দু ও মুসলমান যে পৃথক এই বাস্তবটিকে বিস্মৃত হইয়া আমরা যে কাজ করিতেই যাই না কেন এই বাস্তবটি আমাদিগকে কখনই বিস্মৃত হইবে না। একথা বলিয়া নিজেকে ভুলাইলে চলিবে না যে,

হিন্দুমুসলমানের সম্বন্ধের মধ্যে কোনো পাপই ছিল না, ইংরেজই মুসলমানকে আমাদের বিরুদ্ধ করিয়াছে।

ইংরেজ যদি মুসলমানকে আমাদের বিরুদ্ধে সত্যই দাঁড় করাইয়া থাকে তবে ইংরেজ আমাদের একটি পরম উপকার করিয়াছে—দেশের যে একটি প্রকাণ্ড বাস্তব সত্যকে আমরা মূঢ়ের মত না বিচার করিয়াই দেশের বড় বড় কাজের আয়োজনের হিসাব করিতে ছিলাম, একেবারে আরম্ভেই তাহার প্রতি ইংরেজ আমাদের দৃষ্টি ফিরাইয়াছে। ইহা হইতে কোনো শিক্ষাই না লইয়া আমরা যদি ইংরেজের উপরেই সমস্ত রাগের মাত্রা চড়াইতে থাকি তবে আমাদের মূঢ়তা দূর করিবার জন্য পুনর্ব্বার আমাদিগকে আঘাত সহিতে হইবে;—যাহা প্রকৃত যেমন করিয়াই হোক্ তাহাকে আমাদের বুঝিতেই হইবে;—কোনোমতেই তাহাকে এড়াইয়া চলিবার কোনো পন্থাই নাই।

এই সঙ্গে একটা কথা বিশেষ করিয়া মনে রাখিতে হইবে যে, হিন্দু ও মুসলমান, অথবা হিন্দুদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ বা উচ্চ ও নীচবর্ণের মধ্যে মিলন না হইলে আমাদের কাজের ব্যাঘাত হইতেছে অতএব কোনোমতে মিলনসাধন করিয়া আমরা বল লাভ করিব এই কথাটাই সকলের চেয়ে বড় কথা নয়, সুতরাং ইহাই সকলের চেয়ে সত্য কথা নহে।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কেবলমাত্র প্রয়োজনসাধনের সুযোগ, কেবলমাত্র সুব্যবস্থার চেয়ে অনেক বেশি নহিলে মানুষের প্রাণ বাঁচে না। যিশু বলিয়া গিয়াছেন মানুষ কেবলমাত্র রুটির দ্বারা জীবনধারণ করে না; তাহার কারণ, মানুষের কেবল শারীর জীবন নহে। সেই বৃহৎ জীবনের খাদ্যাভাব ঘটিতেছে বলিয়া ইংরেজরাজত্ব সকলপ্রকার সুশাসনসত্ত্বেও আমাদের আনন্দ শোষণ করিয়া লইতেছে।

কিন্তু এই যে খাদ্যাভাব এ যদি কেবল বাহির হইতেই ইংরেজ

শাসন হইতেই ঘটিত তাহা হইলে কোনো প্রকারে বাহিরের সংশোধন করিতে পারিলেই আমাদের কার্য্য সমাধা হইয়া যাইত। আমাদের নিজের অন্তঃপুরের ব্যবস্থাতেও দীর্ঘকাল হইতেই এই উপবাসের ব্যাপার চলিয়া আসিতেছে। আমরা হিন্দু ও মুসলমান, আমরা ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশীয় হিন্দুজাতি এক জায়গায় বাস করিতেছি বটে কিন্তু মানুষ মানুষকে রুটির চেয়ে যে উচ্চতর খাদ্য জোগাইয়া প্রাণে শক্তিতে আনন্দে পরিপুষ্ট করিয়া তোলে আমরা পরস্পরকে সেই খাদ্য হইতেই বঞ্চিত করিয়া আসিয়াছি। আমাদের সমস্ত হৃদয়বৃত্তি সমস্ত হিতচেষ্টা, পরিবার ও বংশের মধ্যে, এবং এক-একটি সঙ্কীর্ণ সমাজের মধ্যে এতই অতিশয় পরিমাণে নিবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে যে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সাধারণ আত্মীয়তার যে বৃহৎ সম্বন্ধ তাহাকে স্বীকার করিবার সম্বল আমরা কিছুই উদ্বৃত্ত রাখি নাই। সেই কারণে আমরা দ্বীপপুঞ্জের মতই খণ্ড খণ্ড হইয়া আছি, মহাদেশের মত ব্যাপ্ত বিস্তৃত ও এক হইয়া উঠিতে পারি নাই।

প্রত্যেক ক্ষুদ্র মানুষটি বৃহৎ মানুষের সঙ্গে নিজের ঐক্য নানা মঙ্গলের দ্বারা নানা আকারে উপলব্ধি করিতে থাকিবে। এই উপলব্ধি তাহার কোনো বিশেষ কার্য্যসিদ্ধির উপায় বলিয়াই গৌরবের নহে, ইহা তাহার প্রাণ, ইহাই তাহার মনুষ্যত্ব অর্থাৎ তাহার ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম হইতে সে যে পরিমাণেই বঞ্চিত হয় সেই পরিমাণেই সে শুষ্ক হয়। আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে বহুদিন হইতেই ভারতবর্ষে আমরা এই শুষ্কতাকে প্রশ্রয় দিয়া আসিয়াছি। আমাদের জ্ঞান, কর্ম্ম, আচার ব্যবহারের, আমাদের সর্ব্বপ্রকার আদানপ্রদানের বড় বড় রাজপথ এক একটা ছোট ছোট মণ্ডলীর সম্মুখে আসিয়া খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে, আমাদের হৃদয় ও চেষ্টা প্রধানত আমাদের নিজের ঘর নিজের গ্রামের মধ্যেই ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে, তাহা বিশ্বমানবের অভিমুখে নিজেকে উদ্ঘাটিত করিয়া

দিবার অবসর পায় নাই। এই কারণে আমরা পারিবারিক আরাম পাইয়াছি, ক্ষুদ্র সমাজের সহায়তা পাইয়াছি কিন্তু বৃহৎ মানুষের শক্তি ও সম্পূর্ণতা হইতে আমরা অনেক দিন হইতে বঞ্চিত হইয়া দীনহীনের মত বাস করিতেছি।

সেই প্রকাণ্ড অভাব পূরণ করিবার উপায় আমরা নিজের মধ্যে হইতেই যদি বাঁধিয়া তুলিতে না পারি তবে বাহির হইতে তাহা পাইব কেমন করিয়া? ইংরেজ চলিয়া গেলেই আমাদের এই ছিদ্র পূরণ হইবে আমরা এ কল্পনা কেন করিতেছি? আমরা যে পরস্পরকে শ্রদ্ধা করি নাই, সহায়তা করি নাই, আমরা যে পরস্পরকে চিনিবার মাত্রও চেষ্টা করি নাই, আমরা যে এতকাল "ঘর হইতে আঙিনা বিদেশ" করিয়া বসিয়া আছি;—পরস্পর সম্বন্ধে আমাদের সেই ঔদাসীন্য, অবজ্ঞা, সেই বিরোধ আমাদিগকে যে একান্তই ঘুচাইতে হইবে সে কি কেবলমাত্র বিলাতী কাপড় ত্যাগ করিবার সুবিধা হইবে বলিয়া, সে কি কেবলমাত্র ইংরেজ কর্তৃপক্ষের নিকট নিজের শক্তি প্রচার করিবার উদ্দেশে? এ নহিলে আমাদের ধর্ম্ম পীড়িত হইতেছে, আমাদের মনুষ্যত্ব সঙ্কুচিত হইতেছে; এ নহিলে আমাদের বুদ্ধি সঙ্কীর্ণ হইবে, আমাদের জ্ঞানের বিকাশ হইবে না—আমাদের দুর্ব্বল চিত্ত শত শত অন্ধসংস্কারের দ্বারা জড়িত হইয়া থাকিবে—আমরা আমাদের অন্তর-বাহিরের সমস্ত অধীনতার বন্ধন ছেদন করিয়া নির্ভয়ে নিঃসঙ্কোচে বিশ্বসমাজের মধ্যে মাথা তুলিতে পারিব না। সেই নির্ভীক নির্বাধ বিপুল মনুষ্যত্বের অধিকারী হইবার জন্যই আমাদিগকে পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরকে ধর্ম্মের বন্ধনে বাঁধিতে হইবে। ইহা ছাড়া মানুষ কোনোমতেই বড় হইতে পারে না, কোনোমতেই সত্য হইতে পারে না। ভারতবর্ষে যে কেহ আছে যে, কেহ আসিয়াছে, সকলকে লইয়াই আমরা সম্পূর্ণ হইব—ভারতবর্ষে বিশ্বমানবের একটি প্রকাণ্ড সমস্যার মীমাংসা হইবে। সে

সমস্যা এই যে পৃথিবীতে মানুষ বর্ণে ভাষায় স্বভাবে আচরণে ধর্ম্মে বিচিত্র—নরদেবতা এই বিচিত্রকে লইয়াই বিরাট্—সেই বিচিত্রকে আমরা এই ভারতবর্ষের মন্দিরে একাঙ্গ করিয়া দেখিব। পার্থক্যকে নির্ব্বাসিত বা বিলুপ্ত করিয়া নহে কিন্তু সর্ব্বত্র ব্রহ্মের উদার উপলব্ধি দ্বারা; মানবের প্রতি সর্ব্বসহিষ্ণু পরম প্রেমের দ্বারা; উচ্চনীচ, আত্মীয়পর, সকলের সেবাতেই ভগবানের সেবা স্বীকার করিয়া। আর কিছু নহে শুভচেষ্টার দ্বারা দেশকে জয় করিয়া লও—যাহারা তোমাকে সন্দেহ করে তাহাদের সন্দেহকে জয় কর, যাহারা তোমার প্রতি বিদ্বেষ করে তাহাদের বিদ্বেষকে পরাস্ত কর। রুদ্ধ দ্বারে আঘাত কর, বারম্বার আঘাত কর—কোনো নৈরাশ্য, কোনো আত্মাভিমানের ক্ষুণ্ণতায় ফিরিয়া যাইয়ো না; মানুষের হৃদয় মানুষের হৃদয়কে চিরদিন কখনই প্রত্যাখ্যান করিতে পারে না।

ভারতবর্ষের আহ্বান আমাদের অন্তঃকরণকে স্পর্শ করিয়াছে। সেই আহ্বান যে সংবাদপত্রের ক্রুদ্ধ গর্জ্জনের মধ্যেই ধ্বনিত হইয়াছে বা হিংস্র উত্তেজনার মুখরতার মধ্যেই তাহার যথার্থ প্রকাশ একথা আমরা স্বীকার কবিব না কিন্তু সেই আহ্বান যে আমাদের অন্তরাত্মাকে উদ্বোধিত করিতেছে তাহা তখনই বুঝিতে পারি যখন দেখি আমরা জাতি বর্ণ নির্ব্বিচারে—দুর্ভিক্ষ কাতরের দ্বারে অন্নপাত্র বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছি, যখন দেখি ভদ্রাভদ্র বিচার না করিয়া প্রবাসে সমাগত যাত্রীদের সহায়তার জন্য আমরা বদ্ধপরিকর হইয়াছি, যখন দেখি রাজপুরুষদের নির্ম্মম সন্দেহ ও প্রতিকূলতার মুখেও অত্যাচার-প্রতিরোধের প্রয়োজনকালে আমাদের যুবকদিগকে কোনো বিপদের সম্ভাবনা বাধা দিতেছে না। সেবায় আমাদের সঙ্কোচ নাই, কর্ত্তব্যে আমাদের ভয় ঘুচিয়া গিয়াছে, পরের সহায়তায় আমরা উচ্চনীচের বিচার বিস্মৃত হইয়াছি, এই যে সুলক্ষণ দেখা দিয়াছে ইহা হইতে বুঝিয়াছি, এবার

আমাদের উপরে যে আহ্বান আসিয়াছে তাহাতে সমস্ত সঙ্কীর্ণতার অন্তরাল হইতে আমাদিগকে বাহিরে আনিবে—ভারতবর্ষে এবার মানুষের দিকে মানুষের টান পড়িয়াছে। এবারে, যেখানে যাহার কোনো অভাব তাহা পূরণ করিবার জন্য আমাদিগকে যাইতে হইবে;—অন্ন স্বাস্থ্য ও শিক্ষা বিতরণের জন্য আমাদিগকে নিভৃত পল্লীর প্রান্তে নিজের জীবন উৎসর্গ করিতে হইবে; আমাদিগকে আর কেহই নিজের স্বার্থ ও স্বচ্ছন্দতার মধ্যে ধরিয়া রাখিতে পারিবে না। বহুদিনের শুষ্কতা ও অনাবৃষ্টির পর বর্ষা যখন আসে তখন সে ঝড় লইয়াই আসে—কিন্তু নববর্ষার সেই আরম্ভকালীন ঝড়টাই এই নূতন আবির্ভাবের সকলের চেয়ে বড় অঙ্গ নহে, তাহা স্থায়ীও হয় না। বিদ্যুতের চাঞ্চল্য বজ্রের গর্জ্জন এবং বায়ুর উন্মত্ততা আপনি শান্ত হইয়া আসিবে,—তখন মেঘে মেঘে জোড়া লাগিয়া আকাশের পূর্ব্বপশ্চিম স্নিগ্ধতায় আবৃত হইয়া যাইবে—চারিদিকে ধারা বর্ষণ হইয়া তৃষিতের পাত্রে জল ভরিয়া উঠিবে এবং ক্ষুধিতের ক্ষেত্রে অন্নের আশা অঙ্কুরিত হইয়া দুই চক্ষু জুড়াইয়া দিবে। মঙ্গলে পরিপূর্ণ সেই বিচিত্র সফলতার দিন বহুকাল প্রতীক্ষার পরে আজ ভারতবর্ষে দেখা দিয়াছে এই কথা নিশ্চয় জানিয়া আমরা যেন আনন্দে প্রস্তুত হই। কিসের জন্য? ঘর ছাড়িয়া মাঠের মধ্যে নামিবার জন্য, মাটি চষিবার জন্য, বীজ বুনিবার জন্য—তাহার পরে সোনার ফসলে যখন লক্ষ্মীর আবির্ভাব হইবে তখন সেই লক্ষ্মীকে ঘরে আনিয়া নিত্যোৎসবের প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য।